জল
পড়ে
পাতা
নড়ে

জল পড়ে পাতা নড়ে

গৌরকিশোর ঘোষ

ত্রিবেণী প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জল পড়ে পাতা নড়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ হলেও, এটা আমার "দেশ ও মাটি মানুষ" নামক এপিক উপন্যাসের প্রথম খণ্ড। এই উপন্যাসের ঘটনাকাল খৃঃ পূঃ ১৯২২ থেকে ১৯২৬। রচনাকাল ১৯৫৯। বর্ণিত চরিত্রগুলি সবই কল্পিত। তবু যদি কারোর সঙ্গে কোন চরিত্রের সাদৃশ্য দেখা যায় তবে সে যোগাযোগ নিতান্তই দৈব এবং লেখকের অনভিপ্রেত।

বরাহনগর,

২৫শে বৈশাখ ১৩৬৭

গৌরকিশোর ঘোষ

এই লেখকের

এই কলকাতায়
রূপদর্শীর নক্‌শা
সার্কাস
নাচের পুতুল
কথায় কথায়
স্বর্গ যদি কোথাও থাকে
চেনা মুখ
রঙ্গ ব্যঙ্গ
মেঘনামতী
অন্নপূর্ণা
মন মানে না

মানবধর্মী শিবনারায়ণ রায়কে

দুরন্ত ধারা

এক

একে শনিবারের বারবেলা, তায় আমাবস্তে। লোহাজাঙার সা'দের কুড়োনের মা ঘাটে গিয়েছিল ভর সন্ধ্যেয়। গা ধোয়াও হবে, এক কলসী জলও আনা হবে।

কুঠির ঘাটটা জায়গা ভাল নয়। আসশ্যাওড়া, বুনো কুল আর বাবলা গাছের জঙ্গলে ভর্তি। আর জঙ্গলের মধ্যে, এখন যেখানে নজর যায় না, নীল জাগ দেবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাড়ি আকাশপানে মুখ তুলে রাক্ষসের মত হাঁ করে সব বসে আছে। যাকে পাবে তাকেই গিলবে, এই ভাব।

কুঠির মাঠে নাকি বাঘ-ভাল্লুকও যায় না। কুঠির ঘাটে সন্ধ্যেবলায় যেতে সাহসী পুরুষও দ্বিধা করে।

কিন্তু সা'দের বাড়ির কুড়োনের মার কথা আলাদা। সে পুরুষমানুষের কাঁধে পা দিয়ে চলে। ভয়-ডর কুড়োনের মার ছায়া মাড়ায় না।

এ দিগরের মধ্যে কুড়োনের মা-ই একমাত্র মনিষ্যি যে নিত্য সন্ধ্যায় কুটির ঘাটে গা ধুতে আসে আর জল নিয়ে ফেরে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা নেই। বাধা বিপত্তি গেরাহ্যি নেই।

সেদিনও গা ধুতে এসেছিল কুড়োনের মা। এই চোত-সংক্রান্তির আগের দিন। গা ধুয়ে উঠে ভরা ঘড়া কাঁখে নিয়ে রোজ-দিনের মতই হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছিল বাড়ির দিকে। কুঠির মাঠের মাঝ বরাবর আসতেই কুড়োনের মা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এই অসম্ভব স্থানে চাপা কান্নার আওয়াজ আসছে কোত্থেকে? এই অসময়ে? ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে কাঁদে? কোথায় কাঁদে?

কুড়োনের মা এদিক ওদিক চেয়ে দেখল। তার মনে হল, কুঠি-মাঠের মাঝ বরাবর, কাছারি-দালানের খিলেনটা যেখানে অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে, যেখানে একটা বুড়ো বট আর খেজুর গাছ জড়াজড়ি করে আগাছাদের

লাই দিয়ে মাথায় তুলেছে, অন্ধকার যেখানে কালো পাথরের মত জমাট, কান্নাটা যেন সেখান থেকেই আসছে।

ওখানে গিয়ে এই সন্ধ্যেবেলায় কার আবার কান্নার শখ চাপল? কুড়োনের মা দস্তুরমত অবাক হল। বয়স কম হয় নি কুড়োনের মার। অঙ্ক জানে না, তাই সঠিক হিসেব দিতে পারবে না হয়তো। তা যেটের কোলে কুড়োনের বয়েসই তো বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে। বহুদিন মারা গেছে ওর বাপ। তার এতখানি বয়সে আজকের মত এমন অঘটন আর দেখে নি কুড়োনের মা।

জল-ভরা বড় ঘড়াটা এক কাঁখে ব্যথা ধরিয়ে দিয়েছিল। কাঁখ বদলে স্বস্তি পেল। তারপর সে ডাক দিল: ওগো বাছা, তুমি কে গা? কে কাঁদতিছ ওখানে বসে বসে?

কান্নাটা স্পষ্ট করে শুনতে না পেলেও কুড়োনের মা সেটা মেয়েছেলের কান্না বলেই আন্দাজ করেছিল। দেখল ভুল করে নি। তার ডাক শুনে কান্না থামল। শুকনো পাতার উপর খসখস পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপর পাথরকালো অন্ধকার ঠেলে কুড়োনের মার সামনে এসে দাঁড়াল অল্পবয়সী অপরিচিত এক গেরস্ত-বউ। অমনি রূপে যেন চারিদিক আলো হয়ে উঠল।

কুড়োনের মা দেখল, বউটির মুখ প্রিতিমের মত সুন্দর। আর কী চুল! যেন মাথা থেকে কালো জলের ঢেউ নেমেছে, পাছা ছাপিয়ে পায়ের গোছ পর্যন্ত নেমে সে ঢেউ জমে গেছে। পরনে চওড়া লালপাড় শাড়ি। কপালে আর সিঁথেয় সিঁদুর। শাড়ির লাল আর সিঁদুরের লাল টকটক করে যেন জ্বলছে। এ কাদের বাড়ির বউ? একে কোথাও দেখেছে বলে তো কুড়োনের মার মনে পড়ল না।

—তুমি কে বাছা? কাগের বউ? তোমারে তো এর আগে কখনও দেখি নি। এই বিজন বনে জনমনিষ্যি ঢোকে না। ওখানে বসে বসে কাঁদতিছ ক্যান? তোমার সঙ্গে লোক কে আছে?

কুড়োনের মা একসঙ্গে এত কথা জিজ্ঞেস করে বসল। বউটি মৃদু মধুর গলায় যখন সব কথার জবাব দিয়ে গেল তখন কুড়োনের মার মনে হল, সে যেন সুন্দর একখানা গান শুনল।

বউটি বলল: আমার বাড়ি অনেক দূর মা, অনেক দূর। আমার দুঃখের কথা শুনলে পাষাণও গলে যায়। সংসার আছে, সোয়ামী-পুতের ঘর আছে।

কিন্তু সোয়ামী যার উপর নিদয়, তার সব থেকেও কী লাভ বল? সোয়ামী আমার মানুষ নয় গো, পাষাণ। পাষাণ। সতীন তার মাথার মণি, আমি দু চক্ষের বিষ। নৌকোয় করে আমার সোয়ামী আমায় বাপের বাড়িতে রাখতে যাচ্ছিল। কী মতি উদয় হল তার, আমাকে এই বিজন বনে বনবাস দিয়ে নৌকো নিয়ে চলে গেল। ঘরের বউ পথ চিনি নে, তার উপর এই আমাবস্তের রাত। কোথায় যাব? কার বাড়ি আশ্রয় পাব? জানি নে। তাই, মা, বনে বসে মুখ লুকিয়ে কাঁদছিলাম। তোমায় দেখে বল পেলাম। দোহাই ধর্মের, আমাকে এখানে ফেলে তুমি চলে যেয়ো না। রাতের মত তোমার ঘরে মা, আমাকে একটু ঠাঁই দাও।

কী কাকুতি। কী আকুতি! আহা, বেচারা! কুড়োনের মা গলে গেল। তার চোখ দুটো ভরে উঠল জলে। সঙ্গে করে নিয়ে চলল বাড়িতে। কুড়োনের মা আগে আগে, বউটি তার পিছনে। বাড়িতে ঢুকে রান্নাঘরের বারান্দায় ভারী ঘড়াটা নামিয়ে একটু হাঁফ নিয়ে, "বসো বাছা" বলে পিছনে ফিরতেই কুড়োনের মা দেখে, ফাঁকা। কেউ নেই।

বাঃ রে, কোথায় গেল বউটা? তবে বোধ হয় চেগারের পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে। লজ্জা পাচ্ছে ঢুকতে।

—আসো মা আসো। লজ্জা কী? পুরুষমানুষ কেউ নেই এখন। থাকার মন্দি আমার তো ওই শিবরাত্তির সলতেটুকুন—ওই কুড়োন। তা সে বাবু সন্ধ্যের আগে তেড়ি বাগিয়ে বেরোন, ফিরতি ফিরতি মদ্দিরাত।

বলতে বলতে কুড়োনের মা চেগারের কাছে এগিয়ে গেল। বাঁশ ছেঁচে চেগার তৈরি করেছে কুড়োন। যত্ন করে। নিজের হাতে আড়াল তুলে দিয়েছে। ভিতর থেকে বাইরেটা দেখা যায় না।

কুড়োনের মা বাইরে বেরিয়ে গেল। না, এখানেও তো কেউ নেই। বউটা গেল কোথায়? একটু আগেও তো ছিল। হরলাল কামারের বাড়ি ছাড়িয়ে এসেও সে তার পায়ের শব্দ শুনেছে। তা হলে এইটুকুর মধ্যে আর যাবে কোথায়? বেশ মজা তো। সে ভাবল, বউটা কি তবে পাগল? লক্ষণ তো বোঝা গেল না। না কি নষ্ট-টষ্ট? উঁহু, মুখ চোখের অমন ভাব নষ্ট মাগীর হয় না।

কুড়োনের মা হরলাল কামারের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

হরলাল দরজার সামনে পিদিম জ্বেলে, নিকেলের চশমা নাকের ডগায়

নামিয়ে এনে ঠুকুর-ঠুকুর কাজ করছে। কুড়োনের মাকে ফিরতে দেখে একবার চেয়েই আবার ঠুকুর-ঠুকুরে মন দিল।

কী গো বউদি, কী খোঁজছ?

—ও কামার ঠাকুরপো, আমার সঙ্গে যে বউডা আসছিল, সে কি তুমাগের বাড়ি ঢুকে পড়ল?

হরলাল আশ্চর্য হল।

—কোন বউর কথা বলছ? তুমার সঙ্গে আবার বউ গেল কার, তা তো দেখলাম না। ছেলের বিয়ে দিলে কবে?

কুড়োনের মা চটে গেল: ঠাউরপোর সব তাতেই ঠাট্টাবাজি। রঙ্গরস রাখোদিন। শুনলি গা জ্বালা করে। বলি, দুটো চখির উপর দুখান পরকলা তো চাপায়েছ বেশ জম্পেশ করে, তাউ অমন জলজ্যান্ত মানিষ্যিডেরে দেখতি পালে না। সেই ঘাটের থে আমার পিছন পিছন আসতিছে। কাঁদে ককায়ে কলো, সোয়ামীতি ফ্যালায়ে গেছে। রাত্তিরডে দয়া করে এট্টু আশ্রয় দ্যাও। মনডা নরম হল। ভাবলাম, সোমত্থ মেয়ে, কাঁচা বয়েস, তার উপর প্রিতিমের মত রূপ—এসব নিয়ে যায়-ই বা কনে! কলাম, চল আমার বাড়ি। তা দ্যাখদিন, এখন গেল কনে!

এবার হরলাল সত্যিই বিস্মিত হল।

—ধর্মত বলছি বউদি, তুমার সঙ্গে আমি কারুর যাতি দেখি নি। রোজ যেমন একা একা ফের, আজও তাই ফিরিচ। কামারের চোখ এড়ায়ে, জানতো, মাছি পর্যন্ত যাতি পারে না। আমার মনে হয়, তুমি ভুল দেখিচ।

—অত ভুল আমার হয় না। আর ভুল কিসির? কথা কলাম। তারে দ্যাখলাম। পিছন পিছন পায়ের শব্দ পালাম। সব ভুল! তোমার মত আমার তো ভিমরতি ধরে নি। বলি পথ হারায়ে ফ্যালে নি তো।

হরলাল এবার বিরক্ত হল। অনর্থক কাজ নষ্ট। কুড়োনের মায়ের ভিমরতিই ধরেছে। জলজ্যান্ত একটা মানুষ আমার চোখের উপর দিয়ে চলে গেল আর আমি দেখতে পেলাম না! হ্যাঃ। আমার চোখে তো ছানি পড়ে নি। বলে কি পথ হারাবে? জবাব দিল ঠুক ঠুক করতে করতেই: সুজা রাস্তা আবার হারাবে কি? দ্যাখ গে, আগেই হয়তো ঢুকে পড়েছে ঘরে। তবে পরের ফ্যাসাদ আবার ঘরে আনলে ক্যান? বিয়েন বেলাতেই বিদেয় করে দিও।

কিন্তু কুড়োনের মা এই পরামর্শমত চলবার আর ফুরসত পেল না। শেষ রাত্তিরে শুরু হল তার ভেদবমি। বিহান না হতেই শেষ। ওলাইচণ্ডীকে ঘরে ডেকে আনার ফল হাতে হাতে পেল কুড়োনের মা। কুড়োনের মা গেল, ধরল কুড়োনকে। কুড়োনও দুপুরের মধ্যেই গেল। তারপর গেল হরলাল কামার, তার বউ, তিন ছেলে, দুই বেটার বউ। নির্বংশ। তারপর গেল গ্রামখানা। তারপর, আঠারোখাদা, বিনেদপুর, ধপধপি, কুড়োল, নলসি—একে একে ওদিগরের সব গ্রাম।

দম নেবার জন্যই বোধ করি বুদো ভুঁয়ে থামল। বেশ বলে বুদো। যেন প্রত্যক্ষদর্শী। মড়ক হয়েছিল একবার। বুদো ভুঁয়ে সবিস্তারে সেই কাহিনীই শোনাচ্ছিল এতক্ষণ। এবার দম নিতে থামল। থামার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-কাটা এক গর্জ্জন। চকিতে কানে তালা লেগে গেল সবার। বেশ করে তামাক সেজে নরা কলকেটা বামুনের হুঁকোয় পুরতে যাবে, দেয়ার ডাকে আচমকা হাত কেঁপে কলকে পড়ে গেল।

সরকার মশায় হাঁ-হাঁ করে উঠলেন: দশ বছর বয়েস হল ছ্যামড়ার এখনও কাজকম্ম শিখল না। কী রে, ভাঙলি নাকি?

শ্যান কবিরাজ বললেন, ও বাবা সরকার মশায়ের কলকে, ভাঙলি কি রক্ষে আছে?

সরকার মশায় ছোঁ মেরে যেন শ্যান কবিরাজের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলেন।

—আরে ব্বাস্, ও কি যে সে কলকে নাকি? এতদ্দেশে ওর জুড়া নেই। আমার জামাইয়ের ভগ্নিপোত এলাহাবাদের উদিকি কোন্ শহরে যেন ডাক্তারি করে। সেই আমার জামাইরি এই কলকেডা আনে দিইছিল। তা জামাই কলো, বাবা উডা আপনিই নিয়ে যান। যেসব কুমোর নবাব বাদশাগের কলকে বানায়, তাগের হাতের জিনিস। ভাঙলি ও আর পাব কনে?

বুধো ভুঁয়ে ফোড়ন কাটল: নবাবি জিনিস কি চাষাভুষোর হাতে ছাড়ে দিতি হয়? জামাই এত কষ্ট করে আপনারে যখন একটা নবাবী কলকেই পাঠাতি পারল, তখন একজন হুঁকোবরদার পাঠায়ে দিলিই পারত।

সরকার মশায় অন্য দিকে চেয়ে কাশতে লাগলেন ঘন ঘন। এই সব ছেলে-ছোকরাদের টিপ্পনীর জবাব দেওয়া মানে মান-সম্মান খোয়ানো।

নরা এবার খুব সতর্ক হয়ে তামাক সেজে বামুনের হুঁকোটা পুরুত ঠাকুরের হাতে দিল। হুঁকোটা বেশ করে মুছে রিদয় ঠাকুর টানতে শুরু করলেন।

বৃষ্টিটা ধরব-ধরব হয়ে এসেছিল। আবার জোরে শুরু হল। ঘন মেঘ-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে মেজকর্তার মন কিছুটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। আকাশের গতিক ভাল নয়। বৃষ্টি আজ ধরবে কিনা সন্দেহ।

মেজকর্তা অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, নরা, তোর বাপ কই রে?

নরার পিলে চমকে গেল। কী জানি কেন, মেজকর্তাকে দেখলে সে ভয়ে জড়সড় হয়ে যায়। এক মুখ লম্বা দাড়ি, মাথায় টাক, কথাবার্তা কম বলেন, সেই কারণে? নাকি বিদেশে থাকেন, দেখাসাক্ষাৎ কম, সেই কারণে? কি জানি কেন, মেজকর্তা সম্পর্কে নরার ভয়, সেই ছেলেবেলা থেকে। জ্ঞান হওয়া ইস্তক নরার কাছে মেজকর্তা পরম ভয়ের বস্তু। ছোটবেলায় যখনই নরা দুষ্টুমি করেছে, অমনি বাপ বলেছে, দাঁড়া, মাজে কর্তারে ডাকি। আর নিমেষে নরা শান্ত। বড়কর্তা তেজী লোক, ছোটকর্তা ডাকসাইটে দারোগা, বাঘে গরুতে তাঁর নামে এক ঘাটে জল খায়। কিন্তু ওঁদের দেখে ভয় হয় না নরার। ওঁদের সামনে গিয়ে নানা ফরমায়েশ খেটেছে, তামাক সেজেছে বহুবার। এমন কি ছোটকর্তার গায়ে তেল পর্যন্ত মাখিয়ে দিয়েছে। তেমন কিছু তো ভয় হয় নি তার।

যত ভয় মেজকর্তায়। দু বছর আগে বড় মেয়ের বিয়ে দিতে এসেছিলেন। তখন নরা আরও ছোট। ভিড়ের মধ্যে মিশেটিশে দিন কাটিয়ে দিয়েছে। এবার তার অদৃষ্টে কী আছে, কে জানে? মেজকর্তার কাছে-কাছেই দেখি থাকতে হচ্ছে। তাইতো কী যেন একটা জিজ্ঞেস করলেন মেজকর্তা? যাঃ, শুনতেই পায় নি ভাল করে। না, শুনতে পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু মনে করতে পারছে না। হেই মা কালী, কী যে হবে! এক ছুটে পালিয়ে যাবে বাড়ি? আর এ-মুখো হবে না জীবনে?

—নরা, তোর বাবা কী করছে?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এই কথাই আগে আর একবার জিজ্ঞেস করেছেন মেজকর্তা। কী বলবে, কর্তা, না বাবু, না হুজুর?

বাবা? বাবা কুঁড়ে বাঁধতিছে।

যাক, জবাব দিতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল তার। একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়।

—আচ্ছা বাবু (বাবুই বেরুল মুখ দিয়ে), আমি দেখে আসতিছি।

রিদয় ঠাকুর বললেন, তুমারে যেন চিন্তিত দেখাচ্ছে মহি?

মেজকর্তা বললেন, দাদা বাড়ি নেই। কাল ঝিনেদায় গিয়েছেন। মামলা আছে। এদিকে সকাল থেকে বুড়ীর ব্যথা উঠেছে একটু একটু করে।

রিদয় ঠাকুর বললেন, আরে তার জন্যি কিছু ভাবে না। মঙ্গলময়ী মায়ের ইচ্ছেয় সব-কিছু মঙ্গলে মঙ্গলেই হয়ে যাবেনে।

রিদয় ঠাকুরের বিশ্বাসভরা আশ্বাসে একটু আরাম পেলেন মেজকর্তা।

বললেন, না, ঠিক সেজন্যে চিন্তা করছি নে। ভাবছি বৃষ্টির জন্যে। যেভাবে শুরু হয়েছে, থামলে হয় আজ।

বুদো ভুঁয়ে বলল, ভগবানের লীলা বুঝা ভার। এই বিষ্টির পিত্যেশে আমরা এদ্দিন মাথা খুঁড়ে মরিছি। বোঝলেন মাজে খুড়ো, ইবার একটার পর একটা যা আপদ আমাগের মাথার উপর দিয়ে গেল, তা আর কহতব্য নয়। ওলাদেবীর দয়ার কথা তো আপনারে আগেই কলাম। শুধু আমাগের গিরামডায় তিনি দয়া করে থাবলটা মারেন নি। তাও পুবির পাড়ায় রিয়াজদ্দি গাজী আর ইরফান শ্যাখের বাড়ির জনাচারেক গিয়েছে। মড়কের সময় বিষ্টির দেখা ধারে-কাছেও মেলে নি। তখন যদি একটু বিষ্টিও হয়, তা হলি এই সব্বনাশটা আর হয় না। কিন্তু কনে বিষ্টি? আজ তিনি ছিষ্টি ভাসায়ে দেচ্ছেন।

হুঁকোটা ঘুরে ঘুরে এতক্ষণে বুদো ভুঁয়ের হাতে এসে পৌঁছাল। ফতুয়ার পকেট থেকে একটা সরু কাঠের নল হুঁকোতে লাগিয়ে বুদো ভুঁয়ে গোটা কতক টান তাড়াতাড়ি দিয়ে পাশের লোকের হাতে হুঁকোটি তুলে দিল। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে সুখটা মালুম করে নিল।

তারপর শুরু করল, যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্যি রাজার পুণ্যি দেশ। তা মাঘ তো দূরির কথা, ফাল্গুন চৈত গেল, বোশেখ গেল, এক ফোঁটা বিষ্টি নেই। জষ্টিও কাবার হল। কুথায় বিষ্টি? খাল বিল শুকোয়ে খটখট কচ্ছে। নবগঙ্গা হাঁটে পার হচ্ছে লোকে। অদ্যাবধি কারও মাঠে লাঙল পড়ে নি। পড়বে কী করে, মাঠের মাটি শুকায়ে পাথর হয়ে গেছে। আম-কাঁঠালের বোল মুচি ধরতি না ধরতি মাটিতে খসে পড়িছে। মাছ নেই। ঘাস নেই। চারিদিকে হাহাকার। তার উপর মড়ক। কী ভাগ্যি, আজ

শেষ রাত্তিরির থেকে আকাশ মুখ তুলে চালেন। এখন গবগব করে না ঝরলি মাঠ ভেজবে না। পাটের দফা রফা তো ইবারের মত হলই। ধান যদি কিছুডা হয়!

শ্যান কবিরাজ বললেন, পাট লাগায়েও যে কোন্ চতুর্বর্গ ফল হত, তাও তো বুঝি নে। বছর বছর দর তো দেখি হু-হু করে নামে যাচ্ছে। এখন তো চাষের খরচও ওঠে না। সবচে বেশী মার খাচ্ছে মিঞারা।

—আরে, ওগের কথা ছাড়ান দ্যাও।—সরকার মশাই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, ওগের সবই উলটো বুঝলি রাম। আমরা যা করব, উরা তার উলটো করবে। আমরা পূবমুখী আহ্নিক করি, উনারা পশ্চিমমুখী নমাজ পড়েন। আমরা বাইরির থে বাড়ী আসে আগে পায়ে জল দিই, উনারা আগে হাতে জল দেন! আমরা পাঁঠার ঘাড়ে কোপ মারি, উনারা গলায় পোঁচ মারেন। কত আর কব?

শ্যান কবিরাজ সরকার মশাইয়ের কথার ধরনে হেসে ফেললেন। বললেন, যা বলিছ। দ্যাখছে, পাটের দাম পড়ে যাচ্ছে তবু পরের বার বেশী করে বোনছে। ইডা বোঝে না মাল বেশী হলি দাম আরও কমে যায়।

সরকার মশাই বললেন, বলি বুঝাতি চাও কারে? মিঞারে? ওরা যদি কিছু বোঝবেই তাহলি আর চিরকাল নাঙ্গল চাষা হয়ে থাকে? আমার জামাইয়ের ভগ্নিপোত পশ্চিমির যে শহরে ডাক্তারি করে, সে নাকি জামাইরি কয়েছে, ওদিকির মিয়ারা উকিল, ডাক্তার এমন কি জজ ম্যাজিস্টরও হয়। শুনে আমি তো অবাক। চোদ্দ শাস্তর পড়ে যদি মোছলমানের পোলা, তবু তার নাহি যায় নাত নোদ নাঙ্গা শাক ত্যাল ব্যাল ক্যালা। রাতিরি যারা নাত, রোদিরি নোদ, তেলেরে ত্যাল কয় তারা আবার জজ হয় কী করে তা তো বুঝি নে।

মেজোকর্তার মনে পড়ল সরকার মশাই এইমাত্র যে শোলকটি বললেন, ছোটকাল থেকেই সেটা তাঁরা শুনে আসছেন। যদি না তিনি কিছু লেখাপড়া শিখতেন, যদি না কলকাতায় কাটাতেন কিছুকাল, তা হলে চিরকাল এদের মতই অজ্ঞ থেকে যেতেন। এদের মতই বিশ্বাস করতেন মিঞারা চিরকাল লাঙলই চালায়।

হঠাৎ তাঁর প্রথম যৌবনের দিনগুলোর কথা মনে পড়তে লাগল। উজ্জ্বল প্রাণোচ্ছল কলকাতার কথা। কলেজ দিনগুলোর কথা। মনে

পড়ল ঋষিতুল্য প্রফেসরদের কথা। ডঃ হাসানের কথা। হাসান সাহেবের মত পণ্ডিত, তাঁর মত চরিত্র জীবনে খুব বেশী দেখেন নি মেজোকর্তা।

এরা, এইসব কূপমণ্ডুকেরা কীই বা দেখেছে, কতটুকুই বা জেনেছে! দুরন্ত যৌবনে রক্ত যখন গরম ছিল মেজোকর্তার, তখন এইসব মূর্খ অশিক্ষিত লোকেদের তীব্রভাবে ঘৃণা করতেন তিনি। তখন এই ধরনের মন্তব্য শুনলে তাঁর রক্তে কে যেন আগুন ঢেলে দিত। তাদের মন্তব্য যে কত ভুল তা প্রমাণ করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতেন, প্রচণ্ড তর্ক করতেন, শেষ পর্যন্ত ঝগড়া বাধিয়ে দিতেন।

আজ এই উনপঞ্চাশ বছরের দেহে সে তেজ নেই, সে বোকামিও নেই। তর্ক করে শুধু তর্কই করা যায়, আর-কিছু না। প্রৌঢ়ত্ব তাঁকে সে জ্ঞানটুকু দিয়েছে। তা ছাড়া এদের অজ্ঞতার জন্য আজ আর এদের আগের মত ষোল আনা দোষী করতে ইচ্ছা যায় না। জ্ঞানের আলো এদের চোখে জ্বালাবার চেষ্টাই বা কী হয়েছে? কে করেছে? এখন বরং এদের জন্য মেজোকর্তার করুণাই হয়। করুণা হয় তাঁর নিজের জন্যও। কীই বা করলেন তিনিও?

পাটের ব্যাপারে দু-একটা কথা বরং তিনি বলতে পারেন। পাটের আপিসেই কাজ করেন মেজোকর্তা। আমদানী বাবু। রংপুর জেলার পাটের মোকাম ডোমার। সেখানকার বার্কমায়ার কোম্পানির আমদানী বাবু তিনি। তিনি জানেন, পাট চষে পাটরানী পোষার দিন চলে গেছে চাষীর। সাহেবদের কারখানায় পাটের চাহিদা দিন দিন কমে আসছে। এবারও তাঁদের আপিসে কলকাতা থেকে হুকুম এসেছে, প্রথম বাজারে পাট না কিনতে। দাম কতদূর নামে তা দেখার জন্য যেন নিস্পৃহভাবে অপেক্ষা করা হয়।

মেজোকর্তা গলা ঝেড়ে বলতে যাবেন, এমন সময় আর-একবার মেঘ ডেকে উঠল জোরে আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতর থেকে যেন গোলমাল শোনা গেল একটা। মেজোকর্তার বুকটা কে যেন শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে আবার চট করে ছেড়ে দিল। মুখটাও শুকিয়ে গেল।

রামকিষ্টো ভিজতে ভিজতে এসে হতাশ হয়ে বলল, মাজেবাবু, কুঁড়েটা ভাঙে পড়ে গেল।

মেজোকর্তা ঘাবড়ে গেলেন: তা হলে উপায়?

রামকিষ্টো বলল, উঠনে পিরায় এক হাঁটু জল দাঁড়ায়ে গেছে।

হুঁ, গতিক সুবিধের ঠেকছে না। মেয়েটার কপালে কী আছে কে জানে? বোকার মত রিদয় চক্কোত্তির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকলেন তিনি।

পুরুত ঠাকুর সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মহি, আমি বলছি, তুমি মোটেও ভাবে না। নাতনীর গর্ভ বিধিমতে শোধন করা আছে। সুপ্রসব না হয়েই যায় না।

বুদো ভুঁয়ে বলে উঠল, মাজে খুড়োর মেয়ের ঘরে আসতিছেন বটে একজন। থরা আর মড়ক পিছনে রাখে, বিষ্টি মাথায় করে একেবারে ছিষ্টি জানান দিতি দিতি আসতিছেন।

রামকিষ্টো বলল, তা তো তিনি আসতিছেন বুঝলাম, কিন্তু আসবেন কনে? কুঁড়ে বাঁধি কুথায়?

রিদয় ঠাকুর বললেন, তুমি পাকা ঘরামী রামকিষ্টো। যেখেনে সুবিধে পাও সেখেনেই বাঁধ গে। মহি একেই ঘাবড়ায়ে গেছে, ওরে আর ভয় পাওয়ায়ে দিয়ো না।

রামকিষ্টো চলে যায় দেখে মেজোকর্তা বললেন, তুমি একা, না সঙ্গে লোক আছে রামকিষ্টো?

রামকিষ্টো বলল, এ সব কাজ কি একা হয় কত্তা, ছোলেমান নিকিরিরিও ডাকে আনিছি। ও-ও খুব সরেশ ঘরামী। কথা তা না। উঠনে জল জমেই কাজের বীজ মারে ছাড়িছে। অত উঁচো করে পুতা বাঁধলাম, তা এই সুমুন্দির বিষ্টির কাজডা দ্যাখলেন তো, জল পিরায় হাঁটু ছাড়ায়ে উঠতি চায়। ওর মদ্যি কি মাটি বসান যায়? সব একেবারে ঢেয়োয়ে দেচ্ছে।

মেজোকর্তা বললেন, যদি শেষ পর্যন্ত কুঁড়েটা বাঁধতে না পারে, তা হলে ঘরের মধ্যেই না হয় আঁতুড় হবে। করা যাবে কী? কলকাতায় তো হাসপাতালেই প্রসব হচ্ছে।

মেজোকর্তার কথা শুনে সবাই যেন আকাশ থেকে পড়ল। ঘরে হবে আঁতুড়! মেজোকর্তার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল? নাকি খিরিস্টান হয়ে গিয়েছেন? কলকাতার রঙ আজও মেজোকর্তা তা হলে মুছে ফেলতে পারেন নি।

রিদয় ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, মহির আমাদের চিরটাকাল এক

রকম গেল! ও রামকিষ্টো, আর দাঁড়ায়ে আছ ক্যান বাবা, চিষ্টা-চরিত্তির করে গ্যাখগে। ঘরে কি প্রসব হয়?

ভিতর থেকে চাঁপা ছুটে এল। বড়কর্তার ছোট মেয়ে।

হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, মাজে কাকা, শিগগির ভিতরে আস। বড় মা ডাকতিছে। বড়দির ব্যথা বাড়তিছে।

ধক করে হৃৎপিণ্ডে একটা জোর ধাক্কা লাগে। বলিস কী? সর্বনাশ! এখনও যে কুঁড়ে বাঁধা হয় নি। আঁতুড় হবে কোথায়? তবে কি বুড়ীকে ওই উঠনেই নামিয়ে দিতে হবে? মরে যাবে যে মেয়ে। বড়দা এখনও কেন আসছে না? কেন আসছে না?

গলামুখ শুকিয়ে গেল মেজোকর্তার। অস্থিরতা বেড়ে উঠল মনের। বুক-সমান দাড়িতে ঘন ঘন হাত বুলোতে লাগলেন। যেন এইটেই তাঁর এই মুহূর্তের একমাত্র করণীয়।

চাঁপা তাড়া লাগাল, চল শিগগির।

দুই

বাড়ির ভিতরে ঢুকতে মেজোকর্তার আর পা সরে না। বুড়ী বড় আদরের মেয়ে। একমাত্র মেয়ে। মেজোবউয়ের নয়নের মণি, মেজোবউ সেই মেয়ের মায়া কাটিয়ে কবে স্বর্গে চলে গেছে। তা প্রায় দশ বছর হল বই কি। কিন্তু মনে হয় যেন সেদিন।

শেষ সময় সে কী উৎকণ্ঠা মেজোবউয়ের। ছবিটা এখনও চোখে ভাসে। ঘরভর্তি লোক। খাটে শুয়ে কেমন ছটফট করছে মেজোবউ। কাকে যেন কী বলতে চাইছে, কিন্তু বলতে পারছে না। সবাই বুঝতে পারছে যে মেজোবউয়ের সময় হয়ে এসেছে।

হঠাৎ বড় বউঠানের খেয়াল হল, মেজোবউ বোধ হয় কিছু বলতে চায়। কানের কাছে মুখ দিয়ে বড়বউ জিজ্ঞাসা করলেন, ও মেজোবউ কিছু বলবি?

মেজোবউ কথা বলল না, শুধু মেজোকর্তার দিকে একবার চাইল। দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল চোখের কোণা দিয়ে।

বড়বউ বুঝলেন। বললেন, সব ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। সরলা কিছু বলতে চায় মেজোকর্তাকে। ঘর খালি হয়ে গেল। মেজোকর্তা এগিয়ে গেলেন, মেজোবউয়ের মাথার কাছে। মেজোকর্তার হাত দুটো ধরে মেজোবউ ধীরে ধীরে বলল, বুড়ী থাকল। যেন ভেসে না যায়। মেজোকর্তা ইঙ্গিতটা বুঝলেন। বললেন, কথা দিচ্ছি বুড়ির অযত্নের কোন কারণ ঘটাব না। মেজবউ অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। বলল, একটু পায়ের ধুলো দাও। পায়ের ধুলো মাথায় মাখল মেজোবউ। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, কথা দাও, বুড়ীর বিয়ে দেবার আগে কলকাতায় যাবে না। প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিলেন মেজোকর্তা। এত থাকতে হঠাৎ কলকাতার কথা উঠল কেন? এই সময়ে? মুহূর্তে মনে পড়ে গেল কলেজ-জীবনের কথা। একটা মহা বোকামির কথা। তা সে ব্যাপার তো কবেই চুকে গেছে। সংসার পাতার পর একদিনের তরেও মেজোকর্তা কলকাতার কথা তুলেছেন বলে তো মনে পড়ে না। মেজোবউ এতদিন ধরে মনে মনে সেটাও গেরো বেঁধে রেখেছে। আশ্চর্য! মেজোকর্তা বলেছিলেন, কলকাতার কথা ভেবে কষ্ট পেয়ো না মেজোবউ। কলকাতায় যাবার কোন সাধই আমার নেই।

মেজোবউয়ের সেই বুড়ীর আজ সন্তান হবে। মেজোবউ থাকলে কী খুশীই না হত। কিন্তু সেই মানুষটা আজ কোথায়? মেজোকর্তাকেও এত দুশ্চিন্তা মাথায় করে ঘুরে বেড়াতে হত না।

বড়বউয়ের গলার আওয়াজে মেজোকর্তার ভাবনা ছিঁড়ে গেল। ফোঁস করে যে টানা নিশ্বাসটা পড়ল তাতেই যেন বুক খানিকটা হালকা হয়ে গেল।

বড়বউ বললেন, ও মাজে, তুমার কি জ্বর আলো নাকি?

বড়বউ আর মেজোকর্তা একবয়সী। বড়বউয়ের যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়েস আট। মেজোকর্তারও তাই। সেদিন থেকে দুজনের সম্বন্ধ চুলোচুলিরও যত, গলাগলিরও তত। বরাবর তাদের মধ্যে তুই-তোকারি চলে এসেছে। ছেলেপুলে হবার পর তুই থেকে তুমিতে উঠেছেন তাঁরা। হাজার হোক বয়েসটা বেড়েছে তো?

—কী, মুখি কি কুলুপ আঁটিছ? বড়বউ বললেন, রা কাড়ছ না যে বড়? জ্বর আয়েছে নাকি?

মেজোকর্তা একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, বড়বউ বুড়ীর কী হবে?

যেন দৈবজ্ঞ ঠাকুর হাত গুনছেন, বড়বউ তেমনি গম্ভীর চালে বললেন, হয় ছেলে, আর না হয় মেয়ে।

বড়বউয়ের পরিহাসে পরিবেশ হালকা হয়ে গেল। তবে বোধ হয় তেমন সাংঘাতিক কিছু ঘটে নি। দুর্ভাবনার ভারী বোঝা নেমে গেল মেজোকর্তার কাঁধ থেকে।

একটু হেসে মেজোকর্তা বললেন, পাকা গণৎকার হয়ে উঠলে কবে?

বড়বউ বললেন, যবের থে দ্যাখলাম পুরুষমানুষ মেয়েগেরও অধম হয়ে দাঁড়ায়েছে। দ্যাখ্‌ মাজে, তোর এত দুশ্চিন্তা কিসির কদিনি। বাড়িতি কি লোকজন নেই, না এ বাড়িতি তোর মেয়েই প্রথম বিয়োচ্ছে?

মেজোকর্তা বললেন, বুড়ীর কোন অমঙ্গল-টমঙ্গল—

কথা শেষ না হতেই বড়বউ ধমকে উঠলেন: ও ছাড়া তুমার মনে আর কোন চিন্তা নেই? ভাল আমার বাপ হয়েছেন। বালাই ষাট। তুমি এখন যাও দিনি, কুড়েডা যাতে তাড়াতাড়ি বাঁধা হয়, তার চিষ্টা দ্যাখ।

মেজোকর্তা ধমক খেয়ে একটু চুপ মেরে গেলেন। তারপর আমতা আমতা করে বলেই ফেললেন কথাটা: বড়বউ, বলছিলাম কী, এই ইয়ে, বুড়ীকে ওই ভিজে কুঁড়েতে না পাঠিয়ে ঘরে রাখলে হত না?

বড়বউ আকাশ থেকে পড়লেন: ও মাজে কও কী? পোয়াতি খালাস হবে ঘরে? এমন কথা তো আমার চোদ্দ পুরুষিও কেউ শোনে নি।

মেজোকর্তা বললেন, তোমার চোদ্দ পুরুষ তো অনেক কিছুই শোনে নি। তোমার বাবা তো রেলগাড়ির কথাও শোনেন নি। তা বলে কি রেলগাড়ি হয় নি? না, তুমি আর রেলে চড়বে না? কলকাতায় তো হাসপাতালেই সব হয়।

বড়বউ মেজোকর্তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলেন। মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। মেজোকর্তা দেখলেন, ছেলেবেলার দুষ্ট হাসি বড়বউয়ের চোখে ঝিলিক খেলে বেড়াচ্ছে।

মেজোকর্তা সাবধান হতে চেষ্টা করলেন; তিনি জানেন, এর পরেই আসবে একটা আক্রমণ।

বড়বউ বললেন, কলকাতার বাবুর মনের থে কলকাতার জন্যি দরদ যে বুড়ো বয়সেও গেল না দেখছি। কলকাতায় তো অনেক কিছু থাকে। সেখেনে তো আমাগের মত পেত্নী থাকে না, শুনিছি ড্যানাকাটা পরীরে থাকে। কলকাতার শাস্তর কলকাতায় চলুক, দেশে তো তা চলবে না। এখেনকার নিয়ম হচ্ছে, যে ঘরে ছেলেপুলে হয়, সে ঘরডা নোয়ার কামানের দিন ভাঙ্গে ফেলতি হয়। না হলি পোয়াতির উপর দিষ্টি লাগে। তা তুমি কি তোমার মেয়ের জন্যি এই বাড়িডা ভাঙ্গে ফেলতি চাও?

মেজোকর্তা অতটা তলিয়ে দেখেন নি। বড়বউয়ের কথার তোড়ে ঘাবড়ে গিয়ে দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন।

বড়বউ বললেন, বাজে চিন্তা ছাড়ে দিয়ে, এখন যাও দিনি উদিকি। রামকিষ্টো কী করলো ছাখ গে। কুঁড়েডা যেন শক্ত করে বাঁধে। পুতাডা যেন বেশ উঁচো হয়। ডুয়া যেন ভাঙ্গে না পড়ে। আর হ্যাঁ, বুনোপাড়ায় লোক পাঠায়ে অন্ন দাইরি ডাকায়ে আনো। সে লবাবের বিটীর আজ তো দর্শনই পাওয়া যাচ্ছে না।

অন্ন দাইয়ের খোঁজে মেজোকর্তা লোক পাঠিয়ে দিলেন। তারপর ভিতর-বাড়ির উঠনে চললেন কুঁড়ে বাঁধার তদারক করতে। ভিতরের উঠনে উঁকি মারতেই তাঁর আক্কেল গুড়ম হয়ে গেল। গবগব শব্দে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার ঠ্যালা। রামকিষ্টো আর ছোলেমান নিকিরির সঙ্গে নরাও হাত লাগিয়েছে।

তিনজনে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। মেজোকর্তার মুখ কালো হয়ে গেল দুর্ভাবনায়। একে তো কুঁড়ে বানানো অসম্ভব, তায় কুঁড়ে যদি বানাতে পারেও, তার মধ্যে বুড়ীকে রাখা আরও অসম্ভব। চঞ্চল হয়ে উঠলেন মেজোকর্তা। বাইরের বাড়িতে চললেন।

নালা নর্দমা কেটেও উঠনের জল কমাতে পারে নি রামকিষ্টো। সেই হাঁটুজল উঠনে, ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি ফেলেছে ছোলেমান। পোঁতা আর তুলতে পারছে না। ভিজে ভিজে গায়ের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে। শীত লেগে দাঁত কাঁপছে ঠকাঠক। নরাকে কড়া করে তামাক সেজে আনতে বলেছে রামকিষ্টো। তা সে শুয়োরের বাচ্চা গিয়েছে তো গিয়েছেই।

ফেরার নামগন্ধও নেই। বার-বাড়ি থেকে তামাক সেজে এখানে আনতে কলিযুগ না শেষ হয়ে যায়!

রামকিষ্টো বলল, ছোলেমান, যা দিন বার-বাড়ি। গ্যাখেক তো হারামজাদাডারে যমে ধরল নাকি? গ্যাখা পালিই শালার পিঠি মারবি দুই লাথি। ওই যে আসতিছেন নবাবপুত্তুর। ইচ্ছে হচ্ছে কী এই উঠনের জলেই ব্যাটারে পানেট করে ছাড়ে দিই। তাড়াতাড়ি আন্।

নরা এসে দাঁড়াতেই ঠাস ঠাস বাপের হাতের চড় খেল।

কী করছিলি এতক্ষণ, অ্যাঁ? তোরে কলাম এক ছিলিম তামুক সাজে আনতি। তা তুই কি সেখেনে তামাকের চাষ শুরু করলি নাকি? হ্যাঁ রে এই হারামজাদা!

নরা সেই প্রচণ্ড চড় খেয়ে চোখে সরষেফুল দেখল। কেঁদে ফেলল ভ্যাক করে।

বলল, ইচ্ছে করে দেরি করিছি নাকি? বাবুগের জন্যি চার কলকে তামুক সাজে দিয়াস্তি হল। তা আমি করব কী?

এদিকে কড়া তামাকের ধোঁয়া পেটে যেতেই রামকিষ্টোর মেজাজ চট করে নেমে গেল। কলকেটা ছোলেমানের হাতে দিয়ে নরাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিল।

বলল, চুবো বাবা, চুবো। এই বিষ্টির জলে তুমি আর চোখির জল ঢালো না। মারাডে অনেহই হয়েছে আমার। ন্যাও, এখন একটু তামুক টানো।

বলেই হাঁক পাড়ল, ছোলেমান, বামুনির মত কলকে চোষাডা ছাড় দিন। ওই দুধির ছাওয়ালডারে এট্টু পিস্সাদ গ্যাও। দিয়ে কাজে লাগ শিগ্গির, চালাডা বানায়ে ফ্যাল।

ছোলেমান বলল, আঃ, কি বিষ্টি! ইচ্ছে হচ্ছে এই উঠনে শুয়ে গড়াই। মাঠ কাদা-কাদা হয়ে উঠল রামকিষ্টো চাচা। ভোর না হতিই মাঠে গিয়ে পড়তি হবেনে।

রামকিষ্টো বলল, এই ছোলেমান তোগের পাড়ায় সেদিন অত আলো জ্বলতিছিল ক্যান? যাত্তারা হচ্ছিল নাকি?

চালা তুলতে তুলতে ছোলেমান বলল, না না, যাত্তারা না। মাগরোর পীর ছাহেব আয়েলেন। তাই মেদ্দা ছাহেব কলেন, কোরান-ছরিফ পাঠ

হোক, তাই হচ্ছিল। মেদ্দা ছাহেবের জামাই মুক্তার হয়েছে কিনা, তাই। তা বুঝলে চাচা, পীর ছাহেব যেমন এক কছমের সুর রাখিছে, দেখলি রামচরণের ছাগলডার কথা মনে হয়। পাঠ করার সময় সুরডা আবার বাহার দিয়ে দিয়ে নাড়ে। ঠিক মনে হয় যেন রামছাগলে কাঁঠালপাতা চিবোচ্ছে।

নরা হি হি করে হাসতে লাগল। রামকিষ্টো তাকে কড়া ধমক দিল। ধমক দিল ছোলেমানকেও। পীর মৌলভী গুরু পুরোহিত—ওনারা সব গুণীন লোক। ওনাগের নিয়ে ঠাট্টা তামাশা রামকিষ্টো বরদাস্ত করতে পারে না।

চালা তুলতে হিমসিম খাওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রমে কুঁড়েটা খাড়া করে তুলল রামকিষ্টোরা। বাকী ডুয়া বাঁধা। সেই কাজটা আরও কঠিন।

পরিশ্রম গিয়েছে খুব। বৃষ্টির জলে সমানে ভিজে হাড়ে ওদের শীত ধরেছে। তাই নতুন কাজে হাত দেবার আগে ওরা একটু শক্তি সঞ্চয় করে নিচ্ছিল। পুবের ঘরের বারান্দায় গিয়ে আশ্রয় নিল। এক মালসা আগুনও এনে ফেলল নরা। আনল সেরখানেক দা-কাটা তামাক। বসে বসে তাই টানতে লাগল।

রামকিষ্টো বলল, ছাখ ছোলেমান, বিষ্টির যা বহর দেখতিছি তাতে ডুয়া বাঁধা শুধু তোর আমার কম্ম না। এক কাজ করেক দিনি। সদ্দারপাড়ার থে গুডা চারেক জুয়ান মদ্দ ধরে নিয়ে আয়। সবাই মিলে হাত লাগালি তাড়াতাড়ি কাজডা হয়ে যাবে নে।

ছোলেমান লাফিয়ে উঠল: লাখ কথার এক কথা বলিছ চাচা। তুমি যে ক্যান ল্যাখাপড়াডা শিখলে না, তাই ভাবি।

প্রশংসাটা ভালই শোনায় রামকিষ্টোর কানে। আত্মপ্রসাদে চোখ চকচক করে। মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে কলকেটা ছোলোমানের হাতে দেয়। বলে, ক্যানে রে? ও কথা কলি ক্যানে? ল্যাখাপড়া শিখলি আমার কি আর ঢুডো হাত গজাত?

ছোলেমান ফস ফস করে কলকেয় টান মারছিল। রামকিষ্টোর কথা শুনে টান থামাল।

বলল, তালি চাচা, তুমার হাতে আর নাঙ্গলা নড়ি উঠতো না। মেদ্দা ছাহেবের জামাইর মতোন চখি চশমা আর পায় ইস্টাকিন আ'টে সিগারেট ফুকতি ফুকতি সদরে যাতি পাত্তে মুক্তারি কত্তি।

নরার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল বিস্ময়ে। মেদ্দা সাহেবের জামাইয়ের পোশাকে বাবাকে কল্পনা করল নরা। সে দেখেছে মোক্তার মিঞাকে। মোক্তারি পাস করার পর থেকেই তাদের গ্রামে মেদ্দা ছাহেবের জামাইয়ের নাম মোক্তার মিঞা হয়ে গেছে। বাবার চখি চশমা, হি-হি। হাসি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে নরার। বাবার পায়ে ইস্টাকিন, ইস্টাকিন আবার কী জিনিস?

নরা জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ দাদা, ওই যে ইস্টাকিন না কী বলে, সিডা কী?

ছোলেমান বলল, মুজা গো মুজা। ছোট কত্তা প'রে আসেন না? তাই। বাবুরা তারেই কন ইস্টাকিন। মেদ্দা ছাহেবের জামাই এখন তো ফুলবাবু। দেখলি, কিডা কবে যে ও হল রিয়াজুদ্দি গাজীর ছাওয়াল ফটকে! এখন তিনি মুক্তারবাবু।

বাবার পায়ে ইস্টাকিন, হি-হি-হি। হেসে গড়িয়ে পড়ল নরা।

রামকিষ্টো ছেলের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হল। ক্যান, ইস্টাকিন পরা কী এমন শক্ত কম্ম? অবিশ্যি পায়ে পরলে কুটকুট করতে পারে। ওই কারণেই রামকিষ্টো পিরেনও পরতে পারে না। জামা গায়ে দিলেই তার দম বন্ধ হয়ে আসে। না হলে, বাবু সাজতে যে সে পারে না, তা নয়। লেখাপড়া শিখতে গিয়েও তো রামকিষ্টো ছেড়ে দিয়েছিল। সে কবেকার কথা। সেই সেবার মেজবাবু কলকেতা থেকে লেখাপড়া শিখে ফিরে এলেন। গ্রামে ইস্কুল খোলার তখন খুব ঝোঁক উঠেছিল তাঁর। আর জাত-বেজাতের হাতে জল খাবার ঝোঁক। পাঠশালা খুলেছিলেন মেজবাবু। প্রথম প্রথম বেশ চলেছিল দিন কতক। দিনের পাঠশালায় রামকিষ্টোরা যেতে পারত না। মাঠে তা হলে লাঙ্গল দেবে কে? বেশ কথা, মেজবাবু বললেন, তা হলে তোদের জন্য রাত্তিরেই আর একটা পাঠশালা খুলব।

মেজবাবু সে পাঠশালাও খুলেছিলেন। হিন্দু মোছলমান সব পাড়ায় ঘুরে ঘুরে পড়ুয়া জোগাড় করেছিলেন। বইপত্তরও আনিয়েছিলেন মেলা। তোড়জোড় করে পড়াশুনা আরম্ভ হয়েছিল। তারপর একদিন সব ভেস্তে গেল। বাছবিচার না করে মেজবাবু যেই জল চালাবার চেষ্টা করলেন

সবার, অমনি গ্রামে যেন প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাবে, এমন অবস্থা হল। রটে গেল যে, মেজবাবু বেহ্মজ্ঞানী হয়ে এসেছেন। বেহ্মজ্ঞানী কী, রামকিষ্টো তা জানে না। তবে তখনকার গ্রামের হাবভাব দেখে রামকিষ্টোর মনে হয়েছিল, হয় মেজবাবু পাগল, নয় সাংঘাতিক রকমের কিছু।

প্রথমেই দিনের পাঠশালা উঠে গেল। রাতেরটাও যায় যায়। দেওয়ান-বাড়িতে তখন রাতদিন কান্নাকাটি, তর্ক, তর্জন-গর্জন চলেছে। কত্তাবাবু কত্তামা তখনও বেঁচে। সেই কত্তাবাবু, যিনি নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন, বয়সকালে যার দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত, সেই কত্তাবাবুর শাসনও মেজবাবুকে টলাতে পারে নি। ত্যাজ্যপুত্তুর করতে চেয়েছিলেন মেজ-বাবুকে। তবু মেজবাবু তাঁর কোট ছাড়েন নি। একটু একটু মনেও আছে রামকিষ্টোর, মেজবাবুর সেই আমলের দু-চারটে কথা। একটা কথা মেজ-বাবু প্রায়ই বলতেন, ঈশ্বর এক। সকলকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর চোখে উঁচু জাত নিচু জাত নেই। ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে মানুষ। মানুষ মাত্রেই মানুষের ভাই। ভাইয়ের হাতের জল ভাই খাবে বইকি।

রোজ পাঠশালায় এই কথাগুলো বলতেন মেজবাবু। কেন বলতেন, তা রামকিষ্টো জানে না। ও কথাগুলোর মানে কী তাও তারা বুঝতে পারত না। তবে শুনতে খারাপ লাগত না। আর এটাও বুঝত না রামকিষ্টো, এতে এমন কী খারাপ কথা আছে, যা শোনামাত্রই গ্রামসুদ্ধু মাতব্বররা চটে যেত। বিশেষ করে পুরুত মশায়। তিনিই তো বাড়ি বাড়ি ঘুরে বলে বেড়াতেন, যে মহির পাঠশালায় ছেলে পাঠাবে, সে জাতিচ্যুত হবে, সে উচ্ছন্নে যাবে। পুরুত ঠাকুর খুব তেজী লোক। আটখানা গ্রামে তাঁর বিধান চলে। তাঁর কথা অমান্য করবে কে? পাঠশালায় কেউ ছেলে পাঠাল না। মনের দুঃখে মেজবাবু সাহেবের পাটের অফিসে চাকরি নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। তারপর থেকে তো দেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কই প্রায় উঠে গিয়েছিল। মেয়ের অন্নপ্রাশনও বিদেশেই সেরেছিলেন। কর্তাবাবু মারা গেলে সবাই ভেবেছিল, তিনি বোধ হয় শ্রাদ্ধশান্তি আর করবেন না। দেখা গেল, সে ধারণা ভুল। দেশেও এলেন। নিয়মমতই তিনি সেসব করলেন। কর্তামার বেলাতেও নিয়মের কোন লঙ্ঘন করেন নি। মেজ মার বেলাতেও না। মেজমা মারা যাবার পর বড়দিকে বাড়িতে রেখে মেজবাবু একাই গেলেন কর্মস্থলে। তারপর থেকে

আবার দেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ শুরু হল। তবে এ মেজবাবুর সঙ্গে রামকিষ্টো আগের মেজবাবুর কোন যোগই কোথাও দেখতে পেল না। শুধু যে দাড়িই রেখেছেন মেজবাবু তা নয়, তাঁদের সকলের কাছ থেকেই যেন দূরেও সরে গেছেন।

কত দিনকার কথা। মেজবাবুর পাঠশালাটি টিঁকে থাকলে রামকিষ্টোর লেখাপড়া হয়তো হতেও পারত। না হবার কী আছে! মোক্তারও যে হতে পারত না, তাই বা কে বলল? মেদ্দা সাহেবের জামাই, ওই ফটিক মিয়া, ও কি আর লাঙ্গল ঠেলে নি? ঠেলেছে। কিন্তু সুবিধে পেতেই লেখাপড়া শিখতে চলে গিয়েছে। শিখেছেও খুব কষ্ট করে। এখন পাঁচজনে তাকে মান্য তো করবেই।

যাকগে, ওসব আবোল-তাবোল ভেবে লাভ কী? যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল রামকিষ্টো।

বলল, যা বাবা, তাড়াতাড়ি বুনো-পাড়াডা ঘুরে আয়। হাতের কাজ নামায়ে ফেলি চটপট।

ছোলেমান ছুটল বুনো-পাড়ায়।

মেজকর্তা অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন বার-বাড়ির ভিতর। যারা সকালে জটলা পাকাচ্ছিল, তারা কেউই আর নেই। ফাঁকা ঘরের শূন্যতায় তাঁর অসহায় ভাব আরও বেড়ে গেছে। বুড়ীকে উঠোনে নামাতে কিছুতেই তাঁর মন সায় দিচ্ছে না কুসংস্কারে এরা কি পরিমাণ আচ্ছন্ন, সেটা ভেবেই অবাক লাগে মেজকর্তার। পৃথিবীর কত দ্রুত যে পরিবর্তন হচ্ছে, তাঁর কোন খবর এদের কানে পৌছয় না। তিরিশ বছর আগেও এদের ধ্যান-ধারণা যা ছিল, এখনও তাই-ই আছে। তা থাকুক, সে জন্য আর দুঃখ হয় না তাঁর। সে জন্যে আর মাথাব্যথাও নেই। তাঁর ভাবনা, বুড়ীর জন্য। ওই জলের মধ্যে ভিজে কুঁড়েতে নামালে মেয়েকে তাঁর হারাতে হবে। কোন ভুল নেই। অসম্ভব। এ ব্যবস্থা মেনে নিতে তিনি পারবেন না।

কড় কড় বাজ পড়ল। মেজকর্তা একটু চমকে গেলেন। কাছেই কোথাও পড়েছে নিশ্চয়। ঝিলিকে তাঁর চোখে প্রায় ধাঁধা লাগে এমন অবস্থা। ভেতর-বাড়িতে যাবেন এমন সময় দেখলেন, অন্ন দাই বড়

একখানা মানকচুর পাতা মাথায় দিয়ে আসছে। ভিজে সপসপ করছে তার সর্বদেহ।

মেজকর্তা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী রে, কোথায় ছিলি তুই? বড় বউ যে তোর জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।

এমনভাবে মেজকর্তার একেবারে সামনে পড়ে যাওয়াতে অন্ন একটু হকচকিয়ে গেল। চট করে ঘোমটা টেনে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। সেখানে পড়বি তো পড়্, একেবারে বড় বউয়ের সামনে।

বড় বউ ধমকে উঠলেন, এই যে, লবাবের বিটী! বলি সাপের পাঁচ পা দেখিছ না কি?

অন্ন কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বড় বউ লাগালেন আর একটা ধমক।

বলি তোর আক্কেলটা কি গিলে খাইছিস?

অন্ন কাতরভাবে বলল, দোহাই মা, আগে আমার কথাডা শুনে ল্যাও, তারপর তুমার প্রাণে যা চায়, তাই বলো। লুহাজাঙার বদন নিকিরি সেই রাত থাকতি আসে আমারে পিরায় পাঁজাকুলা করে ধরে নিয়ে গেল। কত করে তারে কলাম তুমাগের বাড়ির কথা। কিছুতিই শুনলো না। ওর বউর অনেক রাত্তিরি থেই ব্যথা উঠিছিল। তা মা, মঙ্গলে সুমঙ্গলে কাজডা উদ্ধার হতি তবে গিয়ে তুমার এই ছাড়া পালাম। করব কী মা কও দিনি। এখনও পয্যন্ত দাঁতে একটা দানা কাটি নি। বড়দির জন্যি তুমি ভা'বে না। পেরথম পুয়াতি তো চট করে কিছু হবে না। সুমায় নেবে, নিজিগেরও তো হয়েছে তুডো একটা। জান তো সবই। এখন তুডো খাতি দ্যাও দিনি। একেবারে ভুখচানি পড়ার জুগাড় হয়েছে।

অন্নকে দেখে, তার কথা শুনে বড় বউয়ের প্রাণে জল এল। বড় ননদকে ডাক দিলেন।

ও দিদি, তুমার রান্না হয়েছে? একবার বেরোও তো?

শুভদা নিরামিষ ঘরের থেকে বেরিয়ে এলেন।

ও মা অন্ন, আ'সে পড়িছ! যাক বাঁচালে। বড় ভাবনায় ফেলিছিলে।

বড় বউ বললে, ওরে নিয়ে টানাটানির তো শেষ নেই। ভোর রাত্তিরি লুহাজাঙায় ধরে নিয়ে গিছিল। খালাস-টালাস করে এই আ'তিছে। এখনও কিছু মুখি দিতি পারে নি। তুমার ঘরে হয়েছে কিছু? ওরে দিতি পারবা খাতি

রান্না তো হয়েছে। এখন ওরে দ্যায় কিডা? দ্যাখ্‌ দিনি বউ ওঘরে ফুলি আছে নাকি? থাকলি, দে পাঠায়ে। আমি ভাত ডাল বাড়ে দিই। ও অন্নরে একটু ধরে দিক। যা অন্ন, একখান পাতা-টাতা কাটে আন।

অন্ন বলল, হ্যাঁ, আমি আর বিষ্টির মধ্যি নামছি। পায় আমার হাজা ধরে গেল। এই কচুপাতখান মাথায় দিয়ে আইছি। এইখানাই পাতে বসলাম। এই গুদোমের বারান্দায়। এই পাতেই খাব। তুমি ভাত পাঠায়ে দ্যাও।

তোর বাপু সব তাতেই অনাছিষ্টি।—বলেই শুভদা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

অন্ন ডাকল, ফুলিদিদি, ও ফুলিদিদি!

আঁষের হেঁশেল থেকে মুখ নাড়তে নাড়তে বছর তেরোর ফুলেশ্বরী বেরিয়ে এল। কথা না বলে, মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করল, কী?

অন্ন ফুলিকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

বলল, তুমার গালে কী?

কোঁত করে ঢোঁক গিলে ফুলি বলল, আ মোলো, চ্যাচায়ে পাড়া মাথায় কত্তিছ ক্যান? গলা নামায়ে শুধোতি পার না? আমের আচার খাচ্ছি। বড়পিসি জানতি পারলি পেটে পাড়া দিয়ে বের করবে নে। তুমি খাবা একটু আচার?

অন্ন হেসে বলল, ওমা, কও কী? আচার কি অমন করে খায়! তা ভাল। হা'তের জানে গেছে তুমার কীত্‌তি। এই যে, এই ঘরেই বসে আছে।

বড় বউ ওঘরে আছে শুনে ফুলির মুখ কালো হয়ে গেল। ভাগ্য ভাল, বড় বউ ফুলিকে আচার নিয়ে কোন কথাই বললেন না।

বললেন, দ্যাখ মা, দিদির ঘরের থে আলগোছে ভাত তরকারি আ'নে অন্নরের খাওয়ায়ে দ্যাও। আঁতুরে ঘটিতি করে এক ঘটি জলও ওরে খাতি দিও, কেমন?

অন্নর খাওয়া মাঝ বরাবর এগিয়েছে, অন্ন ডাক দিল, বড়মা, শোন।

বড় বউ বেরিয়ে এলেন।

অন্ন বলল, আসল কথাডা ভুলেই গিছিলাম। লুহাজাঙায় যাওয়াডা এক পক্ষে ভালই হয়েছে, বুঝলে। তাঁতী-বউর পা-ধুয়ানো জলও আনে রাখিছি। পেরথম পুয়াতি। বলা তো যায় না, কখন কোন্‌ডে দরকার লাগে!

এ অঞ্চলে তাঁতী বউয়ের খুব সুনাম। আট-দশটা ছেলেপুলের মা। একটি ফোঁটা কষ্ট কোনটার জন্য পায় নি। ব্যথা উঠেছে কি প্রসব হয়ে যায়। তাই এ-অঞ্চলের দাইরা তাঁতী-বউয়ের পা-ধোয়ানো জল এনে রাখে। যে প্রসূতি বেগ দেয়, প্রসব হতে যাদের খুব কষ্ট হয়, দাইরা সেই সব প্রসূতিকে তাঁতী-বউয়ের পা-ধোয়ানো জল খাইয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অব্যর্থ ফল।

ভিতরের ঘরে গিরিবালা শুয়ে ছিল। অন্নর কথা শুনে তার গা গুলিয়ে উঠল। এবার দুর্গাপূজার সময় তাঁতী-বউকে সে দেখেছে। বারোয়ারি-তলায় ঠাকুর দেখতে এসে এ-বাড়িও বেড়িয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে গল্পও করেছে তাঁতী-বউ। গিরিবালা সেই সময় দেখেছে তার দুই পায়ে হাজা। সেই পা-ধোয়ানি জল ওকে খেতে দেবে নাকি? ওয়াক্ ওয়াক্। হড়হড় করে বমি করে ফেলল গিরিবালা।

ওমা, কী হল মেয়ের? কী হল? বড় বউ ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

তিন

বড় বউ হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন, গিরিবালা খাটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে মেঝেয় বমি করছে।

বছর পনরো বয়েস গিরিবালার। শ্যামবর্ণ। মাঝারি গড়ন। এক মাথা কোঁকড়া কালো চুল। দু-চারগাছি কপালের উপর এসে পড়েছে। প্রথম মাতৃত্বের লাবণ্যের ঢল নেমেছে গিরিবালার গোটা শরীরে। যেন নতুন বর্ষার বিল একখানা।

গিরিবালা শ্রান্ত চোখ দুটো তুলে বড় বউয়ের দিকে চাইল। তারপর মৃগী রোগীর মত লাফিয়ে উঠে জাপটে ধরল বড় বউকে।

হাউমাউ করে চেঁচাতে লাগল গিরিবালা।

বড়মা, ও বড়মা, তুমার দুটো পায় পড়ি বড়মা, আমার মাথার দিব্যি, তুমার ঠাকুরির দিব্যি, আমারে ওইসব ছাইভস্ম খাওয়ায়ে না। আমি আর তালি বাঁচব না। ও বড়মা, তুমারে ব্যাগ্যাতা করি—

গিরিবালার কাণ্ড দেখে বড় বউ ঘাবড়ে গেলেন।

ও মা, বুড়ী অমন উতলা হচ্ছ ক্যান? কী হয়েছে? ঠাণ্ডা হও। কিসির কথা কতি চাচ্ছ, কও দিনি। সুস্থির হয়ে কও।

গিরিবালার উত্তেজনা এক নিমেষে জুড়িয়ে গেল। অবসাদ এসে তাকে গ্রাস করল। খাটের উপর নেতিয়ে পড়ে চোখ বুজে হাঁফাতে লাগল। বড় বউ তার সারা গায়ে, মাথায় পরম আদরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

কাঁদো-কাঁদো গিরিবালা অতি ক্ষীণস্বরে বলল, অন্ন যা আনেছে তা আমারে খাওয়ায়ে না, দোহাই তুমার।

বড় বউ আরও আশ্চর্য হলেন।

কী আনেছে অন্ন, হ্যাঁ মা, কও দিনি? আমি তো বুঝতি পারতিছি নে।

কথাটা স্মরণমাত্রেই আবার পেট গুলিয়ে উঠল গিরিবালার। ওয়াক্ তুলল বার দুই। তবে এবার আর বমি হল না। এইটুকু পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে উঠল গিরিবালা। হাটুরে হাপরের মত বুকখানা উঠানামা করতে লাগল। ধামার মত পেটটায় বার কয়েক চাপ পড়ল।

গিরিবালা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ওই যে তাঁতী-বউয়ের পা-ধুয়ানো জল আনিছে অন্ন। আমি সে বউডেরে দেখিছি। তার দুটো পায়েই হাজা। একেবারে থ্যাক থ্যাক করতিছে···ওয়াক্ ওয়াক্···ও আমি মরে গেলেও খাতি পারব না···ওয়াক্···খাতি গেলিই মরে যাব।

গিরিবালার পেটে ঈষৎ একটা মোচড় লাগল। কপালে ঘামের বিন্দু ফুটে উঠল। বড় বউ আঁচল দিয়ে গিরিবালার মুখ মুছিয়ে দিলেন। হাতপাখা ব্যজন করলেন কিছুক্ষণ।

বললেন, ত্যাখ দিনি মেয়ের কাণ্ডজ্ঞান! ও চাঁপা, এক ঘটি জল আন্, ফুলির মারে কতো, মাঝেডা মুছে দিয়ে যাক। ও মা, বুড়ী! ভয় নেই, ওসব ছাইভস্ম তুমার খাতি হবে ক্যান? বালাই ষাট!

গিরিবালার ধড়ে এতক্ষণে যেন প্রাণ এল। অজানা এক আতঙ্কে দেহের স্নায়ুগুলো ধনুকের ছিলের মত এতক্ষণ টান টান হয়েছিল। এবার তারা শিথিল হল। চাঁপা জল আনল। বড় বউ একটু একটু করে জল নিয়ে গিরিবালার মুখ, চোখ, কপাল, ঘাড়, দু কানের পিছনটা বেশ করে ধুয়ে দিলেন। ফুলির মা এসে ঘর মুছে দিল।

বড় বউ জিজ্ঞাসা করলেন, ও ফুলির মা, রান্না হয়েছে?

ফুলির মা ঘাড় নাড়ল : হ্যাঁ।

তবে যাও, মাজে কত্তারে খাতি দ্যাওগে। ছোট বউরি চান করায়ে দিতি কও। ও ফুলির মা, একটু দাঁড়াও, তুমার গুঁড়োর কোটোডা দেখি।

ফুলির মা গুঁড়ো তামাকের কৌটো আঁচলের গিঁট খুলে বের করে দিল। বড় বউ বেশ করে দাঁতে মিসি মেখে নিলেন, উঠে গিয়ে উঠনে পিচিৎ করে খানিকটা ছ্যাপ ফেলে আরও খানিকটা গুঁড়ো দাঁতে লাগিয়ে ফুলির মার হাতে কৌটোটা ফেরত দিয়ে গিরিবালার পাশে এসে বসলেন। সস্নেহে চাঁপাকে ডাকলেন।

মণি রে, যাও চান করে নাওগে। আজ একা-একাই নায়ে নিও, কেমন? দিদির শরীরডে খারাপ হয়েছে কিনা, আমি একটু ওর কাছে থাকি।

বড় বউয়ের কথার সঙ্গে সঙ্গে মিসির গুড়ো ফস ফস করে এদিক ওদিক উড়ে যাচ্ছিল।

চাঁপা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, বড় মা, কথা কয়ে না, তুমার মুখির গুঁড়ো তালি বড়দির চোখে উড়ে পড়বেনে।

বড় বউ হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। তারপর হেসে ফেললেন।

বললেন, মেয়ের দিনকের দিন বিদ্দি হচ্ছে, অ্যাঁ! ফাজলেমি রাখে যা কই মন দিয়ে শোন। বেশ করে তেল মাখবা, বুঝিছ। গায়, মুখি, পায়ে। তেল মাখে আমারে দেখায়ে তারপর চান করতি যাবা। বুঝলে?

বড় বউয়ের কথা শেষ না হতেই চাঁপা অদৃশ্য। বড় বউয়ের মনটা খচখচ করতে লাগল। তেলটা ভাল করে চাঁপা মাখবে কি না কে জানে! তেলে-জলেই শরীর। ওইটুকু মেয়ে, ও কি আর নিজে নিজে মাখতে পারে তেল? নাঃ।

বড় বউ ডাক দিলেন, ও চাঁপা, তুই আমার কাছেই আয়। তেলের বোতলটা নিয়ে আয় এখেনে।

বেচারী চাঁপা! ভেবেছিল এই একটা দিন যদি বড়মার কবল থেকে রেহাই পায়! বড়মার হুকুমে মুখখানা ব্যাজার করে তেলের বোতলটি নিয়ে হাজির হল।

গিরিবালা শুয়ে শুয়ে রগড় দেখছিল। বড়মার কাছে তেল মাখা যে কী শাস্তি, গিরিবালা তা জানে। বড়দাও জানে। কলকাতায় পড়তে গিয়ে বড়দা বেঁচে গেছে। শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে সেও বেঁচে যাবে। তখন সব কোপ গিয়ে পড়বে চাঁপার উপর।

বড় বউ ততক্ষণে চাঁপার বিনুনি খুলে ফেলেছেন। চিরুনি চালাচ্ছেন তার চুলে। মুখ গোমড়া করে দুই হাঁটুতে মুখ ঠেকিয়ে চাঁপা বসে আছে।

গিরিবালার হাসি পেল।

বলল, এই চাঁপা. মুখখানারে বেগুন বেচা করে রাখিছিস ক্যানে?

সে কথার জবাব না দিয়ে চাঁপা চেঁচিয়ে উঠল, উঃ বড়মা, লাগে।

চাঁপার রকম দেখে গিরিবালা মনে মনে হাসতে লাগল। চাঁপাকে চটাবার জন্য বলল, লাগে, না হাতি! মেয়ে একেবারে ফুলির ঘায় মুচ্ছো যাবেন!

চাঁপা থরথর করে উঠল, ছাখ্ বড়দি, তুই রুগী, রুগীর মত থাক্, ফোড়ন কাটিসনে তো।

বড় বউ ধমকে উঠলেন, আ গেল যা। মেয়ের কথার ছিরিডে ছাখ দিনি! ও রুগী হতি যাবে ক্যান? বালাই ষাট।

চাঁপা অপ্রস্তুত। গিরিবালা মুখ গুঁজে হাসতে লাগল। বড় বউ কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চাঁপার চুলের জট ছাড়াতে লাগলেন। দাঁত-ভাঙা চিরুনি। মাঝে মাঝে চুলের মধ্যে আটকে গিয়ে পট পট করে চুল ছিঁড়তে লাগল। ব্যথা লাগলেও প্রচণ্ড অভিমানে চাঁপা মুখ বুজে রইল। উচ্চবাচ্য করল না। জানে, করলেও ফল হবে না। বাঘে ধরলেও কখনও কখনও নিস্তার মেলে, কিন্তু বড়মার কাছ থেকে ছাড়ান নাস্তি। চাঁপা জানে, এখন জবজবে করে সারা শরীরে তেল মাখতে হবে। তারপর খোল দিয়ে, সর-মেশানো হলুদবাটা দিয়ে ঘষে ঘষে তা তুলতে হবে। তারপর পুকুরের জলে নেমে দুটি কি তিনটি ডুব। বাস্। গায়ে যত খুশি জল ঢাল, আধ ঘণ্টা, না হয় জলে গলা ডুবিয়ে বসে থাক, কিন্তু মাথায় বেশী জল দেওয়া চলবে না। চুলের তেল ধুয়ে ফেলা চলবে না। মাথা রুক্ষু হয়ে গেলে রঙ জলে যাবে চুলের। কালো কুচকুচই যদি করতে না থাকল, তবে সে আর চুল কী? কটা কটা চুলও যা, কুষ্টার ফেঁসোও তাই। ওকে বড় বউ চুলই বলেন না। এসব দিকে তাঁর বড় কড়া নজর।

চার

কড়া নজর ছোট বউয়েরও।

অয়েলক্লথটা পরিপাটি করে পেতে ছেলেকে যত্ন করে শুইয়ে দিলেন। রাজপুত্তুর ঘুমিয়ে পড়ল। ও ঘুমিয়েই থাকে। পাখার বাতাস করতে করতে ছোট বউ ভাবলেন, তা এক রকম ভালই। ডাইনী মাগীদের চোখের আড়াল পড়বে। জানতে পারলে কি রক্ষে রাখবে না কি, ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে না রাজপুত্তুরকে। তাই তো এত সতর্কতা ছোট বউয়ের। তাই এত কড়া নজর।

একটা সুন্দর কাঁথা দিয়ে ছোট বউ আপাদমস্তক ঢেকে দিলেন রাজপুত্তুরকে। একটু নিশ্চিন্ত হয়েছেন কি, কড় কড় করে বাজ পড়ল। চমকে উঠলেন ছোট বউ। ষাট ষাট। রাজপুত্তুরের গায়ে আদরে হাত বুলিয়ে দিলেন। যদি চমকে উঠে পড়ত? কেঁদে উঠত রাজপুত্তুর? তা হলে? তা হলে আর কী, ভারি সুবিধে হত ডাইনীটার। কান্নার শব্দ শুনে এই ঘরে এসে হাজির হত। তারপর রাজপুত্তুরের গলাটি মট্‌টাস্। মটরশুঁটির কচি ডগার মত ভেঙে দিয়ে যেত হারামজাদী।

হঠাৎ ছোট বউয়ের মাথায় ঝিলিক খেলে গেল। সুর করে বলে উঠলেন, কিন্তু গলাটা পেতে কোথায়, গলাটা পেতে কোথায়? হুঁ হুঁ, নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে! দেখ, খুঁজে দেখ, কোথায় রাজপুত্তুর! কোথায়, বের কর। ছোট বউ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অকস্মাৎ হাততালি দিয়ে নাচতে শুরু করলেন। গান ধরলেন। খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারই। খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারই। বাতাসকে লক্ষ্য করে বললেন, খোঁজ্ হারামজাদী, খোঁজ্। ভাবছিস খাটের উপর শুয়ে আছে। এই ছাখ্। একটানে কাঁথাটা তুলে ফেললেন ছোট বউ।

একটা কোল-বালিশ শোয়ানো রয়েছে সেখানে।

ডাক দিলেন, কই আয়? গলা ছেঁড়্? খলখল করে হেসে উঠলেন প্রচণ্ড উল্লাসে। কলা খা, কলা খা। তুয়ো তুয়ো তুয়ো।

আবার সশব্দে একটা বাজ পড়ল। ছোট বউ একছুটে জানালার কাছে গিয়ে আকাশপানে চেয়ে তারস্বরে ধমক দিলেন, এই ও, চোপ রাও।

নরা ছোট বউয়ের ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক সাজছিল। পিছনে ছোট বউয়ের ধমকের আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠেই দিল দৌড়। এক-দৌড়ে একেবারে বাপের কাছে।

রামকিষ্টো জিজ্ঞাসা করল, কী রে?

ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে নরা ছোট বউয়ের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, পাগল!

রামকিষ্টো বলল, তাতে হয়েছে কী?

নরা বলল, আজ খুব বাড়েছে মনে হচ্ছে।

রামকিষ্টো বলল, বাড়ুক, তোর তাতে কী?

নরা ভয়ে ভয়ে বলল, যদি মারে?

রামকিষ্টো ভীষণ চটে গেল। বুনো-পাড়ার সর্দাররা কজন এসে গেছে। হাতে হাতে কাজ চলেছে জোর। অমানুষিক পরিশ্রমে ওরা কুঁড়েটা খাড়া করে ফেলেছে। চারিদিকে পগার কেটে উঠনের জলও কমিয়ে ফেলেছে। ভালমত একটা বেড়া এবার বেঁধে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এই কি তার ন্যাকার করার সময়! রামকিষ্টো মনে মনে তার বউকে গাল দিতে লাগল। কী এক গুণধরই বিইয়েছিল মাগী! তড়াসেই মরছে ছেলেটা।

রামকিষ্টো ছেলের গালে ঠাস করে একটি চড় মারবার ইচ্ছে অতিকষ্টে দমন করল। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, হ্যাখেক যদি ঘাপান খাতি না চাস তো আমার সামনের থে সরে যা।

নরা ভয়ে ভয়ে বাপের কাছ থেকে সরে গিয়ে ছোলেমান নিকিরির পায়ে পায়ে ঘুরতে লাগল।

নতুন কুঁড়েটার উপর ছোট বউয়েরও চোখ পড়ল। খুব গম্ভীর হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরামীদের কাজ দেখতে লাগলেন তিনি। প্রথমে মাথায় কিছুতেই ঢুকল না, ওরা ওখানে জড় হয়ে করছে কী? বৃষ্টিতে ভিজছে।

তা ভিজুক। দরজায় যে বাইরের থেকে শিকল দেওয়া। নইলে তিনিও একটু ভিজতেন।

ও সর্বনাশ! এক পলকে ছোট বউ সব বুঝে ফেললেন। ওরা যে কুঁড়ে বানাচ্ছে! আবার এক রাজপুত্তুর আসছে তা হলে।

কী একটা কথা, কী একটা ব্যথা যেন ছোট বউয়ের অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভেসে উঠতে চাইছে। কিন্তু পারছে না। মানসিক জটিলতার গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। কথাটা স্পষ্ট হয়ে ফুটছে না, ব্যথাটা তীব্র হয়ে উঠছে না। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে ছোট বউয়ের। অনেকক্ষণ ধরে শান্ত হয়ে আছেন। জানালার গরাদের উপর বুকটা জোর করে চেপে ধরে বুক-শিনশিন ভাবটার উপশম চাইছেন। ঝরঝর করে বৃষ্টি ঝরছে। মক মক মক—ব্যাঙেরা ঐকতান গান জুড়েছে পাছ-দুয়ারের পুকুরটাতে। গোয়াল থেকে রাঙ্গী গাইটা হাম্বা হাম্বা ডাক ছাড়ছে। সব যেন নতুন করে শুনতে পাচ্ছেন ছোট বউ। এমন কি গুদোমের পাশের হাজারি গাছটার রসখাঁজা-কাঁঠালগুলোও যেন ছোট বউয়ের চোখের উপর নতুন স্বপ্নের মত ফুটে উঠল।

হ্যাঁ, একটু একটু করে যেন তাঁর মনের উপরকার ভারী পর্দাটা সরে যাচ্ছে। বছর দশেক আগেও যেন এই রকম একটা সমারোহ এই বাড়িতে হয়েছিল। ওই রকম একটা কুঁড়ে বানানো হয়েছিল এ বাড়ির উঠনে। ছোট বউকে যেন তার মধ্যে ঢোকানো হয়েছিল। তারপর? হ্যাঁ, তারপর যেন কী হল? কী হল তারপর? মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না। মনের যে ঘটের মধ্যে এই সব কথা জমানো তার উপর একটা পাথর পড়ে আছে। ভারী পাথর। নাম-না-জানা একটা উদ্বেগ ছোট বউয়ের মনের সেই ঘটটা ধরে প্রাণপণে ঝাঁকি দিতে শুরু করল। তার মনের কোন কোণার অন্ধকারে যন্ত্রণার একখানা ধারাল ছুরি যেন ঝুলে ছিল। ঝাঁকি খেয়ে সেইখানাই খুলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ছোট বউয়ের অন্তরাত্মা প্রচণ্ড আঘাতে দু ফাঁক হয়ে গেল। কী যন্ত্রণা, কী অসম্ভব প্রদাহ!

হঠাৎ ছোট বউয়ের দিব্য চক্ষু খুলে গেল। সব মনে পড়ে গেল। সব। এক রাজপুত্তুর এসেছিল তাঁর কোলে। হিংসেয় সব মাগীর বুক ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। হবে না কেন? আর সবার কোলে বাঁদরছানা,

শুধু তাঁর কোলেই এসেছিল রাজপুত্তুর। সহ্য হবে কেন ওদের? সব চাইতে বজ্জাত ওই ননদটা। ওটা আসলে ডাইনী। ভাতারপুতের মাথা চিবিয়ে খেয়ে এ বাড়িতে এসেছে। ওই ডাইনীই তো তাঁর রাজপুত্তুরের ঘাড় মটকে রক্ত চুষে খেয়েছে। তারপর বাঁওড়ের কাদায় পুঁতে রেখে এসেছে রাজপুত্তুরের দেহটা। রাজপুত্তুর কিন্তু মরে নি। ওরা তো মরে না, শুধু দেহ বদলায়। ওই যে সুন্দর শালুক ফোটে, লাল টুকটুকে পদ্ম ফোটে বাঁওড়ে, ওগুলো কী? ওরাই তো রাজপুত্তুর। শালুককুমার, পদ্মকুমার।

ছোট বউয়ের শান্তভাব আবার কেটে যেতে থাকে। অস্থিরতা বাড়ে। মাথা গরম হয়ে ওঠে। ডাইনী মাগীর উপর আক্রোশ ফেটে পড়ে। তাকে মারবার নানা ফন্দি মাথায় ভাসতে থাকে। ও তো আর এমনি মরবে না। ভাতুড়ে পুকুরের পশ্চিম কোণায় জলের নীচে রূপোর একটা কৌটো পোঁতা আছে। কৌটোর মধ্যে আছে এক কালো কুচকুচে ভোমরা। সেই ভোমরাই ডাইনী মাগীটার প্রাণ। অমাবস্যের ঘুরঘুটি রাতে, এলোচুলে এক নিশ্বাসে ডুব দিয়ে কৌটোটা তুলে আনতে হবে। তারপর ভোমরাটা বের করে দুই আঙুলে ধরে একটানে ঘাড়টা ভেঙে ফেলতে হবে। ব্যাস্, তা হলেই আপদের শান্তি। ছটফটিয়ে মরবে মাগী। মনটা খুশিতে ভরে ওঠে ছোট বউয়ের। মাথাটা অনেক হালকা হয়ে যায়। গরাদ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হি-হি করে হাসতে থাকে আপন মনে। নরা দূর থেকে ভয়ে ভয়ে চায়।

তার দিকে ছোট বউয়ের নজর পড়তেই হাঁক ছাড়েন তিনি, এই বরকন্দাজ, ইধার আও।

নরা পড়িমড়ি করে লাগায় ছুট।

পাঁচ

গিরিবালার ব্যথা উঠল বেলা থাকতে থাকতেই। যন্ত্রণার চেয়ে লজ্জাটাই প্রথমে বড় হয়ে উঠেছিল ওর কাছে। তাই কাউকে কিছু বলে নি। কেমন এক অজানা আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল ওর মনে। ক্রমেই অসহায় বোধ করছিল সে। বারকয়েক পায়খানায় গেল। স্বস্তি পেল না। বিছানায় এসে এলিয়ে

পড়ল। মাঝে মাঝে দু হাত দিয়ে তলপেট চেপে ধরতে লাগল। শেষে অস্থির হয়ে উঠল।

গিরিবালার মনে হল, সাক্ষাৎ এক আগ্নেয়গিরি বাসা বেঁধেছে তার উদরে। প্রথমে ভ্রূণ, পরে একটু একটু করে পুষ্ট হয়েছে অঙ্কুর। অঙ্কুর পুষ্ট হয়ে হয়ে এখন ফেটে পড়বার মত বিরাট শক্তি সঞ্চয় করেছে। সে আর বাধা মানবে কেন? তাকে বাধা দেবে কে? বাইরের আলো বাতাস মুক্তি তার অপেক্ষায় আকুল হয়ে আছে। সে কি আর ভিতরের অন্ধ গুহায় বৃথা কালক্ষেপ করতে পারে? এখন বেরিয়ে আসার পথ চাই তার। তারই সন্ধানে সে ব্যস্ত।

গিরিবালা ক্রমেই কাতর হয়ে উঠতে লাগল। নিদারুণ বেদনা তার সহের সীমা অতিক্রম করল। আজ সকাল থেকেই এই ব্যথা তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা শুরু করেছে। প্রথম দিকে খুব লঘুপায়ে তার আনাগোনা শুরু হয়েছিল। তখন গিরিবালা পরিণাম বুঝতে পারে নি। কাউকে কিছু বলেও নি। শুধু একবার যখন বেশ বড় রকমের একটা মোচড় খেল, তখন লজ্জার মাথা খেয়ে বড়মাকে কথাটা বলে ফেলেছিল। তার পর থেকেই বড়মা তাকে চোখে চোখে রেখেছেন। পরে কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ল ব্যথাটা। অনেকক্ষণ আর কিছু টের পায় নি। গিরিবালা ভাবল, যাক, এবার বোধ হয় নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। অনেকটা হালকা মনেই খাওয়া-দাওয়া সারল।

বিকালের দিকে গিরিবালা প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল। অতর্কিত আক্রমণে হকচকিয়ে গিয়েছিল সে। সামলে উঠতে না উঠতেই আর-এক ঝাঁকি খেল সে। তার মনে হল, এই দুই ঝাঁকিতেই তার মর্মস্থল বুঝি উপড়ে এল। ককিয়ে উঠল প্রচণ্ড বেদনায়। চোখে অন্ধকার দেখল। মৃত্যুর আতঙ্ক ফুটে উঠল তার মুখে চোখে।

কী করলে পরিত্রাণ মিলবে, বুঝে উঠতে পারল না গিরিবালা। বুঝতে পারল না, তার এখন কী করা উচিত। একটু একটু বিরতির পর ঢেউয়ের পর বেদনার ঢেউ এসে গিরিবালাকে নাস্তানাবুদ করতে লাগল। প্রতিবার তার মনে হতে লাগল, এই বুঝি তার প্রাণটা ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। গিরিবালা ছটফট করতে শুরু করল। উঠে বসল। শুয়ে পড়ল। চিত হল। উপুড় হল। আবার চিত হল। হাঁটু দুটো মুড়ে তলপেটে চাপ দিয়ে যন্ত্রণার উপশম করার চেষ্টা করল। বাইরে গেল। একটু পায়চারি

করল। পায়খানায় গেল। কিছুতেই আরাম পেল না, তখন আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে গোঙাতে লাগল। বড় বউ পাশের ঘরে বসে কাঁথা সেলাই করছিলেন। চাঁপা ঘুমিয়ে পড়েছে সামনে। বড় বউ মাঝে মাঝে হাত নেড়ে তার গা থেকে মাছি তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। গিরিবালার অস্পষ্ট গোঙানি তাঁর কানে গেল। ধড়মড় করে উঠে তার কাছে গিয়ে বসলেন। দেখেন, গিরিবালার মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে। বেশবাস আলুথালু। দরদর করে ঘাম ঝরছে গিরিবালার।

মণি রে, ব্যথা উঠল নাকি ?

গিরিবালা কথা বলতে পারল না। বড় বউয়ের একখানা হাত প্রাণপণে চেপে ধরে থাকল।

বড় বউ ব্যস্ত হয়ে ননদকে ডাক দিলেন, ও মা'জদি, আসো দিনি। বুড়ীরি বোধ হয় নামাতি হবে।

শুভদা নিকেলের চশমা পরে ভাগবত পড়ছিলেন। চশমা খুলতে খুলতে এসে পড়লেন।

বললেন, বড় বউ, অন্নরে ডাক। সাধের শাড়িডে পাড়ে আন। আর মহিরি ক' ঠাকুর মশাইরি আনতি লোক পাঠায়ে দিক।

বড় বউ চলে গেলে শুভদা গিরিবালার পাশে গিয়ে বসলেন। আঁচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিতে দিতে আশ্বাস দিলেন।

বললেন, ভয় পায়ে না মা। এমন দিন সব মেয়েরই আসে। কোন ভয় নেই।

তিনি গিরিবালার খোঁপা খুলে চুল এলো করে ডগায় একটা আলগা গিঁট বেধে রাখলেন। গায়ের গহনাগুলো সব খুলে ফেললেন। অন্ন এসে দরজায় দাঁড়াল।

শুভদা বললেন, অন্ন, যা, কুড়েডা ঠিক করগে। মালসায় আগুন কর্। ফুলির মারে জল গরম করতি ক'।

মেজকর্তা হন্তদন্ত হয়ে এলেন। ভয়ে ভাবনায় মুখ চুপসে গিয়েছে। দাড়িতে হাত চলছে ঘন ঘন।

জিজ্ঞাসা করলেন, বুড়ী আছে কেমন ?

স্বরে একরাশ উৎকণ্ঠা। ভয়ে বিছানায়-শোয়া মেয়ের দিকে চাইতে পর্যন্ত পারলেন না।

শুভদা জবাব দিলেন, ব্যথা উঠিছে। ভয় নেই। ভয় কী? তুই লোক পাঠালি ঠাকুর মশায়ের কাছে?

মেজকর্তা বললেন, হ্যাঁ। আচ্ছা মেজদি, যা জল পড়ছে তাতে কুড়েটা তো ভিজে সপসপ করছে। নাই বা নামালে বুড়ীকে। গুদোমের পশ্চিমের বারান্দাটা না হয় ঘিরে দিই। আর একটা ডাক্তার নিয়ে আসি। আঠারোখাদার গোবিন্দ ডাক্তারের তো বেশ হাতযশ আছে।

শুভদা বললেন, মহি, তুই কী মেয়ের চিন্তায় সত্যিই পাগল হলি? ছেলেমেয়ে কী এই বাড়িতে নিহাত কম হয়েছে। কুড়ে ছাড়া কোন্‌ডে ঘরে হয়েছে ক' দিনি? নিয়ম রীত মানতি হবে তো, না কী? ডাক্তার বরং একটা আনতি পারিস। তাতে বুড়ীর উপকার হোক না হোক, তোর মাথা ঠাণ্ডা হবে। তালি আর দেরি করিস নে, এখনই লোক পাঠায়ে দে।

মেজকর্তা আর কথা বাড়ালেন না। লোকও পাঠালেন না। নিজেই ছুটলেন আঠারোখাদায়। আকাশের আক্রোশ তখনও কিছুমাত্র কমে নি।

গিরিবালা কাটা পশুর মত ছটফট করছে কুড়েখানার ভিতর। একটানা গোঙানি শোনা যাচ্ছে তার। উপশমহীন যন্ত্রণার অনন্ত সমুদ্রে সে ভাসছে। দোসরহীন। একেবারে একা। কোথায় তার এই বেদনার উৎস? পেটে। তলপেটে। গিরিবালা তার ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে। অসহায়ভাবে আত্ম-সমর্পণ করেছে বেদনার কাছে। মৃত্যুর কাছে। গিরিবালা জানে তার মৃত্যুর আর দেরি নেই। তবে আর দেরি কেন? মরণ হোক তার। সে আর পারছে না। তার প্রাণটা যেন ভারী এক ভোঁতা জাঁতার মধ্যে পড়ে গেছে। একটু একটু করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

শুভদা ঠাকরুণ কুঁড়ের মধ্যে গিয়ে বসেছেন। তিনি গিরিবালার চুলের ডগের গিঁটটাও খুলে দিলেন। কী একটা শিকড় বেধে দিলেন এলোচুলে। বড় বউ লেপের ওয়াড়, বালিশ-তোশকের ওয়াড় খুলে ফেললেন। সব বন্ধন মুক্ত করা চাই। বাইরের বাঁধন খুলে দিলে যদি গিরিবালার পেটের বাঁধন আলগা হয়! তখন যদি ত্বরায় প্রসব হয়। বাক্সের তালা, কাঠের সিন্দুক, হাত বাক্সের ডালা খোল। কুড়ের বেড়া কেটে দাও। নিয়ম-রীতি মেয়েদের যা জানা ছিল, সব তারা পালন করলেন। ফল কিছু হল না। রিদয় ঠাকুর

এসে মন্ত্র পড়লেন, অস্তি গোদাবরী তীরে জম্ভোলী নামা রাক্ষসী, তস্য স্মরণ-মাত্রেন সুখপ্রসবং ভবেৎ। কিন্তু জম্ভোলীর স্মরণেও প্রসব হল না।

শুভদা বললেন, ও অন্ন, বুড়ীর বগলে হাত পুরে ওরে খাড়া করে তোল, তারপর হাঁটাতি থাক। ও অন্ন, ইবারে বুড়ীরি উপুড় করে শুয়া, শুয়ায়ে আস্তে আস্তে বুড়ীর মাজায় চাপড় মার। বুড়ীর চুলির গুছা ওর মুখি পুরে বমি করা।

সব রকম করা হল। কিন্তু কোন কৌশলই খাটল না।

সব প্রক্রিয়াই ব্যর্থ হল। গিরিবালা ক্রমশই নির্জীব হয়ে পড়তে লাগল।

সন্ধ্যে গেল। রাত হল। ছোট বউ গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা সব দেখতে লাগলেন। দেখলেন, ডাইনি আবার তার কাজ শুরু করেছে। আবার এক রাজপুত্তুর আসছে। আবার তার ঘাড় মটকাবার আয়োজন চলেছে।

ছোট বউ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। প্রবল উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। দাঁড়াও, ছ্যাখাচ্ছি এইবারে মজা! খুঁজে পেতে ঘর থেকে বার করলেন পুরনো আমলের মর্চে-ধরা এক খাঁড়া। দুমদাম লাথি মারতেই দরজার শিকল খুলে গেল।

পা টিপে টিপে কুঁড়ের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সেই মুহূর্তে অন্ন একা ছিল কুঁড়েটাতে। একটু আগে শুভদা গরম জল আনতে গেছেন। ছোট বউ খাঁড়া হাতে 'মাগী তোর রক্ত খাব' বলে হুঙ্কার দিয়ে, এক লাফে কুঁড়ের ভিতর ঢুকে পড়লেন। তা দেখেই অন্নর প্রাণ খাঁচাছাড়ার উপক্রম হল। বাপ রে মা রে করে সে দিল এক ছুট। ছোট বউ চোখের পলকে গিরিবালাকে পাঁজাকোলা করে এনে নিজের ঘরে ঢুকলেন। তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েই ঝপ করে দরজায় খিল এঁটে দিলেন।

ছয়

ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লাগল সবার। শুভদা আর বড় বউয়ের ধমকে অন্ন হাউমাউ থামিয়ে আসল খবরটা যখন বলল, তখনও তার কাঁপুনি থামে নি।

বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করার পর সবার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। বড় বউ তো ভয়ে ভাবনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। শুভদা গুম মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হঠাৎ শুভদা বললেন, অন্ন, একখানা মুটা লাঠি আমারে আনে দে তো। পাগলের পাগলামি আজ বের করে দিই।

রাগে শুভদার চোখ বাঘের মত জ্বলতে লাগল।

বললেন, আর যা, তুই শিগ্‌গির রামকিষ্টোরে ডাকে আন। বাড়িতে পুরুষ মানুষ একটা থাকা ভাল। বড় বউ, তুই আয় আমার সঙ্গে।

দুজনে চললেন ছোট বউয়ের ঘরে।

ছোট বউয়ের আজ ভয়ানক দুশ্চিন্তা। চারিদিকে শত্তুর। রাজ-পুত্তুরকে বাঁচাই কী করে! একবার করে তিনি ছুটে ছুটে গিরিবালার কাছে যাচ্ছেন। তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ভয় নেই, ভয় নেই করে সাহস দিচ্ছেন তাকে। পরমুহূর্তেই খাঁড়া বাগিয়ে দরজার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। কেউ ঢুকেছে কি ঘ্যাঁচ করে এক কোপ। একেবারে দু-ফাঁক।

এমন সময় যা ভেবেছেন তাই, বাইরে থেকে দুমদাম দরজায় ঘা। এ ওই ডাইনির কাজ। ঠিক তাই। অমনি শুভদার গলা শোনা গেল।

এই হারামজাদী, খোল দরজা। ভাল চাস তো এক্ষুনি দরজা খোল। নাহলি মারে তোর হাড় গুঁড়োয়ে দিবানে।

ছোট বউ ভিতর থেকে হুঙ্কার দিলেন, ঢুকিছিস কি ঘ্যাঁচ, দুখান করে দেব। রক্ত খাওয়া তোর জন্মের মত ঘুচিয়ে দেব। ডাইনি কোথাকার! ঢুকে ত্যাখ একবার, আমার হাতে মন্তর-পড়া খাঁড়া রয়েছে।

এমন সময় শুভদার চিৎকার শোনা গেল।

মহি, শিগগির আয়। সব্বোনাশ হয়ে গেছে। পাগল বুড়ীরি আতুড়ির থে তুলে ওর ঘরে নিয়ে গেছে। খাঁড়া হাতে দরজায় দাঁড়ায়ে আছে। কি সব্বোনাশ যে হল কে জানে?

বল কী? মেজকর্তা আর্তনাদ করে উঠলেন। তাঁর পায়ের তল থেকে মাটি যেন সরে গেল।

এখন উপায়?

উপায় ছোট বউই বাতলে দিলেন। মেজ ভাসুরের উপর তাঁর অগাধ ভরসা। জানলা খুলে ভাসুরকে ডাক দিলেন।

বললেন, আমি দরজা খুলছি, কিন্তু খবরদার, ওই ডাইনিগুলো যেন না আসে। আর আমি ওদের কারো রক্ত চুষতে দিচ্ছি নে। আপনি বলুন, কথা দিন, ওদের এ ঘরে ঢুকতে দেবেন না। বড় গিন্নী ইচ্ছে করলে ঢুকতে পারেন। কিন্তু ডাইনিটিকে ঢুকতে দিচ্ছি নে।

মেজকর্তা যেন কুল পেলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

বললেন, হ্যাঁ ছোট বউ, তাই হবে। ও তো তোমারই মেয়ে। তুমি যা বলবে তাই হবে।

ছোট বউ খুব খুশি। দরজা খুলে দিলেন তাড়াতাড়ি। হুড়মুড় করে সবাই ঢুকতে যাচ্ছিল, মেজকর্তা বাধা দিলেন। মেজকর্তা ডাক্তারবাবুকে নিয়ে ঢুকলেন। আর এল অন্ন। আর কাউকে ঢুকতে দিলেন না মেজকর্তা।

এত যে ব্যাপার ঘটল গিরিবালা তার কিছুই জানে না। দুঃসহ বেদনার ভারে আচ্ছন্ন সে। তখন খেয়া মারছে চৈতন্য আর অচৈতন্যের মাঝখানের ঘাটে।

বিন্দুমাত্র শক্তিও আর তার অবশিষ্ট নেই। গোঙানির তেজও নিবু নিবু। চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। মাঝে মাঝে অস্ফুট শোনা যাচ্ছে, মা, মা, আর পারি নে। ছোট বউয়ের চোখে জল।

বাইরে প্রকৃতি হিংস্র। মাতাল। বৃষ্টি আর ঝড়ে মাতামাতি শুরু হয়েছে।

ডাক্তারবাবু গিরিবালাকে পরীক্ষা করলেন। মেজকর্তাকে বললেন,

আপনি বাইরে যান। একটা জোরাল বাতি পাঠিয়ে দিন। অন্নকে বললেন, গরম জল আর সাবান আন। ফরসা ছেঁড়া কাপড় নিয়ে এস। ছোট বউয়ের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। বললেন, খাঁড়াটা মেজবাবুকে দিয়ে দিন। আপনি গোলমাল করবেন না কিন্তু।

ছোট্ট শিশুর মত ছোট বউ ডাক্তারবাবুর কথা মেনে নিলেন। মেজ-ভাসুর তো শিব। ভোলানাথ।

ডাক্তারের অভ্যস্ত নিপুণ হাত প্রায় অচেতন গিরিবালার অঙ্গস্পর্শ করতে লাগল এখানে সেখানে।

বেদনার সমুদ্রে গিরিবালা হালভাঙা নৌকোর মত ভেসে বেড়াচ্ছিল। উঠছিল, নামছিল, হাবুডুবু খাচ্ছিল। কতক্ষণ ধরে সে জানে না। হঠাৎ সে টের পেল পুঞ্জীভূত বেদনার স্তূপ থেকে তাকে এক ধাক্কায় কে যেন উপশমের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার ভারী দেহটা মুহূর্তের জন্য যেন হালকা ঠেকল। অবসাদ আর আরামের অন্তহীন গহ্বরে সে ক্রমশ নেমে যেতে লাগল। একটা কথা সে যেন স্বপ্নের ঘোরে শুনতে পেল, ছেলে।

গিরিবালার অচৈতন্য ঠোঁটে পরিব্যাপ্ত এক টুকরো মৃদু হাসি একাদশীর চাঁদের মত ভেসে উঠল। একটু সলজ্জ, সৃষ্টির কৃতিত্বে একটু-বা গর্বিতও।

বাইরে ঝড় থেমেছে। বৃষ্টি পড়ছে মুষল ধারে। দুরন্ত দুর্নিবার বৃষ্টি। সমস্ত বিশ্ব করুণা-করুণ।

সাত

তার কাছে কেউ ছিল না। সে একা। এই বিশাল পৃথিবীতে, এই অন্তহীন শূন্যতার সমুদ্রে দিক্‌ভ্রষ্ট সে। ভেসে চলেছে একা। কে তাকে চেনে? সে কাকে চেনে? একাকিত্বের বিশাল অজানা মহাসাগরে সে শুধু হাবুডুবু খেয়ে চলেছে। কখনো ভুস্ করে ভেসে উঠছে উপরে, কখনো বা টুপ করে তলিয়ে যাচ্ছে গভীর তলদেশের উদ্দেশে। কত দূরে, কত গভীরে, কোন্ অতলে, সে জানে না। সে তলিয়ে যেতে চায় না। ডুবতে চায় না।

প্রাণপণে হাত পা ছোঁড়ে। হয়ত প্রতিবাদ জানায়। ছোট ছোট দুটি কচি মুঠোয় শূন্যকেই বার বার আঁকড়ে ধরে আশ্রয় পেতে চায়। কিন্তু শূন্য কি আশ্রয় দিতে পারে? আশ্রয় সে পায় না। ডুবতে থাকে অনিচ্ছায়। অসহায়। হঠাৎ ভয় পায়। প্রবল ভয়। ককিয়ে কেঁদে ওঠে। ওয়াঁ ওয়াঁ।

তার চারিপাশে গাঢ় অন্ধকার। ভয় ওৎ পেতে তার শিয়রে বসে আছে। সংশয় হিংস্র থাবা উঁচিয়ে অপেক্ষা করছে পায়ের কাছে। সন্দেহ অস্থির পায়ে লেজ আছড়াতে আছড়াতে তার চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় সে যাবে? কোন্‌খানে আশ্রয় নিলে সে পরিত্রাণ পাবে? তার সন্ধান সে জানে না। এখানে সে যে আগন্তুক। সব যে তার অচেনা। তার হয়ত ধারণা এটা তার শত্রুপুরী। ষড়যন্ত্র আর মৃত্যুর জটলা তার চারিপাশে। এ কোথায় সে এল? কেন এল এখানে? ভয়ে সে চোখ বোজে। চোখ বুজে শুধু কাঁদে। ওয়াঁ ওয়াঁ ওয়াঁ।

ভয়ে সে অস্থির হয়ে ওঠে। পালাতে চায়। হাত ছোঁড়ে, পা ছোঁড়ে প্রাণপণে। কিন্তু গতিহীন তার কোমল দেহটা বিছানায় বন্দী হয়ে থাকে। এক চুলও সরে না। সরে না মৃত্যুর আর ভয়ের সান্নিধ্য থেকে। অসহায়-ভাবে তাই শুধু কাঁদে। ওয়াঁ ওয়াঁ ওয়াঁ।

অকস্মাৎ নিজের তুলতুলে হাতখানা মুখে ঠেকে তার। নিজের দেহের উষ্ণতার স্বাদ পেয়ে নিজেই প্রচণ্ড বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়। এ আত্মীয়তার স্পর্শ থেকে মুক্তি পেতে চায় না। চেটে চেটে উষ্ণতাটুকু ষোল আনা আত্মসাৎ করতে চায়। শক্ত মুঠি মুখে পুরে চুকচুক চাখতে থাকে। উত্তাপ, আরও উত্তাপ পেয়ে খুশী হয় সে। উল্লাসে পশুর মত শব্দ করে কম্ কম্ কম্।

এতক্ষণ সে ভয়ে চোখ বুজে ছিল। এইবার সে চোখ মেলে চায়। দিশে হারিয়ে যায় তার। আবার সেই শূন্য শূন্য শূন্য। দিগ্‌দিগন্তহীন মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে তার দৃষ্টির নিরিখ পথ হারিয়ে ফেলে। ঘরের মটকা অনেক দূর। দেয়াল তো কয়েক যোজন। অতদূরে কচি নজর কি পৌঁছতে পারে! আবার সে চোখ বোজে ভয়ে। বোজে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার খোলে। তার শুধু ভয়ই নেই, কৌতূহলও আছে। আছে অজানা পরিবেশকে জানার আগ্রহ। অন্ধকারই নেই শুধু, আছে আলোর ঝলকও। মৃত্যুর আতঙ্কই শেষ সত্য নয়, সত্য প্রাণের মহা প্রেরণাও। চোখ খুলতেই সূর্যের

উজ্জ্বল আলো তার চোখ থেকে অন্ধকার আর মন থেকে মৃত্যুভয় দূর করে। তার প্রাণে তেজ সঞ্চারিত হয়। বর্ণের সমারোহে তার পুলক লাগে। খুশীর হাসি উপছে পড়ে তার মুখ চোখ বেয়ে। সে অকারণেই হাসির ঢেউ তুলে তুলে জীবনের নতুন নতুন গান রচনা করতে থাকে। আপন খেয়ালে।

শুধু জেগে থাকলেই যে সে এমন করে তা নয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তার রচনা সে করে যায়। তার ঘুম আর জাগরণের সীমানায় কেউ শক্ত হাতে প্রাচীর তুলে দেয় নি। তাই দুই রাজ্যে গমনাগমন তার এত অবাধ। ঘুমের ঘোরেও সে ভয় পেয়ে কাঁদে, আহ্লাদে হেসেও ওঠে।

মাথায় আস্ত-সর্ষের বালিশ আর দুই ধারে দুই নরম পাশবালিশ চাপা দিয়ে তাকে রোদে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে এইমাত্র উঠল। ভয়ানক নিঃসঙ্গ বোধ হল তার। কাঁথাটা ভিজে গেছে। খুব অস্বস্তি ঠেকছিল। আর দেহের কোন যন্ত্রে যেন একটু বেদনাও অনুভব করছে। আর প্রচণ্ড খিধে পেয়েছে তার। এখন অহর্নিশি তার পেটে দাউ দাউ আগুন জ্বলে। এখনও তার পেট জ্বলছে। মোটের উপর ভাল লাগছে না তার। দু-একবার খুঁত খুঁত করে কাঁদল। কেউ শুনল না। কেউ এলও না তার কাছে। তখন দুরন্ত অভিমানে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। কেউ নেই, ওর ব্যথার ব্যথী কেউ নেই এই সংসারে। ও একা, একা, একা।

চাঁপা ছুটতে ছুটতে এল। দেখল, ছেলে একেবারে কেঁদে ফেটে পড়ার যো হয়েছে। তাড়াতাড়ি ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে ও ও ও করে আদর করতে লাগল।

সুনা আমার, মণি আমার, কাঁদে না, কাঁদে না, কী হয়েছে, কী হয়েছে, ও ও ও, কিডা মারেছে আমার সুনারি, কিডা মারেছে, তারে আমি মারে দিবানে, এই দিলাম এক চড়, কাঁদে না, কাঁদে না, ও আমার বাবা, ও আমার সুনা, না না, অত রাগ কি করতি হয়, টিয়েপাখি নিবা, ঝুম-ঝুমি নিবা!

চাঁপা ঝুমঝুমিটা নিয়ে ওর মুখের কাছে নাড়তে লাগল। অদ্ভুত রকমের আওয়াজ শুনে সে প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়ে কান্নাটা কিছুক্ষণের জন্য থামিয়েছিল, কিন্তু শরীরের অস্বস্তি নিরন্তর খোঁচা মারতে আবার দ্বিগুণ ব্যথায় কাঁদতে লাগল। কেউ যে ওর কান্না লক্ষ্য করছে, ওর কান্নার

যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তা ওর সহজাত বোধ ওকে বলে দিল। তাই আরও সুবিধা আদায় করবার জন্য সে পরিত্রাহি ককিয়ে ককিয়ে কাঁদতে লাগল।

থামাতে না পেরে চাঁপা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। অতি কষ্টে তার ওই নাদুস নুদুস ভারী শরীরটা চাঁপা কোলের উপর তুলে নিল। তারপর হাঁটু ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করল।

ও ও ও, সুনা আমার, মনি আমার, বাবা আমার, চুপ কর, চুপ কর, আমসত্ত্ব খাবা, কুলির আচার খাবা, ও দিদি, শীগ্‌গির আয়, না না না, কাঁদে না, কাঁদে না, অত কি কাঁদে, ছি ছি, না না, বকি নি, বকি নি, ও ধন ও ধন, ও সুনা। ধ্যাত্তোরি।

এবার চাঁপা রেগে গেল।

আচ্ছা ছেলে রে বাবা, কানাই বাঁশী বাজাতি আরম্ভ করলেন তো তার আর ক্ষ্যামা নেই। ও দিদি, ও বড়মা, কানে কি সব তুলো ঠাসে রাখিছ? ছেলে যে এদিক আকাটা হয়ে গেল।

চাঁপা অত ভারী ছেলেটাকে ভাল করে নাড়তেও পারে না। এতক্ষণ কোলে নিয়ে ওর পায়ে ঝিঁঝি ধরে গিয়েছে, তাই ছেলেটাকে যেই একটু নড়াতে গেল অমনি টাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে খাটের উপর থেকে মেঝেয় পড়ে গেল। ছেলেটা ক্যাঁক করে একবার শব্দ করেই চুপ মেরে গেল। চাঁপা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

দিদি রে, শীগ্‌গির আয়, তোর ছেলে বুঝি মরে গেল।

ভাত খেতে খেতে গিরিবালা ছেলের কান্না শুনতে পাচ্ছিল। উঠি উঠি করেও উঠতে পারছিল না। আজকাল রাক্ষসের মত ক্ষিদে পায় তার। সে এমনিতেই বড় লাজুক। চেয়ে খেতে পারে না, নিয়ে তো নয়ই। বার বার খাই খাই করাটাও সে পছন্দ করে না। তাই দুপুরের খাওয়াটা একটু বেশি করেই খায়। বড়মা বসে থাকেন সামনে, পিসিমা তদারক করেন, তাতেই গিরিবালা যেন লজ্জায় থালার সঙ্গে মিশে যায়।

আজ রান্নাটাও চমৎকার হয়েছে। বিশেষ করে বড়ি দিয়ে টাটকিনি মাছের ঝোলটা। এ জিনিস খুব ভালবাসে গিরিবালা। তাই তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিল। হঠাৎ চাঁপার চিৎকার শুনে খাওয়া মাথায় উঠে গেল

তার। মরে গেল তার ছেলে! দুম করে কে যেন তার মাথায় ডাঙস মারল। বোঁ করে বাড়িঘরগুলো ঘুরে গেল একবার। গিরিবালা উঠতে চেষ্টা করল, প্রথমবার পারল না। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে উঠেই পাগলের মত দিল ছুট।

হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকে গিরিবালা দেখল ঘর ফাঁকা। চাঁপা নেই, তার ছেলে নেই। সব ফাঁকা। কিছু বুঝতে পারল না গিরিবালা। ফ্যাল ফ্যাল করে তার ছেলের শূন্য বিছানার দিকে চেয়ে রইল। তার হৃৎপিণ্ডটা বুকের ভিতর প্রবল শব্দে হাতুড়ি পিটতে শুরু করেছে। হাত পা, সর্বশরীর তার কাঁপতে লাগল থরথর করে। কী করবে সে, কী তার করা উচিত বুঝে উঠতে পারছিল না।

চাঁপা ঢুকল ঘরে। চাঁপার চোখের জল তখনও শুকোয় নি। গিরিবালার দিকে চেয়ে অপরাধীর হাসি হাসল চাঁপা।

বলল, ধন্যি ছেলে তোর দিদি। আমার কোলে একটুও চুপ করল না। পড়ে ধরে একেবারে আকাটা হয়ে গেলেন। সেই ছোটকাকীমা আসে কোলে তুলে নেলেন, অমনি চুপ। দিব্যি খেলা করছেন হাত পা নাড়ে।

কী বলল চাঁপা! হড়বড় করে কী বলল! কাকীমার কোলে খেলা করছে। হাত পা নাড়ছে। তবে মরে নি। বেঁচে আছে। বেঁচে আছে। গিরিবালা অনেক কষ্টে তার এলোমেলো চিন্তাকে মগজের মধ্যে গুছিয়ে নিল। বেঁচে আছে তার ছেলে। এবার সে অনেক স্পষ্টভাবে তা বুঝতে পারল। কিন্তু কৈ, তার অস্বস্তির, তার মানসিক যন্ত্রণার তো উপশম হল না। হাতুড়ি আরও দ্রুত-তালে পিটে চলল তার বুক, তার দেহের কম্পন আরও বেড়ে গেল। বসে না পড়লে মাথা ঘুরে পড়েই যেত গিরিবালা। খাটের কোণায় বসে পড়ল। তার ছেলে বেঁচে আছে। আঃ! ভগবান, ভগবান, ভগবান!

তার হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে একটা যন্ত্রণাদায়ক বাতাস এতক্ষণ ধরে পাক খেয়ে খেয়ে ঠেলে উঠছিল, এবার একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হুস্ করে বেরিয়ে গেল। সেটা বেরিয়ে যেতেই গিরিবালার বুক নিমেষে হাল্কা হয়ে গেল। এতক্ষণের সব দুশ্চিন্তা, ভয়, আতঙ্ক গলে জল হয়ে তার দুই চোখের কোণ দিয়ে টস টস করে ঝরে পড়তে লাগল। আঃ কি শান্তি, কি শান্তি!

দিদির কান্না দেখে চাঁপার হাসি শুকিয়ে গেল। সে ভাবল, ছেলেকে

ফেলে দিয়েছে বলে দিদি রাগ করেছে। মুহূর্তে চাঁপার চোখেও জল এসে গেল।

দিদির কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, সত্যি দিদি, বিশ্বাস কর, আমি ইচ্ছে করে ওরে ফেলি নি। কান্না থামাতি আমি ওরে কোলে তুলে নিছিলাম। কিন্তু আমি ওই খাটাসরি সামলাতি পারব ক্যান? এমন ঝাঁকি মারল, আমি সুদ্ধু নিচে চিৎপটাং। ভানির দিন, যে ওর কিছু হয় নি। আমার দোষটা কনে ক।

গিরিবালার মনের মেঘ কেটে গেল। সে সস্নেহে চাঁপার মাথায় হাত বোলাতে লাগল। না, আর কোন যন্ত্রণা নেই গিরিবালার মনে। এখন শুধু একটা ইচ্ছে জেগে উঠছে তীব্র পিপাসার মত। তার দুটি স্তন টন টন করছে দুধের ভারে। এখন একবার ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে গিরিবালার। মুখখানা দেখতে ইচ্ছে করছে সোনাধনের। বাস্, আর কোনও আকাঙ্ক্ষা, আর কোনও বাসনা তার নেই। একবার ভাবল, চাঁপাকে আনতে বলে। আবার ভাবল, নিজেই যায় একবার কাকীমার কাছে। তার ছেলে যে-সে নয়, খুব পয়মন্ত। কাকীমার পাগলামি একেবারে সারিয়ে দিয়েছে ছেলে। নাতি নিয়েই আত্মহারা হয়ে আছে।

হঠাৎ চাঁপা খরখর করে উঠল: তুই কী রে, পিচেশ! এখনও আঁচাস নি? আর ওই আটো হাত তুই আমার গায় মাথায় বুলয়ে দিলি?

গিরিবালা একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। চাঁপার ধমকে ধাতস্থ হয়ে দেখে, আরে, সত্যিই তো সে আঁচায় নি। ছি-ছি, কী কাণ্ড বল দিকি! পিসিমা জানতে পারলে সৃষ্টি ধুইয়ে তবে ছাড়বে।

চাঁপাকে মিনতি করল গিরিবালা, মণি রে, তোর দুখ্খানি পায়ে পড়ি, চেঁচাস নে। আমি এক্ষুনি আঁচায়ে আসতিছি। বড় হয়ে ছোটর পায় পড়লাম কিন্তু, এ কথা আবার কয়ে দিয়ে না কারুরই। তালি দেখ কী হয়? পোক পড়বে ওই পায়। বুঝলে?

আট

এই শিশু তার! তারই দেহের অংশ! ভাবলে বিস্ময় লাগে গিরিবালার। রীতিমত বিস্ময়।

ও শুধু বোকার মত, হাবার মত চেয়ে থাকে, নির্নিমেষ চেয়ে থাকে তার ছেলের ঘুমন্ত মুখখানার দিকে। চোখের পলক ফেলতেও ইচ্ছে হয় না তার।

লোকজন থাকলে সে দূরে সরে থাকে। এখনও লজ্জা ভাঙে নি গিরিবালার। বাবাই হোন আর বড়মা কি পিসিমাই হোন, এমন কি চাঁপার সামনেও সে সহজ হতে পারে না। কোলে তুলতে চায় না। পাড়া-প্রতিবেশী কেউ এলে, ওর সমবয়সী কোনও মেয়ে এলে, এসে ওর ছেলের কথা জিজ্ঞেস করলে, তৎক্ষণাৎ লজ্জায় লাল হয়ে যায় তার মুখ। আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে পড়ে। কিন্তু সরে পড়েও কি নিস্তার আছে? কেউ কেউ আসে দস্যুর মতন। গিরিবালাকে টানাটানি করে বের করে আনে। জবরদস্তি তার কোলে ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে মজা দেখে তারা। এইসব অবস্থায় গিরিবালা না পারে ছেলে সামলাতে, না পারে নিজেকে সামলাতে।

সব থেকে বিপত্তি হয় ও-পাড়ার গোয়ালাদিদি এলে। সম্পর্কে ঠাকুরমা হয় গিরির। তাই ইয়ারকির কোন বাঁধন থাকে না বুড়ীর ফোকলা মুখে। গোয়ালাদিদির ত্রিসীমানায় থাকতে চায় না গিরিবালা। তাকে ভালও বাসে বুড়ী। খুব ভালবাসে। যখনই আসে, সর-বাটা ঘি আনে, ক্ষীর আনে। কাঁচা পোয়াতি। ওদের কি আর ক্ষিধের আদি-অন্ত আছে? অষ্টপ্রহর পেটে জ্বলতেই থাকে রাবণের চিতা। বুড়ী এসেই ওকে ডেকে আনবে, কাছে বসাবে, ছেলেকে তুলে দেবে ওর কোলে। তারপর বাটি থেকে ক্ষীর হোক, সর হোক, ছানা হোক—যখন যা আনবে, একটু একটু করে নিজের হাতে তুলে দেবে গিরিবালার মুখে। চাঁপা একদিন চেয়েছিল, ও গুয়ালদি, আমারে এট্টু সর ভাও না। খরখর করে উঠেছিল বুড়ী: ওরে আমার

নোলা রে! সোহাগের সুখতনি। আগে একটা বিয়োয়ে নে দিদির মতন, তারপর গুয়ালদির কাছে সুহাগ খাতি আসিস।

কিন্তু গোয়ালাদির সোহাগ খেয়ে হজম করাও শক্ত। গিরিবালার মনে পড়ল সেদিনের কথা, যেদিন গোয়ালাদি ওকে মাই খাওয়াবার কায়দা শিখিয়ে দিয়েছিল। কী কাণ্ড! কোলের উপর ছেলে কাঁদছে। গিরিবালা বুঝতে পারছে, খিদে পেয়েছে তার। কিন্তু তখন সেখানে জোর জটলা চলেছে মেয়েদের। অত লোকের মাঝে গিরিবালা মরে গেলেও দুধ খাওয়াতে পারবে না ছেলেকে। উঠতেও পারে না। গোয়ালাদিদি তার চুলের জট ছাড়িয়ে দিচ্ছেন। উঠবার কথাটা বলব বলব করেও মুখ ফুটে বলতে পারছিল না। গোয়ালাদিদি ধমক দিল: কী রে, কোন্ রাজ্যি আছিস? ছেলের গলা যে শুকোয়ে কাঠ হয়ে গেল। মাই খাওয়া। গিরিবালা লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে বসে রইল। গোয়ালাদিদি ফোড়ন কাটলেন: মেয়ের নজ্জা নাগছে। বলিহারি নজ্জার! ভাতারের কোলে উব্‌দো হয়ে শুতি নজ্জা হয় নি, নজ্জা হল ছেলের মুখি মাইয়ের বুটা ঢুকতি। এক চড়ে ছিনালি ভাঙে দিতি হয়। নে, মাই বের কর্, খাওয়া ছেলেরে।

কী যাচ্ছেতাই কথা গোয়ালাদির! বড়মা, পিসিমা ও পাড়ার জ্যেঠী খুড়ীরা সব বসে রয়েছেন। গিরিবালার কান মুখ গরম হয়ে উঠল। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, ধরণী দ্বিধা হও। কিন্তু এক গিরিবালা ছাড়া সেই মজলিসের আর-কেউ গোয়ালাদির মন্তব্যে বিচলিত হল না। বরং গিরিবালার বিব্রত ভাব দেখে যেন সবাই আমোদই পেল।

বিয়ের আগে এই মজলিসের ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পায় নি গিরিবালা। হুকুম ছিল না বড়দের। দৈবাৎ কোন কাজে যদি এসেও পড়ত, বড়দের মুখ বন্ধ হয়ে যেত। থমথম করত মজলিস। স্পষ্ট মনে হত, সে অনধিকার প্রবেশ করেছে। বুঝতে পারত, কেউ তার উপস্থিতি বরদাস্ত করতে পারছে না। ভয়ে ভয়ে কাজের কথাটি সেরে সরে পড়ত সেখান থেকে। বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। সেই গিরিবালার এই সভায় এখন অবাধ-প্রবেশ। এখন তার অধিকার মেয়ের নয়, মায়ের। তার পদোন্নতি ঘটেছে।

গিরিবালা এখন মা। পৃথিবীর সব মায়েদের পংক্তিভোজে বসার অধিকার মিলেছে তার। কোন্ জাদুবলে এমন আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল?

এই জাদুর বলে। এই যে সেই জাদু। আমার জাদুমণি।

গিরিবালা ঘুমন্ত ছেলের কাতর মুখের দিকে চেয়ে রইল অপলক। কত ছোট্ট, কতটুকু জীব, অ্যাঁ! কী তাড়াতাড়ি বুকটা উঠছে নামছে দেখ। গিরিবালা নিজেই নিজেকে ডেকে ডেকে দেখাতে লাগল তার খোকাকে। ওই দেখ, ওই দেখ, ঠোঁট নড়ছে। কথা বলছে ষষ্ঠী ঠাকরুণের সঙ্গে। খুব কথা চলে এখন দুজনের মধ্যে। কী কথা বলিস, ও খোকা? ইচ্ছে হয় জিজ্ঞাসা করে। পাগল নাকি গিরিবালা? খোকা এখন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে শিখেছে নাকি যে, বলে দেবে? এখন সব কথা ওর ষষ্ঠীর সঙ্গে। ওই ওই, ওই দেখ স্পষ্ট ঠোঁট নড়ছে, এবার একেবারে বুড়ো মানুষের মত। মুখখানা বেশ রাগী-রাগী হয়ে উঠেছে বাবুর। তার মানে নালিশ করা হচ্ছে। কেন বাপু, আবার নালিশ কেন? আমি কি যন্ত্রণা দিই, কষ্ট দিই? কই, মনে তো পড়ে না। যাই হোক, অজান্তে যদি দোষঘাট কিছু করেও থাকি, তার জন্য অপরাধ নিয়ো না, মা ষষ্ঠী। তোমার দাসীর সর্বদা মঙ্গল কর। যে প্রার্থনা গিরিবালা ছেলেবেলা থেকে বড়মা পিসিমার মুখে হাজারবার উচ্চারিত হতে শুনেছে, মনে মনে ষষ্ঠীর উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করে সেই প্রার্থনাই নিজে আবার করল।

না, জেনে-শুনে কোনও দোষ করি নি। গিরিবালা মা ষষ্ঠীকেই শোনাল। কোন অযত্ন করি নি। ষষ্ঠী ঠাকরুন যেন বিচারের আসনে ছড়ি উঁচিয়ে বসে আছেন। ফরিয়াদী তার খোকা, সোনার খোকা। আর গিরিবালা আসামী। জগতের সমস্ত মায়েদের হয়ে সে যেন জবানবন্দী দিতে এসেছে।

বিরক্ত হই নে আমি, অধৈর্য হই নে। খোকা কী কম বিরক্ত করে? কম জ্বালায়? প্রথম প্রথম ঘুমত। রাতদিন ঘুমত। মাঝে মাঝে ভিজে কাঁথা বদলে দিলে, ও অকাতরে ঘুমত। ওকে ইচ্ছে মতন নাড়-চাড়, চান করাও, কাজল পরাও, সোহাগ কর, কিছু বলত না ও। সে সময়টা ছিল যেন ওর ঘুমের বয়স। তখনও কী আমি নিশ্চিন্তে থাকতে পেরেছি? ওর ওই অকাতর ঘুম দেখে হঠাৎ মনটা ছ্যাঁক করে উঠেছে। এতক্ষণ সাড়া নেই, শব্দ নেই, তবে কী ও মরে গেল? বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছি। সত্যি বলছি মা, তখন আদর করার ছলে ওর গাল টিপে, ওকে অসংখ্য চুমু খেয়ে ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছি। ঘুম ভেঙে বিরক্ত হয়ে ও কতবার ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে উঠেছে। ওর কান্না শুনে আমার প্রাণে জল এসেছে। আবার তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। পরক্ষণেই দেখেছি ঠোঁট নেড়ে

নেড়ে তোমার কাছে ও নালিশ জানাচ্ছে। আনাড়ী মায়ের প্রাণের শঙ্কা যদি অপরাধ হয়, তবে স্বীকার করছি, সেই অপরাধে আমি অপরাধী। রাত্রে ও ঘুমিয়ে থাকে, সাড়াশব্দ দেয় না। পাশে আমি শুয়ে থাকি। কিন্তু আমার তো ঘুম আসে না। এই বুঝি কাঁথাটা ওর মুখে এসে পড়ল, এই বুঝি আমার ঘুমন্ত ভারী দেহের চাপে ওর কচি শরীর থেঁতলে গেল! কত রকম ভয় যে হয়, কী বলব? কতবার আমাকে উঠতে হয়। কতবার যে আঙুল নিয়ে ওর নাকের ডগায় ধরতে হয়, ওর নিশ্বাস পড়ছে কি না বুঝতে হয়। একবার মনে হয় শ্বাস বুঝি পড়ছে, পরক্ষণেই দেখি, না তো, নিশ্বাস পড়ছে না তো। তখন যে মনের অবস্থা কী হয়, তোমাকে কী বলব! তখন আমার বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যায়। চেতনা থাকে না। পাগলের মত ওর নাকের কাছে আমার হাতের ও-পিঠ নিয়ে যাই, গাল নিয়ে যাই। বুঝতে পারি নে। ওর বুকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি, কান ঠেকিয়ে ওর বুকের ধুকধুকানি শুনতে চেষ্টা করি। বুঝতে পারি নে। একটুও বুঝতে পারি নে। তখন এক হেঁচকা টানে বাছাকে বুকে তুলে ফেলি। ওর ঘুম ভেঙে যায়। বিরক্ত হয় আচমকা ঘুম ভেঙে। প্রবল অভিমানে কেঁদে ওঠে। আঃ, সেই শব্দে—কী বলব, সেই শব্দে আমার মরা প্রাণ বেঁচে ওঠে আবার। ও খুব মিথ্যে নালিশ তোমাকে করে না। খুব বিরক্ত করি ওকে।

অপরাধী গিরিবালা স্বীকার করে অকপটে। এবার উলটো চাপ দেয় পাকা উকিলের মত। বিচারককে এনে নামায় আসামীর কাঠগড়ায়। বলে, এ তোমার দোষ ঠাকরুন। সব দোষ তোমারই। তুমি মায়ের কোলে সন্তান দাও, তার বুকে স্নেহ দাও। তার মনে কেন নির্ভরতা দিতে পার না? কেন তাকে নিশ্চিন্ত করতে পার না? সব সময় এক হারাই-হারাই আশঙ্কার পাথারে তাকে নাকানি-চুবানি খাওয়াও কেন?

এর জবাব মা ষষ্ঠী গিরিবালাকে দিলেন না। হয়তো তার খোকনের কানে কানে দিয়ে থাকবেন। গিরিবালার নজর পড়ল তার খোকনের মুখের উপর।

খোকন তখন মুখ টিপে টিপে হাসছে।

দুধের বলকের মত গিরিবালার মনের আবেগ তাই দেখে হঠাৎ উথলে

উঠল। গিরিবালা ছেলেকে বুকে সাপটে ধরে তার মুখে গালে পাগলের মত চুমু খেতে লাগল।

বলল, ওরে দুষ্টু, ওরে দুষ্টু, দুজনে মিলে আমায় জব্দ করার ফাঁদ পাতিছ, অ্যাঁ!

নয়

গিরিবালা স্বপ্ন দেখছিল:

ভূষণ এসেছে। খবর নেই, বার্তা নেই, হুট করে এসে গেল ভূষণ। এসেছে টাট্টু ঘোড়ায়। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরেছে। পিরেনটা ধুতির ভিতর গোঁজা। তার উপর বুক-খোলা আলপাকার কোট। কোটের ভিতর-পকেট থেকে স্টেথিসকোপের হলদে ডাণ্ডির উপর বসানো হাতির দাঁতের মুখ দুটো উঁকি মারছে। পায়ে গার্ডার-দেওয়া মোজা আর ডাবি জুতো আর মাথায় সোলার হ্যাট-টুপি। নতুন-কেনা ঘোড়ার জিনের এক পাশে কালো একটা বাক্স আংটায় ঝোলানো। গিরিবালা চিনল, ওটা ভূষণের চিরসঙ্গী হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্সটা। কিন্তু জিনের ওপাশে চকচক করছে, ওটা কী? গিরিবালা আশ্চর্য হল। ঠাহর করে চেয়ে দেখল, ওটা সাইনবোর্ড। নতুন লেখা রুপোলী আর সোনালী অক্ষরগুলোয় রোদ পড়ে চিকচিক করছে। আর্তকল্যাণ দাতব্য চিকিৎসালয়। কলিকাতা কলেজের পাস-করা, গোল্ডমেডেলপ্রাপ্ত, ভূতপূর্ব হাউস ফিজিশিয়ান ডাঃ ভূষণচন্দ্র বসু, এম. বি. (হোমিও)। সাইনবোর্ডটা বাংলায় লেখা, তাই গিরিবালার পড়তে অসুবিধা হল না। কিন্তু গিরিবালার বিদ্যায় সব কথার মানে বুঝতে পারল না।

তবে এই সব সাইনবোর্ড তো সচরাচর দোকানেই টাঙানো থাকে। অন্তত গিরিবালা তো তাই দেখে এসেছে বরাবর। ঘোড়ার পিঠে আবার সাইনবোর্ড ঝোলায় কে? তাও শ্বশুরবাড়ি আসবার সময়?

না না, শ্বশুরবাড়িতে বিজ্ঞাপন দিতে আসে নি ভূষণ। ঝিনেদার এক চিত্রালয়ের মালিকের কঠিন অসুখ হয়েছিল, ভূষণের চিকিৎসায় ভাল হয়ে

উঠেছে, পয়সাকড়ি দিতে পারে নি ডাক্তারকে, ভালবেসে সাইনবোর্ডখানা লিখে দিয়েছে। পাঁচখানা গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাবেন ডাক্তারবাবু। দেখুক না লোকে।

তাও ভাল। গিরিবালা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ভূষণের কৈফিয়ত শুনে। ছেলে দেখে ভূষণ খুব খুশী। অবিকল নাকি তার মত দেখতে হয়েছে। কী জানি বাপু, হবেও বা। কিন্তু গিরিবালা কিচ্ছু বুঝতে পারে না। এইটুকু ছেলে দেখে বোঝা যায় নাকি কিছু?

তবে এখন পাঁচজনের কাছ থেকে কথাটা শুনতে শুনতে তারও বিশ্বাস হচ্ছে, খোকা বাপের মতই দেখতে হবে। তা খোকা যার মতই দেখতে হোক, ভূষণ যে খুশী হয়েছে তাকে দেখে, গিরিবালা তাতেই খুশী।

ভূষণ সেই দিনই ওদের নিয়ে রওনা হল। একটুও অপেক্ষা করল না। সেজ ভাশুর কলকাতায় থাকেন। তিনি খোকাকে দেখতে চেয়েছেন। এখন ওরা কলকাতায় যাবে। ফিরে এসে ভূষণ ঝিনেদায় বসবে নতুন ডাক্তারখানায়। তাই তার মোটেই সময় নেই।

ঝড়ের মত এল ভূষণ, ঝড়ের মতই ওদের নিয়ে চলে গেল। এখান থেকে ঝিনেদা পর্যন্ত ভূষণ গেল ঘোড়ায়, ওরা পালকিতে। ঝিনেদা থেকে চুয়াডাঙায় ওরা গেল বাস-মোটরে। চুয়াডাঙা থেকে কলকাতায় যেতে হবে রেলে—ঢাকা মেলে।

রেলগাড়ি আসছে না, আসছে না। গিরিবালা ছেলে-কোলে প্ল্যাটফর্মে বসে আছে। ভূষণ কাছে এসে দাঁড়াতেই খোকা তার কোলে যাবার জন্য যেই ঝুঁকি দিয়েছে, অমনি প্রচণ্ড শব্দে গাড়ি এসে পড়ল আর ইঞ্জিনটা যেন ছোঁ মেরে গিরিবালার কোল থেকে খোকাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। স্টেশনসুদ্ধ লোক 'গেল গেল' 'ধর ধর' করে উঠল। ইঞ্জিনের পিছু পিছু সব ছুটল।

গিরিবালা দেখল, ইঞ্জিনের ধোঁয়া কালো কালো হাত বের করে খোকাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে চোঙের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে চাইছে। খোকা প্রাণপণে কাঁদছে, লোকগুলো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, ভূষণ খোকাকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে লাফাচ্ছে, নাগাল পাচ্ছে না। গিরিবালাকে কে যেন পেরেক মেরে প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে। উঠতে পারছে না। উঠবার জন্য মাথামুড় খুঁড়ছে গিরিবালা। পারছে না, একটুও উঠতে পারছে না,

কিছুতেই না। দরদর করে ঘাম বেরচ্ছে গিরিবালার। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। দম আটকে আসছে তার। বুক যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আর পারে না গিরিবালা। একটু বাতাস—একটু বাতাস!

এমন সময় গিরিবালার ঘুম ভাঙল।

ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে তার। ঘর অন্ধকার, হ্যারিকেন কখন নিবে গেছে। গিরিবালা হাঁফাচ্ছে। হাঁফাতে হাঁফাতে অভ্যাসবশে খোকার বিছানায় হাত দিল। খোকা নেই। ছ্যাঁক করে উঠল তার বুক। আশে-পাশে হাত দিল। খোকা নেই। কী হল? তড়াক করে লাফিয়ে উঠল গিরিবালা। বসে পড়ল বিছানায়। গোটা খাটটায় হাত বুলিয়ে নিল। কোথায় খোকা! গিরিবালা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। দ্বিগুণ বেগে ঘামের স্রোত বয়ে চলল তার দেহে।

হঠাৎ খাটের নীচ থেকে খোকার কান্না শোনা গেল। সর্বনাশ! নীচে পড়ে গিয়েছে খোকা! যেন ছোঁ মেরেই তুলে নিয়ে এল খোকাকে। বুকে চেপে ধরে কান্না থামল। মাই খাইয়ে ঘুম পাড়াল। শতবার ধিক্কার দিল নিজের দায়িত্বহীনতাকে, অভিসম্পাত দিল অঘোর ঘুমকে। কপাল ভাল, কিছু হয় নি এবার। কিন্তু কিছু একটা খারাপ হলে, কে ঠেকাত? ষাট—ষাট—ষাট! কোলে তুলে দুলিয়ে দুলিয়ে, চাপড় মেরে মেরে গিরিবালা ছেলের চোখে ঘুম ঢেলে দিল। খোকার চোখে ঘুম এল, এল না গিরিবালার চোখে।

ছেলের পাশে শুয়ে বার বার ঘুমতে চেষ্টা করল। ঘুম নেই, কে কেড়ে নিয়েছে। কে আবার নেবে ভূষণ ছাড়া?

স্বপ্নে খোকাকে হারিয়েছিল গিরিবালা, ভূষণকে পেয়েছিল। ঘুম ভেঙে সে খোকাকে পেল, কিন্তু ভূষণকে হারাল।

এ এক আশ্চর্য অবস্থা তার। ছিল এক গিরিবালা, যখন সে জন্মাল তখন থেকে বিয়ের দিন পর্যন্ত গিরিবালা তো একটাই ছিল। এক ঘর, একটি পরিবার জুড়েই তার যা কিছু ধারণা গড়ে উঠেছিল। সে তখন দেওয়ান-বাড়ির মেয়ে। ওই একটি বাড়ির সুখে তার সুখ, দুঃখে তার দুঃখ, একটি বাড়ির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেই তার আশা তার আকাঙ্ক্ষার ছিল লেনদেন।

যেই তার বিয়ে হল, গিরিবালা দেখল, সে অমনি দুটো বাড়ির মানুষ

হয়ে পড়ল। যেন ভোজবাজি। ওদিকের জন্যও তার ব্যথা, এদিকের জন্যও তার ব্যথা। ওদিকে কাটলেও লাগে, এদিকে কাটলেও লাগে। বিয়ের আগে গিরিবালা যেন ছিল ফোয়ারা, একটিই ছিল তার আধার। বিয়ের পর, গিরিবালা হয়ে উঠল নদী, দু দিকে তার দুটি তীর। একটি বাপের বাড়ি, আর-একটি শ্বশুরবাড়ি।

তবু তাও এক রকম ছিল। কিন্তু যেই মা হল গিরিবালা অমনি আর-এক ভোজবাজি ঘটল। এবারে গিরিবালা নিজেই দুটো গিরিবালা হয়ে গেল—খোকার মা আর ভূষণের বউ।

ঠিক ঠিক, সে তো ভূষণের বউও। আগে সে ভূষণের বউ, তার পরে তো সে খোকার মা। এতদিন শুধু খোকাকে নিয়েই সে মত্ত ছিল, তার মনে যে জায়গা এতদিন শুধু ভূষণের জন্যই ছিল মৌরসী, সেই জায়গা থেকে গিরিবালা ভূষণকে কখন যেন উচ্ছেদ করে দিয়েছে। তাই বুঝি ভূষণের অভিমান হয়েছে। তাই সে আসে নি। আসছে না। খোঁজখবরও নিচ্ছে না।

ভূষণের বউটা যেন এতদিন গিরিবালার মনের কোণার ভাঙা বাক্সের গাদায় আশ্রয় নিয়েছিল, এইবার সে সুযোগ পেয়ে খোকার মাকে ঠেলতে ঠেলতে সেই কোণায় পাঠিয়ে দিল।

ওই যে, যে-গিরিবালা এখন খোকার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জানলার দিকে পাশ ফিরে শুল, শুয়ে শুয়ে অন্ধকার আকাশের গায়ে ফোটা সহস্র নক্ষত্রের মুখে অনেক দিনের না-দেখা স্বামীর মুখখানি মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করতে লাগল, ওই গিরিবালাই ভূষণের সেই বউ।

গিরিবালা দেখল অনেক তারা ফুটেছে আকাশে। কৃষ্ণপক্ষ, তাই চাঁদ নেই। ঘরের ভিতরে অন্ধকার। বাইরে নিটোল রাত। বিরাট কালো একদলা কর্পূর কে যেন একটা প্রকাণ্ড বারকোশে বসিয়ে রেখেছে। একটু একটু করে এক সময় এই রাতের কর্পূর সবটুকু উবে যাবে। তখন সকাল হবে।

কিন্তু কখন সকাল হবে? এখন কত রাত?

মাঠে মাঠে ঝিঁঝি ডাকছে। কখনও কখনও ঝটপট ঝটপট পাখা ঝাড়ছে বাদুড় কি প্যাঁচা। তথ্খক, তথ্খক—মটকা থেকে তক্ষক ডেকে উঠল। ভুতুম্ ভুতুম্, তুই থুলি না মুই থুলি, কত রকম ডাক শুনতে পেল

গিরিবালা। অথচ ভয় পেল না একটি ফোঁটাও। আর আগে? ওরে বাব্বা, রাত্রি হলেই রাজ্যের ভয় এসে ঘিরে ধরত গিরিবালাকে। আর তুই থুলি মুই থুলির ডাক শুনলে? ভয়ে তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যেত। কতদিন জড়িয়ে ধরেছে না বড় মাকে!

কেন, ভূষণের গলা জড়িয়ে ধরে নি বিয়ের রাতে?

কথাটা গিরিবালার মনে পড়তেই টিকটিকি ডেকে উঠল। থপ করে একটা ভারী মত কী যেন পড়ল মশারির চালে। মশারির ভিতরে অন্ধকার। মশার পনপনানি শুনতে লাগল গিরিবালা। বুঝল, ভিতরে মশা ঢুকেছে বেশ। ভাবল, উঠে একবার ঝেড়ে নেয় মশারি। কিন্তু পারল না উঠতে। বেজায় কুঁড়েমি লাগছে তার। ভয়? ভয় আর এখন পায় না গিরিবালা। ভয়-তাড়ানো মন্তর যে তার পাশেই শুয়ে রয়েছে। এই যে এক ফোঁটা এই ছেলে, এই তো সেই ভয়-তাড়ানো মন্তর।

চুপচাপ শুয়ে ভূষণের কথা ভাবতে লাগল। স্বপ্নে-দেখা সাইনবোর্ডটার কথা মনে পড়ল গিরিবালার। ওই রকমভাবে আসবে নাকি ভূষণ? কিছুই বিচিত্র নয় তার কাছে। হয়তো সত্যিই কোনও সাইনবোর্ড-ওয়ালাকে বাঁচিয়ে তুলেছে ভূষণ, আর সে পয়সার বদলে সাইনবোর্ড লিখে দিয়েছে।

গহর নিকিরিকেও তো ভূষণ অমনিভাবে বাঁচিয়ে তুলেছিল। টাকা দেয় নি গহর। ঘটকালি করে বিয়ে দিয়ে দিল তার ডাক্তারবাবুর।

সত্যি, গিরিবালার বিয়েটা কী অদ্ভুতভাবেই না ঘটেছে! গহর তাদের প্রজা। গিরিবালাদের গ্রামের নিকিরি জেলেদের খুব নামডাক আছে ও-অঞ্চলে। ক্রিয়াকর্মে মাছ জোগানোর বায়না ওদের কাছে আসত দূর দূর গ্রাম থেকেও। গহর আবার নিকিরিদের মোড়ল। তার প্রতাপ-প্রতিপত্তি রাজার মতই।

দু বছর আগে একদিন গহর গিয়েছিল মাছের জোগান দিতে ভূষণদের গ্রামের কাছেই। নেমন্তন্নটা ভালভাবেই উসুল করেছিল সে। খাওয়াটা তার একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল। আর তখন সময়টাও তেমন ভাল ছিল না। ওলাওঠায় ধরল গহরকে। সেই যাত্রাই শেষ যাত্রা হয়ে যেত গহরের, কিন্তু বাঁচিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু। বয়সে ছোকরা হলে হবে কী, ডাক্তার বটে ভূষণবাবু। গিরিবালা জানে, গহর এইভাবে বলে বলে তার বাবা জ্যাঠা আর খুড়োর মন ভূষণের দিকে ফিরিয়েছিল। ভূষণের নামে গহর আটখানা

হয়ে উঠত। প্রায়ই এসে জ্যাঠামশাইকে বলত : বড়বাবু, দিয়ে দ্যান বিয়েটা। এই ঘরে পড়লি দিদি আমার সুখীই থাকবেনে।

খবর পেয়ে গিরিবালার বাবাও এসে পড়লেন। গহর তাঁকে জানাল, ডাক্তারবাবুরা চার ভাই। ডাক্তারবাবুই ছোট। বড় আর ছোট বাড়িতে আছেন। সেজ ভাই কলকাতায়। মেজ থাকেন যশোরে। গহরের কথা নিয়ে বাড়িতে এত আলোচনা হয়েছে যে, গিরিবালার সব-কিছু প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে।

আর তখন সব থেকে মজা করত চাঁপা। কার মুখ থেকে কী শুনত আর তাই নিয়ে এমন সব কাণ্ড করত যে বাড়িশুদ্ধ সবাই হেসে কুটিকুটি হত।

একদিন খেতে বসেছে সবাই, চাঁপা হঠাৎ পাকা গিন্নীর মত জিজ্ঞাসা করল, তা নেবে-থোবে কী ?

প্রথমে কেউ বুঝতে পারে নি চাঁপার কথা। চাঁপা নিজেই পরে বুঝিয়ে দিল।

বুড়োদের মত মাথা নেড়ে বলল, বলি বিয়ে তো দেচ্ছ মেয়ের, তা উরা নেবে-থোবে কী ?

এইবার হেসে গড়িয়ে পড়ল সবাই। তখন থেকে চাঁপার নামই হয়ে গেল—নেবে-থোবে কী। কী ক্ষ্যাপান ক্ষেপে যেত চাঁপা তাকে ওই নামে ডাকলে! কত আর বয়েস তখন চাঁপার! সাতও পেরয় নি। তখন থেকেই ওটা এমন টরটরে।

জব্দ শুধু শ্যাম রানারের কাছে। শ্যাম রানারকে দেখলেই চাঁপা ভয়ে কোথায় পালাবে তার দিশে পেত না। শ্যাম রানারের সঙ্গে গিরিবালার কিন্তু খুব ছেলেবেলা থেকেই ভাব। গিরিবালা যখন খুব ছোট, তখন তাদের বারবাড়িতেই পোস্টাপিস ছিল। বছর কতক হল, সেটা এখন হাটে উঠে গিয়েছে। এখন নাকি মেদ্দা সাহেবের গদিতে হয়েছে পোস্টাপিস। দেখে নি গিরিবালা, শুনেছে।

তাদের বাড়িতে যখন পোস্টাফিস ছিল তখন থেকেই তার ভাব শ্যাম রানারের সঙ্গে। শ্যাম রানারের একটা বল্লম ছিল, ঘন্টি-বাঁধা বল্লম। তার এক দিকে ডাকের থলি ঝুলিয়ে নিয়ে ঝুমুৎ ঝুমুৎ ছুটে চলত শ্যাম রানার। আর ফিরে এসে যখন খেতে বসত তখন কত গল্প বলত। তার মুখ থেকে

নানা বিবরণ সংগ্রহ করেই তো গিরিবালা জগৎ সম্পর্কে একটা ভৌগোলিক ধারণা গড়ে তুলেছিল তার মনে।

জেনেছিল, ওদের এই গ্রাম ছাড়িয়ে কিছুদূর গেলেই মধুপুর বলে এক গ্রাম আছে। সেখানে আছে টুইডি সাহেবের কুঠি। সেই কুঠির দেওয়ান ছিলেন তার ঠাকুরদার বাবা, তার ঠাকুরদাদাও। মধুপুর পার হয়ে আরও এগিয়ে যাও। গেলেই পাবে ধোপাঘাটা। এমন এক ভয়ঙ্কর দহ আছে সেখানে, কেউ নাকি তার উপর দিয়ে পাকা পুল বাঁধতে পারে নি, সাহেবরাও না। দড়াটানা নৌকোয় পারাপার চলে। ধোপাঘাটার পরেই ঝিনেদা শহর। এসব গল্প সবার আগে গিরিবালা শ্যাম রানারের মুখে শুনেছে। তার অনেক পরে, বাবার সঙ্গে যখন ডোমার গিয়েছে, বিয়ে হয়ে যখন শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছে, তখন গিরিবালা এ সব দেখেছে নিজের চোখে। গিরিবালার হঠাৎ মনে পড়ল, শ্যাম রানার খুব খেতে পারত। আস্ত আস্ত কাঁঠাল সে খেয়ে ফেলত নিমেষে। ভুতুড়ি, বিচি—এ সবও ফেলত কিনা সন্দেহ।

গিরিবালার বাবা যেদিন সম্বন্ধ করতে যান, সেদিন কিসের যেন এক স্নান ছিল। ওরা সবাই ঘাটে যাচ্ছিল চান করতে। বড়মারা এগিয়ে গিয়েছেন, ও আর চাঁপা পড়েছে পিছিয়ে। ওরা রাস্তায় উঠতেই ঝুমুৎ ঝুমুৎ শব্দ শুনল। শ্যাম রানার আসছে দৌড়তে দৌড়তে। অনেক দিন দেখে নি তাকে। গিরিবালা দাঁড়িয়ে পড়তেই চাঁপা ভয়ে তার পিছনে গিয়ে লুকল।

ছবির পর ছবি ফুটে উঠছে গিরিবালার চোখে। শ্যাম রানার দাঁড়িয়ে পড়ল গিরিবালার সামনে। ঘাম মুছে বলল, দিদিমণি, তুমার বিয়ে হবে গো! বেশ বেশ! বিয়ের কথা শোনামাত্র লজ্জায় প্রায় নুয়ে পড়ে গিরিবালা। কিন্তু আশ্চর্য, শ্যাম রানারের মুখ থেকে বিয়ের কথা শুনতে তার তো তেমন অস্বস্তি লাগল না! বরং মজাই লাগল তার। গিরিবালা জিজ্ঞাসা করল, তুমি কার কাছে শুনলে? শ্যাম রানার বলল, গহর যে ঘাটে নৌকোয় ছই বাঁধছে। মাজেবাবু আজ পাত্তর দেখতি যাবেন যে। বেশ বেশ দিদিমণি, খুব ভাল কথা। ভগমান তুমারে সুখী করুন। আর দাঁড়াল না শ্যাম। ঝুমুৎ ঝুমুৎ ঝুমুৎ ঝুমুৎ ঘণ্টির ধ্বনি তুলে তুলে শ্যাম রানার ফিকে ধুলোর ঘূর্ণি উড়িয়ে উড়িয়ে গিরিবালার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

চান করে ফিরবার সময় দেখে, মেজকর্তা আর গহর সেজেগুজে ঘাটের

দিকে চলেছেন। লজ্জায় গিরিবালা চোখ নিচু করে পথের এক পাশ দিয়ে তার কুমারী শরীরটাকে অতিকষ্টে টানতে টানতে নিয়ে চলেছিল। কিন্তু চাঁপাটা এমন অসভ্য, চেঁচিয়ে উঠল, ও মাজেকাকা, কনে যাচ্ছ? জবাব দিল গহর, বর খুজতি গো ছোড়দি। চাঁপা দুই হাতে তালি দিয়ে নেচে উঠল, জানি গো মশাই, জানি। বড়দিও জানে। না রে বড়দি? কী রকম পাজী হয়েছে মেয়েটা বল দিকি নি! রাগে গিরিবালার ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল। মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, চল বাড়ি, তুমার নাচা কুদা ভাঙে দিবানে। কিন্তু এ সবে চাঁপার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে সমানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছে, রাঙ্গা টুকটুকে বর আনবা কিন্তু আর আস্ত দেখে আনো, ভাঙা হলি নেব না, বুঝলে? চাঁপার কথায় সবাই হো-হো করে হেসে উঠল অতি কষ্টে চাঁপার মুখটি বন্ধ করে সেদিন গিরিবালা ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে পেরেছিল।

ছেলে একটু শব্দ করতেই গিরিবালা পাশ ফিরল। ফিরে এল ঘাটের রাস্তা থেকে, ফিরে এল অতীত থেকে, এসে গেল একেবারে মশারির মধ্যে, তার ছেলের পাশে।

উসখুস করছে ছেলে। গিরিবালা হাত বাড়িয়ে টের পেল ছেলে তার কাঁথা ভিজিয়েছে। শিয়রে ডাঁই-করা অনেক কাঁথা ছিল। শুয়ে শুয়েই তা থেকে একটা শুকনো দেখে টেনে নিয়ে নিপুণ হাতে বদলে দিল। এর মধ্যেই গিরিবালা একেবারে পাকা কারিগর হয়ে উঠেছে। প্রথম প্রথম এই কাঁথা-বদলানো নিয়েই তাকে কী কম ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়েছে! আনাড়ী হাতের খোঁচা খেয়ে খোকার ঘুম ভেঙে যেত। কেঁদে উঠত খোকা। কত কেলেঙ্কারিই না হত! কিন্তু দু-আড়াই মাস যেতে-না-যেতেই গিরিবালা কতবড় ওস্তাদ হয়ে পড়ল! এখন তার খোকা বিন্দুবিসর্গও টের পায় না।

কাজের তাড়া পেয়ে যে সব স্মৃতি এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, গিরিবালার হাতের কাজ ফুরতেই আবার সেগুলো পরিষ্কার অবয়ব ধরে ফিরে ফিরে আসতে লাগল।

ছায়াবাজির খেলা দেখছে যেন গিরিবালা অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে।

…গিরিবালার বিয়ে। বাড়ি-ভর্তি লোকজন। পাইকপাড়া পলেনপুর থেকে জ্যেঠী খুড়ীরা এসেছেন, বিনোদপুর থেকে এসেছেন মামী মাসীরা,

ছত্তরপাড়া থেকে এসেছেন জ্ঞাতিগোষ্ঠী কুটুম্বের দল। আমোদ করছে, ফুর্তি করছে, মৃতদের উদ্দেশে অশ্রুবর্ষণও চলছে, পরক্ষণেই সুবিধা অসুবিধা নিয়ে তারস্বরে ঝগড়া করছে নিজেদের মধ্যে। এই হট্টগোলের মধ্যে গিরিবালাই শুধু তফাত তফাত আছে। তার কোন-কিছুই ভাল লাগছে না। কেন, তা কে বলবে? কেন ওই বিষণ্ণতা, কিসের অস্বস্তি? তাও জানে না গিরিবালা। তার ভাল লাগছে না।

…আচ্ছা, তার বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন বাড়ির সবাই? সে কি মাথামুড় খুঁড়ছিল বিয়ে দাও, বিয়ে দাও বলে। তবে? বাবার উপর প্রচণ্ড অভিমান হল তার। বড়মা, পিসীমা, জ্যেঠামশাই, কাকার উপরও। বড়দাও কম না। সেও ও-দলে যোগ দিয়েছে। ওদের ভালবাসা স্নেহ—সব উপরে উপরে। আসলে গিরিবালা ওদের গলায়-বেঁধা কাঁটা। সাত-তাড়াতাড়ি নামাবার জন্য তাই এত বিড়ালের পায়ে ধরে সাধাসাধি! বিড়াল কে? কেন, ওই যে ভূষণ না কে? যাকে এত সাধ্যসাধনা করে ওরা ডেকে আনছেন গলার কাঁটা নামাবার জন্য?

…বিয়ে হলেই এখান থেকে অন্ন উঠবে গিরিবালার? এই ঘর, এই বারান্দা, এই উঠন, এই গ্রাম, গিরিবালার পরিচিত পৃথিবী, তার আপন জগৎ—যা কিছু অবলম্বন করে সে এতদিন বেড়ে উঠেছে, যার যার সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ, সে সবই তার পর হয়ে যাবে? বড়মা, পিসীমা, চাঁপা, তার সই মহামায়া—এদের সবার চোখে সে হবে ভিন গেরামের বউ ।

…এদের ছেড়ে, এই পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে গিরিবালা যে বাঁচতে পারে, কই, কোনদিন ঘুণাক্ষরেও তো সে কথা তার মনে স্থান পায় নি। ভগবান জানেন, এদের ছাড়া সে কখনও আর কারও কথা ভাবে নি। তবে?

…তবে এরা তাকে পরের ঘরে ঠেলে দেবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন? তাকে পর করে দেবার জন্যই বা এদের এত তাড়াহুড়ো কেন? সে কি কোন অন্যায় করেছে? গুরুতর অপরাধ কিছু করেছে? সে কথা গিরিবালার জানতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে প্রবল এক অস্বস্তি তার মনের মধ্যে ঢুকে ঝড় তুফান তোলে। সে সময় গিরিবালা আর কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারে না। মার মৃত্যুর পর ফুল দিয়ে সাজিয়ে যে ফোটোখানা তোলা হয়েছিল, সেই ঝাপসা ফোটোখানার নীচে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঝোর ধারা ঝরিয়ে কাঁদে। কেঁদে কেঁদে বুকের পাষাণ নামায়।

…কেন, তা গিরিবালা জানে না, তবে এই সময়টাতে মৃত্যুকে বড় নিকট-আত্মীয় বলে মনে হত গিরিবালার। মুহূর্তের জন্যও তার বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করত না। তার কেমন দৃঢ় ধারণাই জন্মে গিয়েছিল, সে বিয়ের আগেই মরে যাবে। মরে মার কাছে গিয়ে আশ্রয় পাবে। চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত আশ্রয়। কিন্তু মরল না গিরিবালা। উপরন্তু সেই ভয়াবহ দিনটি ধীরে ধীরে এক পা দু পা করে এগিয়ে আসতে লাগল। বিয়ের কদিন আগে সে বিকট এক দুঃস্বপ্ন দেখেছিল। সে স্বপ্ন এখনও তার মনে গাঁথা আছে। সম্ভবত চিরকালই থাকবে। গিরিবালা স্বপ্ন দেখল : প্রকাণ্ড একটা কোলাব্যাঙ তার বুকের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে মুখের কাছে এগিয়ে এল, লকলকে জিভ বের করে আকাশ-পাতাল হাঁ করল। এবারে গিলে ফেলবে তাকে। ভয়ে কাঠ হয়ে গিরিবালা চোখ বুজতে যাবে, হঠাৎ তার নজর পড়ল ব্যাঙটার মাথার উপর। ব্যাঙের মাথায় একটা টোপর। এই তবে তার বর! হাউ মাউ করে চেঁচিয়ে উঠল গিরিবালা। এক ছুটে চলে গেল বড়মার ঘরে। বড়মার কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।

…শুভদৃষ্টির সময় সে চোখ খোলে নি। বাসরে এসেও না। সে জানে, চোখ খুললেই ব্যাঙের মুখ দেখতে হবে। কী বোকাই না ছিল গিরিবালা! কোথায় ভূষণ আর কোথায় কোলাব্যাঙ!

বাজনদার পাড়ার থেকে কুঁকড়োর ডাক শোনা গেল। যাক, রাত তা হলে পোহাল। কী সব আজেবাজে চিন্তায় রাতটা কাটল! এখন একটু ফরসা হলেই গিরিবালা বাঁচে। সে উঠতে পারে।

কিন্তু গিরিবালা স্মৃতির হাত থেকে রেহাই পেল না। যতই সে ঢেউ দিয়ে সরিয়ে দিক, একটু সুযোগ পেলেই কুঁচো পানার মত স্মৃতি তার মগজে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

…আশ্চর্য লোক ভূষণ! তার হাবভাব সবই আশ্চর্য লাগে গিরিবালার কাছে। বাসী বিয়ের দিন কী কাণ্ডটাই না করল! গহর এক মণ মাছ ধরে দিয়ে গেল। এ তার ঋণ শোধ।

…বড়বউ নাম-করা রাঁধুনী। জামাই-ভোজের রান্না একা হাতেই তিনি রাঁধলেন। সাত-আট রকম শুধু মাছেরই ব্যঞ্জন। বড় থালার চারিপাশে বাটি সাজিয়ে জ্ঞাতিকুটুম্বের মাঝখানে জামাইয়ের সামনে যেই

সে থালা ধরে দেওয়া হল, অমনি জামাই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। যেন বিষধর সাপ তাঁর সামনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হাঁ-হাঁ, করেন কী, করেন কী!—জামাই পরিত্রাহি চেঁচিয়ে উঠলেন, মাছমাংস স্পর্শ করাও যে নিষেধ। সে কী, সে কথা কি কেউ জানিয়ে দেয় নি? সভাসুদ্ধ লোক অপ্রস্তুত। ভোজটাই বুঝি পণ্ড হয়ে যায়। হঠাৎ ভূষণ হাতজোড় করে বলল, অপরাধ আমাদের, আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করে খেতে বসুন। আমিও বসছি। আমাকে নিরামিষ রান্না এনে দিন। জামাইয়ের বিনয়ে সবাই খুশী হলেন। দুঃখ থেকে গেল শুধু গহরের। তার পরিশ্রম বৃথাই গেল।

…ছোট বড় আরও নানান নাটকীয় কাণ্ড ঘটিয়েছে ভূষণ। আজ মাস-আড়াই তার কোন খবরই নেই। ছেলে হল, সবাই এসে দেখে গেল। শ্বশুরবাড়ির থেকে বড় ভাসুরের ছেলে এসেও দেখে গেল। শুধু ভূষণেরই দেখা নেই। কোটচাঁদপুর না কোথায় যেন আছে, ভাসুরপোও ঠিকমত জানে না। কী ধরনের মানুষ!

গিরিবালার বুকটা টনটনিয়ে উঠল। অভিমানে জল এল চোখে। সে না হয় ফ্যালনা, তা বলে খোকনসোনা, তার কথাও কি মনে পড়ে না ভূষণের, দেখতে ইচ্ছে হয় না! চোখের কোণা দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে বালিশ ভিজতে লাগল। খোকার গায়ে হাত রেখে গিরিবালা মনে মনে বলল, তোর বাবা আমারে বড় কাঁদায়, তুইও কী অমন করে কাঁদাবি, হ্যাঁ খোকা?

খোকা ততক্ষণে জেগে উঠে হাত পা ছুঁড়ে খেলা করতে শুরু করেছে।

গিরিবালা তার মুখে চুমু খেতে খেতে বলল, ধন আমার, সুনা আমার, বাবারে ডাকে আনতি পার না?

দশ

এমন কিছু পেল্লায় বোঝা সোনা মিঞা চাপায় নি তার গাড়িতে। পাঁচ মণ পাটও আছে কিনা সন্দেহ। সুমুন্দির গরু তাও টানতে পারে না। রাগে কসকস করছে সোনা মিঞার শরীর। দ্যাখ দিকিনি, দ্যাখ দিকিনি,

শালার গরুর রকম দ্যাখ দিকিনি! সোনা মিঞা বিপদ বুঝে চঞ্চল হয়ে উঠল। বাঁয়ের গরুটার লেজ মলে, ডাইনের গরুটার পেটে পায়ের গুঁতো মেরে মেরে, হেই গুটি বাঁ বাঁ, বাঁ বাঁ, হেই হেই—করতে করতেই তার গাড়ি খানায় পড়ল। ভাদ্দর মাসের কড়া রোদ, পিঠের উপরকার প্রকাণ্ড মযে-দাদখানায় রোদ পড়ে অসহ্য জ্বলুনি ধরিয়েছে, যেন করাত দিয়ে কেউ তার পিঠের মাংস কেটে নিচ্ছে। দরদরে ঘাম আবার তার উপর নুনের ছিটে মারছে।

সোনা মিঞার মাথায় খুন চেপে গেল। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। বিরাট একটা লাঠি বের করে, দু হাত দিয়ে ধরে গায়ের জোরে গরু দুটোর পিঠে মারল দমাদ্দম দুই বাড়ি। হাড় জিরজিরে গরু দুটোর শিরদাঁড়া বেঁকে ঝুলে পড়ল নীচের দিকে। হুড়মুড় করে তারা এগোবার চেষ্টা করল। প্রাণপণ শক্তিতে। কিন্তু গাড়ির চাকা শক্ত কাদায় ঠেকেছে। এক চুলও নড়াতে পারল না। বাঁ পাশের গরুটার পিঠে বড় বড় ঘা। ফেটে রক্ত বেরতে লাগল। ডান পাশের গরুটা ধ্যাড় ধ্যাড় করে খানিকটে ধেড়িয়ে দিল। তবু গাড়ি এগোল না।

সোনা মিঞার চেহারা তার বলদ দুটোর চেয়ে কিছুমাত্র উন্নত নয়। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে সে নিজেও তার জেলার আর দশজন চাষীর মত হাড্ডিসার। বড় লাঠির দুটো ঘা কষিয়ে সে যেমন তার গরু দুটোকে কাবু করল, তেমনি ওইটুকু পরিশ্রমে নিজেও কাহিল হয়ে হাঁফাতে লাগল।

বলদ দুটোর চেহারা একটু অদ্ভুত ধরনের। সৃষ্টিকর্তা যেন প্রথমে পেট মোটা দু দিক সরু দুটো বৃহৎ নারিকেলে-কুল বানিয়েছিলেন। তারপর তাঁর বলদ তৈরীর স্পৃহা জাগরূক হওয়ায় সেই নারিকেলে-কুলেরই একদিকে মাথা অন্যদিকে লেজ জুড়ে নীচের দিকে চারটি করে খুরওয়ালা পা বসিয়ে দিয়েছেন।

অবশ্য, সোনা মিঞা সে জন্য পরিতাপ করল না। তার গায়ের জোর কমে এলেও রাগের তেজ কমে নি। কারণ, আর একটুখানি পথ এগিয়ে গেলেই সে খেয়াঘাটে পৌঁছাত এবং একটু সকাল সকাল পৌঁছাতে পারলে নতুন ফড়ে ধরে তার পাটগুলো গস্ত করতে পারত। নতুন ফড়েদের কাছে পাট বেচার সুবিধে এই, দামটা নগদ পাওয়া যায়। আর ঘাঘু আড়তদারদের চাইতে তারা লোকও একটু ভাল হয়। দামটাও ওরা দু-এক আনা বেশী দেয়।

পাটের আড়তদারদের মধ্যে সব থেকে ঘুঘু ওই কানা মাড়োয়ারী আগর-ওয়ালা। ওই শালাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না সোনা মিঞা। অবশ্য, না দেখতে পারার প্রধান কারণ, সোনা মিঞা আজ আট বছর ধরে ওর কাছে কিছু টাকা ধারে। যুদ্ধের মধ্যে পাটের দাম হু-হু করে বেড়ে গিয়েছিল। পাট তখন সোনার দামে বিকিয়েছে। সোনা মিঞার তখন বোলবোলাও অবস্থা। বউয়ের জন্য মল খাড়ু কিনেছে, কাঁসার থালায় ভাত খেয়েছে, ভাইকে সাইকেল কিনে দিয়েছে, ঘরের চালে টিন তুলেছে, চালের মাথায় আবার শখ করে পাকা মিস্তিরি লাগিয়ে টিন কেটে ময়ূরও বসিয়েছিল। তখন সোনা মিঞা প্রকৃত মিঞাদের মতই চলাফিরা করেছে। পশ্চিম দেশের দামী বদনাই কিনেছিল চারটে। ঘনঘন দাওয়াত দিয়েছে বাড়িতে। তখন সে মাতব্বর। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর। যে-সে লোক নয়। তাদের গ্রামে সিল্কের লুঙ্গি, জুতো আর ইস্টাকিনের চল সেই প্রথম করেছিল। চশমা কেনবার ইচ্ছেও ছিল। মেদ্দা ছাহেব যে চশমা চোখে দেন, সেই কছমের একটা। সে শখটাই শুধু মেটে নি সোনা মিঞার।

তার আগেই নসিবে আগুন লাগল। যুদ্ধ থেমে গেল। পাটের দাম নামতে লাগল। চার বছরের মধ্যেই কী হয়ে গেল দেখ।

সেই উঠতি সময়ে ওই আগরওয়ালা মাড়োয়ারী সোনা মিঞাদের একেবারে বুকে করে রেখেছিল। চাইলেই টাকা দিত, বাঁধ বাঁধ টিন দিত, সাইকেল, ঘড়ি, লণ্ঠন, নাও না, কে কি নেবে। দাদনের চিটেয় সই মার, না হয় বুড়ো আঙুলের টিপ ছাপ দাও, দিয়ে মাল নিয়ে চলে যাও, পাট দিয়ে দাম শোধ কর।

সেই টিপ ছাপের মারপ্যাচে কী করে যেন সোনা মিঞাকে দেনার জালে জড়িয়ে ফেলেছে ওই মাড়োয়ারী স্মুন্দির পো। প্রথমে ছিল তিরিশ টাকার দেনা। বাড়তে বাড়তে এখন সেটা নাকি ষাট টাকায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ওই দেনা দেখিয়ে দেখিয়ে প্রতি বছর ওর কাছ থেকে সস্তা দরে পাট নিয়েছে। জবরদস্তি করে নিয়েছে। বাজারের দর যখন কুড়ি টাকা, তখন মাড়োয়ারী দর দিয়েছে আঠারো। শালা কানা হলে হবে কী, পেটে পেটে বুদ্ধি। এক চোখ কানা যার বিরোআশি বুদ্ধি তার। সারা হাটে শালা লোক বসিয়ে রাখে। খাতকরা যে ফাঁকি মেরে অন্যের কাছে মাল গস্ত করে পালাবে, তার উপায় নেই।

পলেনপুরের বদু কলু এই ব্যবসায় নতুন নেমেছে। তার সঙ্গেই সোনা মিঞার কথা হয়েছিল। হাটে না ঢুকে সোনা মিঞা পাশ কাটিয়ে খেয়াঘাটে যাবে। সেখানেই বদু কলুকে মাল গস্ত করে দেবে। বদু কলু একটু সকাল সকাল যেতে বলেছিল। তার পুঁজি কম। যার মাল আগে পাবে তারটাই কিনে ফেলবে। তবে? এর মধ্যে যদি অন্য লোকের মাল কিনে ফেলে বদু?

তড়াক তড়াক করে রক্ত সোনা মিঞার মাথায় উঠতে লাগল। বড় লাঠি রেখে দিয়ে পাচন-নড়িখানা তুলে নিল হাতে। ডান দিকের গরুটার পাছায় মারল খোঁচা। খোঁচা খেয়ে গরুটার পাছার থলথলে মাংসে কাটা কাছিমের মত খিচুনি শুরু হল। তবু গাড়ির চাকা এক বিন্দু নড়ল না। সোনা মিঞা পাগলের মত ধাঁই ধাঁই পিটতে থাকল বলদ দুটোকে।

আর পাগলের মত চেঁচাতে থাকল, স্মুন্দির গরু বাড়ি যায়ে আজ তোগের জবাই করব। শালা বলদ না হলি এতদিন তো পাঁচ ছাওয়ালের বাপ হতিস, আজউ ডান বাঁ সড়গড় হল না। থানায় গাড়ি ফেলে ভাবিছ, দিনির মত কাজ চুকোয়ে দিলাম, এখন বসে বসে জাবর কাটবা। তোল গাড়ি। ভাল চাস তো শিগ্‌গির শিগ্‌গির টানে তোল্। না হলি তোগের একদিন কি আমার একদিন, তা বুঝোয়ে দিবানে আজ।

সোনা মিঞা চেঁচায় আর গরু দুটোর পিঠে ধপাস ধপাস পাচনের ঘা কষায়। মার খেয়ে বলদ দুটোর পিঠে অজস্র কালশিরে পড়ে গেল। বলদের সাদা সাদা পিঠের উপর কালো কালো দাগ, মনে হল, কে যেন সাদা কাঁথায় কালো সুতোর ফোড় তুলেছে। বলদ দুটো যথাসম্ভব ঘাড় পিঠের শক্তি দিয়ে বার বার গাড়ি টানতে লাগল। ওদের দু কস বেয়ে ফেনা ঝরতে লাগল, কিন্তু গাড়িকে একটুও নড়াতে পারল না। হঠাৎ ডান দিকের গরুটা হাঁটু মুড়ে শুয়ে পড়ল। পাচন-নড়ির ভোঁতা মাথার গুঁতো দিয়ে সোনা মিঞা বলদটাকে তুলতে চেষ্টা করল। পারল না। তখন সোনা মিঞা তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বলদটার তলপেটে অবিশ্রান্ত পাচন-নড়ির গুঁতো মেরে চলল। তার তখন দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে।

রামকিষ্টো গোটা চারেক কেঁড়ে আর বড় এক খালুই হাতে নিয়ে হাটে যাচ্ছিল। সোনা মিঞার কাণ্ড দেখে ভয় পেয়ে গেল। কেঁড়েগুলো আর খালুইটা রাস্তার এক পাশে রেখে ছুটতে ছুটতে এসে সোনা মিঞার হাত চেপে ধরল। কর কী, কর কী, বলে পাচন-নড়ি কেড়ে নিল।

ধমকে বলল, ওরে আমার চাষার ঘরের পাঁঠা, বলদ মরলি যে তুমিও মরবা। ছ্যাখ দিকি, কী করিছ, মারে মারে যে শেষ করে আনিছ।

হাঁফাতে হাঁফাতে সোনা মিঞা বলল, মারব না তো করব কী? শালার গরু খানায় গাড়ি ফেলিছে। বেলা গেলি হাটে জায়ে ও কুষ্ঠা কার পুঙায় ঠাসব, ওই গরুর, না আমার?

রামকিষ্টো বলল, সুনা ভাই, ক্ষ্যামতা না থাকলি মারে কি গাড়ি তুলতি পারবা? বাঁজা বউরি সাধ খাওয়ালিই কি তার পেটে ছাওয়াল জন্মায়?

রামকিষ্টোর কথা শেষ হতে না হতেই ডান দিকের গরুটা ঘাড় কাত করে এলিয়ে পড়ল। তার চোখ দুটো বুজে আসতে লাগল। গলার দড়িটা তখনও গাড়ির জোয়ালে বাঁধা। ফাঁস পড়ার উপক্রম হল। বলদটার চোখের কোল, মুখের কস আর নাক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রামকিষ্টো তাড়াতাড়ি করে বলে উঠল, সুনা ভাই, গলার দড়ি খুলে ছ্যাও। শিগগির।

রামকিষ্টো তাড়াতাড়ি জোয়াল উঁচু করে ধরল। সোনা মিঞা দড়ি খুলে দুটো বলদই আলগা করে দিল। রামকিষ্টো ডানদিকের বলদের চোখে মুখে ফুঁ দিতে লাগল। ব্যাপার দেখে সোনা মিঞা ঘাবড়ে গেল। ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গেল। ইয়া আল্লা, বলদটা মরে যাবে নাকি! তবে তো সর্বনাশ! বাঁ দিকের গরুটা নির্বোধ চোখে এতক্ষণ ধরে তার সাথীটার উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চলছিল তা দেখছিল। এখন ড্যাবা ড্যাবা চোখ তুলে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল মৃতপ্রায় সঙ্গীটির দিকে। কী মনে হল তার হঠাৎ, হয়তো সাড়া নেবার জন্যই ভয়ে ভয়ে ভাঙা গলায় ডেকে উঠল হা-ম-বা। তারপর কোন সাড়া না পেয়ে, ধীরে ধীরে রাস্তার পাশে সরে গিয়ে খুঁটে খুঁটে ঘাস খেতে লাগল। একটা চিল কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উড়ে গেল উপর দিয়ে। একখানা ফঙ্গবেনে মেঘ খুব আলতো করে একটু ছায়া বুলিয়ে দিয়ে গেল।

ফুঁ দিতে দিতে রামকিষ্টোর মুখ ব্যথা হয়ে উঠল, সোনা মিঞা এগিয়ে এল ফুঁ দিতে।

রামকিষ্টো বলল, ওই কাড়েগুলোয় করে শিগগির জল ভরে আনোদিনি। মনে হচ্ছে ভিরমি খায়েছে। মারির চোটে ওর পিরানডা তো কণ্ঠায় তুলে ছাড়িছ। ছিঃ!

রামকিষ্টোর ভৎর্সনা গায়ে মাখল না সোনা মিঞা। সে দোষী, দোষ করেছে। ন্যায্য অপরাধে এখন তাকে জুতিয়ে দিক না রামকিষ্টো, সোনা মিঞা তাকে একটি কথাও বলবে না।

সোনা মিঞা কেড়েগুলো ছোঁবে ছোঁবে, হঠাৎ রামকিষ্টোর খেয়াল হল।

চেঁচিয়ে উঠল রামকিষ্টো, আরে রও রও, সুনা ভাই, ও কাড়ে বাবুগের, ছুয়ো না, ছুয়ো না। তুমি এদিকে আসো, বসে বসে চোখ মুখি ফুকোও, তলপেটটা আস্তে আস্তে ডলে ভাও। আমি বরং জল আনে দিই।

সোনা মিঞা অপ্রস্তুত হয়ে উঠে এল। রামকিষ্টো দুটো কেঁড়ে নিয়ে জল আনতে ছুটল। সোনা মিঞা বলদটার কাছে বসে বসে কখনও তার মুখে চোখে ফুঁ দিতে লাগল, কখনও তলপেটে মোলায়েমভাবে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, কখনও বা পিঠের শিরদাঁড়া ডলে দিল পরম যত্নে। রাগের ধার পড়ে এসেছে। ভয়ের একটা শুলুনি মাঝে মাঝে তার মগজে গুঁতো মারছে। ধীরে ধীরে সহানুভূতির এক অব্যক্ত বেদনা জন্ম দিতে থাকল সোনা মিঞার মনে।

বেলা-পড়া তেজালো রোদ গদির সামনেকার কড়ুই গাছটার ফাঁক দিয়ে ঝপ করে মেদ্দা ছাহেবের চোখে গিয়ে পড়ল। রোজই পড়ে। সাহেবালি মৃধার মনটা অমনি আনচান করে উঠল। বুঝলেন চা পানি খাবার সময় হয়েছে। চকচকে রোল্ডগোল্ডের টন্‌ক চশমাটা বাঁ হাতের টানে খুলে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে পাকা পাকা ভুরু দুটো ঈষৎ ঝুলে পড়ল। ভারী কাঁঠালকাঠের একখানা পোক্ত ডেস্ক সামনে, ডেস্কের উপর জাবেদা খাতা। খোলা। চশমাটা খাপে পুরে খাতার উপর রেখে দিলেন। তারপর গদি থেকে নেমে রুপোলী রঙের চকচকে বদনাটা হাতে নিয়ে খড়ম পায়ে গাঙের পাড়ে চললেন। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। তলপেট টনটন করছে। এবার একটু হাল্কা হওয়া দরকার।

এটা তাঁর নৈমিত্তিক কর্ম। এবার গিয়ে গদিতে বসলে আর বিষয়কর্ম হয় না। সন্ধ্যে পর্যন্ত গল্পগুজব চলে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট তিনি। তার কাজকর্মও কিছু হয়। দফাদার চৌকিদারেরা আসে। চা পানি আর তামাক ঘন ঘন সরবরাহ হয়। আজ হাটবার। ভিড় একটু বেশীই হবে।

মেদ্দা ছাহেব কলকাতার আদমজী হাজী দাউদ কোম্পানির এজেণ্ট।

এই তল্লাটের পাট ওই কোম্পানির চটকলে যত চালান যায়, তার সবই যায় মেদ্দা ছাহেবের হাত দিয়ে। অবস্থা যুদ্ধের আগে এমন বিশেষ কিছু ভাল ছিল না তাঁর। তবে যুদ্ধের বাজারে আল্লার কুদরতে তাঁর নসিবের রঙ বদলে গিয়েছে। এখন তিনি বাইশ নম্বর ইউনিয়নের পনেরখানা গ্রামের মাতব্বর।

গাঙের পাড়ে মেদ্দা ছাহেবের বড় বড় দুটো পাটের গুদোম। আগে আমদানির সময় পাট ধরত না তার ভিতরে। আর এখন, কী যে মতলব কোম্পানির বুঝতে পারছেন না মেদ্দা ছাহেব, তাই প্রাণে ধরে পাট কিনতেও পারছেন না, গুদোমে অনেকখানি জায়গা খালি পড়ে থাকছে। যুদ্ধের মধ্যে তিন হাজার, চার হাজার মণ মাল পাঠিয়েও মন পান নি কোম্পানির। আরও পাঠাও আরও পাঠাও বলে হুকুম ঝেড়ে ঝেড়ে জান পরেসান করে দিয়েছে। আর এখন, হাজার, পাঁচ শ মণ মাল পাঠালেই টেলিগ্রাম আসে, বাস্ করো, আর না। বছর বছরই দেখি পরিমাণ কমে আসছে। গত বছরের মালই পড়ে আছে গুদোমে। এবারের আমদানির সময়ও তো এসে গেল। কলকাতা থেকে পরিষ্কার কথা এখনও এল না। বড়ই সমস্যায় পড়েছেন মেদ্দা ছাহেব। আগরওয়ালা অবিশ্যি কিনছে। কিন্তু ওর সঙ্গে টক্কর মেরে চলবার মত হিম্মৎ এখনও মেদ্দা ছাহেবের হয় নি।

আর আগরওয়ালার সঙ্গে তাঁর তুলনাও চলে না। বেটা এক নম্বরের চশমখোর। কেনা বেচার ব্যাপারে ও যতটা শক্ত হতে পারে, তিনি ততটা কী করে পারবেন? আগরওয়ালা গ্রামের কে? কেউ না। এখানকার লোকেদের সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক? আগরওয়ালার ব্যবসার মন্ত্র হচ্ছে—ফেল কড়ি মাখ তেল। আগরওয়ালা জানে, টাকা তার হাতে। চাষীরা যতই ফুটুনি করুক, তেজ দেখাক প্রথমে, শেষ পর্যন্ত তার পায়েই গড়াতে হবে। যে দাম সে বলবে, সেই দামেই তার কাছে চাষীকে মাল গস্ত করে যেতে হবে।

কিন্তু মেদ্দা ছাহেব এখানকারই মানুষ। যদিও তিনি জানেন, মনে মনে জানেন, আগরওয়ালার রাস্তাই ব্যবসার ঠিক রাস্তা, তবু ও-পথে তিনি স্বচ্ছন্দে পা বাড়াতে পারেন না। যদি পারতেন তা হলে গত বছর অত মাল তিনি কিনতেন না। মাল তো আগরওয়ালাও কিনেছে, তাঁর থেকে অনেক কম দাম দিয়ে কিনেছে। তিনি চেষ্টা করেও অত কম দাম দিতে পারেন নি।

কোন্ প্রাণে দেবেন? এখন তিনি আতর মাখেন, সেখ ফসীউল্লার গোলাপজল পালাপার্বনে পিচকিরি দিয়ে ছড়ান, তা সত্ত্বেও তাঁর গায়ের পসিনা থেকে যে বদ্বু বের হয়, তা যে নাঙ্গলা চাষারই। এই আর্ত, বেকুব চাষীগুলো যে তার আত্মার আত্মীয় সেই সত্যটাকে এখনও তিনি জবাই করতে পারেন নি।

তবে মেদ্দা ছাহেব এও বুঝতে পারছেন, এভাবে ব্যবসা চালালে তাকে অচিরেই লাল বাতি জ্বালতে হবে। কী যে তিনি করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না।

মেদ্দা ছাহেব দেখলেন, নদীতে পাট-বোঝাই নৌকো সার বেঁধে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। নদীর পাড়ে গরুর গাড়িতেও পাট আমদানি হয়েছে বেশ।

মেদ্দা ছাহেব বদনাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে, মাথার নক্শা-কাটা গোল টুপিটা বাঁ হাতে উঁচু করে ধরে টাকে খানিক হাওয়া লাগিয়ে নিলেন। তারপর ডান হাতের তেলো দিয়ে টেকো মাথার ব্রহ্মতালুটা বার কয়েক ডলে নিলেন। দেখলেন, তার গোমস্তা তুফান মিঞা পাটভাঙা তফন আর মলমলের পিরেন পরে, হাওয়াগাড়ি সিগারেট ধরিয়ে, বকের মত ডিঙ্গি মেরে মেরে, বেশ্তে মাগীদের ঘরগুলোর কাছে ঘুর ঘুর করছে। ভাবলেন, ব্যাটার তো বড় পাখনা গজিয়েছে। তার মানে দেদার পয়সা মারছে।

হাঁক ছাড়লেন, এই তুফানে!

কর্তার ডাকে চমক খেয়ে ফিরে তাকাতেই তুফান মিঞা হকচকিয়ে গেল। সদ্য-ধরানো সিগারেট আঙুলের ফাঁক দিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। মনে মনে বলল, শালার বুড়োর সব দিকে চোখ। মুখখানা পরম বেকুবের মত করে, কুত কুত চোখে মেদ্দা ছাহেবের দিকে চেয়ে, মেহেদি দিয়ে রঙ করা আঙুলের নখ দাঁতে খুঁটতে লাগল।

মেদ্দা ছাহেব ধমক দিলেন, এই হারামজাদা, এখানে কী করতিছিস?

তুফান মিঞা তুড়ুক জবাব দিল, হুজুর, আমদানি দেখতিছি।

ছোকরার তো রস আছে। আমদানি দেখছেন এখানে! কি জানি কেন, জবাবটা শুনে মজাই লাগল মেদ্দা ছাহেবের। রাগটা খপ করে পড়ে গেল। টুপিটা মাথায় বসিয়ে দিলেন। হয়তো গুরুত্ব বাড়াবার জন্য।

গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, কোন্ আমদানি দেখতিছ?

কোস্টার আমদানি হুজুর।

তেমনভাবেই হুকুম দিলেন মেদ্দা ছাহেব, হুঁ। তা ছাখ। তবে লালি ছাড়া ছুঁয়ো না আর এট্টু বাছবিচার করো।

গদির দিকে দু পা এগুতেই মেদ্দা ছাহেব দেখলেন, মেজকর্তা যাচ্ছেন।

ডাক দিলেন, আরে ও মাজেবাবু, আচ্ছালাম ওয়ালেকুম। নাতি পায়ে যে ভুলেই গেলেন আমাদের।

মেজকর্তা বললেন, সেলাম, প্রেসিডেণ্ট সাহেব।

মেদ্দা ছাহেব বললেন, নাতি বুঝি বুকি বুকিই থাকে। একেবারে যে ডুমুরির ফুল হয়ে ওঠলেন।

মেজকর্তা বললেন, বুকে থাকা তো দূরের কথা। আমার মুখ দেখলে আঁতকে ওঠে নাতি। দাড়ির জঙ্গল সাফ না হলে বাবু কোলে উঠবেন বলে তো মনে হয় না।

মেজকর্তার কথায় হো-হো করে হেসে উঠলেন মেদ্দা ছাহেব।

হাঃ হাঃ হাঃ, তবে তো ক্ষুদ্দুর বদমাইসডে বড় কলে ফেলেছে আপনারে। হাঃ হাঃ হাঃ। শখের দাড়ি আর পিরানের নাতি, কার টানের জোর বেশী, ইবার দেখা যাবে, কী কন? হাঃ হাঃ হাঃ!

মেদ্দা ছাহেবের রকম দেখে মেজকর্তাও হেসে ফেললেন।

বললেন, বিচারের আশায় আবার না প্রেসিডেণ্ট সাহেবকে সালিশ মানতে হয়।

মেদ্দা ছাহেব বললেন, তার জন্যি ভাবনা কী? ঝোলের লাউ আর অম্বলের কোদু আমি তো আছিই। চলেন এক পেয়ালা চা-পানি খায়ে যান।

এই গ্রামে চা খাবার চল করেছেন মেদ্দা ছাহেব। বিকাল থেকে তাঁর গদিতে চায়ের আসর বসে, বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সামনে চা চলে। একটা বড় হাঁড়িতে জল অনবরত ফোটে। একটা লোক আছে চা বানাবার জন্য। তার মাইনে পাঁচ টাকা।

হিন্দু মাতব্বররা বিশেষ কেউ এই আসরে যোগ দেয় না। তবে ছোকরার দল এসে জোটে। মেজকর্তার কোনও বাছবিচার নেই। এ তো চা, কলেজ-জীবনে কলকাতায় বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে মুসলমান হোটেলে অনেক শক্ত জিনিসও খেয়েছেন।

হিন্দু মাতব্বররা এই কাজটাকে বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখেন। বুদো:

ভুয়ের ধারণা, এটা মেদ্দা ছাহেবের জাত মারার ফন্দি। প্রকাশ্যে সে কিছু বলে না। প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাবান লোক। ঘন ঘন শহরে যায়, এস ডি ও, মুন্সেফ, এস পি, ডি এস পি-র সঙ্গে দহরম মহরমও আছে। কাজেই সামনে কিছু বলে না। আড়ালে ঘোট পাকায়।

এই নিয়ে তার সঙ্গে মাতঙ্গিনী টেলারিং-এর প্রোপ্রাইটার সুশীল দত্তর সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি বাধে। বুদো ভুয়ে বলে, নাড়ের গায়ে যে রোজ গিয়ে গা ঘষিস, কি পাস, বল দিন। সুশীল দত্ত হেসে জবাব দেয়, ওমা, বুদোদাদা, তাউ জান না, আতরির বাসনাই। তুমিউ দিনকতক ঘষে দ্যাখ না, তুমার গার ঐ পাঁকের গন্ধে কেমন গুলাপের খোশবু ভুর ভুর করবেনে। বুদো চটে যায়। বলে, অত মাখামাখি ভাল না সুশীল, ভাল না। একদিন যদি মোল্লা ডাকে ঐ মেদ্দা তোগের কলেমা পড়ায়ে না ছাড়ে তো আমার নামে কুকুর পুষিস। আর এই বয়সে ছুন্নৎ করলি কেমন লাগে, তখন বুঝবা। সুশীল রাগে না। বলে, নিজিরডা সামলে রাখো, তালিই আমাদের ধম্ম রক্ষা পাবে। এর পর দোকান সুদ্ধু হাসির যে গররা ওঠে, বুদো তা আর সইতে পারে না। রাগে গর গর করতে করতে সুশীল দত্তের সিঙ্গার মেশিনের উপর রাখা বিড়ির বাণ্ডিল থেকে একটা বিড়ি বেছে নিয়ে বিশ্বেসদের দোকানমুখো সরে পড়ে।

মেদ্দা ছাহেবের আসরে লোক সমানে বাড়ে।

চা খাবার পালা শেষ হতে না হতেই সেদিন দফাদার ভক্ত ঘোষ গদিতে ঢুকল। মাথা নুইয়ে মেদ্দা ছাহেবকে সেলাম করল, মেজকর্তার পায়ের ধুলো নিল, তারপর হাতের বিরাট লাঠিটা গদির ছক্কা-পাঞ্জা ছাপ মারা পুরু অয়েল পেপারে মোড়া মেঝেতে শুইয়ে রেখে, এক পাশে উবু হয়ে বসল।

এক গাল হেসে মেদ্দা ছাহেবকে বলল, হুজুর, এটটুসখানি চা কি এই অধীনির বরাতে জোটবে?

ওর কথার ঢঙে গদির লোক হেসে ফেলল।

মেদ্দা ছাহেব হাসতে হাসতে বললেন, দফাদার আমাদের বিনয়ে একেবারে মা-গোঁসাই। তুমি দফাদার না হয়ে ভক্ত বোরেগী হলিই পারতে।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভক্ত বলল, ইচ্ছে তো তাই ছিল হুজুর। কিন্তু গিরামের বোরেগী যে ভিক্ষে পায় না। তাই তো দফাদার হলাম। বাঁশরীর

বদলে হাতে তাই তো বাঁশ ধরতি হল। নামাবলীর বদলে মাথায় বাঁধলাম সরকারের লাল পাগড়ি, ক্যাঁথার ঝুলার বদলে কাঁধে নিলাম এই নীলমণি ঝুলাখান। তা দফাদারের ঝুলা হুজুর, দেখিছেন তো একেবারে শ্যাম বন্ন। ধরে নেন, এর মধ্যিই শ্যাম আছেন।

আবার সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

মেন্দা ছাহেব হাসতে হাসতে বললেন, ভক্তর সঙ্গে কথায় পারবে কিডা? ওরে, ভক্তরে এট্টু চা পানি দে।

সঙ্গে সঙ্গে ভক্তর জন্য চা এসে গেল। একটা জর্মান-সিলভারের গেলাসে। গেলাসটা গনগনে গরম। হাতে তাত লাগায় ভক্ত পাগড়িটা খুলে তার এক মুড়ো দিয়ে গেলাসটা ধরে ফুঁ দিয়ে দিয়ে সুপ সুপ করে চা খেতে লাগল।

মেন্দা ছাহেব বললেন, ন্যাও, ইবার এট্টু কাজের কথা কও দিন। ঝিনেদায় গিছিলে?

ভক্ত চা খেতে খেতে মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

দেখা হল দারোগাবাবুর সঙ্গে?

আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

চায়ের গেলাসটা ঠকাস করে নামিয়ে রেখে ভক্ত জবাব দিল। বলল, আপনার বাঘের হিসেব চুকোয়ে দিয়ে আলাম। শুনে সুখী হবেন হুজুর, আপনার ইউনিয়ন ছাড়া আর কেউ হিসেব বুঝ দিতি পারেনি। দারোগাবাবু খুব চটেছেন ওগের উপর।

সংবাদে সত্যিই খুশি হলেন মেন্দা ছাহেব।

বললেন, বিস্তারিত কও দিন শুনি।

ভক্ত নড়ে-চড়ে বসল। চায়ের গেলাসে আর-একটা চুমুক দিল।

তারপর বলল, হুজুর, গিয়ে দেখি, দফাদারগের ভিড়ে থানা ভর্তি। এক এক জন দারোগাবাবুর ঘরে ঢোকছে, হিসেব দিতি পারছে না, আর দারোগাবাবুর দাবড় খায়ে মুখখানারে চুনির গুদোম করে বেরোয়ে যাচ্ছে। আমারে ডাকে দারোগাবাবু এক দাবড় মারলেন, কী, হিসেব আনোনি তো? আমি হাতজোড় করে কলাম, সে কী কথা হুজুর! আপনি মা-বাপ, একটা হুকুম দিয়েছেন, তা কি অমান্য করতি পারি? পরিষ্কার হিসেব আনিছি। দারোগাবাবু অমনি নড়ে-চড়ে বসলেন। কলেন, বেশ, তুমার ইউনিয়নে

বাঘের সংখ্যা কত? কলাম, হুজুর, আগে সাতটা ছিল, বর্ত্তমানে ছয়। দারোগাবাবু কলেন, আরেকটা গেল কনে? কলাম, হুজুর, সিডা সঠিক কতি পারব না। তবে পায়ের দাগ দেখে আন্দাজ হয়, একুশ নম্বরের দিক হাঁটা দিয়েছে। দারোগাবাবু কলেন, ক্যান, তুমার ইউনিয়নের উপর তেনার এত বীতরাগ হল ক্যান? কলাম, হুজুর, জুড়া পাচ্ছিল না, আমার ইউনিয়নের বাঘিনীগুলো বড় সতী কি না, তাই। দারোগাবাবু কলেন, বেশ, যে কডা আছে তার কডা বাঘ, কডা বাঘিনী? কলাম, হুজুর তিনডে বাঘ, তিনডে বাঘিনী। দারোগাবাবু কলেন, ঠিক জান তো? কলাম, হুজুর, না জানলি ঠিক ঠিক কচ্ছি কেমন করে? দারোগাবাবু কলেন, সিডাও একটা কথা বটে। তারপর খুশি হয়ে তুডো টাকা বকশিশ দিয়ে দারোগাবাবু কলেন, তুমার প্রেসিডেণ্টরে আমার ছালাম দিও।

ভক্ত ঘোষের বিবরণে মেদ্দা ছাহেব খুব খুশি। তিনিও তাকে দু টাকা বকশিশ দিলেন।

মেজকর্তা বাঘের হিসেব কী বুঝতে পারছিলেন না।

জিজ্ঞাসা করলেন, বাঘের হিসেব কী?

মেদ্দা ছাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, সরকারের খেয়াল, আবার কী? হুট করে হুকুম আলো, দেশে কত বাঘ আছে গোন। গুনে এক হপ্তার মধ্যি থানায় গিয়ে তার রিপোর্ট দাও। সরকারী হুকুমির তো আর কোন বাপ-মা নেই। আলিই হল। আমাগেরই যত ঝামেলা।

ভক্ত বলল, হুজুর, হিসেবডা বুঝ করাই হল আসল। না হলিই ঝামেলা। সরকারী কাজের রগড়ই হল ওইডে, যে বুঝিছে সে মজিছে।

মেদ্দা ছাহেব বললেন, তা যা বলিছ।

মেজকর্তা ভাবলেন, ভক্ত একেবারে সার বুঝে গেছে।

ভক্ত বলল, হুজুর, ঝিনেদায় এক নতুন কথা শুনে আলাম। উকিলবাবুগের মধ্যি খুব আলাপ হচ্ছে। কী যেন হয়েছে কলকেতায়, কি, হিন্দু মুসলিম প্যাক্‌টো না কী, তাই। ইবার নাকি ভোট হবে।

মেদ্দা ছাহেব আর মেজকর্তা দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন।

মেদ্দা ছাহেব উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, এট্টু খোলসা করে কও দিন, শুনি।

ভক্ত ঘোষ বলল, হুজুর, আমরা হলাম নিরেট গুরুর শিষ্য। বিদ্যের দোড়

যে কত সে তো ভালই জানেন। ওই কয়ে কলাগাছ পর্যন্ত। বাবুগের ভাবের কথা কি সব বুঝতি পারি? তাও আবার কোন বাবু না উকিল বাবু। মা-রে যিনারা কথার প্যাঁচে মাওই বানায়ে ছাড়ে ছ্যান।

ভক্ত একটু থামল। শুধু হাতে চায়ের গেলাশ ধরে বুঝল তাতটা কমে এসেছে। সুস্প্‌ সুস্প্‌ করে দুই চুমুকে গেলাস খালি করে দিল। তারপর পাগড়ির কোণা দিয়ে মুখটা বেশ করে মুছল।

বলল, খুসালের মামলার তত্ত্ব নিতি যোগেন মুউরির কাছে গিছিলাম। যায়ে দেখি উকিলবাবুরা একখান খবরের কাগজের উপর হুমড়ি খায়ে পড়িছেন। মড়ির উপর শগুন পড়লি যেমন শোভা হয়, তেমনি হয়েছে। আর ব্যাঙাচির ন্যাজের মত মুউরিরা সব নিজির নিজির বাবুর কাছার কাছে দাঁড়ায়ে আছেন। আর ওই কুল বক্সী, অভয় বোস আর রামতারণ উকিলির ছাওয়াল গুড়গুড়ে চক্কোত্তি মুখ নাড়ে বাক্যির তুফান ছুটোয়েছেন। ভাবলাম, কলি উল্টোলো নাকি? শেষে শোনলাম, সে সব কিছু না, কলকাতায় হিন্দু মুসলমানের প্যাক্‌টো না কি ক্যাক্‌টো, তাই হয়েছে। ভোট হবে। বাবুরা কাউন্সিলি যাবেন। হিন্দুরা হিন্দুগেরে ভোট দেবে, মুসলমানরা দেবে মুসলমানগেরে। হিন্দু মোছলমানে একতা হয়ে যাবেনে। এই তো বিত্তান্ত, আমি যা বুঝিছি। হ্যাঁ, এইসব না কি সি আর দাস না কেডা, তিনার আজ্ঞে। যা জানি কলাম, এখন হুজুর, আপনারা বুঝে নেন।

ভক্ত ঘোষের বয়ান শেষ হলে কিছুক্ষণের জন্য গদির মানুষদের মুখে কথা সরল না। এদিকের কথা থেমে যেতেই হাটের কোলাহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। হাটের তখন যৌবন অবস্থা। বেচা-কেনা, দর-কষাকষি, ছোটখাট তর্ক-বিতর্কের শব্দগুলো মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, কখনও একতাল শব্দপিণ্ডের সঙ্গে আরেক তাল শব্দপিণ্ডের প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধছে। প্রচণ্ড ধাক্কায় পিণ্ডাকৃতি গণ্ডগোল যেন আবার ভেঙে ছোট ছোট শব্দে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণেই ভাঙাচোরা তোবড়ানো শব্দগুলো আবার নতুন নতুন শব্দসমষ্টির গায়ে লেপ্টে নতুন নতুন সব অর্থহীন আওয়াজ সৃষ্টি করছে।

মেজকর্তা অন্যমনস্কভাবে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ভক্ত ঘোষের কথার মর্ম বুঝতে চেষ্টা করছিলেন।

মেদ্দা ছাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কী বোঝছেন মাজেবাবু?

এ সব রাজনীতির তত্ত্ব মেজকর্তা ভাল বোঝেন না। নিশানাহীন

শিকারীরা বনের মধ্যে দুমদাম বন্দুকের আওয়াজ করে গ্রামের লোকেদের মনে যেমন সম্ভ্রমের সৃষ্টি করে, মেজকর্তার কাছে রাজনীতিকদের ক্রিয়াকলাপ অবিকল তেমনিই ঠেকে।

মেন্দা ছাহেবের প্রশ্নে মেজকর্তা একটু হাসলেন।

বললেন, বুঝলাম হুজুগের আরেকটা ঢেউ আসছে।

ক্যান মাজেবাবু, আপনি ইডারে হুজুগ বলছেন ক্যান?—সফীকুল মোল্লা এক পাশে এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল, এবার খ্যানখেনে গলায় প্রশ্ন করল। কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে উঠল, আমি তো মনে করি, অ্যাদ্দিন পরে হিঁদুগের আক্কেলের গুড়ায় পানি পড়িছে। ভোট যদি সত্যিই আলাদা আলাদা হয়, মোছলেম জাহানের তাতে তরক্কিই হবে। চাকরিবাকরির সুবিধে আমাদের কিছু হতি পারে।

মেজকর্তা বললেন, সে তো এখনও হতে পারে সফীক মিঞা।

সফীক একটু তিক্ত হাসি হাসল।

বলল, পাগল হয়েছেন মাজেবাবু, আমাগের কি চাকরি কেউ দেয়! গায় যে পিয়াজ রসুনির গন্ধ। তাছাড়া আপনাগের ঘরে ঘরে আই এ, বি এ, এম এ। মোছলমানের ছাওয়াল এনট্রান্স পাস করলো যদি সে বড় পীর। সুজা রাস্তায় আপনাগের নাগাল ধরতি আমাগের দুডো তিনডে জনম কাবার হয়ে যাবে। তা তদ্দিনের এন্তেজারে কী কেউ থাকতি চায়!

মেন্দা ছাহেব বললেন, বাবু মিঞার দেখি মাস্টারি করতি করতি বুদ্ধির চিরাগে রোশনি ধরেছে। কথাডা বলিছ বড় ভাল। এই যে আমার জামাইডে মুক্তারি পাস করে ঝিনেদার কোর্টে ঘষ পাড়ছে। পিরেন পাতলুন ছাপ করার কড়িউ জুটাতি পারছে না। মোছলমান মুক্তারির হাতে কেস তুলে হিঁদুতিউ দ্যায় না, মোছলমানেও দ্যায় না। ভরসাই পায় না। তাই তো খায়ে না-খায়ে মুরুরি কলকেতায় পাঠালাম। যাও বাপ, অন্তত গিরাজুয়েট পাস করে আসো গে।

সফীক বলল, খোদা আপনার মনের ইচ্ছে পুরোয়ে দেন। কিন্তু দিনকাল যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাতে নিজির কোলে ঝোল টানার চিষ্টা না করলি বাঁধা মার খাতি হবে। মোছলেমদের জন্যি আলাদা ব্যবস্থা করার সত্যিই দরকার হয়ে পড়িছে।

তর্কে বিতর্কে মেজকর্তা বড় একটা ভিড়তে চান না আজকাল।

সফীকুলের কথা শুনে তাঁর মনে হল, লোকটা যা বিশ্বাস করে তাই বলছে। এইসব লোক কোন কিছু তলিয়ে বোঝে না। আস্থাভাজন লোকেরা যা বুঝিয়ে দেয়, তাই এদের কাছে শেষ কথা। চাকরি চাকরি করেই এরা হন্যে হয়ে উঠেছে। শুধু এরা কেন, হিন্দু মুসলিম সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিয়েছে চাকরির ফল পাড়ার জন্য। কিন্তু কটা চাকরি আছে দেশে?

মেজকর্তা বললেন, আমাদের দোষটা কী জান? আমরা বড় হাওয়ায় নেচে বেড়াই। কোনও জিনিসটাই তলিয়ে দেখার চেষ্টা করি নে। সফীক মিঞা, তুমি জান, বাংলায় সরকারী চাকুরের সংখ্যা মোট কত?

সফীক মাথা নাড়ল। না, সে জানে না। সত্যিই জানে না।

মেজকর্তা বললেন, সরকারী হিসেবেই, আমার যতদূর মনে পড়ছে, তিন লক্ষ একুশ হাজার, কি বাইশ হাজার। না হয়, ধর চার লক্ষই। আর বাংলার লোকসংখ্যা এখন পাঁচ কোটি, তার মধ্যে মুসলমান ধর পৌনে তিন কোটি। এখন বল, ওই চার লক্ষ চাকরিই যদি মুসলমানদের দেওয়া যায়, একটা পদও যদি হিন্দুদের না দেওয়া হয়, তা হলেই কী বাংলার মুসলমানদের সমস্যা মিটবে? তা হলেও যে দু কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ মুসলমানের সমস্যা থাকে। তার ব্যবস্থা কী দিয়ে করবে?

মেদ্দা ছাহেব আর সফীকুল একসঙ্গে বলে উঠল, বলেন কী মাজেবাবু! এমন কথা তো কেউ শুনোয় নি।

মেজকর্তা বললেন, আমাদের আসল সমস্যা কি এই যে, কার ভাগে কটা চাকরি পড়বে? সমস্যা তার চেয়েও ঢের ঢের বেশি জটিল। এই পাঁচ কোটি লোকের জন্য কী ভাবে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা যায় তাই ভাবা, তার জন্যে ব্যবস্থা করা, তাই হল প্রকৃত সমস্যা। এখন বল, সরকারী চাকরি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিলেই কী দেশের তাবৎ লোককে দুধে-ভাতে রাখার ব্যবস্থা করা যাবে? দেশের আসল যা রোগ, দারিদ্র্য, তার চিকিৎসা না করে, কলকাতায় বসে কালনেমির লঙ্কা ভাগ হচ্ছে। কলকাতায় বসে ফতোয়া ঝাড়লে, তা সে যিনিই ঝাড়ুন, আমার ধারণা, তাতে দেশের লোকের এক তিল উপকার হবে না। সে তুমি প্যাক্টই কর আর যাই কর।

মেজকর্তা অনেক দিন পর একটু গরম হয়ে উঠছেন যেন। অনেক দিনের অনেক কথা উৎসমুখে জমে ছিল। ধীরে ধীরে যেন গলতে শুরু করেছে।

বললেন, আশ্চর্য আশ্চর্য সব ব্যাপার ঘটছে। বাইরে থেকে দেখলে তার যেন কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই পাটের কথাই ধর। ভাবলেই আমার কেমন অবাক লাগে। বাংলা দেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও পাট হয় না। অথচ পৃথিবীর সব দেশে বাংলার পাটের চাহিদা। এই পাট জন্মায় যে চাষী তাকে যদি পাটের দামের ন্যায্য হিস্যা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেত, তা হলে এই একটা ফসল দিয়েই আমার ধারণা, আজ দেশের অর্ধেক চেহারা বদলে ফেলা যেত। সে তো দূরের কথা, আজ পাটের চাপে আমাদের চাষীর জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। এক দিকে এই অবস্থা, আরেক দিকে চটকলের মালিকরা কোটি কোটি টাকা লাভ করছে।

মেজকর্তার কথা শুনে সফীকুল চুপ করে গেল। মেদ্দা ছাহেব, ভক্ত ঘোষ, গদির লোকেরা চেয়ে রইল মেজকর্তার মুখের দিকে।

মেজকর্তা বলতে লাগলেন: সাহেব কোম্পানিতে কাজ করলাম এত বচ্ছর। দেখলাম তো সব। এমন দরদী লোক থাকত যদি দেশে, এমন বিচক্ষণ সব নেতা, যারা এসে অভয় দিত চাষীদের, বুঝিয়ে বলত, তোমার গায়ের জল দিয়ে তৈরী ফসল নিয়ে অন্য লোকে মোটা টাকা লাভ করছে, এই আমরা পাটের ন্যায্য দাম ঠিক করে দিলাম, তার নীচে কেউ তোমরা পাট বেচো না। তোমরা সবাই যদি একমতে থাক, তবে ওই দামেই ওরা পাট কিনতে বাধ্য হবে। না যদি কেনে তবে সাধের কারখানা বন্ধ করে দিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। তবে ইংরেজের জাত বেনের জাত, প্রাণ গেলেও ব্যবসা বন্ধ করবে না। ওই দামেই পাট কিনবে বাধ্য হয়ে। ওরা শক্তের বড় ভক্ত। তা হলে দেখতে দেশের ভোল ফিরে যেত। কোন নেতা একদিনের জন্যও এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, এমন তো শুনি নি। দেশের লোক নিয়েই তো দেশ। এরাই তো দেশের লোক। এদের দুর্দশা লাঘবের কথা না ভেবে, তার সুরাহার ব্যবস্থা না করে, দেশ দেশ বলে চেঁচানো যদি হুজুগ না হয়, তো হুজুগ আর কাকে বলে? একবার বলছি হিন্দুর জন্য হিন্দুর ভোট, মুসলমানদের জন্য মুসলমানদের ভোট, আবার সেই সঙ্গেই বলছি হিন্দু মুসলিম ঐক্য। এসব ব্যারিস্টারি ভেলকিবাজিতে কাউন্সিলেই ঢোকা যায়। তার বেশি কিছু হয় বলে তো আমার মনে হয় না।

মেজকর্তার হঠাৎ মনে হল, যেন কেরাসিন কাঠের বাক্সে দাঁড়িয়ে

একটা লেকচার দিচ্ছেন। সেই পুরনো আমলের রোগ। অমনি তিনি মুখ বন্ধ করে ফেললেন। অনেক কথা মনের মধ্যে জমে উঠতে লাগল। কিন্তু না, আর বক্তৃতা নয়। সেসব দিন চুকে গেছে। তবু, মেজকর্তা ভাবলেন, লোকে যে বলে 'স্বভাব যায় না মলে', কথাটা মিথ্যে নয়।

সফীকুলের চোখে সম্পূর্ণ আলাদা একটা ছবি ভেসে উঠল। এ ছবি সে দেখতে আদৌ অভ্যস্থ নয়। কিন্তু মেজবাবুর কথা এত পরিষ্কার, সফীক তা উড়িয়ে দিতে পারল না। ওর মনে কথাগুলো ধারাল কলম দিয়ে যেন লেখা হয়ে যেতে লাগল।

মেজকর্তা উঠে পড়লেন। বেলা যে গড়িয়ে গেল। হাট সারতে দেরি হয়ে যাবে।

শ্যাম রানার দুখানা চিঠি তাঁর হাতে তুলে দিল। মেজকর্তা দেখলেন, একখানা চিঠি সুধাময়ের, কলকাতা থেকে আসছে। আরেকখানা ভূষণের, কোত্থেকে আসছে বোঝা গেল না। সুধাময়ের কলেজ বন্ধ কদিনের জন্য। সে আসছে বাড়িতে। ভূষণও আসছে বলে লিখেছে।

বেলা পড়ে আসছে। মেদ্দা ছাহেবের সাঁঝের নেমাজের সময় প্রায় হয়ে এল। নিয়মিত দু ওখ্‌ত নেমাজ পড়েন মেদ্দা ছাহেব। একটু পরেই তিনি উঠবেন। মাথায় এবার একটা কাপড়ের টুপি পরবেন তারপর একখানা শতরঞ্চি আর বদনাটা নিয়ে উঠবেন। চলে যাবেন নদীর ধারে। বদনায় পানি ফিরিয়ে উজু করে নেবেন, তারপর পরিষ্কার জায়গায় শতরঞ্চি বিছিয়ে আধ ঘণ্টা ধরে নেমাজ পড়বেন। ফকিরের দেওয়া একটা মালা আছে তাঁর। সেইটে জপতে জপতে ফিরে আসবেন আবার।

সফীকুলও উঠব উঠব করছিল। মেজকর্তার কথাগুলো তখনও তার মগজে ঘোরাফেরা করছিল।

এমন সময় সোনা মিঞা মুখটি চুন করে গদিতে ঢুকে পড়ল।

আদাব আরজ বড় মিঞা। মেদ্দা ছাহেবকে সে সালাম দিল।

আদাব আরজ। মেদ্দা ছাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কী খবর, সোনা মিঞা ?

সোনা মিঞার বুক দুরদুর করে উঠল। কী করে কথাটা পাড়বে ভেবে পেল না। বদু কলুকে শেষ পর্যন্ত ধরতে পারে নি। রামকিষ্টোর সাহায্যে বলদটাকে অতিকষ্টে চাঙ্গা করে সে যখন খেয়া ঘাটে গেল, তখন সব ভোঁ-ভাঁ। কোথায় বদু কলু আর কোথায় কে ? চোখে অন্ধকার দেখল সোনা

মিঞা। আগরওয়ালার খপ্পরে পড়তে ইচ্ছে হল না তার। গাড়িটাকে অন্যের জিম্মায় রেখে নতুন ফড়ে ধরবার আশায় এদিক ওদিক ঘুরঘুর করতেই মেদ্দা ছাহেবের গোমস্তা তুফান মিঞার সঙ্গে দেখা হল। লালি পাট আছে শুনে সে সোনা মিঞাকে গদিতে আসতে পরামর্শ দিল। তাই সে এসেছে। টাকার তার বড় দরকার। আবার ছায়াদটাও আজ বড় খারাপ। কী আছে নছিবে কে জানে?

সাহস সঞ্চয় করে সোনা মিঞা বলল, জে, মন পাঁচেক কুষ্টা ছিল।

মেদ্দা সাহেব কথা শেষ করতে না দিয়েই শোভান আল্লা বলে উঠে পড়লেন।

বললেন, নেমাজের ওখ্‌ত হয়ে গেছে মিঞা। কুষ্টা এই সালে যাতে কিনতি পারি, যাই তার জন্যি খুদাতালার কাছে আর্জি পেশ করে আসি গে। যা দিনকাল পড়িছে উপরআলার মেহেরবানি না পালি কিনাকাটা সব খতম করে দিতি হবে নে।

শেষ ভরসাও হাতছাড়া হয় দেখে সোনা মিঞা কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। মেদ্দা ছাহেব নীচে নেমে আসতেই হুড়মুড় করে তাঁর পায়ে গড়িয়ে পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

বলল, বড় মিঞা, আপনি মেহেরবানি না করলি জানে মারা যাই যে।

আরে, পা ছাড় পা ছাড়, বেকুব।

মেদ্দা ছাহেব অস্থির হয়ে উঠলেন।

বললেন, গুণা হবে, গুণা হবে আমার। মুছলমান আল্লা রছুলের বান্দা, কারও পায়ে হাত দিলি দোজখে যাতি হয়। কোথাকার পাগল!

সোনা মিঞা পা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার ছোট ছোট চোখের দু কোণ বেয়ে মোটা মোটা জলের ধারা বুকের হাড়তোলা খাঁচার উপর পড়ে এবড়ো-খেবড়ো জমির উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে লাগল।

বলল, গোস্তাকি মাফ করবেন বড় মিঞা। আজ আমার মাথার ঠিক নেই। ঘরে বিবি মর মর। ছাওয়াল নষ্ট হয়ে গিয়ে নাকি প্যাট পচে উঠিছে। ঝিনেদার বড় ডাক্তার না দেখালি বাঁচবে না। সরকারী ডাক্তাররে দেখাতি হবে। তা সে যাট সত্তর টাকার ধাক্কা। কিছু কুষ্টা ধুয়ে আনিছিলাম। দোহাই খোদার, কুষ্টা কটা নিয়ে নেন। ভাল লালি কুষ্টা আছে, নিজির চোখি রঙ দেখে নেন।

মেদ্দা ছাহেব বললেন, বড় বিপদেই ফেললে মিঞা। বিক্রি নেই, শুধু কিনেই যাচ্ছি। তা খোদার যা ইচ্ছে। বলি আজকের দর জান তো? তের টাকা।

সোনা মিঞা আঁতকে উঠল, কন কি বড় মিঞা? জানে মরব তালি। এ যে লালি কুষ্টা। রেশমের মত মুলায়েম। লম্বায় মাথা ছাড়ায়ে যায়। এর দাম তের টাকা! মাত্তর!

মেদ্দা ছাহেব এবার একটু উগ্র হলেন। তুমি বড় ঘুঘু মিঞা। তুমারে চিনি নে, আজ কারে পড়িছ তাই মেদ্দার কথা মনে পড়িছে। ভাবিছ চোখির জলে পথ পিছল করে সড়সড়ায়ে চলে যাবা! সুখির দিনি আগরওয়ালা বাপ সাজে, কই, সে বাপ এখন দেখে না ক্যান? অ্যাঁ! আগরওয়ালার কাছে গিয়ে তো কই ট্যাঁ-ফোঁ কর না। যত তড়পানি আমার কাছে! নরম মাটিতি বিড়েলে হাগে।

বললেন, ছাখ মিঞা, বাহাসের সুমায় নেই। নেমাজের ওখ্‌ত পার হয়ে যাচ্ছে। দিতি হয় ছাও, দিয়ে টাকা নিয়ে বিবির ইলাজ কর গে। আর না হয় রাস্তা ছাখ।

উপায় কী? মেপে দিল সোনা মিঞা, টাকা গুনে লুঙ্গির খুটে বাঁধতে বাঁধতে ভাবল, এই প্রথমবার ভাবল, এই পাটের দর আগরওয়ালা সত্যিই কি এত কম দিত?

সফীকুলও বসে বসে ভাবছিল। একটু আগেই মেজবাবু এই ঘরে বসে বলে গেলেন পাটের চাপে এদেশের চাষীর নাভিশ্বাস উঠেছে। মেজবাবু যা বলে গেলেন, তা সোনামিঞা সফীকুলের চোখে আঙুল যেন দেখিয়ে দিয়ে গেল। সে ভাবছিল, সোনামিঞা আর মেদ্দা ছাহেব দুজনেই কি মুসলমান? একই মুসলমান?

এমন কথা আগে আর ভাবে নি, এমন করে ভাবে নি সফীক।

বারো

রামকিষ্টো মেছোহাটায় গিয়ে ছোলেমানকে খুঁজে বের করল। দেখল ছোলেমান, ছিরিপদ কৈবত্ত আর বুনো পাড়ার বিধু সদ্দার একত্র বসেছে। বুঝল, তিনজনে আজ জোট বেঁধে মাছ ধরতে গিয়েছিল। রামকিষ্টো খালুই এগিয়ে দিতেই ছোলেমান হাত বাড়িয়ে সেটা নিল। রেখে দিল তার পাশে।

রামকিষ্টো বলল, মাজেবাবুর খালোই। কী মাছ ধরলি আজ?

ছোলেমান বলল, ওই তুই কল্লার পাল্লায় পড়ে আজ জান বেরোয়ে গেছে চাচা। সারাদিন জাল বয়ে পালাম গিয়ে তুমার শোল আর সরপুঁটি। শোলগুলো বাড়িতি নিয়ে তো ছালুন রাঁধে খাতি হবে। হাট ভর্তি শোল, কেনবে কেডা? সরপুঁটিগুলোই যা ভরসা। বড়ই আছে। চার আনা পাঁচ আনা কুড়িউ যদি বেচতি পারি, তালি তু আড়াই টাকা হতি পারে।

রামকিষ্টো বলল, গিছিলি কোন্ পালি?

ছোলেমান টিটকিরি কাটল, ওই যে ছিরিপদ, উনি আসে খবর দেলেন, আঠারোখাদার বিলি রুই মাছ, কাতল মাছ, উনার হাতে ধরা পড়ার জন্যি ছটফট ছটফট করতিছে—

ছিরিপদ বলল, ছ্যাখ্ ছোলেমানে, তুই তখনের থে আমার কুষ্টি কাটতি বসিছিস, ইবারে ছাড়ান দে। আচ্ছা! কওদিন রামকিষ্টো দাদা, জলের মনে কী আছে কেউ কতি পারে? সবাই কয়, আঠারোখাদার বিলি বড় মাছ আছে, ভাবলাম দেখে আসি, তাই তিনজনে গাছো জাল নিয়ে গিছিলাম। সত্যি দিনডা একেবারে মাঠে মারা গেছে।

বোকার মত হাসতে লাগল ছিরিপদ। গা জলে গেল ছোলেমানের।

বলল, কস নে, কস নে, বড় মুখ করে ও কথা কস নে ছিরিপদ। শুনলি, লোকে তোর জন্মে সন্দ করবে। পানি দেখে মাছের তল্লাস নিতি পারিস নে, সে কথা আবার জানান দিতিছিস! তুই ঠিক ঠিক কৈবর্তের ছাওয়াল তো?

এইবার ছিরিপদ বেশ রেগে গেল।

বলল, ছ্যাখ, ফের যদি একটা কথা কস, এই কোচের এক ঘায় তোর মুখির দফা রফা করে দিবা নে।

বিধু সর্দার বলল, লাও ভাই, লাল সুতোর বিড়িটো খাও, থেইয়ে মেজাজটো ঠাণ্ডা কর। লাও রামকিষ্টো ভাই, তুমহিও একটো ধরাও। ঝগড়া রাগ করলে শোল পুঁটি তো রুই কাতলা হয়ে উঠবেক নাই।

বিড়ি ধরিয়ে রামকিষ্টো বলল, সরপুঁটি এক থালুই রাখিস ছোলেমান। মাজেবাবুরে শুধোয়ে আমি এক্ষুনি আসতিছি।

কেঁড়েগুলো হাতে নিয়ে রামকিষ্টো ভিড় ঠেলে ঠেলে মেজকর্তার সন্ধানে বিশ্বেসদের দোকানের দিকে চলতে লাগল।

হাটের মধ্যে কেন, এই অঞ্চলের মধ্যেই বিশ্বেসদের দোকান সব থেকে বড়। বছর তিরিশ আগে অনুকূল বিশ্বেস এই দোকানের পত্তন করেন। তার ছেলে মকর বিশ্বেস বুকের রক্ত ঢেলে দোকানটাকে এমনিভাবে বাড়িয়ে তোলেন। মকর বিশ্বেসের বয়েস হয়েছে। লোহাজাঙ্গার তাঁতি-সমাজের তিনি এখন মাতব্বর ব্যক্তি। হাটবারে ভিড় বেশি হয়, ছেলে গোপাল বিশ্বেস যথেষ্ট লায়েক, সে-ই এখন দোকানের কাজকর্ম দেখে, তবু হাটবারের ভিড় ঠেকাতে এখনও বুড়ো এসে দোকানে বসেন।

লোকে বলে, মকর বিশ্বেসের টাকার সীমা নেই। বুড়ো হাড়-কেপ্পন। হাত দিয়ে জল গলে না। কিন্তু বিশ্বেসরা যে কোথায় টাকা রাখে সে সন্ধান কেউ জানে না। বারকয়েক বাড়িতে ডাকাত পড়েছে, একটা তামার পয়সাও কোনবার কেউ পায় নি। হাটের দোকান দুবার লুঠ হয়েছে, মাল ছাড়া নগদ টাকা মেঝে খুঁড়েও পাওয়া যায় নি।

বিশ্বেসদের দোকানের তিনটে ভাগ। এক পাশে কাপড়-জামার দোকান, মাঝখানে মনিহারী, সাইকেল, তেল আর অন্য পাশে মুদিখানা।

গোপাল বিশ্বেস যুবক। বয়েস তিরিশ বত্রিশ। কিন্তু হাবেভাবে প্রৌঢ়। কালো মোটা চেহারা। পরনে ফিনফিনে রেলির ছাপান্ন ইঞ্চি ধুতি। তবুও তা পরার গুণে হাঁটুর উপর উঠেছে। গায়ে মলমলের পাঞ্জাবি, বোতামের ঘর বাঁ-কাঁধের দিকে। সোনার চেন-বোতাম। হাতের আট আঙুলে আংটি। গলায় সরু চেন হার। পরিপাটি পাতা কাটা সিঁথি। খুব পান খায় গোপাল।

দোকানের মাঝখানে উঁচু বেদী। আগে এখানে মকর বিশ্বেস আটহাতী

মোটা ধুতি আর ফতুয়া পরে একা একা বসতেন। এখন গোপাল সেখানে নবরত্ন সভা বসিয়েছে। জাতে তাঁতি হলেও, সেই এখন এ তল্লাটে হিন্দু সমাজের মাথা। সরকার মশাই, শ্যান কবিরাজ, বুদো ভুঁয়ে, ইস্তক রিদয় ঠাকুরও গোপালের সভার নিয়মিত সভাসদ। গোপাল আগরওয়ালাকে গ্রাহ্য করে না। শিকড় নেই তার। টাকা রোজগার করতে এসেছে, রোজগার করছে কারবার ফেঁদে। ওর কথার দাম কী? কে মানে ওকে? এখানে ওর কোন সমাজ নেই। মেদ্দা ছাহেবের গদির দিকেই গোপাল আড়চোখে মাঝে মাঝে চায়। ওই লোকটা এখানকার আর এক সমাজের মাথা। ধনে-দৌলতে নয়, মানে-মর্যাদায় লোকটা দিন দিন বাড়ছে। সরকারের ঘরে মেদ্দা ছাহেবের খাতির খুব। ওই জায়গাটায় গোপাল হার মেনেছে।

নইলে ওর তুল্য কে? এই হাটের ইজারা ওর, খেয়াঘাটের ইজারা ওর, কেরাসিন তেলের সোল এজেন্সি ওর। সমাজের বামুন-কায়েত ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ইচ্ছে করলে আঙুলের ইশারায় ওঠবোস করাতে পারে তাদের। কিন্তু সে ইচ্ছেই করে না গোপালের, কখনও করবেই না। ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ, এ বিধির বিধান, গোপাল সেটা মানে। জানে সে বৈশ্য। রিদয় ঠাকুর বিধান দিয়েছেন বৈশ্যের জল, বিশেষ করে লক্ষ্মীর যে বরপুত্র, তার হাতের জল সমাজে চল্‌। বাপের উপর এইখানেই টেক্কা মেরেছে গোপাল। তার পরিবারকে সমাজে উঠিয়েছে। তার ছেলের অন্নপ্রাশনে ব্রাহ্মণ এসে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন। কায়স্থ বৈদ্য পাত পেড়ে খেয়ে গিয়েছেন। আর তার জন্য গোপালকে বিদ্রোহ করতে হয় নি, ঘটা করে শুদ্ধি আন্দোলন করতে হয় নি, ভিক্ষুকের মত কারও কৃপাপ্রার্থীও হতে হয় নি। শুধু সে একবার মনের ইচ্ছা সবিনয়ে প্রকাশ করেছিল মাত্র। শাস্ত্রমতেই সমাজ আপনা থেকেই তাকে কোলে তুলে নিয়েছে। এখন, সত্য বলতে কি, গোপালই এখানকার সমাজের মাথা। হাটের ইজারা খেয়াঘাটের ইজারা, কেরাসিন করোগেট টিন আর সিমেন্টের সোল এজেন্সি যেমন তার, গোপাল জানে, এই সমাজও তেমন তার, তারই। তার এখন একটিমাত্র বাসনা, সরকারের সঙ্গে একটু দহরম-মহরম করে। কিন্তু সেখানে যে ওই মেদ্দাটা আগে থেকেই পাত বিছিয়ে বসে আছে। লোকে যে বলে, না'ড়েরা বড্ড সরকারের পা-চাটা হয়, তা সে কথাটা নিতান্ত মিথ্যে নয়। মেদ্দা ব্যাটা আবার তা সবার ঘাড়ে পা দিয়ে চলে।

মেজকর্তা দোকানে ঢুকেই দেখেন গোপালের মজলিশ বেশ জমেছে। বুদো ভুঁয়ে হাত-পা নেড়ে কী যেন বলছিল, মেজকর্তাকে দেখেই কল কল করে উঠল।

আসেন আসেন মাজে খুড়ো। বসতি আজ্ঞে হয়। ও গুপাল, তুমার এখেনে তো আবার চায়ের বন্দোবস্ত নেই, মানী লোকরা আসবে ক্যান তুমার এখেনে, তা মাজে খুড়োর জন্যি টিকে ধরাতি কও।

গোপাল গম্ভীরভাবে হুকুম দিল, ওরে, খুড়ো মশাইরি তামুক দে।

বুদো ভুঁয়ে বলল, শুধু ধুঁয়ো ঠ্যাকালি আজকাল আর চলবে না গুপাল, বুঝিছ, চা-র ব্যবস্থাও করে ফ্যাল। সত্যিই মেদ্দার তুলনায় আমাগের আসরডা হল শুষ্কং কাষ্ঠং, কি কন স্যান মশাই ?

মেজকর্তা হাসতে হাসতে খোঁচাটা হজম করলেন।

বললেন, সর্বনাশ! বুদো, তুমিও কি শেষে চাচার চর হয়ে উঠলে? সবাইকেই ওই দলে ভেড়াবে নাকি শেষ পর্যন্ত!

বুদো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

বলল, ক্যান খুড়োমশাই, ও কথা কলেন ক্যান ?

মেজকত্তা বললেন, এক চা দুবার চাইলেই তো চাচা হয়ে গেল হে।

সভাসুদ্ধু সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। বুদো ভুঁয়ের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বোকার মত হাসতে লাগল সে।

সরকার মশাই বললেন, মাজেবাবুর বোড়ের চালেই আমাগের বুদোবাবু মাত।

মেজকর্তা বললেন, গোপাল মণ দুয়েক চাল পাঠিয়ে দিও তো।

সরকার মশাই বললেন, কন কী মাজেবাবু, দেওয়ান-বাড়ির এই অবস্থা হয়েছে নাকি আজকাল ? এখনই চাল কিনে খাতি হচ্ছে ?

মেজকর্তা বললেন, তালপুকুর হয়ে উঠেছে দেওয়ানবাড়ি। ঘটিও ডুবছে না। গোপাল, আর-এক টিন কেরাসিন তেল পাঠিয়ে দিও।

গোপাল বলল, খুড়োমশাই, কেরাসিনির টিন পরশু পালি কি খুব অসুবিধে হবে? সাদা তেল আর নেই। কুঠির সাহেবের ওখেনে চার রাত্তির যাত্তারা হবে। সকালে লোক পাঠায়ে বারো টিন তেল নিয়ে গেছে।

সবাই অমনি কুথাকার দল, কুথাকার দল করে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

গোপাল বলল, কলো তো ছিরিচরণ ভাণ্ডারীর দল।

তামাক দিয়ে গেল। মেজকর্তা দু টান দিতে না দিতেই রামকিষ্টো এসে হাজির।

বলল, মাজেবাবু, দুধ কিনিছি। ছোলেমান ভাল সরপুঁটি আনেছে। খালোই রাখে আইছি। নেবেন নাকি?

মেজকর্তা বললেন, এক খালোই ন্যাও গে যাও, আমি আসছি।

রামকিষ্টো বেরিয়ে যেতেই দোকানের এক কর্মচারী এসে জানাল, কত্তাবাবু মেজকর্তাকে ডেকেছেন।

যেখানে কাপড় বিক্রি হয় মকর বিশ্বেস এখন সেখানে বসেন। মেজকর্তা আসতেই তাঁকে একেবারে পাশে নিয়ে বসালেন। এখনও তাঁর পরনে সেই চিরকেলে সাজ, সেই আটহাতী ধুতি আর ফতুয়া।

মকর বিশ্বেস বললেন, এই যে মহি, অহির খবর কী? আজকাল আর বেরোয়-টেরোয় না, নাকি? অনেক দিন দেখি নি।

মেজকর্তা বললেন, ম্যালেরিয়া ধরে বড়দাকে খুব কাবু করে দিয়েছে। পারতপক্ষে বেরোন না।

মকর বিশ্বেস জিজ্ঞাসা করলেন, শীতল কনে এখন? ওর বউ নাকি সুস্থ হয়েছে একটু? সেই রকম যেন শুনলাম।

মেজকর্তা বললেন, শীতল এখন কালীগঞ্জ থানায় আছে। লিখেছে তো, শিগ্‌গির মাগরোয় বদলি হবে। তখন একবার বাড়ি আসবে। তা ওর কথা—মেজকর্তা থামলেন একটু।

তারপর বললেন, ছোট বউমার ব্যাপারটা বড় আশ্চর্য। দশ বছর ধরে কত রকম চিকিৎসেই তো হল। কিন্তু কিছুতেই ভাল হলেন না। বুড়ীর ছেলে হবার সময় কী যে হল, একেবারে ভাল হয়ে গেলেন।

মকর বিশ্বেস বললেন, সব তাঁরই ইচ্ছে। কিসির থিকে যে কী হয়, বুঝা ভার। তা তুমার নাতি যাবে কবে? যাব যাব ভাবি নাতিরি দেখতি, তা সুমায় আর করে উঠতি পারি নে। জামাই কি আয়েছেন?

মেজকর্তা বললেন, চিঠি এসেছে জামাইয়ের। আর কি, এসে পড়লেন বলে।

মকর বিশ্বেস বললেন, তুমার আর ছুটি কদিন আছে?

মেজকর্তা বললেন, ছুটি তো ফুরিয়েছে অনেক দিন। কাজে যাবার আর

ইচ্ছে নেই। ভালও লাগে না এই বয়সে বিদেশে একা একা পড়ে থাকতে। ভাবছি এবারে গিয়ে ইস্তফা দেব।

মকর বিশ্বেস বললেন, তবে তো বড় সুমায় তুমারে ডাকিছি। সবই দেখতিছি ভগবানের ইচ্ছে। ছাখ মহি, অনেক দিন ধরে একটা কথা ভাবতিছি। আমাগের ধারে কাছে কোন ইস্কুল নাই। হয় মাগরো আর না হয় গাঙ পেরোয়ে সেই হরিশঙ্করপুর। ইস্কুলির অভাবে এদিককার ছেলেপেলেরা মুখ্খু হয়ে থাকতিছে। আমার ইচ্ছে একটা ইস্কুল হোক। টাকা দু পাঁচ হাজার লাগে, আমি দিবানে। আমার ভাবনা, ম্যাও ধরে কেডা! এখন তুমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ভগবান হয়তো কাজডা করালিউ করাতি পারেন। তুমি তো চাকরি ছাড়বাই ঠিক করিছ। এখন ভাবে ছাখ, ব্যাগারডা খাটবা কি না?

মকর বিশ্বেস চুপ করলেন। মেজকর্তা অপ্রত্যাশিত এ প্রস্তাবের জবাব চট করে দিতে পারলেন না। এই গ্রামে ইস্কুল করা, এ যে তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন। কিন্তু মকর বিশ্বেস এতদিন চুপ করে ছিল কেন? এখন তাঁর যৌবন বয়ে গিয়েছে, ভাঁটা পড়েছে উৎসাহ উদ্যমে? দেহযন্ত্রের নাট বল্টু আলগা হয়ে পড়েছে। এই শিথিল শরীর নিয়ে পারবেন কি এত বড় একটা দায়িত্বের ভার কাঁধে তুলে নিতে?

মকর বিশ্বেস বললেন, এদিককার কেউ যদি এ কাজ পারে, তবে একমাত্র তুমিই পারবা। তুমি একটু ভাবে ছাখ। যাওয়ার আগে জবাব দিও।

মেজকর্তা কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হাটের মধ্যে তুমুল গণ্ডগোল বেধে গেল।

ছোলেমানকে নিয়েই হাঙ্গামাটা পাকাল।

হাটের গোমস্তা নিরাপদ বিদয় ঠাকুরের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। যেমন মাতাল তেমনি লোভী। ওর তোলা তোলার বিরুদ্ধে হাটসুদ্ধ ব্যাপারীর মনে নালিশ জমে আছে। দুটো পেয়াদা নিয়ে হাটময় ঘুরে বেড়ায়, আর যার যা ভাল জিনিস খপ খপ করে তুলে নিয়ে ধামায় ফেলে।

ছোলেমানের ডালায় বড় বড় সরপুঁটি দেখে লোভ সামলাতে পারে নি নিরাপদ। খপ খপ করে চারটে মাছ তুলে নিতেই ছোলেমান 'আরে আরে ঠাউর, কর কী' বলে তার হাত থেকে মাছ কেড়ে নিয়েছে।

বলল, মাছ দেখলিই বুঝি খাবল দিতি ইচ্ছে করে! মারে দিলি বড় ভাগটা, না!

নিরাপদ নেশায় টলছিল। তার মাথায় রক্ত চড়ে গেল।

চেঁচিয়ে বলে উঠল, শালা নিকিরি, তোর এত বড় আস্পদ্দা, আমার হাটে বসে তুই আমার গায়ে হাত তুলিস! বামন হয়ে চাঁদ পাড়তি চাস! বেচাচ্ছি তোর মাছ!

নিরাপদ একটানে ডালার মাছ মাটিতে ফেলে দিল, আরেক টানে চুবড়ির মাছ দিল ছড়িয়ে। তারপর বড় বড় সরপুঁটিগুলোকে দু পায়ে মাড়াতে লাগল।

আর বলতে লাগল, ব্যাচ্ শালা মাছ ব্যাচ্, ব্যাচ্ হারামজাদা, মাছ ব্যাচ্।

আকস্মিক এই ব্যাপারে ছোলেমান থ হয়ে গেল। কিছু বুঝতে পারছিল না সে। তার চোখের সামনে চকচকে মাছগুলো শিলাবৃষ্টির মত ছড়িয়ে পড়ল। এই ছাখ করে কী, লাথি মেরে মেরে মাছগুলোর করে কী ঠাউর? একটু আগেই মাছগুলো তার ডালায় ছিল। রুপোর মত চকচক করছিল সরপুঁটিগুলো। পড়ন্ত রোদ্দুরে কী সুন্দর জেল্লা বেরুচ্ছিল ওগুলোর গা দিয়ে! ছোলেমান দেখল, মাছগুলো হঠাৎ তার ডালা থেকে যেন উড়ে গিয়েই প্যাচপেচে কাদায় পড়ল। যাঃ, ডালির মাছগুলোও গেল! ওই যে, ঠাউর কী নিষ্ঠুর আক্রোশে পা দিয়ে থেঁতলে দিচ্ছে। আহা, অমন রুপোর শরীর কাদা লেগে কালো হয়ে উঠল। এই ছাখ, প্যাট প্যাট করে কেমন পিত্তি গলে যাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল, মাছগুলো তার। তার আজকের পেটের ভাত জোগাবার একমাত্র সামগ্রী। আর তার ওই দশা! বিস্ময়ের ভাবটা কেটে যেতে লাগল ছোলেমানের। তার মাছের ওই দশা করছে! ওই মাতাল, বদমায়েশ তারই চোখের উপর তার সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফলকে লাথিতে লাথিতে ওইভাবে বরবাদ করে দিচ্ছে!

খাবে কী সে? কিসের ভাগ দেবে ছিরিপদকে? বিধু সদ্দারকে?

হঠাৎ যেন ছোলেমানের ভাবনা চিন্তা বন্ধ হয়ে গেল। তার মাথাটা খালি, একেবারে খালি হয়ে গেল। এক সেকেণ্ড, দু সেকেণ্ড, তিন সেকেণ্ড। তারপর—

প্রচণ্ড ক্রোধের আগুন ছোলেমানের মগজে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। চৈত্র মাসে খড়ের ঘরে যেন খপ করে আগুন লেগে গেল। দমকে দমকে

বেড়ে উঠল সে আগুন। ছড়িয়ে পড়ল তার শিরা-উপশিরায়। খুন চেপে গেল তার। চোখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরুতে লাগল।

বাঘের মত হুঙ্কার দিয়ে উঠল ছোলেমান, শালার বামুন, তোর গুষ্টির জাত মারি।

বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল নিরাপদর ঘাড়ে। ঠাস করে মারল এক চড়। ছোলেমানের এক চড়ে বাবা গো বলে নিরাপদ উল্টে পড়ল। ছোলেমান তার বুকে হাঁটু দিয়ে গলা টিপে ধরল। পেয়াদা দুটো প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে তারাও ঝাঁপিয়ে পড়ল ছোলেমানের উপর। লাথি কিল চড় সমানে মারতে মারতে নিরাপদকে অতিকষ্টে ছোলেমানের কবল থেকে রক্ষা করল। লোকজনের ভিড় বাড়ল। মজা দেখতে অনেকে এগিয়ে এল। সাবধানীরা দশ হাত দূরে পালাল। লোকের পায়ের চাপে ছোলেমানের মাছের ডালা চুবড়ি, মেজকত্তার খালুই একসঙ্গে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এদিক ওদিক ছড়ালো মাছ, কিছু পায়ে পায়ে থেঁতলে গেল। কিছু গেল লোকের হাতে হাতে।

একটু দূরে, একটা পাগল গাছের ডালে সর সর করে উঠে গিয়ে নাচতে নাচতে বগল বাজাতে লাগল, লাগ্ ভেলকি লাগ্, ঘুরে ফিরে লাগ্, কার আজ্ঞে, বাবা নারদের আজ্ঞে।

এক সময় পা ফস্কে পড়ে গেল পাগল। তখন সেদিকে সোরগোল উঠল। কিছু লোক দৌড়ল সেদিকে, কিছু লোক ভাগল।

রামকিষ্টো দু হাতের জোরে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে যখন মেছোহাটায় এল, তখন ছোলেমানের অবস্থা বেশ খারাপ। মারের চোটে তার কপাল ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে। দুটো যমদূতের মত পেয়াদা তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলেছে বিশ্বেসদের দোকানে। নিরাপদর গাল ফুলে গেছে, নেশাও ছুটেছে। সে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। আর পেয়াদা দুজনের আগে আগে যাচ্ছে। ছোলেমান পাথরের মূর্তির মত চুপ করে আছে। তার চোখ দিয়ে শুধু আগুন ছুটছে।

বিশ্বেসদের দোকানের সামনে ভিড় আর ধরে না। পেয়াদা দুটো ছোলেমানের হাত গামছা দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে রেখেছে।

নিরাপদ কাঁদতে কাঁদতে নালিশ করল, ছোলেমান তোলা দিতে চায় নি। সে অতি ভদ্রভাষায় বলেছে, তোলা না দিলে হাটের মালিকের চলবে কী করে!

তার উত্তরে ছোলেমান অশ্রাব্য ভাষায় বাপ-মা তুলে গালাগাল দিয়ে তাকে বেদম মেরেছে। পেয়াদা দুটো না থাকলে আজ নিরাপদর হয়ে যেত।

শোনামাত্র বুদো ভুঁয়ে চেঁচিয়ে উঠল, কী, না'ড়ে হয়ে বামুনের গায়ে হাত তোলা, এত বাড় বাড়েছে না'ড়েরা! দেশে আর বাস করা যাবে না দেখছি! গুপাল, এর নেহ্য বিচার তুমার করতি হবে।

গোপাল নিরাপদর নালিশ শুনেই ঘটনার মধ্যে মেদ্দা ব্যাটার উস্কানি আবিষ্কার করে ফেলেছে। নইলে সামান্য নিকিরি তোলা দিতে অস্বীকার করে! এত সাহস পায় কোথায়!

গোপাল নেমে এসে হুঙ্কার দিল, শালা, তুমি ভাবিছ, বড় গাছে দড়া বাঁধিছ, না? নিরাপদ, মার্ শালার মুখে দশ ঘা জুতো।

ছোলেমান বলতে গেল, বাবু—

বুদো ভুঁয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, চোপ শালা।

সে কথা শোনামাত্র নিরাপদ বীরবিক্রমে এক পাটি জুতো তুলে নিয়ে পটাপট মারতে লাগল ছোলেমানের মুখে। একটা কথাও বলল না ছোলেমান। কোনও প্রতিবাদ করল না।

মেজকর্তা এসে মাঝপথে নিরাপদকে থামিয়ে দিলেন। তার মুখ চোখ থমথম করছে।

গোপালের দিকে চেয়ে শুধু বললেন, গোপাল, ওকে ছেড়ে দিতে বল। বিচার করে সাজা দিও। ন্যায়-অন্যায়ের বিচার গরম মেজাজে করা যায় না। সময় লাগে।

মেজকর্তার গলার স্বরে কী ছিল কে জানে, গোপাল তাঁর কথা অমান্য করতে পারল না। ছোলেমানকে ছেড়ে দিতে হুকুম দিল।

ছোলেমান ছাড়া পেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল।

মেজকর্তা বললেন, যা, বাড়ি যা।

ছোলেমান মেজকর্তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইল। তার চোখ দুটো টলটল করে উঠল। কী একটা বলতে গিয়ে বলল না। নিদারুণ অপমানে লজ্জায় মুখ নিচু করে তপ্ত গনগনে মন আর জর্জরিত দেহ টানতে টানতে ভাঙা হাটের ভিড়ে মিশে গেল।

তেরো

দুই ভাই মুখোমুখি বসে ছিলেন। অনেকক্ষণ। কথা ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন বিশ্রাম। দুপুর-গড়ানো রোদ এখন আলস্য ঢালছে। মেয়েদেরও হেঁসেলের পাট চুকে গেছে। ঘরে ঘরে তারা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে।

দুই ভাই শুধু বসে আছেন মুখোমুখি। বড়কর্তা স্বভাবতই কৃশ। সম্প্রতি ম্যালেরিয়া তাঁকে আরও কাবু করেছে। তাঁরও মাথায় টাক, তবে সে শুধু চাঁদিটুকুতে। তারপরেই বেশ চুল আছে। যাত্রাদলের রাজমন্ত্রীরা যে ধরনের পরচুলো মাথায় পরে, অনেকটা সেই ধরনের। কানেও উঁকি-মারা চুল এবং বুকে লোমের বাহার। সবেতেই পাক ধরেছে।

বড়কর্তা চুপচাপ বসে বুকের খাঁচায় পুরনো ঘি ডলতে লাগলেন। শ্লেষ্মা কুপিত হওয়ায় কদিন ধরে বড় কষ্ট পাচ্ছেন। রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে।

কিন্তু সেই কারণে বেশী ভাবছেন না বড়কর্তা। শরীর থাকলেই আধি-ব্যাধি থাকবে। শরীর ব্যাধির মন্দির। যত বয়স বাড়বে ততই পাড়ু হবেন রোগে। হতেই হবে, এ তো জানা কথা। না, সেজন্যে ভাবছেন না বড়কর্তা। তিনি ভাবছেন, হাজরাহাটির সাত বিঘে জমির কথা। বড় ভাল আমন জমি। রাখতে পারলে বছরে অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ মণ চাল ঘরে উঠত। কিন্তু ও-জমি রাখা যাবে না। এই বয়সে, এই শরীরে, ছয়-সাত মাইল ঠেঙিয়ে ওই জমিতে চাষের তদারক করা আর পোষায় না। না, আর নিজে না দেখলে কি চাষ ওঠে?

তিন-চার বছর ধরে কাহিল হয়ে পড়েছেন বড়কর্তা। তেমন চলাফেরা করার তেজ ফুরিয়ে এসেছে তাঁর। তাই যে মুহূর্তে ঢিল দিয়েছেন তিনি, সেই মুহূর্ত থেকে চারিদিকে ছড়ানো জমিজমা বাপের বেয়াড়া ছেলের মত ব্যবহার শুরু করেছে। আয়ত্তে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে ক্রমশ। আয় কমে আসছে সংসারের। বড়কর্তার ক্ষমতা যতদিন অটুট ছিল, ততদিন সংসারের চাকা গড়গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়েছে। কাউকে কিছু ভাবতে হয় নি।

ভাবনা-চিন্তার ছোঁয়া ভাইয়েদের গায়ে যাতে না লাগে প্রাণপণে সে চেষ্টা তিনি করে এসেছেন। বুড়ীর বিয়েতে দেনা করতে হয়েছে, ছোট বউয়ের চিকিৎসাতেও দেনা জমেছে, দেনা করেই তো পৈতৃক দুর্গোৎসব চালিয়ে যেতে হচ্ছে। তার খবর সামান্য কিছু মহি জানে, পুরো জানেন তিনি, আর জানেন বুড়ো মকর বিশ্বেস।

মহি হুট করে কলকাতায় পড়া ছেড়ে দিয়ে এল, এম. এ-টা আর পড়ল না। গ্রামে এসে ইস্কুল খুলল বিনা পয়সায়। ছোটলোকদের উন্নতি নিয়ে মেতে উঠল। জাতিভেদ উঠিয়ে দেবার জন্য কোমর বেঁধে লেগে পড়ল। বছর দুয়েক গ্রামে ছিল। কী বক্তৃতাটাই না করেছে! শুধু বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালে হয়তো অতটা হৈ-চৈ উঠত না। যা ও তখন বলেছে, তা কাজেও করেছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাঁড়াল মুচি ডোমের হাতের জল খেয়েছে। মুসলমানের রাঁধা খাদ্য খেয়েছে। বাবা বেঁকে দাঁড়ালেন ওর কাজে, সমাজ মার মার করে উঠল। রটে গেল, মহি বেহ্ম হয়েছে। কলকাতায় নাকি এক বেহ্ম-মেয়ের সঙ্গে বিয়েও ঠিক করে এসেছে। কিন্তু কোথায় কী? বেহ্ম-মেয়ে নয়, বাবার ঠিক-করা পাত্রীকেই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করল মহি। তিক্তবিরক্ত হয়ে একদিন গ্রামও ছাড়ল। বার্কমায়ার কোম্পানিতে সামান্য চাকরি জুটিয়ে ডোমার রওনা দিল। কলকাতায় গেল না কেন, সে এক রহস্য। সেখানে গেলে একটা ভাল চাকরিই পেতে পারত। ছেলে তো সে ভাল।

অবশ্য কলকাতায় গেলেও গ্রাম ছাড়তে হত। ডোমার গিয়েও তাই করেছে মহি। বাবা মধুপুরের সাহেবকে ধরে শীতলকে দিলেন পুলিসে ঢুকিয়ে। আর সংসারের বড় ভারী জোয়ালটা দিলেন তাঁর কাঁধে চাপিয়ে। সেই জোয়ালই তিনি এতদিন টেনে এসেছেন সাধ্যমত। টেনেছেন মুখ বুজে। এখন বড় ঠেকে পড়েছেন।

শুধু শরীরের দিক থেকে নয়, মনের দিক থেকেও ঠেকে পড়েছেন বড়কর্তা। এখন কেবল মনে হয়, হিসেবে বুঝি ভুল হয়ে গিয়েছে। জমির উপর জোর না দিয়ে ব্যবসা-ট্যাবসায় মন দিলেই ভাল হত হয়তো। মকর আর তিনি তো একই বয়সী, একই সঙ্গে জীবন আরম্ভ করেছেন, অথচ দেখ, শেষ বয়সে মকর কী জমাল আর তিনি কী জমাতে পারলেন!

যে ভাবনাটা তাঁর এখন হচ্ছে, সেটা জীবনের শুরুতেই কেন ভাবেন নি? এখন বড় আপসোস হয় তাঁর।

জমিদারি করবার সাধ কখনও মনে জাগে নি তাঁর। তবু-যে জমির পিছনে ছুটেছেন সারাজীবন, সে শুধু নিশ্চিন্তে অনায়াসে দুধে-ভাতে থাকবার লোভে। ক্ষেতের ধানের ভাত খাব, বাড়ির পুকুরের মাছ খাব, নিজের গোয়ালে গরু থাকবে, সেই গরুর দুধ খাব, আর বারবাড়িতে শতরঞ্চি বিছিয়ে দাবা পাশা খেলব; কোন ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে যাব না—এই ছিল আশাটা। সে আশা যে মরীচিকা, সে আশা কুহক স্বপ্ন, তা তো জানা ছিল না আগে। যখন জানা গেল, তখন বেড়াজালে ভয়ানক জড়িয়ে পড়েছেন বড়কর্তা। জাল কেটে বেরিয়ে আসবার আর উপায় নেই।

ধীরে ধীরে অনেক কিছুই শিখলেন। বুঝলেন, ভদ্র গৃহস্থ যারা, নিজে হাতে লাঙল ঠেলতে যারা পারে না, পারবেও না, তারা যদি গৃহস্থালি রাখতে চায় তবে তাঁদের দয়া ধর্ম ভদ্রতা বিসর্জন দিতে হবে। কিষাণকে এমনভাবে দাবিয়ে রাখতে হবে, যাতে সে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে না পারে। চোখে-ঠুলি-বাঁধা কলুর বলদের অবস্থায় চাষীকে নিয়ে যেতে না পারলে, ও হারামজাদাদের কাছ থেকে আর কাজ পাওয়া যাবে না। বড়কর্তার নরম মন, তিনি কখনই পুরো পাওনা আদায় করতে পারেন নি তাঁর প্রজা-চাষীদের কাছ থেকে। তাঁর ভদ্রতা, তাঁর মমত্ববোধের সুযোগ নিয়ে প্রচুর ঠকিয়েছে তারা বড়কর্তাকে। শয়তান, আস্ত শয়তান সব। মহিটা পাগল, এইসব স্বার্থসর্বস্ব কুটিল লোকগুলোর হিত করবার আশায় সময় নষ্ট করেছে। মহির ধারণা, চাষা ব্যাটারা খুব সরল, এক-একটা ধোয়া তুলসীর পাতা! হুঁঃ!

এখনকার বড়কর্তা যেন সেই আগের আমলের নাবালক বড়কর্তাকে সেরেস্তার কাজ বুঝাতে বসলেন। তোমার নিজের যদি কিষাণ থাকে তবে তাকে এমনভাবে রাখ, যাতে সে পুরো-পেট খেতে না পারে, তার পেটে ক্ষিধের আগুন জ্বলতে থাকলে সে আরেকবার খাবার আশায় তোমার কাজটি হাসিল করে দেবে। পেট ভরে খেতে দিয়েছ কী মরেছ। সে তখন একটু গড়াতে চাইবে, বসে বসে তামুক পোড়াবে, দু-চারটে খোসগল্প করে সময় নষ্ট করবে। যদি ভাগচাষে জমি কর, তবে দেখ, চাষীর ঘরে যেন ছিঁটেফোঁটাও বাড়তি খাবার না থাকে। ঋণের দায়ে সে যেন আষ্টেপৃষ্টে তোমার কাছে

বাঁধা থাকে। তবে চাষীর জাত শায়েস্তা হবে। তবে তোমার গোলা ভরবে। বুদো ভুঁয়েকে দেখ, সরকার মশাইদের ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্য কর। তোমার চেয়ে অনেক কম জমি বুদো ভুঁয়ের, অনেক খারাপ জমি সরকার মশায়ের, কিন্তু তারা চাষীদের চিনেছে, ঠিক চিনেছে, ভদ্রতা ছাড়তে পেরেছে, পেরেছে বলেই ধান খন্দ তাদের গোলা থেকে উপচে পড়ছে।

কিন্তু বড়কর্তাকে তার গৃহস্থালি ভাসিয়ে দিতে হচ্ছে, কারণ তিনি লোকটি বড় ভদ্র। দয়ামায়াটা তিনি ছাড়তে পারেন নি। খাতকরা তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার নেয়, তিনি সে টাকা সব সময় আদায় করতে পারেন না। সময় বুঝেই যেন ব্যাটাদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে, আর এমনই খারাপ হয় যে, নিতান্ত পাষাণ হৃদয় না হলে টাকার কথা উচ্চারণই করা যায় না। বেশ, অসময়ে না হয় টাকা দিতে না পারলি, সময়ে শোধ দে। তখন কোন ব্যাটার টিকিও দেখা যায় না। ভাগচাষীরা বীজ নিয়ে যায়, সারের টাকা নিয়ে যায়, অথচ পারতপক্ষে তাঁর জমি চষে না। বীজ, সারের টাকা খেয়ে ফেলে। তারপরে এসে পায়ে ধরে। বদমায়েসগুলো জানে গ্রামের মধ্যে এই একটা মানুষ আছে—বড়কর্তা, পা জড়িয়ে ধরতে পারলেই যার কাছ থেকে মাফ পাওয়া যায় সব অপরাধের।

আর কৃতজ্ঞতার বদলে এই সব চাষী তাঁকে ধান দেয় না, কলাই সরষে দেয় না, তবে কী দেয়? দেখা হলেই সেলাম দেয়, দেবতার মত খাতির করে। ভাগের ভাগ ফসল কড়ায় ক্রান্তিতে শোধ দেয় তাদেরই, যারা নাদনা উঁচিয়ে বসে থাকে, দেনা-পাওনায় কড়া-ক্রান্তি কারচুপির চেষ্টা করলে যারা বুকে বাঁশ ডলে তা আদায় করে নেয়, যাদের ওরা দুবেলা গাল না দিয়ে জল খায় না। এই আমাদের চাষী!

এসব জানা সত্ত্বেও জমির কুহকে ভুললেন কেন বড়কর্তা? কেন শুধু জমির পর জমিই কিনে চললেন? ভুল ভুলই। হয়তো ভেবে থাকবেন, জমির পরিমাণ বেশী থাকা ভাল। কিছু কিছু করেও ফসল যদি সব জমি থেকে আসে তা হলে ওই যে যাকে 'রাই কুড়িয়ে বেল' বলে তাই হতে পারে।

আজ বুঝছেন, সে হিসেবেও ভুল হয়েছে তাঁর। তাই কয়েক বছর ধরে জমি বেচতে শুরু করেছিলেন। দূরের দূরের জমিই বেচে দিচ্ছেন প্রথমে। দিয়ে দেনা শোধ করছেন।

হাজরাহাটির এই জমি মহির টাকায় কেনা। বড়কর্তা জানেন, মহি এসব

ব্যাপারে তাঁর কথায় উপর কথা বলবে না। তবু যে তাঁর মতামত জানতে চাইছেন সে জমিটা মেজকর্তার টাকায় কেনা হয়েছে বলে নয়, মেজকর্তা বাড়িতে আছেন বলেই। বড়কর্তার সিদ্ধান্তের কোন প্রতিবাদ মেজকর্তা করেন নি।

কথাবার্তা চুকে গিয়েছে। দুই ভাই মুখোমুখি বসে আছেন চুপ করে। বড়কর্তা বুকে পুরনো ঘি সমানে ডলে যাচ্ছেন। তার দুর্গন্ধে ঘরের দুপুর ভারী হয়ে উঠেছে। একটা জলচৌকির উপর তামার টাটে কতকগুলো পুরু পুরু আকন্দপাতা পড়ে আছে। পুরনো ঘিটুকু ডলা শেষ হলে হলে ওগুলোর কাজ শুরু হবে।

বড়কর্তা ঘড়ঘড় করে কেশে উঠলেন। বুকের খাঁচাটা কাশির দমকে ফুলে ফুলে উঠে আবার চুপসে গেল। বড়কর্তার অর্শের ব্যথাটায় চাড় লাগায় জায়গাটা দপ দপ করতে লাগল। কী রকম একটা বিরক্তি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। ঘি ডলে ডলে হাতটাও ধরে এসেছে।

মেজকর্তা আগুনের মালসাটা চুপিসাড়ে টেনে নিলেন। একটা আকন্দের পাতা আগুনের আঁচে গরম করে বড়কর্তার হাতে দিলেন।

বললেন, হয়েছে, এবার সেঁক দিতে থাকুন।

বড়কর্তা হাত বাড়িয়ে গরম পাতাটা নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন। একটা কাশির বেগ এল, কিন্তু কাশিটা এবার চাপতে পারলেন বড়কর্তা। চাপতে পেরে খুশীই হলেন। আকন্দের তাতটায় বেশ আরাম লাগছে।

কারও মুখে কথা নেই। দুজনে শুধু বসে থাকলেন মুখোমুখি।

জমিজমার ব্যাপারে মেজকর্তা কোনদিনই কোন কথা বলেন নি, আজও বললেন না। ও-জিনিস তাঁর মাথায় একদম ঢোকে না। বড়কর্তা যা বললেন তিনি নিঃশব্দে মাথা নেড়ে তাতেই সায় দিয়ে গেলেন। সব না জানলেও এটা তিনি জানেন, সংসারের মাথায় একটা বিরাট দেনার বোঝা চেপে আছে।

চাকরিটা ছেড়ে এলে এক থোক টাকা পাওয়া যাবে কোম্পানির কাছ থেকে। একটু বুঝে চলতে পারলে সুধাময়ের রোজগার পর্যন্ত ওই টাকায় চালানো যেতে পারবে। অবশ্য আর-একটা খরচ আছে, চাঁপার বিয়ের। তার এখন দেরি আছে, বছর তিন-চার তো বটেই। তার মধ্যে

সুধাই দাঁড়িয়ে যেতে পারবে। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে সুধাময়। ফাইন্যাল দেবে এ বছর। কটা দিন আর!

সুধা খুব বুদ্ধিমান ছেলে, তার জন্য মেজকর্তার কোন দুর্ভাবনা নেই।

মেজকর্তার মনে দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে অন্য কারণে। গহর এসে আজ সকালে যে খবর দিয়েছে, সেটা মোটেই সুবিধের নয়। তখন থেকে তিনি সেই কথাটাই ভাবছেন।

ছোলেমানের ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াবে। কতদূর যেতে পারে, মেজকর্তা সেই কথাই ভাবছিলেন।

গোপালের নির্দেশে নিরাপদ দশজনের সামনে ছোলেমানকে যখন জুতোর বাড়ি মারছিল, মেজকর্তার চোখে তখন জুতো মারার বর্বরতাটাই খুব প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছিল। ছোলেমান কোনও অপরাধ করেছে কি করে নি, সেটা তিনি জানেন না। সেটা তাঁর কাছে বড় বলে মনে হয় নি। একটা অত্যন্ত বর্বর পদ্ধতিতে একটা মানুষকে অপমান করা হচ্ছে, দশজনের সামনে প্রবল পক্ষ জুতো মারছে দুর্বল একজনের মুখে, এইটেই তাঁর কাছে বড় হয়ে ফুটে উঠেছিল। তাই তিনি গোপালের কাছে আবেদন করেছিলেন ছোলেমানকে নিষ্কৃতি দিতে। বলেছিলেন, বিচার করে সাজা দিতে। গোপাল এক অর্থে তাঁর দুটো অনুরোধই রক্ষা করেছে। তৎক্ষণাৎ ছোলেমানকে মুক্তি দিয়েছিল সে। এবং পরে সে ছোলেমানকে সাজাও দিয়েছে, বিচার করেই দিয়েছে। নিরাপদ অভিযোগ করেছিল, ছোলেমান তোলা দিতে অস্বীকার করেছে, আর হাটের ইজারদারের গোমস্তাকে মেরেছে। দুজন পেয়াদাই একবাক্যে হলপ করে সাক্ষী দিয়েছে, নিরাপদর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। এবং যেহেতু দুটো অপরাধই গুরুতর, গোপাল তাই বিশেষ বিবেচনাপূর্বক ছোলেমানকে নামমাত্র সাজা দিয়েছে, ও-হাটে ছোলেমান আর বসতে পারবে না।

মেজকর্তা ভাবছিলেন, বর্বরতার যা সংজ্ঞা, গোপালের বিচারকে তার মধ্যে ফেলা যায় কিনা? অনেক ভেবেও এটাকে বর্বর বলতে তিনি পারলেন না। একেবারে খাঁটি সভ্য জগতের বিচার করেছে গোপাল। ইংরেজের আদালতেও অনেক সময় এমন সূক্ষ্ম বিচারই ঘটে থাকে। মেজকর্তার আর-কিছু বলার মুখ রাখে নি।

কিন্তু এই বিচারে নিকিরিকুল ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে। ওরা দরবার

করতে গিয়েছিল গোপালের কাছে। গোপাল ওদের হাঁকিয়ে দিয়েছে। এখন নিকিরিরা একজোট হয়ে বলছে, বিনাদোষে ছোলেমানকে মারা হয়েছে, ওর মাছ নষ্ট করা হয়েছে, ওকে অপমান করা হয়েছে, আবার ওকেই সাজা দেওয়া হল। বেশ বিচার বটে!

গহর এসেছিল এই ব্যাপারে মেজকর্তাকে মধ্যস্থ মানতে। মাজেবাবুর উপর ওদের পাড়ার সকলেরই নাকি অগাধ বিশ্বাস। তিনি নাকি কারও পক্ষ টেনে কথা বলবেন না। সাক্ষীসাবুদ ডেকে তত্ত্বতালাশ নিয়ে যে রায় মাজেবাবু দেবেন, গহররা মাথা নিচু করে তা মেনে নেবে।

মধ্যস্থ হতে মেজকর্তা রাজী হন নি। গহর ক্ষুণ্ণ মনে চলে গিয়েছে। মেজকর্তা গহরকে বোঝাতেই পারেন নি যে, এক পক্ষের আস্থা থাকলেই মধ্যস্থ হওয়া যায় না, মধ্যস্থতা করতে গেলে দু পক্ষের আস্থাই দরকার। গহররা যেন এমন লোককে সালিশ মানে যার কথা দু তরফেই মানবে।

বলাই বাহুল্য, গহর খুশী হয় নি এ কথায়। কী ভাবল কে জানে? এ কথা ভাবল না তো, বিরোধটা গোপালের সঙ্গে লেগেছে বলেই মেজকর্তা কৌশলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। ভাবল কি তাই? মনটা খচখচ করতে লাগল তাঁর। বুড়ো হলে মানুষ অনেক ভীতু হয়। এ কথাও তো গহর ভাবতে পারে। কিন্তু এটাই বা কী এমন সান্ত্বনার বাক্য! নিজের উপর মেজকর্তা বিরক্ত হলেন। সঙ্কটের মুখে যে হাল ধরতে না পারে তার আবার বড় বড় কথা বলার সাধ কেন? নিজেকেই তিরস্কার করলেন মেজকর্তা।

গহর যাবার সময় বলে গেল, ছোলেমানের অপমান, তাদের সকলের অপমান বলেই তারা ধরে নিয়েছে। তিল থেকেই ব্যাপারটা আবার তালের আকার না ধরে?

বেলা পড়তেই বুদো ভুঁয়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির।

বলল, এই যে মাজে খুড়ো, আপনি নাকি গহররে কয়েছেন, গুপালের বিচার অন্যায় হয়েছে। ন্যায্য বিচার না হলি তুমরা ওর হাটে বস না।

বুদো ভুঁয়ের কথা শুনে মেজকর্তার আপাদমস্তক জ্বলে গেল। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করলেন। পাছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলেন, তাই চুপ করে থাকলেন।

বুদো ভুঁয়ে বলল, গুপালের গোমস্তার অপমান করাউ যা, গুপালের

অপমান করাউ তাই। ও একই কথা। তুমি যার খাবা তার বুকি বসে দাড়ি উপড়াবা, এ তো হয় না। আর বিচারডা এমন অনেহ্যই বা কী হয়েছে, যারে জেলে পাঠানো উচিত ছিল, তারে হাটে বসতি বারণ করা হয়েছে। আমি আরউ গুপালরে কলাম—গুপাল, হারামজাদা খুনেটারে এত অল্পে ছাড়ে দিলে? বিট্টা নাড়ে, বামুনের গায়ে হাত তুলিছে! এত বড় আস্পর্দা! এই সুযোগে বিটার বিষ দাঁত কটা ভাঙ্গে দেওয়া যাতো। তা গুপাল কলো—দাদা, ওগের মত একতা আমাগের যদি থাকত তো ছ্যাখতেন, কী কত্তাম। মাজে খুড়ো বোধ হয় আমার উপর সেদিন একটু অসন্তুষ্টই হয়ে গেছেন। আমি কলাম—আরে না না, উডা তুমার ভুল। আজ আবার এই কথা শুনছি। বলি ব্যাপারডা কী?

মেজকর্তা বিরক্তি চেপে বললেন, গোপালের চোখ তোমার চেয়ে দেখি ভালই। এখন দেখছি, শুধু চোখ না, তোমার কানেও দোষ আছে।

মেজকর্তার কথার ধরনে, বুদো ভুঁয়ের উৎসাহ খানিকটা নিবে গেল।

একটু থতমত খেয়ে বলল, ক্যান খুড়োমশাই, আমার কানের দোষটা ছ্যাখলেন কিসি?

মেজকর্তা বললেন, আমি যে গহরকে ও-কথা বলেছি, তা তুমি শুনলে কার কাছ থেকে? গহর তোমাকে বলেছে?

বুদো ভুঁয়ে এতক্ষণে জোর পেল।

বলল, গহরের মুখির থে আমার শুনতি হবে ক্যান? গহর কি আমার মিতে, না গুরুঠাউর? আমি যে কথা কলাম, তা বাজারের সবাই জানে। আপনি কী কতি চান, বাজার সুদ্ধ সবারই কানের দোষ হয়ে গেল?

মেজকর্তা এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না। সম্ভবত একটু বিব্রতই বোধ করলেন। আবার কি সবাই তাঁর বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে নাকি? তাঁর সঙ্গে সবার লড়াই শুরু হবে নাকি আবার? কিন্তু কেন? এবার তাঁর অপরাধ কী? আর তো কারও ভাল করবার বাসনা তাঁর নেই? তাঁর মাথার সেই পোকা মরেছে। তাঁর যৌবনও ফুরিয়েছে। এখন তো তিনি একটা হাঁটু-ভাঙা দ।

না না, আর-কারও সঙ্গে বিরোধ নয়, আর কোন ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নয়। এবার তিনি নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে চান কটা দিন। শেষের কটা দিন নিরুপদ্রবে এই গ্রামেই, একটা পরিচিত তাঁর অত্যন্ত আপন গণ্ডির মধ্যেই

কাটাতে চান। যতদিন তেজ ছিল তাঁর, যৌবন ছিল, অফুরন্ত বল ছিল মনে, ততদিন এই গ্রামের বিরুদ্ধে তাঁর একটা প্রবল অভিযোগ ছিল, এককালে তীব্র বিদ্বেষও ছিল। ভেবেছিলেন, আর কখনও পা দেবেন না গ্রামে। ডোমারকেই আপন করে নেবেন। কিন্তু বয়স যখন বাড়ল, স্ত্রীর মৃত্যু হল, তখন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, এতদিন যেখানে কাটালেন, সেটা নিতান্তই বিদেশ। সেখানে তাঁর কোন শিকড় নেই। জন্মসূত্রে যে মাটিতে তিনি বাঁধা পড়েছেন, সেই তাঁর আপন মাটি। একা, সম্পূর্ণ একা, বিদেশে আর থাকতে ভাল লাগে না। তাই তো ঠিক করেছেন, গ্রামেই এসে বাস করবেন।

এখন বুদো ভুঁয়ের কথা শুনে মেজকর্তা তাই কিছু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

মেজকর্তা বললেন, বাজারে কী রটেছে, তা আমি জানি নে। তুমি যা বললে সেই কথাই যদি রটনা হয়ে থাকে, তা হলে শোন, আমি ওর একটা বর্ণও বলি নি।

কথাটা বলেই মেজকর্তার মনে হল, তিনি কি কৈফিয়ৎ দিতে বসলেন নাকি? কে কী মিথ্যে কথা রটিয়ে বেড়াবে আর তার জন্য তাঁকে যার-তার কাছে জবাবদিহি করতে হবে? কেন, কী এমন চোরের দায়ে ধরা পড়েছেন তিনি? তা ছাড়া, কে এই বুদো? একটা অর্বাচীন, অশিক্ষিত গ্রাম্য গোঁয়ার। ওর আস্পর্ধাও তো কম নয়। হঠাৎ দপ্ করে রাগ চেপে গেল তাঁর। ইচ্ছে হল, তক্ষুনি উঠে চলে যান বুদো ভুঁয়ের সামনে থেকে।

বুদো ভুঁয়ে তৎক্ষণাৎ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। মেজকর্তার জবাব শুনে এক-গাল হেসে ফেলল সে।

বলল, খুড়োরে কি আমি চিনি নে! আমি কথাডা শুনা মাত্তর গুপালরে কয়ে দিছি, মাজে খুড়ো এ ধরনের কথা কওয়ার লোকই না। গুপালের অপমান যে আমাদের সবারই অপমান, সে-কথা মাজে খুড়ো জানেন। আমারে কয়েছেন তিনি।

মেজকর্তা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, সে-কথা আমি আবার কখন বললাম?

বুদো ভুঁয়ে চোখ টিপে বলল, আহা, আপনি কবেন ক্যান? আপনার জবানিতি আমিই গুপালরে কইছি। কথাডা তো মিথ্যে নয়। গুপাল এখন

আমাগের সমাজের মাথা। ওর মান-অপমানে আমাদের সকলেরই মান-অপমান।

মেজকর্তার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছিল ঠাস করে একটা চড় বুদো ভুঁয়ের গালে কষিয়ে দেন। কিন্তু তা পারলেন না। পারলেন না বলেই রাগের ঝাঁজটাও বেড়ে উঠল। আরেকবার ভাবলেন, ওটাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। তাও শেষ পর্যন্ত পারলেন না। বুদো ভুঁয়ে গ্যাট হয়ে তাঁর সামনে বসে রইল। তারপর স্থির করলেন, ও যা বকে বকুক, চুপ করে থাকাই শ্রেয়।

বুদো ভুঁয়ে বলল, অনেক খবরই রাখি। মেদ্দা উস্কোয়েছে নিকিরিগের। উরা নাকি আর হাটে বসবে না মাছ বেচতি। না বসলি তো ভারি ক্ষেতি। কোট ধরে কদিন থাকে দেখি। গুপাল বলেছে, অন্য জায়গার থে জালে আনবে হাটে। একটা পয়সা হাট-খাজনা নেবে না তাগের থে। দেখি মিঞাগের ত্যালানি কদ্দিন থাকে! তুরা আমাগের জাতে মারার চিষ্টা করিস, ইবার আমরা তোগের ভাতে মারব।

সর্বনাশ! এইসব মতলব চলছে নাকি! বলে কী বুদো!

মেজকর্তা বললেন, দেখ বুদো, তোমরা কি একটা হাঙ্গামা বাধাবে নাকি শেষ পর্যন্ত?

বুদো হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেজকর্তার মুখের কাছে।

জিজ্ঞাসা করল আওয়াজ চেপে, উরা কি সেই রকম উয্যুগ করতিছে নাকি? মেদ্দা বিটার মনের ইচ্ছেটা কী, কন দেখি মাজে খুড়ো?

মেজকর্তা হঠাৎ খুব শীতল হয়ে গেলেন। বললেন, দেখ বুদো, একটু হিসেব করে কথা বলতে শেখ। মেদ্দার মনের খবর তুমি আমাকে জিজ্ঞেস কর কোন্ সাহসে?

বুদো ভুঁয়ে বলল, আপনি আমার উপর রাগই করেন, আর যাই করেন, উচিত কথা কতি বুদো ডরায় না। গুপাল কয়, মেদ্দার হাঁড়ির খবর এই গিরামে শুধু এক মাজেবাবুই জানেন। তা সে তো মিথ্যে বলার লোক না। আপনার তো আমাগের সঙ্গে কোন ওঠবোস নেই, যা কিছু ওই মেদ্দার সঙ্গে। তা যাক গে সে কথা, উরা কি সত্যিই হাঙ্গামার জুগাড়যন্তর করতিছে নাকি? তা বাধাক না ইবার কাজিয়া, মুগুরির গুঁতো কারে কয় মিঞাগেরে বুঝোয়ে দিবানে।

মেজকর্তা এতক্ষণে বুঝলেন, জল অনেকদূর গড়িয়েছে। কিসের থেকে

কোন্ ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেল। মেজকর্তার মনের রাগ পড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। দুশ্চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

বললেন, দেখ বুদো, একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে তোমরা কী পাগলামি শুরু করলে! ছোলেমানের বিষয়টা তার চেয়ে একটা নিরপেক্ষ সালিশের হাতে তুলে দাও না। যারা নিজের চোখে ঘটনাটা দেখেছে তাদের সবাইকে ডেকে, বেশ করে খোঁজখবর নিয়ে, একটা বিচার হোক। সাজা যার প্রাপ্য, সে পাক।

বুদো ভুঁয়ে এবারে বেজায় উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, ব্যাপারটা আপনি যত তুচ্ছু মনে করতিছেন, তত তুচ্ছু নয়। এর ভিতরে অনেক বড় জিনিস লুকোয়ে আছে। আপনি তা জানেন না। হয়তো বোঝবেনও না। মাজে খুড়ো, এই গিরামে আপনার জন্ম হতি পারে, তবুও আমি কব, আপনি এখেনে বিদেশীর মতনই নতুন। আপনি যদি আমাগের সমাজের লোক হতেন তো বোঝতেন, আমাগের মনে কী আগুন জ্বলতিছে। যারা চিরকাল পায়ের তলায় ছিল, তারা যখন দল পাকিয়ে চোখ রাঙ্গাতি আসে, তখন বুকি অপমানের শেল যে কেমন জোরে বাজে, তা আপনি কী করে বোঝবেন? জমির খাজনা চালি যখন চোখ পাকায়, ফসলের ন্যায্য ভাগ চালি যখন ন্যায্য অন্যায্যর বিচার করতি চায়, আমাগের মেয়েদের ধরে ধরে নিয়ে যায়, তখন বুকি যে কী আগুন জ্বলে ওঠে, তার আঁচ আপনি টের পাবেন কী করে? যদি পাতেন তালি আর ইটারে তুচ্ছু, বলে উড়োয়ে দিতি পারতেন না। ভাবে ছাখেন, দিনকাল কতদূরি গড়ায়েছে? নিকিরির ব্যাটা ছোলেমান, হারামজাদার বাড় কতদুর বাড়েছে, সে নিরাপদর গায়ে হাত তোলে! আর আপনি ইটারে কন তুচ্ছু! আপনার কাছে তুচ্ছু হতি পারে, আপনি জাত মানেন না, আমাগের সমাজের পরোয়াও করেন না। করলি ওগের মোড়ল, ওই ভেড়ার দলের বাছুর পরামানিক, ওই মেদ্দার ওখানে বসে অম্লানবদনে চা খাতি আপনার বাধত, ওগের পক্ষ টানে কথা বলতিও পারতেন না। আমাগের মনে আগুনের ছ্যাঁকা অনেক আছে। ছোট ছ্যাঁকাতেও পোড়ে, বড় ছ্যাঁকাতেও পোড়ে। কোনটাই তুচ্ছু নয়।

বুদো ভুঁয়ে একটু গরম হয়েই উঠে পড়ল। মেজকর্তা লেখাপড়া জানেন। বুদো ভুঁয়ে তাই শ্রদ্ধা করত তাঁকে। সেই শ্রদ্ধার ভিতে ফাটল ধরেছিল ইদানীং, আজ বেশ নড়ে উঠল। একটা কাপুরুষ, ভেকধারী বুড়ো। মেদ্দার

চরও হতে পারে। ঘর-শত্রু বিভীষণ। লেখাপড়া শেখার এই পরিণাম! দূর দূর! তাঁর স্বর্গত পিতা যে তাকে লেখাপড়া শেখান নি, সেই কৃতজ্ঞতায় তাঁর নিরাকার পায়ে ভক্তিভরে প্রণাম জানালেন মনে মনে।

বুদো ভুঁয়ের পেটে যে এত কথা থাকতে পারে, এমনভাবে যে সে তা বলতে পারে, সেটা আশা করেন নি মেজকর্তা। বুদো ভুঁয়ের সম্পর্কে তাঁর ধারণা কিছু বদলাল। বুদোর অভিযোগ হয়তো অস্পষ্ট, কিন্তু ওই সব অভিযোগ যে বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছে তার মনে তা অতি সুস্পষ্ট। বুদো ভুঁয়ের যা নালিশ, তা এ গ্রামের প্রায় সকলের, বিশেষ করে মাতব্বরদের নালিশ। খাতকরা টাকা দিতে চায় না, চাষী তাদের পরিশ্রমে চাষ-করা ফসলের ভাগ অন্যের হাতে তুলে দিয়ে ফতুর হবার সময় অসন্তোষ জানায়, কিছু দুর্বৃত্তস্বভাবের লোক কখনও কখনও নারীহরণ করে, তাদের উপর অমানুষিক বর্বরোচিত অত্যাচার করে। এ সবই সত্যি। এই গ্রামের, এই মহকুমার, এই জেলার অধিকাংশ চাষীই মুসলমান। তাই অধিকাংশ অপরাধে মুসলমানরাই অপরাধী। মেজকর্তা জানেন, এটাও সত্যি। মেজকর্তার একটা কথা মনে হল, মনে হল যেখানে মুসলমান নেই, সেই সব জায়গাতেও যে এই একই ধরনের অপরাধ (বুদোর চোখে যেগুলো গুরুতর অপরাধ বলে মনে হয়) ঘটে বুদো যদি তার খবর রাখত, তা হলে সে এত জোরে কার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করত?

সফীকুলের কথা মনে পড়ল মেজকর্তার। সফীকুলের প্রবল নালিশ হিন্দুদের বিরুদ্ধে। তার ধারণা, সরকারী চাকরির সব ধান হিন্দু-বুলবুলিতে লোপাট করে দিচ্ছে, তাদের ভাগে আর-কিছুই জুটছে না। ব্যবসার সবটুকু শাঁস হিন্দুরা খেয়ে ফেলেছে, মুসলমান চাষীর মুখের গ্রাস খাজনার নামে সুদের নামে হিন্দুরা জবরদস্তি কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ছোলেমানকে অপমান করল নিরাপদ, তাকে সাজা দিল গোপাল। ন্যায় করুক আর অন্যায় করুক, তার দায় দায়িত্ব তো নিরাপদর আর গোপালের। কিন্তু গহর তা মানবে না। তার কাছে ছোলেমানও কেউ না, গোপাল নিরাপদও কেউ না। সে ধরে নিয়েছে, বিশ্বাস করেছে, মুসলমানের উপর অবিচার করেছে হিন্দু। বলা যায় না, হয়তো মেদ্দা ছাহেবও এই কথাই বিশ্বাস করেন। এরা এভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত, এই বিশ্বাস নিয়েই এরা জন্মেছে। মরতেও চায় বিশ্বাসের কোলে মাথা রেখে।

ছোলেমান আর গোপাল। দুজনে ছিল দুটো মানুষ। দুটো সুস্পষ্ট অবয়ব ছিল তাদের। তাদের ধরা যেত, ছোঁয়া যেত। কথা বলা যেত তাদের সঙ্গে। বলা যেত, গোপাল ছোলেমান অপরাধ করে নি। তোমার বোঝার ভুল হয়েছে। ছোলেমানকে ডাক। ভুল করে যাকে সাজা দিয়েছ তাকে কাছে ডেকে দুটো মিষ্টি কথা বল। তাকে বুঝিয়ে দাও, নিরাপদর গায়ে হাত তোলা তোমার উচিত হয় নি ছোলেমান। নিরাপদ অন্যায় করেছে তোমার মাছ ফেলে দিয়ে, তুমি এসে নালিশ করলেই পারতে। তোমার মাছের দাম আমি ওর কাছ থেকে আদায় করে দিতাম। ছোলেমান অমনি দোষ স্বীকার করত। অমনি হাত দুটো জোড় করে বিনীতভাবে বলত, হুজুর, কসুর হয়ে গিয়েছে, মাপ করে দিন। ওই মাছ কটাই ছিল সম্বল হুজুর, তার ওই দুর্দশা দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারি নি। ঘরে হুজুর উপোস চলছে। ছোলেমানের চোখ টলটল করে উঠত। ওরা যে এই স্বভাবের লোক। গোপাল, ওই কথা শুনে তোমারও বুক টনটন করে উঠত। নিরাপদকে তুমি ছি-ছি করতে। ব্যাপারটা ওইখানেই চুকে যেত। মানুষের দুঃখ মোচন করতে মানুষের আর কতটুকু সময় লাগে!

কিন্তু মানুষ যে মানুষ থাকতে চায় না। ভালবাসে নুনের পুতুল হতে। সমুদ্রের নোনা জলে মিলিয়ে যেতেই তার আগ্রহ প্রবল। তাতে প্রবল গর্জন সহজেই তোলা যায়। ঢেউয়ের গুঁতোয় অস্থির করে দেওয়া যায়। একটা নিরাবয়ব সমষ্টি সম্পর্কে নিদারুণ সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে তোলা যায় সকলের মনে।

তাই তো গোপাল আর গোপাল থাকল না। সে হিন্দু সমাজের বিস্তীর্ণ সমুদ্রের জলে নুনের পুতুলের মতই গলে গেল। ছোলেমানও মিলিয়ে গেল মুসলমান সমাজের মধ্যে।

মেজকর্তা জানেন, বিতর্কে বিশ্বাসের ভিত নড়ানো যেমন যায় না, তেমনি নুনের পুতুলকে যুক্তি দিয়ে বোঝানোও যায় না।

কিন্তু এখন কী কর্তব্য তাঁর?

বুদো ভুঁয়ে মিথ্যে বলে নি। এ গ্রামে তিনি অতিথি। আগে তাঁর এ কথা মনে হয় নি, এখন বুদো ভুঁয়ের চাঁছাছোলা কথা শুনে মনে হচ্ছে, সত্যিই তিনি এ গ্রামের কেউ না। কেউ না? এ তাঁর গ্রাম নয়? তবে

তিনি কোন গ্রামের লোক? মেজকর্তা সে-কথা জানেন না। তবে এটা বুঝেছেন, এ গ্রামের কেউ নন তিনি। কিন্তু কেন, কেন তিনি কেউ নন? এখানে কী তিনি জন্মান নি, এই বাড়ি কী তাঁর নয়? হ্যাঁ, তাঁরই। তবে?

গ্রাম কী শুধু একটা নিরেট বাড়ি আর একটুখানি জন্মাবার জায়গা? গ্রামের লোক, গ্রামের সমাজ, এদের নিয়েই গ্রাম। এরাই হল গ্রাম। এদের সঙ্গে যোগ কোথায় তাঁর? এখানকার সুখ দুঃখে কী বুদোর মত উদ্বেলিত হন তিনি? না। এখানকার ভাবনা চিন্তার শরিক কী তিনি? না। এদের সিদ্ধান্তে কী সায় দিতে পারেন তিনি? না না। তবে, এদের সঙ্গে তাঁর যোগ কোথায়? এই মাটিতে তাঁর শিকড় কোথায়?

মেজকর্তার মনে হল, সত্যিই তাঁর এখানে কোন শিকড় নেই। নেই বলেই এখানকার ঘটনাপ্রবাহে ভাসমান ভেলায় তাঁর ভূমিকা অসহায় এক যাত্রীর। ভাল মন্দ যা-ই কিছু ঘটুক না কেন, কোন কিছুরই মোড় ফেরাবার সাধ্য তাঁর নেই। বুদো ভূয়ের এই মাটিতে শিকড় আছে, শক্ত শিকড়। যতই মারাত্মক হোক, একটা ঘটনার সৃষ্টি সে করতে পারে। মেদ্দা ছাহেবও পারেন। কারণ ওরা সব নুনের পুতুল। নিজের নিজের সমাজের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে ওরা সহজেই গলে যেতে পারে।

তিনি তা পারেন না। তাঁর শিক্ষা দীক্ষা, তাঁর বিচার বিবেচনা, তাঁর বিবেক তাঁকে নিটোল একটি ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। সেটি গোষ্ঠীর সমুদ্রে গলে না। গলে না বলেই তো সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে পিণ্ডাকার হতে তিনি পারেন না। আর গোষ্ঠীর সমুদ্র তাঁকে হজম করতে পারে না বলেই তো ঢেউয়ের গুঁতোয় তাঁকে কিনারে ফেলে দেয়। সেই কারণেই তিনি এখানে অপাংক্তেয়। এদের লোক নন। সিন্ধবাদ নাবিকের গল্পের সেই মায়াবী বৃদ্ধের মত ব্যক্তিত্বের এই বোঝাটি মেজকর্তার কাঁধে চেপে আছে। এটি কলকাতার দান। এককালে এই বোঝাটি ছিল তাঁর গর্বের বস্তু। আজ যখন তাঁর বয়স বেড়েছে, শক্তি কমেছে, নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন, তখন কী দুর্বহই না হয়ে উঠেছে এই বোঝা!

মেজকর্তাকে কে নিঃসঙ্গ করেছে? এই ঘাড়ের বোঝাটি। কে তাকে তাঁর গ্রাম থেকে, তাঁর সমাজ থেকে, তাঁর আপন জনেদের কাছ থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে? এই, এই, এই দৈত্যটি। যাকে তোমরা বিবেক বল, ব্যক্তিত্ব বল, মনুষ্যত্ব বল, সেই দুরারোগ্য ব্যাধিটি।

এখন এই বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাবেন তিনি? কোথায় গিয়ে শান্তিতে একটু আশ্রয় নিতে পারবেন? এমন কি কোথাও জায়গা আছে, যেখানে তিনি তাঁর আপন সমাজ পাবেন? এমন কোন রাজ্য আছে কি, বিবেক যার রাজা? যাত্রাদলের বিবেক নয়, যুক্তি আর বিচারের যে সন্তান, সেই বিবেক।

কেন কলকাতা? কলকাতা! কলকাতাতেও ত সেই খুনের পুতুলদেরই রাজত্ব। মূলে কোন তফাত নেই। গ্রামের লোকের বিদ্যে কম, তারা নিজেদের চেহারা ঢাকতে পারে না, কলকাতা ছদ্মবেশ ধরবার কায়দাটা বেশ রপ্ত করেছে। প্রায় তিরিশ বছর আগেই তিনি কলকাতার ছল ধরে ফেলেছিলেন। সে কী যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা! মেজকর্তার কাছে একদিন সভ্যতা আর কলকাতার অর্থ একই ছিল। যে-আলোকে তিনি একদিন নতুন-জীবনের-পথ-দেখানো আলো বলে মনে করেছিলেন, সেটা যে রঙ-মশাল ছাড়া আর কিছু নয়, এটা যেদিন আবিষ্কার করলেন, সেই দিনই তিনি কলকাতা ছেড়েছেন। কী নিদারুণ ব্যথাই না সেদিন তাঁর বুকে বেজেছিল! এখন আর সে ব্যথা নেই। আছে আতঙ্ক। অচেনা ঘরে একা একা রাত কাটাতে শিশুর যে আতঙ্ক হয়, সেই আতঙ্ক। কোথায় যাবেন তিনি?

কখন তাঁর ঘরে সন্ধ্যা ঢুকে পড়েছে মেজকর্তা তা টের পান নি। এই আরেক জ্বালা। দিনে প্রচুর আলো থাকে। পৃথিবী তখন কত বড় হয়ে যায়। কত প্রসারিত। আর সন্ধ্যা তাকে গুটোতে গুটোতে কত সঙ্কীর্ণ এক ঘরে পুরে ফেলে। তাঁর এই ছোট্ট ঘরখানির মাপে বাঁধা পড়ে পৃথিবী। না, তাও না। আরও অন্ধকার বাড়ে, পৃথিবী আরও গুটোয়। চলে আসে মশারি-ঢাকা খাটের চৌহদ্দির ভিতরে। মেজকর্তার কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে। নিঃসঙ্গতা অসহ্য ঠেকে। অসহ্য। অসহ্য। বড় ইচ্ছে হয়, কেউ এসে কাছে বসুক। গায়ে পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিক। কারোর শরীরের উত্তাপ পেয়ে তাঁর এই নিঃসঙ্গত্বের ভয় দূর হোক। কেউ এসে দুটো কথা বলুক। তাঁর ক্ষতবিক্ষত মনে একটু স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়ুক।

বাড়ির সকলে এখন কাজে ব্যস্ত। মেয়েরা রান্নাঘরে। দাদার বোধ হয় ঘুম এসেছে। সন্ধ্যার সময়টাতেই ঘুম আসে বড়কর্তার। একমাত্র মেজকর্তাই এখন বেকার। একেবারে একা।

হঠাৎ মনে পড়ল নাতির কথা। মনে পড়ল জামাইয়ের চিঠি এসে গেছে। এবার যে কোনদিন সে এসে পড়বে। তার মানে মেয়েরও যাবার দিন ঘনিয়ে এল। তাঁর বুকটা শিন শিন করে উঠল।

বাড়িটা বেশ কিছুদিন ঝিমিয়ে পড়বে। ওইটুকু এক শিশু সমস্ত বাড়িটাকে কেমন ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল এতদিন। এবার বাড়িসুদ্ধ সবাই একেবারে বেকার হয়ে পড়বে।

ক্ষুদে ডাকাতটা এ বাড়ির সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পালাবে। মেজকর্তার মনে হল তাঁকেও ভরত রাজার দশায় ধরেছে। শিশু হরিণের মায়ার শিকল তাঁর পায়েও জড়িয়ে গেছে। বুঝলেন, এবার তাঁর কর্মনাশ হবে।

হঠাৎ মেজকর্তার ইচ্ছে হল, ওকে একটু দেখেন। ইচ্ছে হল, একবার বুকে জড়িয়ে ধরেন ওকে। আবার ভাবলেন, কী আর আছে দেখবার! মেয়ের ছেলে কার ঘরে কটা থাকে? স্বভাবের নিয়মেই একদিন তাকে নিজের ঘরে যেতে হবে। যেতে হয়, যাবে। যাবে? এখনও যে কোলে নিতে পারলেন না নাতিকে? একদিনের তরেও যে বদমায়েশটা উঠল না তাঁর কোলে।

ওদের যে একদিন চলে যেতে হবে, মেজকর্তা একথা তো জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জামাইয়ের চিঠি পাওয়ার আগে পর্যন্তও তো জিনিসটা তাঁর কাছে এমন মারাত্মক সত্যে প্রকট হয়ে ওঠে নি। তা যদি উঠত, তাহলে তিনি কি এত ঢিল দিতেন নাতির সঙ্গে ভাব করতে? মোটেই না। চেষ্টার মাত্রা আরও না হয় বাড়িয়ে দিতেন। দিয়ে দেখতেন কী ফল হয়!

মেজকর্তা আর বসে থাকতে পারলেন না। গুটি গুটি চললেন নাতির ঘরের উদ্দেশে।

ঘরে তখন কেউ ছিল না। তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ঘুমকে তাড়িয়ে সে আপন মনে খেলা করছিল। মেজকর্তা ঢুকে দেখলেন, ঘর ফাঁকা। জোরালো লণ্ঠনটা আরেকটু উস্কে দিয়ে, আস্তে আস্তে তার বিছানার কাছে গিয়ে খপ করে তাকে তুলেই এক চুমু খেলেন। আচমকা সেই দাড়ির জঙ্গলে তার মুখটা ডুবে যেতেই সে ভয়ে তারস্বরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। এ পাশের ঘর থেকে কী হল, কী হল করে ছোট বউ ছুটে এসে মেজ ভাশুরের কোলে তাকে দেখেই জিভ কেটে ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেলেন। প্রায় সেই সঙ্গেই আর এক ঘর থেকে বড় বউ আর গিরিবালাও এসে পড়ল।

বাবার দাড়ি দু মুঠোয় শক্ত করে ধরে ছেলে চোখ বুজে চেঁচাচ্ছে আর বাবা তাকে না পারছেন কোলে রাখতে, না পারছেন নামাতে। তাদের দেখে বাবা আরও অপ্রস্তুত হলেন। যেন চোরের দায়ে ধরা পড়েছেন। বাবার মুখ চোখের ভাব দেখে গিরিবালা আর স্থির থাকতে পারল না, খিল খিল করে হেসে ফেলল।

বড় বউ হাসতে লাগলেন।

বললেন, ও, তুমি? সেউ ভাল। আমি আরো ভাবলাম, ছেলেরে বুঝি বাঘে ধরল। তা তুমি এখেনে আইছ কোন্ কম্মে! চুরি করে নাতিরি আদর খাওয়াতি না কি? মাজেবাবু ইবার বড় কলে পড়িছ। ওই দাড়ি ইবার মাটিতি গড়াগড়ি দেবে, বুঝিছ। নাতিরি যদি কোলে তুলে নাচাবার শখ থাকে তাহলি পরামানিক ডাকে ওই জঙ্গল ঝুড়ে আসোগে।

সামান্য ব্যাপারটা এতদূর গড়াল দেখে প্রথমটায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন মেজকর্তা। তার পরে মনে মনে রাগ হল তাঁর। রাগ হল ওই বিচ্ছুটার উপর।

বড় বউয়ের কথার উত্তরে বললেন, বয়ে গেছে আমার। লাট সাহেব সামান্য লোকের কোলে উঠতে বড়ই নারাজ দেখছি। তা থাকুন, তিনি পালঙ্কেই থাকুন।

নাতিকে বিছানায় শুইয়ে দিতেই তার কান্না থেমে গেল। চোখ বড় বড় করে সে দেখতে লাগল মেজকর্তাকে। সেই চাউনিতে মেজকর্তার ব্যক্তিত্ব যেন হেলে পড়ল। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

মনকে প্রবোধ দিলেন, তুমি আপন আপন ভাবলে হবে কী, আসলে এ সংসারে কেউ কারো নয়। কী আশ্চর্য, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তামাক খাবার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠল। বড় বাজে কাজে দিনটা গিয়েছে। এতক্ষণে তবু একটা কাজের মত কাজ পাওয়া গেল।

চোদ্দ

দড়বড়িয়ে ঘোড়া দাবড়ে এই অবেলায় যিনি এসে পৌছলেন, এ বাড়ির কেউ তাকে আশা করেন নি।

রামকিষ্টোই তাঁকে প্রথমে দেখল। কিন্তু চিনতে পারে নি। ঘোড়াটা গোয়ালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবার কালে রামকিষ্টো সওয়ারের মুখ দেখতে পায় নি। গাছের আড়াল পড়ে গিয়েছিল।

বাড়ির সকলেরই খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গিয়েছে। তা বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে হল বই-কি। শুভদা ছাড়া আর সবাই যে যার ঘরে ঢুকে গড়িয়ে নিচ্ছে। বড়কর্তার একটু তন্দ্রা এসেছে, মেজকর্তা 'প্রবাসী' পত্রিকাখানা খুলে দুপাতা পড়ছিলেন, ঘুমের আক্রমণে সেই পাতাখোলা 'প্রবাসী' তাঁর বুকের উপর ঢলে পড়েছে। বড় বউয়ের ঘরে ফুলির মার সঙ্গে বড় বউ গল্প করছিলেন একটু আগে, চাঁপা আর ফুলিতে সমানে খুনসুটি চলছিল, এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে। ফুলির মার নাক ডাকছে এখন। বড় বউয়ের চোখ বুজে এসেছে, ঠোঁট ফাঁক হয়ে সামনের দাঁত দুটো বেরিয়ে পড়েছে। চাঁপা আর ফুলি গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ফুলির মুখ থেকে লালার একটা ঘন স্রোত গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে। একটা গুয়ে মাছি বার বার ফুলির গালে গিয়ে বসছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফুলির গালটা নড়ে নড়ে ওঠায় আবার সেটা উড়ে উড়ে যাচ্ছে।

আরেকটা ঘরে ছেলেকে নিয়ে শুয়ে ছিল গিরিবালা। ছোট বউও পাশে শুয়ে ছিল। গিরিবালা ঘুমে অচেতন। ছোট বউ ঘুমিয়েছে কিনা কে জানে, তবে একেবারে নিশ্চল।

হাত-পা নেড়ে ঘুমকে প্রাণপণে প্রতিরোধ করছিল একমাত্র ছেলেই। বড়রা যার আক্রমণে কাবু, সেই ঘুমকে সে যেন কচি কচি হাত-পা নেড়ে বেদম শায়েস্তা করছে। দু-একবার ধমক দিল যেন কাকে? ব্‌বো ব্‌বো। তার শরীরে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছে সে। ম্‌ম্‌ম্‌ ম্‌ম্‌ম্‌ বলে জানাতে চাইল সে কথা। কেউ তার কথায় কর্ণপাত করল না। দিবানিদ্রা ভঙ্গ

হল না কারো। সেই অস্বস্তিটা প্রবলভাবে বেড়ে উঠছে তার শরীরে। বিরক্ত লাগছে তার। যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। এবার খুঁত খুঁত করে কেঁদে উঠল। তাতেও কেউ দৃষ্টি দিল না তার দিকে। এবার হয়তো সে তার কান্নার স্বরগ্রাম চড়াতে তুলে দিত, কিন্তু তার আগেই চূড়ান্ত উপশম হয়ে গেল। আর কাঁদল না সে। কাঁথাটি জবজবে করে ভিজিয়ে পরমানন্দে আঙুল চুষতে শুরু করল। না, আর কোন উদ্বেগ, কোন অভিযোগ নেই তার। বেশ আরামই লাগছে।

এ বাড়িতে দিনের কাজ শেষ হতে সবার চেয়ে দেরি হয় শুভদার। বিধবা মানুষ। কাজকম্ম সেরে নাইতে-খেতে রোজই বেলা গড়িয়ে যায়। সেদিনও হেঁসেলে শিকল তুলে বারান্দায় নামছিলেন, ঘোড়ার পায়ের শব্দ বাইরের উঠনে এসে থামতেই চৌকাঠ ধরেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। কে আবার এল? ডিঙ্গি মেরে চেগারের ওপাশে উঁকি মেরেই অবাক হয়ে গেলেন।

খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলেন, ও মা, শীতল! ওলো ও বড় বউ, বড় বউ, ওঠ্ ওঠ্, শীতল আয়েছে।

শুভদার চিৎকারে বড় বউয়ের ঘুম ছুটল। কে? ছোট্ ঠাকুরপো? ও মা! ধড়মড়িয়ে উঠে গায়ের আঁচলটা সামলে নিলেন, এলোচুল জড়িয়ে নিলেন তাড়াতাড়ি, একটা বড়সড় হাই তুললেন। তারপর ফুলির মাকে ঠেলেঠুলে তুলে দিলেন।

বললেন, ও ফুলির মা, আখাটা ধরাওগে দিনিন, ছোটু ঠাকুরপো আয়েছেন।

আবার একটা হাই তুললেন বড় বউ।

ফুলির মাকে বললেন, এট্টু গুঁড়ো ছাও তো দাঁতে ঘষি।

ফুলির মা কৌটো খুলতে খুলতেই বড় বউ পাশের ঘরে হাঁক দিলেন, ওরে, ও ছোট, ওঠ্, ছোট্‌ঠাকুরপো আয়েছেন রে। উঠে পড়্।

কথাটা কানে গেল ছোটবউয়ের। কিন্তু অর্থটা তাঁর কাছে তেমন পরিষ্কার হল না। কোনরকম চঞ্চলতা জাগল না তাঁর মনে। কেউ একজন এসেছে, সেটা বেশ বুঝলেন। কে এসেছে, সেটা তত পরিষ্কার হল না। তিনি তেমনি নিশ্চলভাবেই শুয়ে রইলেন। তাড়াহুড়ো করে উঠবার কোন তাগিদ বোধ করলেন না।

কে এসেছে? বড়দি বলল, ছোট্‌ঠাকুরপো। ছোট্‌ঠাকুরপো? হ্যাঁ, ছোট বউয়ের মনে পড়ল, মনে পড়ছে, ধীরে ধীরে, একটু একটু করে মনে পড়তে লাগল, ছোটকর্তাকে বড়দি এই নামেই ডেকে থাকেন বটে। তার মানে ছোটকর্তা এসেছেন। বুঝলেন ছোট বউ। তবু কেন তাঁর আগ্রহ জন্মাচ্ছে না ছোটকর্তা সম্পর্কে? কেন ছোটকর্তার ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে না তাঁর মনে? কোন চাঞ্চল্য জাগছে না, উৎসাহ জাগছে না, উষ্ণতার জন্ম হচ্ছে না ছোট বউয়ের ভোঁতা মনে। দশ বছর আগে পর্যন্ত ছোটকর্তার সঙ্গে ছোট বউয়ের কী একটা যেন জীবন্ত সম্পর্ক ছিল। আবছা আবছা আন্দাজ হচ্ছে তাঁর। তারপর কী যেন হয়ে গেল হঠাৎ, ঝপ করে একটা বিরাট ভারী আর ভয়ঙ্কর কালো আবরণ পড়ে গেল তাঁর মনে। পুরনো দিন, পুরনো সম্পর্ক সব যেন মুছে গেল। সে সব কথা আর স্পষ্ট করে মনে রইল না কিছু।

আবার একদিন হঠাৎ কী হল, ছোট বউ গিরিবালার খোকাকে ঝোঁকের মাথায় বুকে তুলে নিলেন। অমনি অশ্বত্থামার ঘেয়ো মাথায় যেন তেলের প্রলেপ পড়ল। কী একটা জলুনি আরাম হয়ে গেল। আশ্চর্য ঘটনা! আরো আশ্চর্য, যেই সেই অহোরহ মনপোড়ানি ঠাণ্ডা হল, অমনি সেই ভারি অন্ধকারের পর্দাটা ছিঁড়ে ফর্দাফাই হয়ে গেল। দশ বছর পরে আবার তাঁর মনে পিলপিল করে ঢুকতে লাগল প্রখর আলোর রশ্মি। আবার সেই ভুলে-যাওয়ারা চেনা হয়ে পড়ল। তবে সবটা অন্ধকার এখনও দূর হয় নি, এখনও ছোট বউয়ের মনের কোনায় কোনায় বিস্তর ঝুলকালি জমে আছে, এটা তিনি বুঝতে পারেন। বুঝতে পারেন, সেই কারণেই তাঁর মনের সর্বত্র সমানভাবে আলো পড়ে না। শীতলের দিকটা হয়তো সেই কারণেই অন্ধকার।

তাই হয়তো শীতলের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ফুটছে না তাঁর মনে। কিংবা কিছু কিছু হয়তো ফুটছে, সবটা নয়। মনের যে আয়নায় প্রিয়জনের ছবি সুস্পষ্ট হয়ে ফোটে, দশ বছরের অব্যবহারে ছোট বউয়ের সেই আয়নাটির বহু জায়গা থেকেই পারা খসে খসে গেছে।

তাই, ছোট বউ সেই আয়না দিয়ে প্রাণপণে শীতলের ছবিটা দেখতে চেষ্টা করেও তাঁকে পুরো দেখতে পাচ্ছিলেন না। কোথাও মুখের একটা কোণা, কোথাও নাকের সামান্য একটু আভাস, কোথাও বা কপালের একটু ভগ্নাবশেষ দেখতে পাচ্ছিলেন। সেই কারণেই ছোট বউয়ের মনে কোন আগ্রহ, কোন উৎসাহ, কোন উষ্ণতার জন্ম হচ্ছিল না।

গিরিবালার খোকা শব্দ করতেই ছোট বউ তার দিকে ফিরলেন। দেখেন সে উস্‌খুস্ করছে। দেখেছ কাণ্ড, কাঁথা ভিজিয়ে শুয়ে আছে! তৎক্ষণাৎ ছোট বউয়ের স্তিমিত রক্তস্রোতে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হল। উৎসাহ, আগ্রহ এবং তৎপরতা ফিরে এল তাঁর মনে। তিনি চটপট কাঁথাটি বদলে দিলেন।

ছোটকর্তা ঘোড়া থেকে নেমে চারিদিক চেয়ে রামকিষ্টো বা নরা কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন নিজেই ঘোড়ার পিঠ থেকে জিনটা খুলে ফেললেন। জিন খুলতেই ঘোড়ার পিঠের গরম ভাপ তাঁর গায়ে লাগল। বাঁ হাত দিয়ে ঘোড়াটার পিঠে চটাস চটাস দুটো আদরের চাপড় মেরে জিনটা বারবাড়ির বারান্দায় রেখে দিলেন। তারপর ঘোড়াটাকে পুবদিকের গায়ে, লম্বা ছায়ায়, একটা খুঁটিতে বাঁধলেন। লাগামটা ঘোড়ার মুখেই থাকল আপাতত। সে ল্যাজ দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে খট্ খট্ করে বার কয়েক পা ঠুকলো, উর্ধ্বমুখী হয়ে মাথাটা দুবার ঝাঁকিয়ে নিল, তারপর নিশ্চিন্ত মনে লাগামের লোহাটা কড়াত কড়াত চিবোতে লাগল।

ছোটকর্তা পিছন ফিরতেই দেখেন চেগারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে শুভদার হাসি-হাসি মুখখানা উঁকি মারছে। মনটা বেশ খুশী হয়ে উঠল ছোটকর্তার। দেড় বছর পরে আজ বাড়ি ফিরলেন।

শুভদা বললেন, ও শীতু, শরীর ভাল আছে তো তোর?

ছোটকত্তা হাসতে হাসতে বললেন, দারোগার শরীর ইস্পাতের শরীর মা'জদি। ও আগুনিউ গলে না, জলেউ মরচে ধরে না। তারপর তুমাগের খবর ভাল তো?

শুভদা তাড়াতাড়ি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নে ঘরে আয়, জামাকাপড় ছাড়্, মুখি হাতে জল দে। রোদি একেবারে যে ঝামড়া পুড়া হয়ে গিছিস।

শুভদার কথা শেষ হতে না হতেই বড় বউ গুদোমবাড়ির দরজা দিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন।

বললেন, এই যে মদ্দ বাহাদুর, বাড়ি ঘরের কথা তালি এতদিনি স্মরণ হল? সূয্যু আজ কোন্ দিকি উঠিছে?

ছোটকর্তা হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, হুরি পরীরা নেক নজরে চায় না গো বউঠান, বাড়ি আসার সুখটা কি কও?

বড় বউ হাসতে হাসতে টিপ্পনী কাটলেন, বুঝলাম যেই খবর পাইছ, নিজির

ছুরিডে মেরামত হইছে, অমনি বুঝি বুকি পুলকের হাওয়া গড়াগড়ি খাতি লাগিছে আর বাবু পক্ষীরাজ দাবড় দিয়ে আ'সে পড়িছে। তা আ'স এখন বুঝ সমঝ করে ন্যাও।

শুভদা তাড়া দিলেন, নে বড়-বউ, তোর ঠাট্টা তামাসা এখন রাখ্, শীতুরি জামাকাপড় ছাড়তি দে।

ছোটকর্তা বললেন, দাঁড়াও, বুড়ির ছেলেরে আগে দেখি, শালা কতবড় বাহাদুর একবার বুঝে নিই। চল দিন বউঠান।

ছোটকর্তা হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকতেই ছোট বউ শশব্যস্তে উঠে পড়লেন। ছোটকর্তার দিকে বোবা নজরে একবার চেয়ে ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেলেন। গিরিবালা একপাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। আগে সে কাকাকে মনে মনে ভয় করত, এখন লজ্জাও তার সঙ্গে এসে যোগ দিল।

ছোটকর্তা এক নজর ছোট বউয়ের দিকে চেয়ে নাতির দিকে মন দিলেন। দারোগার অদ্ভুত পোশাকের জন্যই হোক কি লোকটা অপরিচিত বলেই হোক সে বড় বড় চোখ তুলে ছোটকর্তাকে বেশ অভিনিবেশ সহকারে দেখতে লাগল।

বেশ মোটাসোটা ছেলে হয়েছে বুড়ির। বেশ মুখ চোখ। আর বেশ সাহসও আছে শালার। কেমন চেয়ে আছে গুলগুল করে। কাঁদছে না তো!

নাতিকে খুবই ভাল লাগল ছোটকর্তার।

আয় শালা, কাঁধে ওঠ্, বলেই ছোটকর্তা ন্যাদনেদে কচি দেহটাকে এক হ্যাঁচকায় তুলে তাঁর বিশাল কাঁধে বসিয়ে দিলেন। আর বসামাত্র সে ওখানে অপকর্ম করে বসল। প্রবল প্রতাপান্বিত সরকার বাহাদুরের মোহরমারা খাকি পোশাকের উপর দিয়ে সেই অপকর্মের তরল সাক্ষী গড়িয়ে পড়ল। ডাকসাইটে দারোগাবাবু অভাবনীয় এই ঘটনার আকস্মিকতায় কিঞ্চিৎ বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

বড় বউ এবং শুভদা তুজনেই হেসে ফেললেন। শুভদা ঠোঁট টিপে, বড় বউ খিলখিল করে। একমাত্র গিরিবালার মুখ শুকিয়ে গেল। ভয়ে তার অন্তরাত্মা ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল।

বড় বউ হাসতে হাসতে বললেন, কেমন দারোগাবাবু, এখন বোঝ কেমন!

ছদ্ম গাম্ভীর্য মুখে টেনে ছোটকর্তা বললেন, বড়ই সাংঘাতিক ব্যাপার। দারোগার ঘাড়ে হাগে, এ শালা তো বড় কমলোক হবে না।

বলেই ছোটকর্তা হা-হা করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন। অপকর্মটি করা ইস্তক সে বেচারিও অস্বস্তিভোগ করছিল। ছোটকর্তার পিলে-চমকানি হাসিতে সে ভয় পেয়ে তারস্বরে কেঁদে উঠল।

ছোটকর্তা খোকাকে গিরিবালার কাছে গছিয়ে দিতে দিতে বললেন, বড় জবরদস্ত ছেলে হয়েছে রে তোর। যা ধুয়ায়ে মুছায়ে নিয়ে আয়।

ছোটকর্তার স্বরে প্রসন্নতার সুর পেয়ে গিরিবালা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক, কাকা তাহলে দোষ ধরেন নি খোকার। উঃ ভগবান! স্বস্তির একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল গিরিবালা।

ছেলেটাকে দু হাতে ঝুলিয়ে নিতে নিতে গিরিবালা খুব চটে গেল তার উপর। কত বড় আস্পদ্দা ভাব দিকি একবার! কী দুঃসাহস! পরক্ষণেই গোটা দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই ভয় ডর বিরক্তি তার মন থেকে দূর হয়ে গেল। ফিক ফিক করে হাসতে থাকল। সত্যি খোকা, মাঝে মাঝে কী যে কাণ্ড বাধাস! গিরিবালা সস্নেহে অপরিচ্ছন্ন খোকার ভালমানুষি মাখানো মুখখানা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

বাড়ির মধ্যে এই অসময়ে কলরব শুনে মেজকর্তার ঘুমটি ছুটে গেল। উঠে এসে শোনেন শীতল এসেছে। জামা কাপড় ছাড়তে গেছে তার ঘরে। বাইরে বেরিয়ে দেখেন, শীতলের ঘোড়াটা ল্যাজ উঁচু করে নাদছে আর ঘরের খুঁটিতে ঘাড় ঘষছে।

মেজকর্তা রামকিষ্টোকে ডাক দিলেন জোরে। গোয়াল থেকে সে সাড়া দিল।

মেজকর্তা বললেন, এদিকে আয় দিকি একবার।

রামকিষ্টোর হাতে অনেক কাজ। সে ভাবল মা'জেবাবুর বোধ হয় তামাকের তেষ্টা পেয়েছে। ছেলেটাকে পাঠাতে চাইল। কিন্তু সে 'লবাবের বিটা' যে কোথায় এখন আছেন তা ভগবানই জানেন।

তবু, কাছে পিঠে যদি থাকে, তাই হাঁক পাড়ল, ওরে ও নরা!

নরা কাছেই ছিল। গোপালভোগ আমগাছটার সাফ-সোফ তলায় বসে নালসে পিঁপড়ের আনাগোনা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। পিঁপড়ে সম্পর্কে

নরার আগ্রহ প্রবল। ফাঁক পেলেই এই অদ্ভুত ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণীগুলোর ক্রিয়া-কলাপ খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করে থাকে।

নরা অনেক দিন ধরে, একটু একটু করে, অনেক কীর্তিই দেখেছে ওদের। কী করে ওরা বাসা বাঁধে? আচ্ছা শোন, যা দেখেছি, তাই বলছি। ওদের মধ্যে অনেকগুলো বড় বড় পিঁপড়ে আছে। ওরাই বোধ হয় মোড়ল। শুঁড় নেড়ে নেড়ে ওরা যা বলে আর সবাই তা মান্য করে। বর্ষার আগে দেখো, এই গোপালভোগ আমগাছের পাতায় পাতায় ওই বড় বড় পিঁপড়েগুলো ঘুরে ঘুরে কী যেন খোঁজে। বল তো, কী খোঁজে? বাসা বানাবার জায়গা। যেই জায়গা ঠিক হয়ে গেল, জায়গা মানে কী, আমগাছের গোটা কতক শিয়ারা, যে সব শিয়ারা পেড়ে এনে ঠাকুরমশাই পুজোর সময় ঘটের মুখে দেন সেই শিয়ারা। দেখে দেখে নরা এখন বুঝে গেছে কোন ধরনের শিয়ারায় নালসে পিঁপড়ে বাসা বাঁধে আর কোথায় বাঁধে না। ওদের তরিবৎ খুব। বড় ডালে খুব শক্ত রুক্ষ পাতায় ওরা পারতপক্ষে বাসা বাঁধতে চায় না। একেবারে ফুল কচি পাতাতেও না। শক্ত সমর্থ যুবো পাতা আর নরম ডালই ওদের পছন্দ। নরাকে আমের শিয়ারা আনতে বললে সে এসব ডাল কক্ষনো ভাঙে না। বাবা, কেষ্টর জীব! ওদের ঘর ভেঙে দেওয়া কি যে-সে কথা! পাপ লাগবে না!

হ্যাঁ, তারপর যা বলছিল নরা, শোন। বাসা বাঁধার জুৎমত শিয়ারাগুলো ঠিক করা হল। তারপর কী যেন একটা হুকুম দেয় মোড়লগুলো আর দলে দলে পিঁপড়ে এসে বাসা বাঁধবার শিয়ারাগুলোয় উপর ঘুরে বেড়াতে থাকে। ঘুরছে তো ঘুরছেই। শুধু ঘুরছেই। দিনরাত শুধু ঘোরাফেরাই চলছে। তারপর হঠাৎ একদিন দেখবে, আম শিয়ারার নরম পাতাগুলো একের পিঠে আরেকটা জুড়ে জুড়ে গিয়েছে। আর সমস্ত শিয়ারাটা ধীরে ধীরে ফুলে উঠে, গুটিয়ে গুটিয়ে একটা বড়সড় টোপরের মত হয়ে উঠছে। এই অদ্ভুত দৃশ্যটা কতদিন যে গোপালভোগের শিকড়ে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে দেখেছে নরা, তার সীমাসংখ্যা নেই। এই সময় নাওয়া খাওয়া ভুলে যায় সে। কাজকর্মে মন থাকে না তার। বাবার বকুনি বেড়ে যায়। কুঁড়ে বলে তার বদনাম হয়। চড় চাপড়ও খায়। তবু এ নেশা তার যায় না। বড়রা কিছু দেখে না, দেখতে চায় না। ওরা শুধু চড়ই মারতে পারে। আচ্ছা বলুক দেখি বাবা, কেন আমের শিয়ারাগুলো একদিন এমন করে

গুটিয়ে যায়, বলুক দেখি, কোন্ কায়দায় এমন ঘটে? সে বেলায় মুখ ভোঁতা।

পিঁপড়েরা পালে পালে ওই যখন পাতায় পাতায় ঘোরে, ওরা কী বিনা কাজে ঘোরে ভেবেছ! মোটেই না, ওরা বিনা কাজে ঘোরে না, ওরা তখন আঠা মাখায় পাতায়। একদিন হাত দিয়ে দেখেছিল নরা তাই জেনেছে। সেই আঠা যত শুকিয়ে আসে, শিয়ারার পাতাও তত গায়ে গায়ে জুড়ে যায়। ততই শিয়ারাটা ফুলে ফুলে ওঠে। একদিন সব ফাঁক যখন বন্ধ হয়ে যায় মালপত্তর মুখে মুখে বয়ে এনে পিঁপড়েরা সব তার ভিতরে ঢুকে পড়ে। দু-একটা বাইরে থাকে পাহারায়। ভিতরে অন্যেরা বোধ হয় ডিম পাড়ে।

এই দিনও নরা শুয়ে শুয়ে দেখছিল। তবে এখন সে চিত হয়ে শোয় নি। শুয়ে ছিল উপুড় হয়ে। নরার চোখের সামনে একটা কচুপাতার উপর বড় একটা নালসে পিঁপড়ে। পিঁপড়েটার চোট লেগেছে বলে নড়তে পারছে না। নরার পিঠের চাপেই থেঁতলে গেছে পিঁপড়েটা তাই নরার দুঃখের অন্ত নেই। নরা তাকে কচুর পাতায় তুলে দিয়েছে।

কচুর পাতায় গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল পিঁপড়েটা। দাঁড়াতে পারছে না। উল্টো হয়ে, পা'গুলো উপরে তুলে পিলপিল করছে। নরা জানে না এ অবস্থায় কী করলে পিঁপড়েটা ভাল হয়ে উঠতে পারে। পিঁপড়ের রোগের ওষুধ আছে বলে তো সে শোনে নি। বাবা হয়তো জানতে পারে। কিন্তু তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাটা নিরাপদ কি না বুঝতে পারছিল না। বাবার হাতের চড়গুলো খুব কড়া এবং সেগুলো তার পিঠে পড়বার এত কারণ চতুর্দিকে ছড়ানো আছে যে একা সে সামাল দিতে পারে না। তাই যেচে আরেকটা সুযোগ সে বাবার হাতে তুলে দিতে চাইছিল না। হঠাৎ পিঁপড়েটা কচু-পাতার উপর উঠে দাঁড়াল। উত্তেজনায় নরার বুক ধুকধুক করে উঠল। উঠেছে! উঠতে পেরেছে!

পিঁপড়েটা উঠে দাঁড়াল বটে কিন্তু এক পাও নড়তে পারল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল প্রায় একটি ঘণ্টা। মাঝে মাঝে পা'গুলোর মধ্যে শুঁড় দিয়ে কী করছিল কে জানে। ভাঙা পা মেরামত করছে নাকি? সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে, পাতার উপর হুমড়ি খেয়ে, নরা দেখবার চেষ্টা করল। নাঃ কিছুই দেখা গেল না। নরা কিঞ্চিৎ নিরাশ হল।

পরক্ষণেই নরা দেখল নালসেটা টিপ টিপ করে মাজা নাচাচ্ছে। কী রে বাবা, বাহ্যি করবি না কি? আবার নরার হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হল। এটা নরার মনের অনেক দিনের প্রশ্ন: পিঁপড়ে কী বাহ্যি পেচ্ছাব করে? আজ সে প্রশ্ন নিরসনের জন্য ভগবান এই পিঁপড়েটাকে তার হাতে তুলে দিয়েছেন। জয় ভগবান!

ঠিক কোন্‌খানটি দিয়ে যে পিঁপড়েরা ওই সব কাজকর্ম হাসিল করে সেটি মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য নরা যে মুহূর্তে তৈরী হল, ঠিক সেই সময় তার কানে বাপের ডাকটি তীরের মত এসে বিঁধল। ডাকটি শুনেই বুঝল বাবা একটু গরম হয়েছে। এবং এ জগতে গরম বাবা যেহেতু ঈশ্বরের চাইতে শক্তিমান, সেই কারণেই নরা ভগবানের ইচ্ছেটা তাঁর হাতেই অর্পণ করে ক্ষুণ্ণ মনে বাবার হুকুম তামিল করতে ছুটল।

নরাকে দেখে রামকিষ্টোর মনে বাৎসল্যভাব বিন্দুমাত্র জাগরুক হল না। কারণ, খেয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গোয়াল পরিষ্কারের কাজে লাগতে হয়েছে। পচা গোবর আর চোনায় ভেজা মাটি কোদাল দিয়ে চেঁছে ওগুলোকে সারগাদায় নিয়ে ফেলা যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য কাজ। কোমর পিঠ টন টন করতে থাকে। মেজাজ ভাল থাকার কথা নয়। শালার গরুগুলোরও হয়েছে তেমনি। দুধ তো সব কটা বন্ধ করেছে। হাটবাজার থেকে কিনে আনতে হয় রোজ, কেন, ওই সঙ্গে নাদাটাও বন্ধ করলে পারত। তাহলে রামকিষ্টোর আর এত ঝামেলা পোয়াতে হয় না। হারামজাদীরা দুধ দেবার কেউ না, জাবনা খাওয়ার মা গোঁসাই।

রামকিষ্টোর মনের অবস্থা যখন এই রকম ঠিক সেই সময়ে তার সামনে নরা এসে ব্যাজার মুখে দাঁড়াল। রামকিষ্টো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। পেট পুরে খেতে দাও, বিছানা পেতে ঘুমোতে দাও অমনি ছেলের মুখে হাসি উথলে ওঠে। আর কাজের গন্ধ পেলেই মুখখান একেবারে অমাবস্যে। মারে ওই মুখে এক লাথি!

রামকিষ্টো অবশ্য লাথি মারল না। ছেলের সঙ্গে যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহারই করল। গোবরমাখা হাত দিয়ে নরার চুলের ঝুঁটি ধরে দুটো ঝাঁকুনি দিল।

দাঁত কিড়মিড় করে বলল, এক ডাকে আসা হয় না, বাবুর মন কোন্ গাছে বাঁধা, অ্যাঁ? যাও, মা'জেবাবু ডাকতিছেন, বোধ হয় তামাক খাবেন,

সাজে ছ্যাও গে। তারপর এক কন্ধে এখেনে আনে ছ্যাও। দেরি কর‍লি মাজা সুজো থাকবে নানে।

ঝাঁকির জন্য নয়, পচা গোবরের গন্ধে নরার পেট গুলিয়ে উঠল। কান্নার একটা প্রবল ইচ্ছা মনে গুঁতো মারতে লাগল। নিতান্ত মা'জেবাবুর সামনে পড়তে হবে তাই সামলে নিল। তবে বিলক্ষণ চটে গেল তার উপর। মানুষটা কেমন ধারা গো! তামুক খাবার সময় অসময় নেই! একমুঠো আশ-শ্যাওড়ার পাতা ছিঁড়ে মাথা ঘষতে ঘষতে মেজকর্তার সামনে গিয়ে হাজির হল নরা।

মেজকর্তা বললেন, নরা, তোর বাবা কোথায় রে?

নরা মিন মিন করে বলল, গুয়াল ফিরোচ্ছে।

মেজকর্তা বললেন, ও। তা তুই ঘোড়াটা মাঠে বেঁধে দিয়ে আসতে পারবি?

ঘুড়া! নরা চমকে উঠল। কয় কী মা'জোবাবু। কার ঘুড়া? নরা হকচকিয়ে চাইতেই দেখে মস্ত একটা ঘোড়া বারবাড়ির পুব ছামুতে বাঁধা আছে। দেখেই চিনল, ছোটবাবুর ঘোড়া। কখন এলেন ছোটবাবু? নরার মনে পড়ল, খানিকক্ষণ আগে ঘোড়ার টগবগি একটু শুনেছিল বটে। তেমন খেয়াল করে নি।

মা'জেবাবু তারে ওই ঘুড়া বাঁধতি কচ্ছেন! নরার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। উরে সব্বোনাশ! উডা যে ডাকাত। অমন জুয়ানমদ্দ ছাওয়াল বড়বাবুর, তারেই মারিছিল এক আছাড়। নরা কী আর আস্ত থাকবে নাকি? ওই ছ্যাখ, খালি মাটিতেই কেমন খটাস খটাস লাথি ঝাড়তিছে। ওর একখান নরার প্যাটে পড়লি, প্যাট গলে যে ডাল ভাতে হয়ে যাবেন।

মেজকর্তার কথা শুনে শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল নরার।

অতিকষ্টে বলল, বাবু, বাবারে ডাকে নিয়ে আসব?

মেজকর্তা বললেন, যা।

আর নরা অমনি প্রাণপণে দিল ছুট। যেন মেজকর্তার হুকুম এখনই বদলে যাবে।

হাঁফাতে হাঁফাতে গোয়ালের দরজায় গিয়ে নরা উত্তেজিতভাবে ডাক দিল, বাবা রে, শিগ্‌গির আয়, ছোটবাবু আয়েছেন।

রামকিষ্টো বেরিয়ে এসে দেখল, নরার মুখ চুবসে গেছে। থরথর করে কাঁপছে ছেলে।

অবাক হল রামকিষ্টো।

বলল, ছোটবাবু আয়েছেন তা তোর পিরাণডা বেরোয়ে যাচ্ছে ক্যান? তুই কী খুনী আসামী? তোরে জেলে দেবে নাকি ছোটবাবু?

হাঁফাতে হাঁফাতে নরা বলল, ছোটবাবুর সেই ঘোড়াটাও আয়েছে যে। মা'জেবাবু কয়, নরা ঘুড়াডা বাঁধে দিয়ে আয় দিনি মাঠে।

নরার ভয়ের কারণডা এতক্ষণে বুঝল রামকিষ্টো। ছেলের তড়াসে ভাবটা আর কাটল না। বড্ড ভিতু। এবার কিন্তু আর রাগ হল না রামকিষ্টোর। জীবনে কিচ্ছু করতে পারবে না ও। মায়ের আদর খেয়ে খেয়ে একেবারে ননীগোপাল হয়ে উঠেছে। নরার ভবিষ্যৎ ভেবে দুঃখ হল রামকিষ্টোর। কেমন যেন আলাভোলা গোছের হয়ে উঠেছে ছেলেটা। মায়া হল তার।

রামকিষ্টো হঠাৎ গোবরমাখা হাতখানা দিয়ে পরম আদরে নরার গালটা টিপে দিল।

বলল, তালপাতার সিপাই! তোর ওই বয়েসে আমি শিঙেল মোষ চরাইছি, বুঝলি।

গালে পচা গোবর লাগতেই নরা বেজায় চটে গেল।

চেঁচিয়ে উঠল, করিস কী? উঃ, গন্ধ! থু থু।

নরা দু হাতে গাল ঘষতে লাগল। ছেলের রকম দেখে হো-হো করে হেসে উঠল রামকিষ্টো। বাপকে হাসতে দেখে নরা একটু অবাক হল প্রথমে। পরক্ষণেই খুশি হয়ে উঠল। বাবাকে হাসতে দেখলে খুব আনন্দ হয় নরার। কি আশ্চর্য, যেই খুশি-খুশি ভাবটা নরার মনে জেগে উঠল, অমনি পচা গোবরের গন্ধটাও ওর নাকে আর অত বিকট লাগল না। সেও বাপের সঙ্গে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

রামকিষ্টো বলল, চল দিনি দেখি কনে তোর ঘুড়া।

রামকিষ্টোর হাত ধরে নরা গুটিগুটি বারবাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। এখন সে এই দুনিয়ার কাউকে ভয় করে না। মা'জেবাবুকেও না, ছোটবাবুর ওই ঘোড়াটাকেও না।

পনের

ছোটকর্তাকে ভয় খায় না, সমীহ করে না, এমন লোক কমই আছে এ অঞ্চলে। বড় ডাকাবুকো লোক। ডাক সাইটে দারোগা। অসুরের মত তাঁর চেহারা। একটু খাটো কিন্তু শরীরখানা যেন পেটা লোহায় তৈরী। কালো রঙ, চোখ দুটো লালচে লালচে, নাকের নিচে প্রকাণ্ড এক কাইজারি গোঁফ। গলার আওয়াজে যেন মেঘ গুড়গুড় করে। কে বলবে, বয়েস তাঁর চল্লিশ পার হয়েছে।

অনেক দিন পরে বাড়ি এলেন ছোটকর্তা। এসে দেখলেন ভালই লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও তাঁর নজরে পড়ল, বাড়িটার জৌলুস যেন আগের মত আর নেই। যেন বুড়ো হয়ে পড়েছে বাড়িটা। আগে গুদোম বাড়ির মাঠকোঠার গায়ে প্রতি বছর চুণের কলি ফেরানো হত। চকচক করত কোঠাটা। এখন কেমন ভোঁতা ভোঁতা-দেখাচ্ছে। কে জানে কতদিন চুন পড়ে নি তার গায়ে! সিমেণ্টের সিঁড়ির দু পাশে হাতির শুঁড়ের বর্ডার। ফরমায়েস দিয়ে বানিয়েছিলেন বড়দা। অযত্নে সেই হাতির মাথার সিমেণ্ট খসে গিয়েছে। একটা দাঁতও কী করে যেন ভেঙেছে। চোট খেয়েছে শুঁড়ের ডগাটা। পৈঠাগুলাও একের পর এক এবড়ো-খেবড়ো হয়ে উঠছে। বল্টু বসানো বসানো মজবুত দরজার নক্‌শাগুলো আগে কেমন চমক মারত। এখন লোহার বল্টুতে মর্চে ধরেছে। নক্‌শার রঙ উঠে গেছে। দরজার কব্জা ঢিলে হয়েছে। চৌকাঠে কুমরে পোকার মাটির দুর্গ একের পর এক সংখ্যায় বেড়েছে।

ঢেঁকিঘরের চারধারে আগে সুন্দর করে বেড়া দেওয়া ছিল। দু ধারের বেড়া এখন ভেঙে পড়েছে। ধান সিদ্ধ করার মাটির বড় বড় মাঠগুলোর একটাও আস্ত নেই।

তাঁর নিজের ঘরটার অবস্থাও ভাল না।

মেজদার ঘর তো কবেই পড়ে গিয়েছে। গুদোমে আশ্রয় নিয়েছে মেজদা।

ছোটকর্তা ভাবলেন, বড়দা নিরন্তর থাকেন বাড়িতে, তাই হয়তো এসব

জিনিস এমন করে তাঁর নজরে পড়ে না। অবিশ্যি বড়দার বয়েসও হয়েছে। এসব নজরে পড়লেও, তদারকি আর তাঁর সামর্থ্যে কুলায় না। মেজদা তো চিরকালের উদাসীন।

এত বড় বাড়ির তদারক করা জোয়ান লোকের কর্ম। তাঁর সময় থাকলে হাত লাগাতেন এ কাজে। কিন্তু তিনি কি জোয়ান? জোয়ান ছাড়া কী? বয়স বেড়েছে, সেই জন্যই কি এই প্রশ্ন? এই সন্দেহ? তা বাড়ুক না বয়স। বয়স বাড়লেই লোক বুড়ো হয় নাকি? এখনও তিনি একটানা তিরিশ-চল্লিশ মাইল ঘোড়া দাবড়াতে পারেন। একটুও হাঁফ ধরে না। তাঁর হাতের রদ্দা খেলে এখনও জাঁহাবাজ বদমায়েস গুণ্ডা ত্রিভুবন অন্ধকার দেখে। এক জায়গায় বসে একটা গোটা পাঁঠা খেয়ে নিতে পারেন। পুরো এক বোতল বিলিতি মদ সাবাড় করলেও কর্তব্যে তিলমাত্র ত্রুটি হয় না। কালীগঞ্জে দুটো মেয়েমানুষ তাঁর বাঁধাই ছিল। না, বুড়ো হবার কোন লক্ষণ নেই, সময়ও নেই তাঁর। বুড়ো হতে যাবেন কোন্ দুঃখে!

তাঁর হাতে যে সময় নেই, নইলে বাড়িটার ছিরি ফিরিয়ে দিয়ে যেতেন। তবে, ছোটকর্তা মনে মনে ঠিক করলেন, ঝিনেদায় যদি কালীগঞ্জের মত অতদিন থাকতে পারেন, যদি তাঁকে হুট্ করে বদলি না করে, তবে বাড়ি-ঘরের চেহারা পাল্টে ফেলবেন। এ কী কথা! তাঁরা এখনও সবাই জীবিত! এর মধ্যেই বাড়িটা, অনাথা বিধবার সম্পত্তির মত হয়ে উঠবে কেন? এ বাড়ির অবস্থা এখনই যদি এই হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে শেষ বয়সে দাঁড়াবেন কোথায়? ছেলেপুলেরা ভোগ করবে কী?

ছেলেপুলে? চকিতে ছোটকর্তার মনে হালকা একটা বেদনার ছাপ পড়ল। একটি মুহূর্ত মাত্র স্থায়ী হল সেটা, তারপর এক ফুঁয়ে উড়ে গেল। ছোটকর্তা মনে মনে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, সুধা, সুধাই তো এ বাড়ির ছেলে। আমরা থাকতে এ বাড়ির হাল যদি এই হয়, সুধা তা হলে দাঁড়াবে কোথায়?

নাঃ, বড়দাকে বলে যেতে হবে, বাড়িটা যেন মেরামত করে ফেলেন। যতদিন আমরা জীবিত আছি ততদিন দেওয়ানবাড়ি যেন দেওয়ানবাড়ির মতই থাকে।

এর আগেও তো মাঝে মাঝে বাড়িতে এসেছেন ছোটকর্তা। এসেছেন, কিন্তু কতক্ষণ আর থেকেছেন বাড়িতে! ছোটকর্তার প্রাণের টান, টানের

রশিটা তখন অন্যত্র অন্য গাছে টনটনে হয়ে বাঁধা ছিল। অন্য কোথাও, আর কিছুতে মন দেবার ফুরসত ছিল কোথায় ?

এবার সেই বাঁধা নিয়ম পালটে গেল। এই প্রথম, বাড়িটার উপর যেন তাঁর চোখ পড়ল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতে লাগলেন ছোটকর্তা। ঘুরতে ঘুরতে তিনি কুয়োতলায় এসে পড়লেন। ডবল চাড়ির কুয়ো। কিন্তু ভাঙতে ভাঙতে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, ভয় হয়, একদিন না একেবারে ধসে পড়ে। কুয়োতলাটায় ঢেঁকিশাকের জঙ্গল জমে গেছে। যে বাঁশের ডগায় বালতি বেঁধে জল তোলা হয়, সেটা এত পুরনো, এমন নড়বড়ে হয়েছে আর এমন মচমচ করে যে মনে হয় এই বুঝি সবসুদ্ধ মাথায় ভেঙে পড়ল। দেখে তো ছোটকর্তা অবাক। এ কুয়োয় তো মানুষ খুন হল বলে ! না না, এ সব চলবে না। বড়দাদাকে একটা পাকা ইঁদারা বানাতে বলে যেতে হবে। এমন ইঁদারা, যা পঞ্চাশ-ষাট বছর অনায়াসে টিঁকবে। সুন্দর একটা কপিকল লাগাতে হবে ইঁদারায়। তা হলে আর বাঁশের ঢেঁকিকলে জল তুলতে হাত ব্যথা হবে না কারও, মাথায় বাঁশ ভেঙে কারও মরার ভয় আর থাকবে না। সুধার বউ এসে কপিকলে জল তুলবে। মোটেই কষ্ট হবে না তার। সুধার নাতিরা এসেও সেই ইঁদারার জল খাবে। শুনবে তাঁদের ঠাকুরদাদার বাপ-কাকারা এই ইঁদারা বানিয়ে গিয়েছে। কী ছিল তাঁদের নাম ? অহি, মহি আর শীতল। তিন ভাই ছিল একেবারে হরিহর আত্মা। ছোটকর্তা ভাবলেন, ইঁদারাটার গায়ে তাঁদের নাম খোদাই করে রাখলে কেমন হয় ? যতদিন ইঁদারাটা থাকবে, ততদিন তাঁরা বেঁচে থাকবেন তাঁদের বংশধরদের মধ্যে। কত পুরুষ ধরে কে জানে ?

এ এক নতুন অনুভূতির স্বাদ পাচ্ছেন ছোটকর্তা। দিনরাত চোর ছেঁচড় ডাকাত, খুন জখম, জালিয়াতি জুয়াচুরি বাটপাড়ি, তদন্ত-তল্লাশি মামলা-মোকদ্দমা, কোর্ট-কাছারি নিয়েই তাঁকে পড়ে থাকতে হয়। নিয়ত বিচরণ করতে হয় হিংস্র নৃশংস রুক্ষ এক জগতে। তাঁর দিনরাতের ভাবনা থেকে স্নেহ প্রেম ভালবাসা একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেছে কবে !

আজ এ কী হল ? বুড়ির ছেলেটাকে কোলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে সে অপকর্ম করে দিল তাঁর পোশাকে। পাষণ্ডদমন খাকীর পোশাকটা ছাড়তে যেন বাধ্য করল তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সত্তার দারোগাগিরির খোলসটা যেন জোর করেই ছাড়িয়ে দিল ওই শিশু। তাঁর মধ্য থেকে বের করে আনল

স্নেহময় মমতাময় অন্য এক শীতলকে। এই নতুন শীতলের কোনখানেও আর দারোগাত্ব লেগে নেই। এই শীতল এখন পুরোপুরি এক গৃহস্থ, এক দাদু।

জীবনের এ এক নতুন স্বাদ পাচ্ছেন ছোটকর্তা। এক নতুন বর্ণ, নতুন গন্ধ, নতুন অর্থ। এই প্রথম তিনি বুঝতে পারলেন, হঠাৎ বুঝলেন, শুধুমাত্র দারোগাগিরিতেই, তার অশুচি পরিবেশেই, শেষ হয়ে যাবে না তাঁর জীবন। তাঁর যদি মৃত্যু হয় এখন, তবুও বিনষ্ট হবে না তাঁদের পারিবারিক জীবনের ধারা। আজ বুড়ির ছেলে হয়েছে, কাল সুধার ছেলে হবে, পরশু হবে চাঁপার। ওদের নাতিপুতি হবে। অনেক ঝরনার জল যেমন নানা স্রোতে বয়ে এসে একটা বড় নদীতে মেশে, তারপর আবার ছড়িয়ে যায় নানা শাখায় প্রশাখায়, বয়ে নিয়ে যায় মূলস্রোতের জলধারা, তেমনি ওরাও ছোটকর্তাদের বংশের ধারাটি বয়ে বয়ে নিয়ে মিশে যাবে হাজারটি পরিবারে। এই হাজারটি পরিবারের মধ্যেই তাঁদের অংশ কিছু না কিছু গচ্ছিত থাকবে। ছোটকর্তার অংশও থাকবে। অনেককাল থাকবে। হয়তো সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত। তার মধ্যে কারও না কারও চেহারায় কোন এক অজ্ঞাত, কী এক রহস্যময় প্রক্রিয়ার ফলে যখন তাঁর সাদৃশ্য দেখা দেবে, তখন সেই পুরুষের লোকেরা বলাবলি করবে: আরে! এর চেহারাটা দেখি শীতল দারোগার মত, অবিকল তাঁর মতই হয়েছে। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই গড়ন! হুবহু! কোন্ শীতল? না, ওই যে আমাদের দেশের ভিটেবাড়িতে অক্ষয় ইঁদারার গায়ে তিন ভাইয়ের মধ্যে যাঁর নাম আছে, সেই।

ছোটকর্তা লেখাপড়া বিশেষ শেখেন নি। তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এ জিনিস সঠিক কিনা, তা নিয়ে তাঁর মনে কোন প্রশ্ন দেখা দিল না। মন বরং বিনাদ্বিধায় এই সিদ্ধান্তই মেনে নিল। মেনে নিয়ে সুখ পেল।

বেলা পড়তেই এক জামবাটি গরম দুধ খেয়ে তিনি জিভ দিয়ে গোঁফ মুছতে মুছতে বারবাড়িতে এসে বসলেন। বড়কর্তা পাশার ছক পরিপাটি করে পেতেই রেখেছিলেন। একমাত্র শীতল এলেই এখন এই খেলা যা জমে। শীতল বড়কর্তার মনের মত খেলুড়ী। আগে অনেকেই এ খেলাটা জানত। তাঁদের অনেকে মরে ধরে যাওয়ায় বড়কর্তা এ পাট প্রায় তুলেই দিয়েছেন। আনাড়ীদের সঙ্গে খেলে সুখ হয় না।

শীতল এসে বসতেই খেলা শুরু হল। আর দু-চার দানের পরেই খেলা জমে উঠল।

ছোটকর্তার ইচ্ছে ছিল, খেলতে বসেই বাড়ি সারাবার কথাটা বড়কর্তার কাছে পাড়বেন। কিন্তু তার আগেই, বড়কর্তা এমন তেড়ে দান ফেলতে লাগলেন যে সামলাতে সামলাতে বাড়ির চিন্তা ছোটকর্তার মাথায় উঠে গেল।

অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরে এসেছে শীতল। বদলি হবার কথা ছিল মাগরোয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝিনেদাতেই বদলি হয়ে এল। ভালই হল, বড়কর্তা ভাবছিলেন এখন অবরে সবরে দেখা সাক্ষাৎটাও তো হবে। শীতল অবশ্যি বলছিল, এটা টেম্পোরারি বদলি। কবে কোথায় যেতে হয়, ঠিক নেই। বড়কর্তার ইচ্ছে ছিল, শীতলকে জিজ্ঞাসা করবেন, ঝিনেদায় পাকা বদলি নিতে পারবে কি না সে। কিন্তু বাপ রে, শীতল করছে কী? পর পর এমন সব মোক্ষম দান ফেলছে যে বড়কর্তা কাহিল। প্রায় পাকা ঘুঁটিও মারবে নাকি শীতল? অচিরেই পাশার দানে ডুবে গেলেন বড়কর্তা।

খাওয়ার ডাক যখন পড়ল, তখন দুই ভাইয়ের ধ্যান ভাঙল। ছোটকর্তা আজ সুবিধে করতে পারেন নি। দুটো দান চটিয়ে দিয়েছেন, একটা দানে হেরেছেন। কাজেই হারই হয়েছে তাঁর। হার হত না, যদি না মাঝে মাঝে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন। অন্যমনস্ক তিনি হতেন না, যদি গলাটা ভিজিয়ে নিতে পারতেন। এটা তাঁর গলা ভেজাবার সময়। একটি পাঁট দিশী টেনে যদি বসতে পারতেন, তো দেখতেন কোন্ শালা পাশা খেলায় শীতল দারোগাকে হারায়! বড়কর্তা তাঁর দাদা, দাদাদের সামনে মদ খেয়ে এসে বসতে তাঁর এখনও বাধে। সে জ্ঞানটা তাঁর আছে। সে জ্ঞানটা তাঁর আছে বলেই তৈরী হয়ে বসতে তাঁর বেধেছে। তাই তিনি বার বার অন্য-মনস্ক হয়ে পড়েছেন, খেলায় ভাল করে গা-ই লাগাতে পারেন নি। ভাল ভাল দান ফেলেও কাজের বেলায় গড়বড় করে ফেলেছেন। তাই তো হেরে গেলেন। এ তো প্রায় ষড়যন্ত্র করে হারানো। মেজাজটা খচে গেল ছোটকর্তার।

রাগের চোটে হার্মোনিয়মের ঘিয়ে-ঘিয়ে রীডের মত হাতির দাঁতের পাশা তিনটে নিয়ে দু হাতের তেলোয় এমন জোরে ঘষলেন যে সেগুলো খড়মড় করে আর্তনাদ করে উঠল। তারপর থপাস করে ওগুলোকে পাটির উপর ফেলে, বিরক্তি চেপে বেরিয়ে গেলেন।

এ বিরক্তি খাওয়াদাওয়ার পরও কাটল না ছোটকর্তার। একটা অস্বস্তি, একটা দুনিয়া-হারানো ফাঁকা ফাঁকা ভাব, মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। রাত নটা, সাড়ে নটা হবে। কালীগঞ্জ থানার হাবিলদার ব্যাটা এতক্ষণে বসন্ত সাউয়ের দোকানে খুব জমিয়েছে। তিনি তো নেই, আর কী, এখন ও ব্যাটাই রাজা হয়ে বসেছে। আর কালিন্দী মাগীও এতক্ষণে গণপতি বেনের পালোয়ান ছেলেটাকে বুকে তুলে নিয়েছে নিশ্চয়। হারামজাদী কি কম শয়তান! ছোটকর্তা জানেন, ইদানীং ছোকরাটা খুবই ঘোরাঘুরি শুরু করেছিল। কিন্তু তাঁর ভয়ে বেশীদূর এগোতে সাহস করে নি। জানে তো সবাই, সদ্য-বিয়োনো বাঘিনীর কোলে তবুও হয়তো শোওয়া যায়, কিন্তু শীতল দারোগার মেয়েমানুষের পাশে—একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আজ আর কালিন্দীর কোন ভয় নেই। বাঘ সরে গেছে চিরকালের মত। শিয়াল কুকুর এখন স্বচ্ছন্দেই চড়তে পারবে তার নাগরদোলায়। একথা চিন্তামাত্রই ছোটকর্তার গায়ে বিরক্তি যেন বিছুটির চাবুক মারল।

মরুক গে কালিন্দী। যার সঙ্গে খুশি শুগ্‌গে যাক। কিন্তু তিনি এই রাতটা যাবেন কার কাছে? অনেক কাল গ্রাম ছাড়া। তাঁর ভাবের মানুষ যে ছিল, সে অনেক দিন আগেই এ পথ ছেড়ে ধর্মে মতি দিয়েছে। আগের বারই তা দেখে গিয়েছেন। তিলক কেটে কণ্ঠি পরে সে এখন গোঁসাই বষ্টুমি হয়েছে। এ গ্রামে তার এখন মান সম্মান খুব। যত ব্যাটা বদমায়েস কৃতকর্মের যন্ত্রণার হাত এড়াতে তার পায়ে হত্যে দিতে যায়। ছোটকর্তার কাছে সত্যিই এ একটা বড় বিস্ময়! কী করে লোকের এমন আশ্চর্য পরিবর্তন হয়! মানুষ চরিয়ে খেতে হয় ছোটকর্তাকে। আসল নকল চিনতে ভুল হয় না। গোঁসাই বষ্টুমির ধর্মে কর্মে এক ফোঁটাও খাদ নেই। সে তিনি সেবার তাকে নতুন রূপে দেখামাত্র বুঝতে পেরেছিলেন।

সেবারও এই রকম অনেক দিন বাদে বাড়িতে ফিরেছিলেন ছোটকর্তা। সন্ধ্যাবেলায় দেহের কামড়ে এমনি অস্থির হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন গোপালদাসীর কাছে। কিন্তু গোপালদাসীর বাড়িতে পা দেবামাত্র বুঝলেন অন্য কোথাও, অন্য কারও কাছে এসে পড়েছেন। বাড়িটাই শুধু বদলে যায় নি। মানুষটাও বদলেছে। ইস্তক ওর অথর্ব স্বামীটা পর্যন্ত।

বাড়িটায় সুন্দর একটা আখড়া বসেছে। গোপালের মন্দির হয়েছে। আরতি হচ্ছিল তখন। নানা রকম ফুলের সুবাস বাড়িময় ভুরভুর করছে।

আর পরিষ্কার তকতকে করে নিকানো উঠোন। কোথাও ছিটেফোঁটা ময়লা নেই।

ওখানে গিয়ে একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ছোটকর্তা। জুতো পায়ে উঠন মাড়াতেই বাধ-বাধ ঠেকল তাঁর। গোপালদাসীর জন্যে মিলের পাছাপেড়ে ফিনফিনে শাড়ি এনেছিলেন হাতে করে। একখানা শাড়ি, এক বোতল মদ, গোপালদাসীর আশ্চর্য সুন্দর একটা দেহ, এই ছিল ছোটকর্তার গ্রামে এসে একটা রাত কাটাবার উপকরণ। যখনই আসতেন ছোটকর্তা, দেখতেন, তার অথর্ব স্বামীটা বারান্দায় বসে বসে ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক খাচ্ছে। ছোটকর্তাকে দেখে এক মুহূর্তের জন্য ভুড়ুক ভুড়ুক থামাত জয়রাম, তার চোখে বিদ্বেষ আর ঘৃণা আর জিঘাংসার অদৃশ্য তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলাটা লিকলিক করে ছুটে বেড়াত। কিন্তু একটা শব্দও সে উচ্চারণ করত না। পর-মুহূর্তেই তার হুঁকো আবার ভুড়ুক ভুড়ুক ডাক ছাড়তে শুরু করত। কিন্তু সেই লিকলিকে হিংস্র ছুরির ফলাটা সে আর গুটিয়ে নিত না। তিনি তার সেই ধারাল চোখের উপর দিয়েই গট গট করে গোপালদাসীর ঘরে ঢুকে যেতেন। গোপালদাসী হাসতে হাসতে আসত। তাঁর জুতোর ফিতে খুলে দিত। কাচানো একখানা ছোটকর্তারই দেওয়া শাড়ি কাপড়-ছাড়বার জন্য এগিয়ে দিত। হাত মুখ ধোয়ার জল এনে বারান্দায় ছোট একটা জলচৌকি পেতে দিত, পরিষ্কার একখানা গামছা ভাঁজ করে মাজা চকচকে গাড়ুর মুখে রেখে যেত। ছোটকর্তা হাত মুখ ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে, গোপালদাসীর পরিপাটি করে পাতা নক্সিকরা, বড়, ফরসা কাঁথা দিয়ে মোড়া বিছানায় এসে আরাম করে বসতেন।

গোপালদাসী মুচকি হেসে ছোটকর্তার প্রাণ কেড়ে নিত। বলত, তিষ্টা পায়েছে বুঝি? শিকের উপরকার হাঁড়ির মধ্যি গিলাসটা আছে, পাড়ে নিয়ে তিষ্টা মিটোতি থাক। আমি তামুক সাজে আনি।

ছোটকর্তা এলেই গোপালদাসীর দেহে পিরীতের ঢল নামত। প্রবল সেই জোয়ারের টানে টানে সে একখানা নতুন সরার মত বাড়িময় যেন ভেসে ভেসে বেড়াত। আর আশ্চর্য, তাই দেখতে দেখতে ছোটকর্তার দেহের তাড়না একেবারে কমে যেত। ধীরে ধীরে যে নতুন অনুভূতিটার জন্ম হত তাঁর মনে সেটা রুক্ষ নয়, রাক্ষস নয়, সেটা অনেক স্নিগ্ধ, অনেক প্রাণ-জুড়ানো মন-ভরানো। তখন ছোটকর্তার কাছে শুধুমাত্র সুন্দর, আঁটসাঁট দেহসর্বস্ব

গোপালদাসীর আকর্ষণটা আর তত প্রবল থাকত না। এমন সুন্দর করে উঠন নিকুতে পারে যে গোপালদাসী, যে এত ভাল কাঁথা সেলাই করতে পারে, শিকে বুনতে পারে, এত ভাল কথা বলে যে, এত সেবা করে, যত্ন করে আবদার করে যে, সেই গোপালদাসী পাটরানীর রূপ ধরে ছোটকর্তার মনের সিংহাসনে বিরাজ করতে থাকত। মায়া মমতায় প্রেমে ছোটকর্তা কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়তেন, যেন পঙ্গুই হয়ে পড়তেন। অসাড় শিকারকে নিয়ে শিকারী বিড়াল যেমন খেলা করে গোপালদাসী তেমনি ছোটকর্তার শিথিল ব্যক্তিত্ব নিয়ে ইচ্ছেমত খেলা করত। পিরীতের মানুষের হাতে নিজেকে স্বেচ্ছায় এমন বিলিয়ে দিয়ে যে কী অপূর্ব সুখ, গোপালদাসীর মত ভাবের মানুষের সংস্পর্শে যে কখনও আসে নি, সে কী করে বুঝবে? এ সুখের কাছে ঘর সংসার, প্রতাপ প্রতিপত্তির সুখ বিলিতি মদের পাশে যেন বেলের পানা বলেই ছোটকর্তার মনে হত।

গোপালদাসী এমনি খানিক ছোটকর্তার সামনে নানা ছলে ঘুরে, খানিক খানিক করে ঘরের কাজ সেরে, প্রায় মাঝ রাত্রে এসে যখন হুড়কো বন্ধ করত, তখন যে লোকটি ঢুলু ঢুলু চোখে, তার বিছানায় মোটা একটা পাশবালিশ কোলে নিয়ে বসে বসে ঢুলত, সে কিন্তু ছোটকর্তা নয়; মদের নেশায় আর পুলকের আবেশে জরে-যাওয়া সে একতাল পুতুল-গড়ানো মাটি। গোপাল-দাসীর কারিগরিতে সেই মাটি থেকে একটা নতুন পুতুল জন্ম নিত। গোপালদাসীর দেহের উত্তাপে তাতে নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হত। ভোর-রাত্রে একটা নতুন ছোটকর্তা, বন্দর থেকে রঙ-ফেরানো জাহাজের মত, বেরিয়ে যেত গোপালদাসীর বাড়ি থেকে। পুবের পাড়ার মুসলমান-বাড়ির রাতপ্রহরী কুঁকড়ো কোঁকর কোঁ ডাক ছেড়ে তাকে স্বাগত করত।

কিন্তু অভ্যাসবশে, দীর্ঘকালের অনুপস্থিতির পর, গোপালদাসীর বাড়িতে পা দিয়েই ছোটকর্তা দেখলেন, আগেকার দুনিয়ার যাবতীয় দলিল তামাদি হয়ে গিয়েছে। পিছন ফিরে গেরুয়া কাপড় গায়ে জড়িয়ে গোপালের আরতি করছে গোপালদাসী, না না, গোঁসাই বষ্টুমি। ভক্তবৃন্দ তাকে ঘিরে বসে আছে। বারান্দায় জয়রাম বসে। তার স্থাণুদেহেও পরিবর্তনের রঙ লেগেছে। পাতলা পাতলা লম্বা চুলে ঝুঁটি বাঁধা। গায়ে নামাবলী। কপালে তিলক। গলায় তুলসীকাঠের মালা। হুঁকোর শব্দ স্তব্ধ। ছোটকর্তার দিকে চেয়ে জয়রাম হাসল। তার চোখের ছুরি কোথায় গেল?

পুষ্পচন্দনে সুবাসিত সেই পরিবেশে সেদিন অনধিকার প্রবেশ করে ছোটকর্তা বিলক্ষণ বোকা বনে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখের মদের গন্ধ, দেহের ঘামের গন্ধ যেন চারিদিক থেকে তাড়া খেয়ে আশ্রয় নেবার জন্য নিরীহ পোষা কুকুরের মত তাঁরই চারপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বিলাতী মিলের মিহি শাড়ির মোলায়েম ভাঁজের মধ্যে লুকনো মদের বোতলটির কাঠিন্য এই প্রথমবার নিজের অস্তিত্ব জাহির করল।

ছোটকর্তা কী আর করবেন, চুপচাপ সেই উঠনের এক পাশেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

আরতি শেষ হল। সবাই হরিধ্বনি দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল। গোঁসাই বষ্টুমি চরণামৃতের পাত্রটা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই ছোটকর্তার সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাই বষ্টুমির চোখ মুখে হাসির আলো জ্বলে উঠল। এ বড় স্নিগ্ধ আলো। এতে আভা আছে, তাপ নেই। এ হাসি ছোটকর্তার অচেনা।

দেখেই ছোটকর্তা বুঝলেন, এ হাসির বয়স অনেক, চরিত্রও ভিন্ন। যার মুখে এ হাসি ফুটল, সে লোক আর যেই হোক, ছোটকর্তার সেই আগের মানুষটি নয়। ছোটকর্তার মনে ক্ষোভ হল না, তাঁর রাগও হল না। একটা আশা নিয়ে, একটা পিপাসা নিয়ে এসেছিলেন তিনি। সে আশা মেটবার সম্ভাবনা নেই বুঝে তাঁর মনে হঠাৎ একটা শূন্যতার সৃষ্টি হল। তারপর প্রচণ্ড ক্ষিদের সময় খাদ্য না পেলে পাকস্থলিতে যেমন জারক রস ঝরে ঝরে পড়ে, তেমনি তাঁর শূন্য মনে বেদনার রস ঝরে পড়তে লাগল।

গোঁসাই বষ্টুমি ধীরে সুস্থে ভক্তবৃন্দের হাতে চরণামৃত বিলোতে বিলোতে এক সময় ছোটকর্তার সামনেও এসে দাঁড়াল। বলল, খুব তিষ্টা পায়েছে না? হাত পাত তো, ন্যা'ও তো এই চন্নামেত্ত, দেখ তো তিষ্টা মেটে কি না?

এতক্ষণে নিজেকে ফিরে পেলেন ছোটকর্তা। কী ভাবে আমাকে, অ্যাঁ! আমাকেও কী ওদের দলে চালান করে দিল? না কি ঠাট্টা করছে বষ্টুমি? প্রবল একটা অট্টহাসি বুকের ভিতর থেকে ঠেলে বেরুতে চাইল। কিন্তু না, বষ্টুমি ঠাট্টা করে নি। ওর মুখে, চোখে, ওর ঠোঁটের, কোথাও ঠাট্টা নেই। সেখানে গভীর এক বিশ্বাস। তাই আকাশ-ফাটানো হাসিটা আর হাসলেন না ছোটকর্তা। বষ্টমির এই গভীর বিশ্বাসটাই যে একটা চরম রসিকতা

ও বেচারী তা জানে না। বোধ করি ভেবেছে, এই এক ফোঁটা চরণামৃতে জগাই-মাধাইয়ের মত ছোটকর্তাও উদ্ধার হয়ে যাবে।

গোঁসাই বষ্টুমির মুখে সেই হাসি। হাতে ছোট্ট একটা পঞ্চপাত্রের হাতা। সেই হাতায় সুবাসিত চরণামৃত এক ফোঁটা শিশিরবিন্দুর মত টলটল করছে। হাতাটা সে এগিয়ে ধরল ছোটকর্তার দিকে। ভক্তবৃন্দেরা অধীর আগ্রহে, কী হয় দেখবার জন্য, স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাঁদের দিকে। ছোটকর্তার খুব মজা লাগল এই খেলা দেখে। একবার ভাবলেন, চলে যাবেন। কিন্তু গোঁসাই বষ্টুমির মুখের দিকে চেয়ে সে ইচ্ছে চলে গেল তাঁর। ছোটকর্তার উপর কত গভীর আস্থা যে বষ্টুমি রাখে, তা তার মুখে আঁকা রয়েছে। সে যদি চরণামৃত না দিয়ে বিষও দেয়, তবুও সেটা ছোটকর্তা তার হাত থেকে অম্লানবদনে নিতে পারেন। বষ্টুমির মুখে সে কথা যেন পাকা কালিতে লেখা রয়েছে। এ বিশ্বাসটা ভেঙে দেবার কথা মনে হতেই ছোটকর্তার মনে কষ্ট হল। ছোটকর্তার বয়স হয়েছে। ও সব চ্যাংড়ামি করতে ইচ্ছে হল না। তা ছাড়া ওই গাড়োল ভক্তগুলোর সামনে বষ্টুমিকে অপদস্থ করতেও মন চাইল না ছোটকর্তার। তিনি হাত বাড়িয়ে চরণামৃতটুকু নিয়েই গলায় ঢেলে দিলেন। তারপরে আন্তরিকভাবেই বললেন: না গো, গোঁসাই বষ্টুমি, আমার তিষ্টা এতে মেটবে না।

গোঁসাই বষ্টুমি খুব খুশী হয়েছিল। বলেছিল, আজ না মিটুক, গুপাল একদিন তোমার তিষ্টা মিটোবেনই মিটোবেন। দেখো, এ আমি কয়ে দিলাম।

তারপর ভাঁজ-করা শাড়িটা দেখে ছেলেমানুষের মত খুশী হয়েছিল বষ্টুমি। বলেছিল, বেশ সুন্দর কাপড়খান, দ্যাও আমারে। আমি ওখান ছুপায়ে পরব। শাড়িটা দিতেই বষ্টুমি টের পেল ওর মধ্যে মদের বোতল আছে। তেমনি হাসি হেসেই সে বলেছিল, আমি সবই রাখে দিলাম। জয় গুপাল বলে শাড়ি সুদ্ধু হাত তুলে গোপালকে প্রণাম করল বষ্টুমি। ছোটকর্তাও হাঁটা দিলেন। যেতে না যেতেই পিছন থেকে ভক্তরা জয় জয় রাধে-কৃষ্ণ হরি হরি বোল বলে ধ্বনি দিয়ে উঠল।

এবার আর ছোটকর্তা হাসি চাপতে পারলেন না। ব্যাটারা ভেবেছে, নিশ্চয়ই ভেবে নিয়েছে, তাদের গোঁসাই বষ্টুমি আরেক অধমকে তরিয়ে দিলেন। হাঃ হাঃ হাঃ। খুব একটা মজার খেলাই খেললেন বটে। হাঃ হাঃ

হাঃ। হাসতে হাসতে তিনি টের পেতে লাগলেন সেই বেদনার ধারটা একটু একটু কমতে শুরু করছে।

পুরনো কথা মনে পড়তেই ছোটকর্তার বিরক্তি একটু যেন কমে এল। গোপালদাসীতে যে সুখ পেয়েছিলেন ছোটকর্তা, কালিন্দী তা দিতে পারে নি। আর কোন মেয়েমানুষ তা দিতেও পারবে না। পাম্পশু'র সুখ কী চটি জুতোয় মেলে! তা না মিলুক, তবু চটিতেও তো পা বাঁচে। তাই গোপাল-দাসী ধর্মে কর্মে মন দিতে, বৃথা হা-হুতাশে কালক্ষেপ করেন নি তিনি। কালীগঞ্জে বদলি হতে কালিন্দীকে জুটিয়ে নিয়েছিলেন। সে ছাড়া আরও একজন ছিল। কালীগঞ্জের সঙ্গে তিনি এখন তাঁদেরও ছেড়েছেন।

গোপালদাসীর কথা তাঁর মনে পড়ল আজ। কিন্তু বিশেষ কিছু আলোড়ন তুলল না। দেখবার ইচ্ছাও জাগল না মনে। এই গ্রামে, আর কোনও মেয়েমানুষের সন্ধান তিনি আপাতত রাখেন না বলেই তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। এখন সে বিরক্তি কিছুটা কমল।

কিন্তু শরীরের অস্বস্তি গেল না। হজমের ওষুধ পেটে পড়ল না, ওদিকে গুচ্ছের হাবিজাবি গিলে পেট এখন গজগজ করছে। ম্যাজম্যাজ করছে সর্বাঙ্গ। শরীরের বাঁধনটাই ঢিল হয়ে গেছে। একটা বড় বিছানার বাণ্ডিল শক্ত করে না বেঁধে কাঁধে করে বয়ে নিতে যেমন অসুবিধে লাগে, ছোটকর্তারও শরীরটা বয়ে বেড়াতে তেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল।

সঙ্গে করে কিছু আনেন নি। সেইটেই মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছে। ভেবেছিলেন বেলা পড়লে লোহাজাঙ্গায় যাবেন, নবীন তাঁতির বাড়ি। নবীন ছোটকর্তার বহুদিনের সঙ্গী। তার ঘরে সরঞ্জাম সব সময় মজুত থাকে।

গেলেই হত লোহাজাঙ্গায়। বাজে কাজে সারাদিন সময় নষ্ট হল। এখন এত রাতে আর যাওয়া যায় না। গায়ে গতরে ব্যথা ধরেছে এতটা পথ ঘোড়া ঠেঙিয়ে। এখন বাসিমুখে কোথাও বেরুবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন ছোটকর্তা। দু-এক ঢোঁক গিলতে পারলেও উৎসাহটা চাঙ্গা হয়ে উঠত। এমন নিরামিষ রাত বহুদিন তিনি কাটান নি।

বারবাড়িতে তক্তাপোশের উপর বিষণ্ণ মনে দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে ছোটকর্তা রামকিষ্টোকে ডাক দিলেন। ডাক শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল

রামকিষ্টো। এ বাবা ছোটবাবু, একেবারে কাঁচাখেগো দেবতা। পান থেকে চুন খসলেই অনর্থ।

রামকিষ্টো বলল, ছোটবাবু, ডাকলেন?

ছোটকর্তা বললেন, হ্যাঁ। গা হাত পা একটু টেপেক তো। বড্ড চাবাচ্ছে।

রামকিষ্টো ছোটকর্তার হাত পা যত্ন করে টিপতে লাগল। বেশ আরাম পেলেন ছোটকর্তা।

জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর এদিককার খবরাখবর কী, ক'দিনি একটু শুনি। আছিস কেমন?

রামকিষ্টো ফোঁস করে লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলল।

বলল, আর খবর? কী বা ক'ব ছোটবাবু, অভাব অভিযোগ সে তো লাগেই আছে। ধান পাটের দর নেই। ম্যালোয়ারি আমাগের চিবোয়ে ছিবড়ে বের করে ফেলতিছে। কী সব চিহারা ছিল এক-একজনের, আর কী হয়ে দাঁড়াচ্ছে! হাত পা কাঠি-কাঠি। রক্তশূন্যি। পেটটা ডাগর-ডাগর। এক-একজন যেন তালপাতার সিপাই। সুখ আর কোনদিকিই নেই। দাঙ্গা কা'জেটাই এ দিগরে ছিল না, ইবার সিটাউ বোধ হয় হয়ে ছাড়বে?

দাঙ্গার নাম শুনে ছোটকর্তা উৎকর্ণ হলেন। এতক্ষণ পরে তাঁর দারোগা-সত্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। গোঁফে চুমকুড়ি দিতে দিতে যেন ক্রমশ সজাগ হয়ে উঠতে লাগলেন।

বললেন, দাঙ্গা! দাঙ্গা বাধাচ্ছে কিডা?

গলায় যেন শ্রাবণের মেঘ ডেকে উঠল।

রামকিষ্টো বলল, কিডা আবার বাধাবে! অবস্থা গতিকি বা'ধে যাতি পারে।

ছোটকর্তা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। এই একটা মহৎ দোষ ব্যাটার। আসল কথায় আসতে আসতে রাত পুইয়ে দেবে।

রামকিষ্টোকে ধমক মারলেন ছোটকর্তা।

বললেন, কথাগুলোরে দাঁতের ফাঁকে না পুষে বাইরি ছা'ড়ে ছ্যাও। কী, দাঙ্গা করার শখটা চাপল কার?

রামকিষ্টো বলল, নিকিরিগের সঙ্গে গুপাল বিশ্বেসগের। নিকিরিরা

আলাদা হাট বসাবে এই হাটের দিন। গুপালবাবুরা নাকি ভাঙে দেবে সিডা। ভুঁয়ে মশাই, বিশ্বেসগের দলের পাণ্ডা হয়েছেন। ধনেশ্বর গাত্তির উদিকির থে নাকি নমসুদ্দুর লাঠেল আনায়েছে। এই তো সব শুনতিছি। ইবার রক্তারক্তি একটা না হয়েই নাকি যায় না।

রামকিষ্টো ছোটকর্তার গা হাত পা টিপতে টিপতে সমস্ত ঘটনা বলে ফেলল। সব শুনে ছোটকর্তা গুম মেরে পড়ে রইলেন। মেজকর্তার মত বিচলিত হলেন না তিনি। মনে মনে সিদ্ধান্ত করে ফেললেন, সুখে থাকতে যখন ভূতের কিল খাবার সাধ হয়েছে, তখন ব্যাটাদের ত্যালানি নিশ্চয়ই বেড়েছে। এক-একজন মহামাতব্বর হয়ে উঠেছে দেখছি।

রামকিষ্টো বলল, ছোটবাবু, পরশুদিন হাট। তোড়জোড় যে রকম, বুঝি বা রক্তারক্তি সত্যিই ঘটে যায়। নিকিরিরাও তো ছাড়ে কথা কওয়ার লোক না।

এতক্ষণ ছোটকর্তার শরীরটা ঠাণ্ডাই ছিল। রামকিষ্টোর অভ্যস্ত হাতের টিপুনিতে বেশ আরাম আরাম লাগছিল। রামকিষ্টোর ঘ্যানর ঘ্যানরেও তাঁর মৌজ নষ্ট হয় নি। কিন্তু এখন তার শেষ কথাটা ঝিমিয়ে-পড়া দারোগার পেটে ঢুঁ মেরেই যেন তন্দ্রাভঙ্গ করল। বলে কী ব্যাটা! পরশুদিন এখানে হাঙ্গামা বাধবে? খুন জখম হবে? তার মানে সব ঝামেলা এসে পড়বে তাঁর ঘাড়ে। তখন তদন্ত কর রে, আসামী ধরে চালান দাও রে, ফেরারীদের পিছু পিছু কুকুরের মত তাড়া করে বেড়াও রে, কেস তৈরি কর, মামলার তদ্বির কর, হাজারো বখেড়া। গ্রামের কেস, একটি আধলা আমদানি হবে না। কোন শালা তো একটি পয়সা উপুড়হস্ত করবে না। শুধু নাকের জলে চোখের জলে হওয়াই সার হবে।

খপ করে ছোটকর্তার মাথায় আগুন জলে উঠল। হাত নিসপিস করতে লাগল। শালারা ভেবেছে কী? দেশ অরাজক হয়েছে? কার রাজত্বে বাস করছে, সেটা ভুলে গিয়েছে সব? আচ্ছা, শীতল দারোগা কাল সকালেই সেটা মালুম পাইয়ে দেবেন। তাঁর সঙ্গে চালাকি!

দাঙ্গা হাঙ্গামায় অরুচি নেই দারোগাদের। ছোটকর্তারও না। কায়দা-কানুন রপ্ত আছে ছোটকর্তার। অধিকাংশ সময় হাঙ্গামা মিটে গেলেই ঘটনাস্থল থেকে ডাক আসে। তাতেই সুবিধে। ধীরে সুস্থে তদন্ত করা

যায়। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা যায়। এ বিষয়ে একটা প্রধান নিয়ম হচ্ছে, দারোগা যত পুরনো হন, তাঁর হাতে তত নিরীহ লোক গ্রেপ্তার হয়। কারণ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, দুর্বল নিরীহ লোকদের মধ্যেই নালিশ করার প্রবণতা বেশী দেখা যায়। নিজেদের রক্ষা করার মুরোদ নেই, তাই রাজার কাছে আশ্রয় চাইতে থানায় এসে আছড়ে পড়ে। রাজা তো বিলেতে থাকেন, তাঁর নাগাল পাবে কোথায়? তাই দারোগা-বাবুর সুখ শান্তিই নষ্ট করে এসে। তার দাওয়াই তাই বের করতে হয়েছে। কারণ ব্রিটিশের রাজত্ব আইনের রাজত্ব। আর আইনের চোখে তো সবল দুর্বল নেই, সবাই সমান। সাহায্য একবার চেয়ে বসলে, সে সাহায্য দিতেই হবে। না দিলে চাকরি নিয়ে টানাটানি। তাই ঘাঘু দারোগা সুযোগ পেলেই নিরীহ লোকেদের ধরে বেঁধে থানায় টেনে আনেন। তারপর বিধিমতে তাদের উপর এমন অব্যর্থ সব দাওয়াই প্রয়োগ করেন যে, প্রাণ গেলেও তারা আর থানামুখো হয় না, ফলে দেশের লোকের মনে ঈশ্বরভক্তি বাড়ে। তারা যীশুখ্রীষ্টের মত ক্ষমাশীল হয়। রিপোর্টের খাতায় কমপ্লেন আর জমতেই পায় না। আখেরে দারোগাবাবুদের প্রমোশন হয়।

রামকিষ্টোর কথা শুনে ছোটকর্তার রাগ হল দুটো কারণে। প্রথম কারণ, হাঙ্গামাটা পাকালোই যদি, তবে তাঁর নিজের গ্রামে কেন? আর কি গ্রাম ছিল না তাঁর থানার এলাকায়? আর দ্বিতীয় কারণ, হাঙ্গামাটা শেষ পর্যন্ত যদি তাঁর গ্রামেই ঘটছে, তবে এত তাড়াতাড়ি কেন? এখনও তিনি থানায় গিয়ে বসেন নি। সমঝোতা হয় নি ছোট দারোগার সঙ্গে, হাবিলদার সিপাই-দের সঙ্গে। কেন, পরশু দিনটা পঞ্জিকার কী এমন শুভদিন যে, ওই দিনে দাঙ্গা না বাধালে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

ওসব কিছু নয়, আসলে এইসব হাঙ্গামা ঘটিয়ে ছোটকর্তাকেই বে-ইজ্জত করবার মতলব ফেঁদেছে ব্যাটারা। মেদা ব্যাটার পেয়ারের দারোগা হঠাৎ বদলি হয়ে গেল, তার জায়গায় ছোটকর্তা এসেছেন তো, ব্যাটা খবর পেয়েছে, ভেবেছে, আচ্ছা, হোক শীতল দারোগা জব্দ। আর ওই ব্যাটা বুদো, ইঁচড়ে পাকা, আপনি-মোড়ল, ওটা তো বহুদিন থেকেই তক্কে তক্কে আছে, কী করে দেওয়ান বাড়ির লোকেদের একটু অপদস্থ করা যায় তার চেষ্টায়। এ বাড়ির লোকের উন্নতি দেখলে তোমার বুকে টিকের আগুন জ্বলে ওঠে বুদো, না? তোমার বাবা ব্যাটাও খুব জ্বালিয়ে গেছে আমাদের। দাঁড়াও দেখাচ্ছি,

টের পাওয়াচ্ছি তোমাদের শীতল দারোগার জোড়ন কারে বলে। শীতল দারোগার ওই নামটাই শীতল, বুঝেছ, নাদনাখানা গরম। কত গরম, এবার টের পাবে।

ছোটকর্তা বললেন, রামকিষ্টো, কাল সকালে উঠেই গহরের বাড়ি যাবি। বলবি, ছোটবাবু ঝিনেদায় বদলি হয়ে আয়েছেন। এ খবর তাঁর কানে পৌঁছান মাত্তর তিনি বাড়িতি এসে গেছেন। যদি পিরানে বাঁচার সাধ থাকে, এক প্রহরের মধ্যিই মেদ্দার গদিতে গিয়ে হাজির হও। আর বুদোরে গিয়ে কবি, ও যেন বিশ্বেসগের দুকানে হাজির থাকে। যা এখন। এক ছিলিম তামাক সাজে দিয়ে যাস।

রামকিষ্টো ভয়ে ভয়ে তামাক সেজে দিল। বুঝল, ছোটবাবু এর মধ্যেই বদলে গেছেন। এ হল সেই ছোটবাবু, যার নামে ত্রিভুবন থরহরি কম্পমান।

প্রাণভরে তামাক টেনে ছোটকর্তা শুতে চলে গেলেন। অনেক দিন, প্রায় দশ বছর পরে নিজের খাটে শুতে উঠলেন। ওর মধ্যেও তাঁর নজরে পড়ল, আজ জোড়া বিছানাই পাতা হয়েছে। কেন জানি, কেমন যেন একটু বাধ বাধ ঠেকতে লাগল তাঁর। যার-তার সঙ্গে শোয়াই এতদিন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। আজ যেন নিয়ম ভঙ্গ। অনেক দিন পরে পুরনো অভ্যাসে ফিরতে হচ্ছে। যেন দশ বছর আগে ব্যবহার করা জুতোয় আবার নতুন করে পা গলাতে হচ্ছে। পা ঢুকেছে ঠিকই, তবু কেমন অস্বস্তি ঠেকছে।

এই নতুন অবস্থায় পড়ে, ছোটকর্তার মন থেকে হাঙ্গামার চিন্তা আপাতত মুছে গেল। ছোটবউ এখনও ঘরে আসে নি। ওদের কাজ সারা হয় নি এখনও, সারাদিনের পরিশ্রম আর উত্তেজনার পর এখন অবসাদ যেন ছোটকর্তাকে কোলে তুলে নিল। এই বিছানা কে পেতেছে, ছোটবউ? ছোটবউ এমন পরিপাটি করে বিছানা পাততে পারছে তা হলে? তা হলে তো সত্যিই সেরে গেছে। আগের মতই হয়ে উঠেছে আবার। শরীর এলিয়ে আসছে ছোটকর্তার। কিন্তু পাগল হবার আগে ছোটবউ কেমন ছিল? যাচ্চলে, এ আবার কী কথা!···একটা হাই তুললেন ছোটকর্তা। কী কথা মানে, তখন ছোটবউ কেমন ছিল, সেটা না জানলে, এখন সে আগের মত হয়েছে কিনা, বুঝবেন কী করে? কেমন করে তখন বিছানা পাতত ছোটবউ? খাবার জল ঢাকা দিয়ে রেখে যেত, না শুতে আসার সময় সঙ্গে করে আনত?

কই, মনে তো পড়ছে না। গোপালদাসী জলের গেলাস হাতে করেই ঢুকত, সেটা মনে আছে। কালীগঞ্জের ওই খানকীগুলোর ওসব বালাই ছিল না, মদে চুর হয়ে বিছানায় পড়ত হারামজাদীরা, সেটাও মনে আছে। কিন্তু ছোটবউ এক্ষেত্রে কী করত, সেটা তো মনে নেই। কিছুতেই মনে পড়ছে না। মসলা-দেওয়া পান এনে গোপালদাসী তাঁর মুখে দিত। হেসে হেসে বলত, মুখির গন্ধ না গেলি কি চলে! কালীগঞ্জের মাগীগুলো তো নিজেরাই এক-একটা ভাঁটিখানা, এসবের সাড় থাকবে কোত্থেকে! কিন্তু ছোটবউয়ের তো সাড় ছিল। তিনি যেদিন মদ খেয়ে আসতেন সেদিন ছোটবউ কি তাঁকে পান খাওয়াত, নাকি মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে থাকত? কিছুই মনে নেই। তিনি যেদিন জেগে থাকতেন, সেদিন ছোটবউ ঘরে ঢুকে কি তাঁর সঙ্গে কথা বলত? যেদিন ঘুমিয়ে পড়তেন, সেদিন এসে কি জাগাত তাঁকে? কী আশ্চর্য, কিছুই যে মনে নেই। পর পর দুবার হাই তুললেন ছোটকর্তা। মট মট হাতের আঙুল মটকে নিলেন।

তা হলে? তা হলে তিনি কী করে বুঝবেন কতখানি ভাল হয়েছে ছোটবউ? এখনও পর্যন্ত কাছে পান নি তাকে। ওই যা এক ঝলক তখন দেখা হয়েছে। বুড়ির ছেলের পাশে শুয়ে ছিল। তিনি ঢুকতেই ঘোমটা টেনে সরে গেল। একটুখানি তাকিয়েছিল যেন তাঁর দিকে। তাকিয়েছিল কি? ঠিক মনে পড়ছে না। তবে বাঁধা পাগল তো আর নেই। তা হলে তিনি এ ঘরে শুতে পারতেন কী করে? এখানেই তো শিকল তুলে আটকে রাখা হত তাকে। যতবার এসেছেন এর আগে, একই দশা দেখেছেন। এই ঘরেই সে থেকেছে দশটি বছর। হেসেছে, কেঁদেছে, খেলেছে, চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করেছে। একগাদা লোকের সামনে উদোম হয়ে ধেই ধেই করে নেচেছে। বদ্ধ পাগল ছিল তখন।

প্রথমবার এসে ছোটবউয়ের এই অবস্থা দেখে মুষড়ে পড়েছিলেন ছোটকর্তা। প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিলেন মনে। কী করবেন বুঝে উঠতে পারেন নি। যে ছিল তাঁর বউ, সে হল পাগল। তাঁকে লাথি দেখায়, কাছে এগুতে গেলে গায়ে থুথু ছোঁড়ে, আদর করে বশে আনতে গেলে কামড়াতে আসে। মারে। সমস্ত বাড়িটাকে অস্থির করে তুলেছিল।

ছোটকর্তার মনে পড়ল, সেই বিশ্রী ঘটনার কথা। তাঁরা বারবাড়িতে বসে ছিলেন। অনেক লোক ছিল সেখানে। ছোটবউকে দিদি আর বউদি

বোধ হয় চান করাতেই নিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তাদের হাত ছাড়িয়ে ছোটবউ বারবাড়িতে এসে পড়ল। একটানে পরনের কাপড় খুলে ফেলে এমন কুৎসিত সব কাণ্ড করতে লাগল যে, ছোটকর্তাদের মাথা কাটা গেল। বড়দা পাঁচজনের মধ্যে বসে দু হাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠলেন, শীতু শীতু, তুই উটারে ভিতরে নিয়ে যা। ছোটকর্তা বুঝতে পারলেন, বড়কর্তা গলার স্বরে জমাট ঘৃণা ছুঁড়ে দিলেন। পিছন থেকে কে যেন হাসি চাপতে পারল না। ছোটকর্তা যেন কী হয়ে গেলেন! তাঁর মনে ছোটবউয়ের প্রতি সহানুভূতি আর সমবেদনার যে উৎসটি সজীব ছিল, সেটি চট করে, সেই মুহূর্তেই শুকিয়ে গেল। ছোটকর্তা দেখলেন, তাঁর স্ত্রী, তাঁর সাত পাকের বউ, তাঁরই চোখের সামনে, সেই বারবাড়ির উঠন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর পলক না পড়তেই কোন জাদুকর ঠিক সেখানে রেখে গেল মনুষ্যাকৃতি এক কিম্ভূতকিমাকার একটা জানোয়ারকে। ছোটকর্তা দ্রুত পায়ে উঠনে নেমে গেলেন, বিনা দ্বিধায় সেই জানোয়ারটার মানুষের মত সরু ঘাড়ে মারলেন তাঁর অসুরের মত হাতের এক প্রচণ্ড ধাক্কা। সেই জানোয়ারটা ছিটকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ছোটকর্তা অবলীলাক্রমে তাকে দুই হাতে মাথার উপর তুলে নিলেন, তারপর ধানের বস্তার মত ভিতর বাড়ির উঠনে ছুঁড়ে দিলেন। সেটা ঝুপ করে মাটিতে পড়ল। কোত্থেকে যেন রক্ত পড়ছিল, ঠিক খেয়াল ছিল না। হয়তো কোথাও কেটে গিয়েছিল সেটার, হয়তো হাত পা ভেঙে গিয়েছিল। ছোটকর্তা ভিতরবাড়িতে ঢুকে সেই কুণ্ডলী-পাকানো মাংসের পিণ্ডে খুব জোরে মারলেন একটা লাথি। একটু উল্টে গেল সেটা। তারপর আরেকটা লাথি মেরেছিলেন কি না, তাঁর ঠিক স্মরণ নেই। কুকুর বিড়ালকে আমরা যখন মারি, তখন ক'ঘা মারি তার কি হিসেব রাখি! তাই ছোটকর্তা সঠিক বলতে পারবেন না আরেকটি লাথিও মেরেছিলেন কি না। কিংবা, হঠাৎ অনেকগুলো লোক (কত লোক তাও তাঁর খেয়াল ছিল না) তাঁকে সেদিন পাঁজাসাপ্টা করে ধরে না ফেললে ওই জন্তুটাকে তিনি থেঁতলে ফেলতেন কি না, তাও জানেন না।

শুধু এটা জানেন, ওই ঘটনার পর থেকে ছোটবউ সম্পর্কে কোন আগ্রহ, কোন ঔৎসুক্য ছোটকর্তার মনে আর জাগে নি। তাঁর মনে ছোটবউয়ের জীবন্ত অস্তিত্বটি যেন শীলাপাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ছোটকর্তার যে

মনটি স্ত্রীর প্রেমে, তাঁর ভালবাসায় উষ্ণ হয়ে থাকত, এই ঘটনার পর সেটি যেন মৃত উনুনের মত শীতল হয়ে গেল।

হয়তো এই কারণেই, এখন, ছোটকর্তা বিছানায় শুয়ে স্মৃতি খুঁটেও এমন কোন চিহ্ন, কোন নিশানা খুঁজে পাচ্ছেন না, যা দিয়ে আগেকার ছোটবউয়ের সঙ্গে এই ছোটবউকে মিলিয়ে নিতে পারেন।

হঠাৎ ছোটকর্তার সমস্ত ভাবনা বন্ধ হয়ে গেল। এক সময় অপ্রস্তুতভাবেই টুপ করে ঘুমের গভীরে তলিয়ে গেলেন। তাঁর চৈতন্যের উপরতলে নানা ভাবনার যে ফাতনাটা এতক্ষণ ধরে টিপ টিপ করছিল, যেন এখন বিরাট ভারী এক মাছের টানে সোঁ করে সেটা অতলে তলিয়ে গেল। পরক্ষণেই আবার, তেমনিই হঠাৎ সেটা যেন ভুস্ করে ভেসে উঠল। ঘুম ছুটে গেল ছোটকর্তার।

ছোটবউ এসে যদি সেদিনের সেই অমানুষিক মারের কৈফিয়ত চায়, তা হলে ছোটকর্তা কী তার জবাব দেবেন? এই ভাবনাটাই গুঁতো মেরে আবার জাগিয়ে দিল ছোটকর্তাকে। কী বলবেন তিনি? সেই মারের পর ছোটবউ হাত পা ভেঙে অনেক দিন শয্যাশায়ী ছিল। একদিনের তরেও কোন অভিযোগ করে নি, আহত কুকুরও তো গোঙায়, কিন্তু ছোটবউ তাও করে নি। শুধু, তারপর থেকে, যে দু-একবার ছোটকর্তার কাছাকাছি হতে হয়েছে ছোটবউকে, সেই কয়বারই ছোটবউয়ের চোখের মণি দুটো ধীরে ধীরে জ্যামিতিক শূন্যের মত প্রাণহীন হয়ে উঠেছে। তাঁর দেহের স্নায়ুগুলো এক অভাবিত আক্রমণ, অকথ্য অত্যাচার সহ্য করার জন্য যেন প্রস্তুত হয়ে থেকেছে। ছোটকর্তা সেটা যেন এই মুহূর্তে আবিষ্কার করলেন, এই এতদিন পরে।

তাই বোধ হয় ছোটবউ তখন অমন বোবা দৃষ্টি ফেলেছিল তাঁর উপর। সত্যিই তাঁর পানে তা হলে ছোটবউ চেয়েছিল তখন! হ্যাঁ, এখন ছোটকর্তার মনে হল, তাতে আর কোন ভুল নেই।

উঃ, গরম লাগছে বড়। হাওয়া নেই। বাইরের মত ছোটকর্তার মনের মধ্যেও গুমোট। দারুণ অস্বস্তি লাগছে তাঁর। সময়মত ওষুধ পেটে পড়লে, এসব যন্ত্রণা কিছুই ভোগ করতে হত না। নেশার কাছে পুত্রশোকও জব্দ। বিকেলবেলায় নব্‌নের কাছে চলে গেলেই হত। ওই একটিমাত্র মনের বন্ধু, এক গেলাসের ইয়ার এখনও তাঁর আছে এই গ্রামে।

তার কাছে গিয়ে পড়তে পারলে এতক্ষণ আর ভাবনা থাকত না কোনও।

তা না করে, কতকগুলো ভাল ভাল ভাবের মোহে পড়ে সময় নষ্ট করলেন। এখন তার ফল ভোগ করুন।

ঘুম ভেঙেছে বটে ছোটকর্তার, কিন্তু চোখের পাতা এখনও খোলেন নি। চোখ বুজেই তিনি চারিদিক হাতড়াতে শুরু করলেন। পাখা-টাখা রাখে নি না কি? না, কোথাও পাখা পেলেন না। ছোটবউ যদি হাতে করে আনে একখানা, একটু যদি বাতাস করে, তবে এক্ষুনি তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু কোথায় ছোটবউ? আসছে না কেন? কত রাত এখন? হেঁসেলের কাজ কি মেটে নি এখনও?

নাকি ছোটবউ আসবেই না তাঁর কাছে? ভেবেছে হয় তো, কাছে গেলেই মার খাবে সেদিনের মত। সত্যি-সত্যিই তাই ভাবছে নাকি ছোটবউ? পাগল আর কাকে বলে?

সেদিন কি ছোটবউকে মেরেছিলেন ছোটকর্তা? মেরেছিলেন তো একটা পাগলকে। পাগল কি মানুষ? সে তো পশুর সমান। সে তো পশু। সেদিন ছোটকর্তা মেরেছিলেন তেমন এক পশুকে। মানুষকে কি কেউ ওভাবে মারতে পারে? ছোটবউয়ের কাছেই যেন বারবার কৈফিয়ত দিতে লাগলেন তিনি। না না, ছোটবউ, তোমার কোন ভয় নেই। এস, এস, তুমি স্বচ্ছন্দে উঠে এস খাটে। সরে এস আমার পাশে। এদিকে ফিরে শোও। দেখ তো, এই হাতের ভয় তুমি করছিলে তো! দেখ এবার, এই হাত কত আদর করতে পারে। কত কোমল, কত স্নেহময়, দেখছ তো! বউকে কি কেউ অমন করে মারতে পারে?

ছোটকর্তা জানতেও পারলেন না, কখন তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলতে লাগলেন ছোটবউয়ের সঙ্গে।

রান্নাঘরে মেয়েদের খাওয়াদাওয়া চুকল। হেঁসেলের পাট চুকিয়ে, কপাটে তালা এঁটে চাবিসুদ্ধ আঁচলটা ঝনাত করে পিঠে ফেলে বড়বউ ফিরে দাঁড়াতেই দেখলেন, ছোটবউ তখনও ল্যাম্পোটা ধরে তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বড়বউ সস্নেহে বললেন, কী লো ছোট, পান খাবি এট্টা?

ছোটবউ কথা বললেন না। বাধ্য মেয়ের মত ঘাড় নাড়লেন। বড়বউ

হেঁট হয়ে পানের বাটাটা তুলে নিলেন। একটা পান ছোটবউয়ের হাতে দিয়ে, একটা নিজের গালে পুরলেন।

বললেন, নে, খা।

ছোটবউ বিনাবাক্যে আদেশ পালন করলেন। বড়বউ আর দুটো পান তার হাতে দিলেন।

বললেন, ঠাকুরপো যদি খাতি চায় তারে দিস, কেমন?

ছোটবউ সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করলেন।

বড়বউ তাঁর থুতনিটা ধরে একটু নেড়ে দিলেন।

বললেন, যাও ভাই, অনেক রাত হয়েছে, শুয়ে পড়গে, কেমন? আমি বিছানা পাতে দিইছি।

ছোটবউ অমনি আদেশ পালন করতে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন। বড়বউ সেদিকে চেয়ে রইলেন। দেখলেন, ছোটবউ উঠনে নামা মাত্র কেমন অন্ধকারে মিশে গেল। একটুখানি এগিয়ে যেতে তাকে আর দেখা গেল না। শুধু কেরাসিনের ল্যাম্পোটার মোটা শিসটাই যেন কাঁপতে কাঁপতে পুবের ঘরে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বড়বউ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। চতুর্দশীর রাত ঘুরঘুট্টি। আকাশে লক্ষ তারার মেলা। অন্ধকার রাতে কত তারা দেখা যায়। বড়বউয়ের এইরকম রাতই খুব ভাল লাগে। তারাগুলো দপ দপ করছে। ওগুলো যেন লক্ষ এয়োতির কপালের টিপ। কেমন জীয়ন্ত। এর কাছে পূর্ণিমার চাঁদের স্থির আলো কিছু না, যেন বিধবার ধপধপে একখানা সাদা থান। রান্নাঘরের পিছনকার কেয়াঝোপ থেকে তীব্র গন্ধ আসছে। এই গন্ধে সাপেরা আসে। কী যেন একটা অন্ধকারে স্যাঁত করে সরে গেল! ভুলো কুকুরটা হবে বোধ হয়। ধপ করে তাল পড়ল কার বাগানে, একটা তারা ছুট হল আকাশে। ফেউ ডেকে উঠল গোয়াল জ্যেঠির বাগানে। ছোটকর্তার ঘোড়াটা বারবাড়ির গোয়ালে পা ছুঁড়ল খটখট। বুড়ির ছেলেটা খুত খুত করে কাঁদতে লাগল। না, আর না, বড়বউ ভাবলেন, যাই এবার, অনেক রাত্তির হল। কিন্তু মেজদির হয়েছে তো? আর কত পিঠে বানাবে?

বড়বউ ডাক দিলেন, ও মাজদি, হল?

শুভদা চুষির পায়েসের কড়াইয়ে হাতা দিয়ে ঘুঁটতে ঘুঁটতে জবাব দিলেন, এই যে রে মণি, হয়ে আয়েছে। আর-একটু।

বড়বউ নিরামিষ ঘরের বারান্দায় উঠে ভিতরে উঁকি দিলেন। বাস্ রে, কত পিঠে এর মধ্যে বানিয়ে ফেলেছে মেজদি, ঘর যে প্রায় ভরে গিয়েছে !

শুভদা বললেন, শীতুর কাণ্ড তো, হয়তো বিয়েনে উঠেই ঘুড়ায় জিন চাপায়ে কবে চললাম। তাই সব সারে রাখলাম।

একখানা পাটিসাপটা হাতে তুলে বড়বউয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে শুভদা বললেন, চাখে দেখ তো বড়বউ, নরম হয়েছে কি না ?

বড়বউ সভয়ে পিছিয়ে এলেন।

হাসতে হাসতে বললেন, আমি কি চাঁপা না ফুলি ? এত রাত্তিরি এসব পেটে গেলি কি আর বাঁচব ভাবিছ কাল ?

শুভদা বললেন, নে না লো, একখানা পাটিসাপটায় তোর আর কী এমন ক্ষেতি করবে ? চাঁপা ফুলি জাগে থাকলে তোরে আর সাধতাম না।

এমন সময় বড়বউয়ের ঘর থেকে চাঁপার আওয়াজ পাওয়া গেল।

আমারে ডাকতিছ না কি, ও পিসিমা।

বড়বউ আর শুভদা একসঙ্গে হেসে উঠলেন হো-হো করে।

বড়বউ বললেন, ন্যাও, তুমার চাখনদারের অভাব মিটিছে তো, ইবার আমি যাই। দেখো, রাত একেবারে শেষ করে দিয়ো না। তাড়াতাড়ি সারো।

চাঁপা চোখ মুছতে মুছতে চলে এল শুভদার কাছে।

শুভদা বললেন, আসো, আসো, লক্ষ্মী মেয়ে। এতক্ষণ আমার হাতই যেন চলতিছিল না।

ছোটবউ ঘরে এসে দেখলেন, তাঁর বিছানাটা অনেক চওড়া হয়ে গেছে আজ। আর ছোটকত্তার বিরাট শরীরটা সে বিছানার অনেকখানি জায়গা এলোমেলোভাবে জুড়ে রেখেছে। আর ঘড়াত ঘড়াত নাক ডাকছে তাঁর। তা হোক, তাতে অবশ্য এমন কোন মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয় নি। যে জায়গাটুকু খালি আছে, তাঁর রোগা পট্‌কা শরীরটুকু তাতেই এঁটে যাবে। এতক্ষণ তাঁর চলাফেরা বেশ স্বচ্ছন্দেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। বড়বউ চালাচ্ছিলেন, তিনি চলছিলেন। একটা পান মুখে দিয়ে, দুটো পান হাতে নিয়ে, যেমন যেমন বড়বউ বললেন, তেমন তেমন চলে তিনি ঘরে এসে পৌঁছলেন। এখন ও লোকটা যদি আবার নতুন করে কিছু হুকুম দিত তো ভালই হত, সেইমত

কাজই তিনি করতে পারতেন। কিন্তু ও তো ঘুমুচ্ছে। কিছুই বলছে না। ছোটবউয়ের স্বচ্ছন্দ গতির বাঁধা শড়কটা এখানে এসেই যেন ভেঙে গেল। এবার তাঁকে নিজের বুদ্ধিতে চলতে হবে। সেইটেই যা সমস্যা।

প্রথম সমস্যা এই পান দুটো। কী করবেন এ দুটো নিয়ে? এক হাতের ল্যাম্পোটা যত সহজে নামিয়ে রাখলেন, তত সহজে অন্য হাতের পান দুটো নামিয়ে রাখতে পারলেন না। সে দুটো তাঁর হাতেই ধরা রইল কিছুক্ষণ। তারপর কী মনে হল, কুলুঙ্গিতে একটা রেকাবের উপর রেখে দিলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। মশা পনপন করছে। মশারি ফেলা নেই। মশারিটা ফেলে দিলেন। তারপর ফুঁ দিয়ে ল্যাম্পো নিবিয়ে দিতে গেলেন। ল্যাম্পোয় শিসটা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রথম ফুঁয়ে নিবল না। এবার ছোটবউ কিছুটা সতর্ক হয়ে ফুঁ দিলেন। জোরালো বাতাস ঝপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিখাটার উপর। টুঁটি টিপে ধরল তার। অমনি অন্ধকার হয়ে গেল।

তারপর ছোটবউ খাটের উপর উঠলেন। এ বিষয়ে তাঁর যেমন কোনও আগ্রহ জাগল না, তেমনি দ্বিধাও হল না বিন্দুমাত্র। এক পাশে শুয়ে পড়লেন। তাঁর পাশে একটা বিরাট শরীর। অন্ধকারে সেটাকে আরও প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে। নাক ডাকছে তাঁর। ছায়াময় সেই ভারী বস্তুটার সীমারেখাগুলো তালে তালে উঠছে, নামছে। ছোটবউয়ের কানের গোড়াতেই একটা মশা পনপন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে মশারিটা ঝাড়তে ইচ্ছে করল। নইলে মশার কামড়ে কচি ছেলেটা ঘুমুতে পারবে না। পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ল, কোথায় কচি ছেলেটা? সে তো এখানে নেই, সে যে তার মায়ের কোলে, অন্য ঘরে ঘুমুচ্ছে সে। কথাটা মনে পড়তেই ওঠবার, মশারি ঝাড়বার ইচ্ছেটা চলে গেল। পাকা চামড়ায় কামড় মেরে মশা বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না। এখানে শুয়েছেন তো তিনি আর ওই প্রকাণ্ড শরীরটা। সেটা তাঁর চেনা? সেটা তাঁর অচেনা? ওই শরীরটা যদি অচেনাই হত ছোটবউয়ের, তবে কি তিনি এত সহজে খাটে উঠতে পারতেন? এমনভাবে শুয়ে থাকতে পারতেন তাঁর পাশে? এ লোকটা তাঁর চেনা বইকি। ও তো ছোটকর্তা, বড়বউয়ের ছোট্‌ঠাকুরপো, ছোটবউয়ের স্বামী। স্বামী? এই কথাটা মনে ধরতে ধরতেও ফসকে যাচ্ছে। ছবিটা পরিষ্কার ফুটছে না। তাই যেমন অচেনাও লাগছে না ছোটকর্তাকে, তেমন

খুব চেনাও ঠেকছে না কিন্তু। তাই ওর পাশে শুয়ে পড়তে যেমন দ্বিধাও হয় নি, তেমন ইচ্ছেও হয় নি।

বেলা করে ঘুম ভাঙে ছোটকর্তার। অভ্যাস। পাঁড়ে এক কনেস্টবল ছিল কালীগঞ্জ থানায়, সে রাঁধত ছোটকর্তার। সেই ভোরবেলা চা বানিয়ে ছোটকর্তার ঘুম ভাঙাত।

বাড়িতে ঘুম ভাঙানো সিপাই নেই, তাই দেরিটা একটু বেশীই হল। চোখ মেলে চেয়ে দেখলেন, ঘরে আলো, কিন্তু দ্বিতীয় লোক কেউ নেই। রাত্রে কি এ ঘরে একা কাটিয়েছেন না কি? চট করে পাশে নজর পড়ল। কেউ নেই সেখানে, তবু বেশ বোঝা যায় ফাঁকা ছিল না জায়গাটা, কেউ একজন ছিল। ওই যে মাথার বালিশে·টোল খাওয়া, ওই যে তোষকের ভাঁজে কার একটা লঘু শরীরের আলতো স্বাক্ষর। ওই যে লম্বা একগাছি প্রাণহীন চুল। কার ও চুল? ছোটবউয়ের। ছোটবউ তা হলে এসেছিল রাত্রে। শুয়েছিল তাঁর পাশে। তা সত্ত্বেও তাঁর অস্তিত্ব ছোটকর্তার কাছে অনুপস্থিত থেকে গেল! যেমন থেকেছে এই দশ বছর। বড় মজার ব্যাপার তো! ছোটকর্তার সেই বাতিকগ্রস্ত মাছ-ধরা ভদ্রলোকের গল্পটা মনে পড়ল। সে সারাদিন চার ছড়িয়ে ছিপ ফেলে পুকুরপাড়ে বসে থাকত, আর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ত তখনই, যে-মুহূর্তে মাছ এসে তার বঁড়শির টোপ গিলত। ফলে, সে রোজ উঠে দেখত ছিপখানা অবধি মাছে টেনে নিয়ে গেছে। ছোটকর্তারও কি সেই দশায় ধরল নাকি? কখন এল ছোটবউ, কখনই বা গেল?

যাক গে, সে চিন্তায় বৃথা সময় নষ্ট করার কোন মানে খুঁজে পেলেন না ছোটকর্তা। বেলা যথেষ্ট হয়েছে। ছোটকর্তা এক ঝাঁকিতে উঠে পড়লেন। চায়ের অভ্যাস মেজাজটা কিঞ্চিৎ খিঁচড়ে দিল।

বিরক্তি নিয়ে বারবাড়িতে এসে বসতেই রামকিষ্টোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

রামকিষ্টো বলল, ছোটবাবু, খবর দিয়ে আইছি।

কিসের খবর? ছোটকর্তা চট্ করে মনে করতে পারলেন না। হঁ্যা, মনে পড়েছে, এখন মনে পড়ল বটে, গোটাকতক লোক দাঙ্গা বাধাবার তালে আছে। আপাদমস্তক জ্বলে গেল তাঁর।

হঠাৎ ছোটকর্তার মনে হল, এ গ্রামের, এ বাড়ির লোকজন, এমন কি

ঘরদালান পর্যন্ত যেন তাঁকে জব্দ করতে চায়। জব্দ করতে পারলে খুশী হয়। কাল বাড়ি আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত যা যা ব্যাপার ঘটেছে তার আমুপূর্বিক হিসেব কষতে বসলেন। তিনি বাড়ি এসে বুড়ির ছেলেকে ভাল মনে আদর করতে গেলেন, প্রতিদানে ছোঁড়াটা তাঁকে অপদস্থ করে ছাড়ল। এ তো গেল এক নম্বর কেস। দু নম্বর কেসে তাঁকে ঠকালো এই বাড়িটা। কী যে সব ভাল ভাল ভাব উদয় হল মনে বাড়িটাকে দেখে যে, নব্‌নের ওখানে যাবার সময় পার করে ফেললেন। স্রেফ একটা ধাপ্পায় পড়ে মৌতাত থেকে বঞ্চিত হলেন। সেই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন বড়দা। ছোটকর্তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পাশা খেলায় হারিয়ে দিলেন তাঁকে। এটা তিন নম্বর। চার নম্বর কেসের আসামী ছোটবউ স্বয়ং। কাল রাত্রে কি জব্দটাই না তাঁকে করল ছোটবউ!

এতো গেল বর্তমানের কথা। অতীতে গোপালদাসী তাঁকে বোকা বানায় নি? এখন বুদো আর গহর শালারাও জোট বেঁধেছে। ভবিষ্যতে তাঁকে জব্দ করার ভার নিয়েছে এরাই! দেখাচ্ছি মজা।

কাল সন্ধ্যে থেকে যে অসন্তোষ, যে অস্বস্তি, যে বিরক্তি, একটু একটু করে মনের মধ্যে জমছিল, সেগুলো এখন একটা সুস্পষ্ট উপলক্ষ্য পেয়ে ক্রোধের আকার ধারণ করল। রাগটা ফেটে পড়ল এদেরই উপর। দাঙ্গার সাধ দিচ্ছি মিটিয়ে।

ছোটকর্তা এক ধাক্কায় সেই গৃহবিলাসী ভাল মানুষ লোকটাকে যেন সরিয়ে দিলেন। গোঁফে চাড়া দিয়ে এবার উঠে দাঁড়াল সেই ডাকসাইটে, সেই চোয়াড় দারোগাটা। শরীরটা যার পেটা-লোহায় তৈরী। চেহারাটা যার মহিষাসুরের মত। চোখ দুটো যার লাল লাল ভাঁটা।

ছোটকর্তা দাঁড়িয়ে উঠেই বাজপড়া স্বরে হাঁকাড় মারলেন, রামকিষ্টো, ঘোড়ায় জিন দে।

বলেই ঘরে ঢুকলেন পোশাক আঁটতে। খাকীর হাফ প্যাণ্ট, খাকীর হাফ শার্ট, খাকীর ফুল মোজা। চওড়া বেল্টটা কোমরে আঁটতেই অস্বস্তিকর ম্যাজম্যাজে ভাবটা অনেকটা কাটল। এই পোশাকে দেহটাই শুধু নয়, চোয়াড়ে মনটাও ফিটফাট হয়ে ওঠে। ক্রশ বেল্ট এঁটে, ভারী বুটটা পরতেই মনে হয়, পরোয়া কোন শালাকেই নেই। তিলমাত্র তেড়িবেড়ি করেছ কি এক লাথিতেই থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব! এখন আমি কারো বাপ

নই, খুড়ো নই, দাদু নই, পিরিতের জলে গলা থপথপে সেই কাদার পুতুলও নই। আমি দারোগা। মহামান্য সম্রাট বাহাদুর পঞ্চম জর্জ, সেই যাঁর সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, আমি তাঁর বান্দা, তাঁর 'ল অ্যাণ্ড অর্ডারে'র সদাজাগ্রত কর্তব্যপরায়ণ রক্ষক।

ছয়ঘরা পিস্তলটা কোমরে ঝুলিয়ে একটা তকমা আঁটা খাকী রঙ পুলিসী হ্যাট মাথায় চাপিয়ে বেরুতে যাবেন, এমন সময় শুভদার সঙ্গে দেখা।

শুভদা অবাক হয়ে বললেন, ও শীতু, এ কী, যাচ্ছিস কনে? খায়ে বেরো। খাবার দিইছি।

ভারী গলায় ছোটকর্তা বললেন, তুলে রাখ। সময় নেই এখন। ফিরতি দেরি হতি পারে।

শুভদা আর-কিছু বলার আগেই ছোটকর্তা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই হতভম্ব শুভদার কানে ঘোড়ার দড়বড়ি বেজে উঠল। আস্তে আস্তে এক সময় মিলিয়েও গেল।

ষোল

ছোটকর্তা এতটা না করলেও হয়তো পারতেন। ধড়াচুড়াটা পরলে কোনই ক্ষতি ছিল না। এ-গ্রামের সবাই তাঁর চেনা। সব জানাশোনার মধ্যে। গ্রামের হাটতলাটাও দেওয়ানবাড়ি থেকে বিশেষ দূরে নয়। ঘোড়ায় যাবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু ছোটকর্তা এখন কুটুম্বিতা করতে যাচ্ছেন না। নেমতন্ন রক্ষার জন্যও না বা কোন মাইফেলেও না। সোজা সরকারী কাজে নেমে পড়েছেন তিনি। পোশাকে কি আচার-আচরণে এখন এমন একতিল ফাঁকও তিনি রাখতে চান না, যাতে ব্যাটারা আস্কারা পেতে পারে। যাতে ব্যাটারা 'ও আমাদের ছোটবাবু, আরে উনি তো এই গেরামেরই ছাওয়াল' বলে দু পাটি দন্ত বিকশিত করে তাঁকে আমল না দেবার চেষ্টা করতে পারে। তাতে ঘটনার গুরুত্ব লঘু হয়ে পড়বে। আর ব্যাটারা সেই সুযোগে চ্যাংমাছের মত পিছলে সটকে পড়বে। তারপর বৈঠকে বৈঠকে পান-তামাক উড়তে উড়তে তাঁর কুষ্টি কাটবে, তাঁকে ব্যঙ্গ করবে, বিদ্রূপ করবে, মুখ মুচকে

বলাবলি করবে: কই, কী করল তুমাগের শেতলা দারোগা, আমাগের কী করতি পারল, ওই তো তার মুরোদ, হ্যাঃ।

ছোটকর্তা যেন চোখের সামনে ওদের জটলা দেখতে পেলেন, ওদের গুজগুজ ফুসফুস কানে শুনলেন। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি।

না, কোন সুযোগ তিনি ওদের দেবেন না। কোন আস্কারা দেবেন না ওদের। এখন তিনি দারোগা। এখানেও তিনি দারোগা। কেমন দারোগা, তা তিনি টের পাইয়ে দেবেন এবার ওই বুদোটাকে, ওই মেদ্দাটাকে, এই অঞ্চলের সমস্ত বদমায়েস কটাকে।

রাগের চোটে ঘোড়াটার তলপেটে ভারী জুতোর ঠোক্কর মারলেন একটা। ঘোড়ার গতি দ্রুততর হল। খুরের ঘায়ে ধুলোর ঘূর্ণি উঠতে লাগল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায়।

অলক্ষ্যে ঘোঁট পাকাতে যাঁরা খুব দড়, তাঁদের লক্ষ্য করে ছোটকর্তা মনে মনে বললেন, এতকাল ঘুঘু দেখেছ, এবার দেখবে ফাঁদ কাকে বলে।

হাটতলার কাছে এসে আবার এক গুঁতো খেলো ঘোড়াটা। সদর্প লাফ মেরে নয়ানজুলিটা পেরিয়ে হাটতলায় ঢুকে পড়ল। চালাগুলোর টিনে তার খুরের খটাবট খটাবট শব্দ প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। একটা বড় কুঁকড়ো ডিঙি মেরে মেরে এগিয়ে আসছিল, আচমকা দড়বড় দড়বড় শব্দ চতুর্দিকে ধ্বনিত হতেই ক্বক্ ক্বক্ করে দৌড় মারল। একঝাঁক পায়রা দানা খুঁটে খাচ্ছিল, ঝপ করে উড়ে গেল। দুটো বিড়াল বেদম ঝগড়া করছিল, পালাল। একটা ঘেয়ো কুকুর গুপে ময়রার দোকানের সামনে 'মাটি থেকে ছানার জল চেটে খাচ্ছিল, হকচকিয়ে একবার চেয়ে দেখল।

হাটতলা যারা ঝাঁট দিচ্ছিল, তারা ঝাঁটা চালাতে চালাতে চোখ বেঁকিয়ে ছোটকর্তাকে দেখে নিল একবার। আগরওয়ালা গদিতে বসে হিসেব কষছিল। দারোগাকে তার গদির দিকে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখে ভয় পেয়ে গেল। কোন অপরাধ করে নি সে, আইন ভঙ্গ করে নি, তবুও তার বুক দুরদুর করতে লাগল। আর সে তৈরী হল অবশ্যম্ভাবী একটা অতিশয় বাজে খরচের হিসেব লিখতে। সে তার অভিজ্ঞতা থেকে জানে, দারোগা আসা মানেই কিছু গাঁটগচ্চা যাওয়া।

আগরওয়ালা এখানে অদ্ভুত এক পরিবেশের মধ্যে বাস করে। এখানে তার কারও সঙ্গে সদ্ভাবও নেই, কলহও নেই। দরকার পড়লে টাকার জন্য হাত

পাতে সবাই। শোধ দেবার বেলায় বেগ দেয় সবাই। তার ভাই-বন্ধু এখানে কেউ নেই, সমাজও নেই। একমাত্র আইনই তার রক্ষক। তাই স্থানীয় দণ্ড-মুণ্ডের কর্তাদের পায়ে সে নফরের মত লুটিয়ে পড়ে। নজরানা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখে। আগরওয়ালাকে দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না, এ-গ্রামের তাবৎ লোককে কিনে রাখবার মত টাকা তার আছে। কিন্তু সে বিষয়ে তার গর্ব নেই, অহঙ্কার নেই। সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি আর অপরিসীম সতর্কতা—হৃদয়বৃত্তির এই দুটি স্রোতে সে তার জীবনের নৌকো খুলে দিয়ে বসে আছে। সে জানে, এখানকার সবাই তাকে মনে মনে ঘৃণা করে। কিন্তু তার বুঝি কাউকে ঘৃণা করার সময়ও নেই।

আগরওয়ালা কোনরকম বাহানা না করে যা অবশ্যম্ভাবী, তার জন্য তৈরি করতে লাগল নিজেকে। গরিবের উপর বেশী জুলুম যাতে না হয়, তার জন্য প্রয়োজন হলে দারোগাবাবুর হাতে-পায়ে যদি ধরতে হয়, ধরবে সে। ঘাড় তেড়া রেখে, শির না ঝুঁকিয়ে লড়াই করা যায়, প্রাণ ত্যাগ করা যায়, কিন্তু নির্বান্ধব বিদেশে নিঃসম্বল এসে ব্যবসা করা যায় না। ব্যবসা করে লক্ষপতি হওয়া যায় না। মূর্খের মত বীরত্ব দেখিয়ে, প্রাণ খুইয়ে, ফাঁকা হাততালিই পাওয়া যায়, হাতের ফাঁক রুপেয়ায় ভরানো যায় না। সে কাজে বীরত্ব নয়, ধীরত্ব চাই, মান রাখার জন্য তাতে প্রাণ খোয়ালে চলে না, মান দিয়েও প্রাণটি রাখাই আসল। মান খোয়ালে সব যায় না, আগরওয়ালা তা জানে। তাই সে প্রস্তুত হল মনে মনে।

কিন্তু না, দারোগার ঘোড়া আগরওয়ালার দরজায় থামল না। সবেগে বেরিয়ে গেল। বটগাছটাকে বাঁয়ে রেখে, হাটতলায় অর্ধেক একটা চক্র কেটে বিশ্বেসদের গদির দিকে মুখ ফেরাল। সেখানেও থামল না। বিশ্বেস-দের গদির ধার ঘেঁষে সোজা পুবমুখে চলে গেল। থামল গিয়ে মেদ্দা ছাহেবের ওখানে।

ভক্ত দফাদার জানত, দারোগাবাবুর ঘোড়া হাটতলায় ঢুকে দুলকি চালে সোজা পথে প্রেসিডেণ্ট সাহেবের ওখানে গিয়ে উঠবে। সে তাই জায়গা মতই দাঁড়িয়ে ছিল। মতলব ছিল, দারোগাবাবুর ঘোড়াটি নাগালের মধ্যে আসামাত্র সে তার লাগামটি ধরে ফেলবে, তারপর দারোগাবাবুকে সসম্মানে নিয়ে যাবে প্রেসিডেণ্ট সাহেবের গদিতে। যত্ন করে তাঁকে নামাবে ঘোড়া থেকে। তবে না তার আনুগত্য প্রকাশ পাবে! চাকরি পাকা থাকবে। এই তো দস্তুর।

তাই নিশ্চিন্তে সে হাটতলার কোণায় দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল তখন, সে যখন দেখল দারোগাবাবুর ঘোড়া গুপে ময়রার দোকান বরাবর না এসে ডান দিকে দড়বড়িয়ে দৌড় মারল। যাচ্চলে, দারোগাবাবু ওদিকে যান কোথায়? ভক্ত ঘোষ ঝোলা লাঠি, বেল্ট পাগড়ি সামলে ছুট দিল ঘোড়ার পিছু পিছু। কিন্তু ঘোড়া যে বাতাসের আগে ছুটেছে, তার পিছু ধরবে কী করে?

ভক্ত হন্তদন্ত হয়ে আগরওয়ালার গদির সামনে দিয়ে যেতেই আগরওয়ালা তাকে ডাকল।

আরে ভাই দফাদার, জরা শুনো তো, কী বেয়াপার আছে আজ, বাতাও না ভাই। দারোগাবাবুকে তো নৌতুন লাগল। বদলি এসেছেন কী?

পালা-পার্বণে ভক্ত ঘোষ পার্বণী বেশ ভাল রকমই পায় মাড়োয়ারী বাবুর কাছ থেকে। তার ডাক অমান্য করতে পারে না অথচ ঘোড়াটা তার চোখের বাইরে চলে যায়।

সে তাড়াতাড়ি হাত-এড়ান জবাব দিল, উরে ব্বাস, এখন কি দাঁড়ানোর সুমায় আছে মাড়োয়ারী বাবু। জবর ইনকোয়ারি শুরু করিছেন আমাগের নতুন দারোগা। এই গিরামেই ওই দেওয়ানবাড়ির ছোটবাবু ইনি। এই পেরথম নিজের থানায় আলেন। মিজাজ খুব কড়া। আজ কী হয় কে জানে?

মাড়োয়ারীর মনে আরও খানিক কম্প তুলে ভক্ত সটকে পড়ল। বিশ্বেসদের দোকানের সামনে দিয়ে যেতেই বুদো, নিরাপদ আরও কে কে সব কলকল করে উঠল: ও ভক্ত, ও দফাদার, শোনদিন দেখি। বলি ব্যাপারটা কী?

ভক্ত আর দাঁড়াল না, যথেষ্ট দেরি হয়ে গিয়েছে, তা ছাড়া সে জানেই বা কী? কিন্তু সে দফাদার, দারোগার গতিবিধি সম্পর্কে সে কী জানে আর কী জানে না, বাইরের লোকে তা জানবে কেন?

তাই সে, সেখানে একটুও না থেমে, ঘাড়টা ঈষৎ ফিরিয়ে, দফাদারী কায়দায় জবাব দিল, ব্যাপার খুবই গুরুচরণ মশাই, তৈরী থাকেন, সুমায় হলি সবই জানতি পারবেন।

তারপর গটগট করে এগিয়ে গেল মেদ্দা ছাহেব গদির দিকে।

বুদো ভুঁয়ে এবার ফাঁপরে পড়ল। ভোরবেলায় রামকিষ্টোর মুখে শমন

পাওয়া ইস্তক মন খুঁতখুঁত করছিল তার। এই ছোটখুড়ো লোকটা যেন কেমন-কেমন! বুদোকে বাড়ির উপর ডাকলেই তো পারতেন। তা না করে এখানে আসতে বলার মানে কী? নিরাপদকেও আসতে বলা হয়েছে।

স্পষ্ট নয়, ছায়া-ছায়া কতকগুলো আতঙ্ক বুদোর মনে ঘুরপাক খেতে লাগল। তার সঙ্গে ছোটখুড়োর কী এমন কাজ থাকতে পারে? তাকে এখানে আসতে বলা হল কেন? ছোটখুড়ো ধড়াচুড়ো পরেই বা এমন হাটময় ঘোড়া দাবড়ে বেড়াচ্ছেন কেন? দোকানের সামনে তাঁর ঘোড়া আসামাত্র তারা সবাই তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। বুদো ভুঁয়ে মুকিয়েই ছিল—ছোটকর্তা নামামাত্র সে এগিয়ে যাবে, এই যে ছোটখুড়ো আসেন আসেন বলে ভিতরে আনবে তাঁকে, হাঁকডাক করে তামাক দিতে বলবে, ঘোড়াটা বাঁধতে বলবে কাউকে। কিন্তু ছোটকর্তা ভ্রুক্ষেপও করলেন না। থামলেনও না, এমন কি ঘোড়ার গতিও কমালেন না। এ আচরণের মানে কী? তারপর ভক্ত দফাদারই বা তার দিকে আড়চোখে চাইল কেন? বুদো ভুঁয়ের ধারণা ভক্ত শুধু তার দিকেই চেয়েছে। কেন বলল তৈরি থাকতে? তৈরি থাকার মানে কী? নাঃ সব মিলিয়ে ব্যাপারটা খুব সুবিধের ঠেকছে না। হঠাৎ বুদোর মনে হল তার একটা চোখ তিরতির করে নেচে উঠল। কোন্ চোখ নাচল? সেদিকে মনোযোগ দেবার আগেই চোখের নাচন বন্ধ হয়ে গেল। আরে গেল যা, ডান চোখ নাচল কি বাঁয়েরটা, সেটাও মনে করতে পারছে না সে? কী ব্যাপার? পুরুষমানুষের ডান চোখ নাচা ভাল, বুদো তা জানে। সেটাই নেচেছে, নিশ্চিন্তভাবে বুদো তা জানতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারত। কিন্তু খেয়াল করে নি সে। বুঝতে পারছে না। এখন এই ঘটনাই তাকে যেন অস্বস্তিতে অস্থির করে ফেলল। এবার বুদো সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে তার চোখটা আবার নাচে কি না, সেদিকে মন দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। যেন চোখ নাচার উপর তার মরা-বাঁচা নির্ভর করছে।

বুদো ভুঁয়ে কতক্ষণ এদিকে তার মনটাকে আটকে রেখেছিল, সে খেয়াল ছিল না। গোপালের ভাইপো গদা গলদঘর্ম হয়ে দোকানে ঢুকে যখন চেঁচিয়ে উঠল, আরে ব্বাস, আজ মেদ্দা ছাহেরের দুকানে যেন ভুইকম্প লাগিছে। আমাগের ছোটবাবু দারোগা গহররে আর ছোলেমানরে এমন ঘাপান ঘাপাতিছেন যে মেদ্দা পর্যন্ত থরথরায়ে কাঁপতি লাগিছে।

এ-কথা শুনেই বুদোর বুক খালি করে নিশ্চিন্তির নিশ্বাস পড়ল।

বুঝে ফেলল বুদো ছোটকর্তার মতলবখানা কী? রামকিষ্টোর কাছে বুদো শুনেছিল, এই থানায় বদলি হয়ে এসেছেন ছোটখুড়ো। গহর আর ছোলেমানকে যখন ঝুড়েছেন, তখন বিষয়টা নিশ্চয়ই নিরাপদ সংক্রান্ত সেই গোলমালটা।

বুদো হাসতে হাসতে বলল, বুঝলে গুপাল, আমাগের ছোটখুড়ো যেন বাতাসের মুখি খবর পায়।

নিরাপদ বলল, কী ব্যাপার, ও বুদোদা, ছোটবাবু মেদ্দার ওখেনে অত উস্তম-কুস্তম করতিছেন, বলি ব্যাপারখানা কী?

বুদো যেন সব জানে, যেন তার পরামর্শ মতনই ছোটকর্তা মেদ্দার ওখানে গিয়েছেন, এমনি একখানা ভাব করল।

নিরাপদকে চোখ টিপে বলল, যথা ধর্মং স্তথা জয়ং অর্থাৎ কিনা ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। এখন চুপচাপ থাক, ছোটখুড়ো এখন নাড়ে বিটাগের গালে বিনা জলে ক্ষুর ঘষতিছে তো, কাজটা চুকোয়ে মদ্দরে এখেনে আগে আসতি ত্যাও, তখন সবই জানা যাবে। আমারে যখন খবর দিয়ে আনায়েছে এখেনে, তখনি বুঝিছি আজ এক কাণ্ড হবে। তার উপরে সারাক্ষণ ডান চোখটা নাচতিছে। ওরে, তামুক সাজ্।

তামাক এলে বেশ জম্পেশ করে টান লাগাল বুদো। তারপর কিছুক্ষণ চক্ষু নিমীলিত করে থাকল।

নিরাপদ বুদোর গা ঘেঁষে বসল এসে।

মিচকি মিচকি হেসে বলল, তার মানে ইবারকার মড়কটা ভাগ্নী-জামাইর উপর দিয়েই গেল, কী কও।

দোকানসুদ্ধু লোক নিরাপদর কথায় হেসে উঠল।

বুদো হাসতে হাসতে বলল, রসিকতাটা বড় লাগসই হয়েছে। তা ছোট-খুড়ো আমাগের থানায় আসে ভালই হল। মাথার উপরে নিজিগের লোক থাকলি উনো বল দুনো হয়ে ওঠে, কী কও।

সবাই মাথা নাড়ল, সে তো একশবার।

এমন সময় ভক্ত ঘোষ এসে সরকারীভাবে ঘোষণা করল, বড়বাবু আসতিছেন।

বুদো ফোড়ন কাটল, বড়বাবু আবার কিডা গো?

ভক্ত যথাসম্ভব চাপরাসের মর্যাদা বজায় রাখবার জন্য বিরস কণ্ঠে বলল, দারোগাবাবু।

বুদো হাসতে হাসতে বলল, তোমাগের যিনি বড়, আমাগের তিনি ছোট, বুঝলে দফাদার।

ভক্ত কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ছোটকর্তা উপস্থিত হতেই সে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পুলিসী জুতো মসমসিয়ে ছোটকর্তা দোকানে ঢুকে পড়লেন। একগাল·হেসে বুদো 'আসেন, আসেন ছোটখুড়ো' বলে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

ছোটকর্তা সঙ্গে সঙ্গে বাজখাঁই গলায় দিলেন এক দাবড়, কুটুম্বিতে রাখো।

সেই আওয়াজে বুদোর প্রায় কাছা খুলে যায়, অবস্থা এমনই বেসামাল হল। গোপালের মনে হল, তার আটচালা টিনের ঘরখানার মটকা বুঝি খুলেই গেল। সব থেকে হকচকিয়ে গেল নিরাপদ। একটু আগে বুদোর কথায় ভর দিয়ে সে যে জমির উপর দাঁড়িয়ে ছিল, ছোটকর্তার এক ধমকে সে জমি তার পায়ের তলা থেকে সট্ করে যেন সরে গেল। সে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে বুদোর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ছোটকর্তা বুদোকে আরেক ধমক দিলেন, খুব বুঝি মাতব্বর হয়ে উঠিছ, পাখনা গজায়েছে, অ্যাঁ? বলি পিঁপড়েগের পাখনা কখন গজায়, তা জান?

হ্যাঁ, জানে বই কী। পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে। এ কথা জানে বলেই বুদো আরও ফ্যাসাদে পড়ল। এখন এই মারাত্মক উত্তরটা দেয় কেমন করে?

বুদোর তখন সব তালগোল পাকিয়ে গেছে, বুকের রক্ত শুকিয়ে এসেছে, আর হাঁটু দুটোতে কেমন যেন কম্প ধরেছে।

ছোটকর্তা আবার ধমক দিলেন, পিঁপড়ের পাখা কখন গজায়? মরবার সুমায়। এই অল্প-বয়েসে তুমাগের আবার মরবার সাধ হল ক্যান? জেল ফাটকে না যায়ে বুঝি আর ছাড়বা না? দাঙ্গা করার জন্য খুব যে কোমর বাঁধিছ, ইবার যে ওই কোমরে দড়ি পড়বে।

নিরাপদ চোখে অন্ধকার দেখল। বুদো-ফুদো সব পার পায়ে যাবে। মরতে মরবে সে-ই। সেই তো দোষী। তার কোমরে দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে পাঁচজনের চোখের উপর দিয়ে। কিন্তু নিরাপদর দোষই বা কোনখানে। হাটে তো সে নতুন তোলা তুলছে না। তোলা দিতে

গাঁইগুঁই সব শালাই করে, কিন্তু সে সব আপত্তি শুনলে তো নিরাপদকে শুকিয়ে মরতে হয়। তাকে গোপাল মাইনে দেয় তো মাত্তর দুটাকা। দু টাকায় কার পেট চলে? তারপর নিরাপদর নেশার একটা খরচ আছে। ভূপাল সাউ তার অবশ্য বন্ধুলোক, রোজকার নেশা সে-ই চালিয়ে দেয়, নগদা কড়ি গুনতে হয় না, কিন্তু ভূপাল সাউয়ের ব্যবসা মদ বেচা, সে তো দানছত্র খুলে বসে নি, তাই নিরাপদ তার হাটের খরচাটা চালিয়ে দেয়। আর আছে ওই খোঁড়া মাগীটা, কেষ্টদাসী। তারও তো খরচ আছে একটা। মাগীর আবার নোলাটা ভাল জিনিসের গন্ধে সপ সপ করে। তার জন্যই তো নিরাপদকে এই খোয়ার সহ্য করতে হচ্ছে। তা ছোলেমান শালারই বা এত লাটসাহেবি কিসের? তোলা তো সবাই দেয়, গোমস্তাকে মারধোর করে কে?

কিন্তু এসব যুক্তি কি টিকবে দারোগাবাবুর কাছে! যে রকম মারমূর্তি তাঁর, কোন কথা পাড়াই যে দায়। বুদো যে বুদো, অমন চৌকস লোক, দারোগাবাবুর সঙ্গে যার অত আত্মীয়তা (সে যে কেমন আত্মীয়তা, সে তো দেখা গেল), সে-ই ভুঁয়ের পো কেমন ন্যাতা মেরে গেছে, দেখাচ্ছে যেন বিড়ালের থাবায় নেংটি ইঁদুর, ওর কাছে নিরাপদ তো কীটস্য কীট? অথচ ঘোঁট পাকাতে বুদোই এগিয়ে গেছে। গোপালকে তাতিয়েছে, ব্যবস্থা বন্দোবস্ত যা কিছু সেই করেছে। কাল যারা নিকিরিদের হাট ভাঙবে তাদের এনে গোপালদের দুর্গাবাড়ির চাল ছাইতে লাগিয়ে দিয়েছে। বুদোর পেটে পেটে বুদ্ধি। কিন্তু এখন? কোনও বুদ্ধি খাটবে না আর ঘর-পোড়ার কাছে। দারোগাবাবুর ঘাপান খাও বসে বসে। নিরাপদর একবার ইচ্ছে হল, সব ফাঁস করে দেয়, দিয়ে দারোগাবাবুর পা জড়িয়ে ধরে এবারকার মত মাফ চেয়ে নেয়। মরুক শালা বুদো। কিন্তু এর মধ্যে গোপাল রয়েছে যে। বাস্ রে! গোপাল চটলে এ গ্রাম থেকে চির জীবনের মত নিরাপদর অন্ন উঠবে। তাই সে চুপ মেরে গেল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল সসেমিরা অবস্থায় পড়েছে। এখন এগুলে ভেড়োর ভেড়ো, পিছুলে গুয়োর ব্যাটা। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল তার। সে মনে মনে জটা-শিবের স্মরণ নিল। এ যাত্রা উদ্ধার করে দাও বাবা, মানত করছি গাজনের দিন এক বোতল আসল মাল তোমার মাথায় ঠেকিয়ে প্রসাদ নেব।

গোপাল চুপ করে বসে বসে ভাবছিল, খবরটা থানা অবধি পৌছল কী করে? বড় কেলেঙ্কারী হয়ে গেল দেখছি। ছোটকর্তা যে এই থানায় বদলি হয়ে এসেছেন, সে খবরও তো কেউ তাকে দেয় নি। কতবড় একটা সুযোগ ছিল, এই সুযোগে সে দিব্যি সরকারী মহলে ঢুকে যেতে পারত। খাতির জমাতে পারত। ইস্, কত বড় একটা মওকা মিলেছিল তার। এই উজবুকগুলোর জন্য সব ভেস্তে গেল। খুব আফসোস হল গোপালের। চটেও গেল মনে মনে। বুদোটার জন্য তো কোন কাজ চুপেচাপে সারবার উপায় নেই। দিনরাত ধর্মরাজার ম্যাড়ার মত তাল ঠুকে বেড়াচ্ছে। এখন গোঁয়ার মদ্দ যদি টের পায় লেঠেলরা তার বাড়িতে মজুত রয়েছে (টের পায় নি, তাই বা কে বলল? সঙ্গে তো সিপাই নেই, সেগুলো তার বাড়িতে এতক্ষণ মোতায়েন হয়েছে কিনা কে জানে?), তা হলে হেনস্থার আর বাকি থাকবে না কিছু।

গোপাল ধীর মাথায় কর্তব্য ঠিক করে নিল। দোকানের পিছন দিকে কাজের ছলে এগিয়ে গেল। ইশারা করে ভাইপোকে ডাকল। চুপি চুপি বলল, যদি দেখিস সিপাইতে বাড়ি ঘিরে রাখেছে, তাহলি তাদের কবি—দারোগাবাবু কলেন, তিনি এক্ষুনি আসতিছেন, বলেই চলে যাবি নীল বাগানে। লাঠিগুলো সব নদীতি ফেলে দিবি। তারপর ঘর ছাওয়া নিয়ে ওগেরে খানিকক্ষণ গালি-গালাজ করবি। বাবারে তাড়াতাড়ি দুকানে পাঠায়ে দিবি। আর যদি দেখিস, সিপাই-টিপাই ধারে-কাছে নেই, তাহলি সব ব্যাটারে টাকা-পয়সা চুকোয়ে দিয়ে বিদেয় করে দিবি। যা, দেরি করিস নে, আমার সাইকেলখান নিয়ে যা।

ভাইপোকে পাছ-দুয়ার দিয়ে বের করে দিয়ে গোপাল কাপড়ের দোকানে কাজ দেখতে লাগল। বুদোকে এ অবস্থায় একেবারে বাঘের মুখে ফেলে আসার জন্য কিছুক্ষণ তার মনটা খচ্‌খচ্ করতে লাগল। কিন্তু আত্মরক্ষাও তো ধর্ম।

বুদো এখন একেবারে একা পড়ে গেল তোপের মুখে। একবার মিনমিন করে বুঝি বলেছিল, সে কোন অন্যায় কাজ করে নি। তার সমাজকে যারা হুমকি দেখিয়ে অপমান করতে চেষ্টা করেছে, সমাজের মান রক্ষার্থে সে তাদের চোখ রাঙানির জবাব দিয়েছে।

তার উত্তরে ছোটকর্তা এমন দাবড় দিয়েছেন যে বুদোর মুখের কথা মুখেই জমে গেছে।

খুব যে লম্বা-চওড়া কথা বলতি শিখিছ হে!···

ছোটকর্তার কথাগুলো কথা নয় তো, বুলেট।

···অ্যাঁ, সমাজ রক্ষের ভার তুমার ঘাড়ে চাপাল কিডা? তুমার কথার ভাব দেখলি মনে হয়, এ রাজ্যিটা যেন তুমারই। ভুলে যায়ে না রাজত্বটা হচ্ছে পঞ্চম জর্জের। এখেনে কোন রকম বদমাইসির জায়গা নেই। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যি আমাগের মত গুটা কয়েক অধমরি মাইনে দিয়ে পুষে রাখা হয়েছে। সাবধান করে দিচ্ছি বেশী পাকামো করতি যায়ে না। দিনকাল বড্ডই খারাপ। একটু তেড়িবেড়ি করিছ কি, সব কটারে বি-এল কেসে ঠেলে দেব। ঘানি টানায় কত সুখ দিন কতক পায়ে আসলি মাতব্বরি ঘুচে যাবে। দাঁড়াও, আজই একটা পাকা বিহিত করে যাই।

ছোটকর্তা হাঁক মারলেন, দফাদার!

ভক্ত লম্বা সেলাম দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, হুজুর।

এতক্ষণে বুদো ভুঁয়ের পিলে সত্যি চমকে উঠল। নিরাপদ আর থাকতে পারল না।

ধর্মত বলছি হুজুর, আমার কোন দোষ নেই, আমি এ সবের মধ্যি একেবারে নেই। মাইরি বলছি। জটাশিবির মাথা ছুঁয়েও কতি পারি। এই আপনার পা ছুঁয়ে কচ্ছি।

নিরাপদ ছোটকর্তার দুখানা পা জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল। বুধো ভুঁয়েও নিজের অজান্তে হাত কচলাতে শুরু করল।

ছোটখুড়ো—বলেই বুদো সামলে নিল। বলল, হুজুর, বে-আইনী কোন কাজ সত্যিই আমি করি নি। গোপালরি জিজ্ঞেস করে দেখেন।

এতক্ষণে বাবুরা মচকালেন। ছোটকর্তার মন থেকে মেঘ কেটে যেতে লাগল। মোল্লাদের দৌড় ওই মসজিদ পর্যন্ত। মেদ্দাটাও আজ হাত কচলিয়েছে। কেমন একটা ফুর্তির ভাব ছোটকর্তার মনের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠছে। মেঝেয়-শোয়া নিরাপদর দিকে নজর পড়ল। কুকুর, নেড়ি কুত্তা! চাটুক পা। বুদো দু হাত সমানে কচলে যাচ্ছে। ছুঁচো কোথাকার! যাক গে, রাগ এখন অনেকটা পড়ে এসেছে তাঁর। গোঁফে একটু তা দিয়ে নিলেন ছোটকর্তা।

চারিদিক তাকিয়ে ছোটকর্তা বলে উঠলেন, দোহারগেরে ফেলে মূল গায়েন গ্যালেন কনে? আমার চিহারাখান বুঝি গুপালবাবুর তেমন পছন্দ হল না?

আজ্ঞে, এই যে আমি, এখেনেই আছি।—গোপাল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

ছোটকর্তা বললেন, কী, এসব কী শুনতিছি!

গোপাল খুব বিনীতভাবে বলল, ওসব মাথাগরমের কথা ছাড়ান দেন। আমরা থাকতি এখেনে কোন অঘটন ঘটবে না, এ আমি জোর করে কতি পারি। বাবারে আনতি লোক পাঠায়ে দিছি। আলেন বলে।

ছোকরা তো বেশ চালু আছে। গুছিয়ে কাজ করতে পারে। ছোটকর্তা গোপালের ধীরস্থির ভাব দেখে চমৎকৃত হলেন। হুঁ, উন্নতি করবে জীবনে।

এবার একটু নরম হয়ে ডাক দিলেন, দফাদার, প্রেসিডেণ্ট সাহেবের ডাকে আন।

খবর পেয়ে মেদ্দা ছাহেব তৎক্ষণাৎ এসে পড়লেন।

ছোটকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, কী, পাণ্ডাগুলোন আছে তো?

মেদ্দা ছাহেব বললেন, জে।

ছোটকর্তা বললেন, ঠিক আছে, আপনি একখানা মুচলেকা মুসোবিধে করে আনেন তো, বাবুগের টিপ-দস্তখত কবায়ে নিই। আর হ্যাঁ, বিশ্বেসমশাই আসতিছেন, একটা সালিশ বসাতি হয়। সালিশটা বসবে কনে? একটা নিরপেক্ষ জায়গা চাই।

মেদ্দা ছাহেব এবার ক্ষুণ্ণ হলেন। তিনি প্রেসিডেণ্ট, এতকাল তাঁর ওখানেই সালিশ বসেছে। ছোটকর্তার হুকুমে এবার সে নিয়ম পাল্টে গেল। তার মানে ছোটকর্তা তাঁকেও বিশ্বাস করছেন না, দলে ঠেলে দিয়েছেন। ইচ্ছে হল, প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এ বড় গোঁয়ার লোক। একটু আগেই তাঁকে কম হেনস্থা করে নি। আর নতুন সুযোগ দিতে ইচ্ছে করল না। কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকলেন তিনি।

ভক্ত ঘোষ বলল, হুজুর, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা জায়গার কথা কই।

মেদ্দা ছাহেব, গোপাল, বুদো—সবাই দফাদারের মুখের দিকে চাইলেন।

ছোটকর্তা বললেন, কও।

ভক্ত ঘোষ বলল, হুজুর, মাড়োয়ারী বাবুর গদিতি বসলিই হয়। তিনি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই।

ছোটকর্তা বললেন, বেশ কথা, যা, তারে খবর দিগে। আমার ঘুড়াডারেউ নিয়ে আসিস।

মেদ্দা ছাহেব ক্ষুণ্ণ মনে বললেন, আমি তালি মুচলেকার মুসোবিদেটা ওখেনেই নিয়ে যাচ্ছি।

ছোটকর্তা বললেন, বেশ কথা, ওগেরউ আনবেন।

সালিশের কাজ চুকিয়ে মুচলেকায় দস্তখত টিপ নিয়ে ছোটকর্তা যখন ঘোড়ায় চাপলেন তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। লোকজন বিদায় নিতে, মাড়োয়ারী হুজুরকে অনেক মিনতি করে পেস্তার শরবত খাইয়েছে আর ঠিক ঘোড়ায় উঠবার মুখে পঁচিশটে রূপোর টাকা তোড়ায় বেঁধে এনে গরুড় পক্ষীর মত হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থেকেছে। হুজুর যদি কিরপা করে লিয়ে নেন তো মাড়োয়ারী ধন্ন হোয়ে যাবে। এটা আবার কী? নজরানা হুজুর। বাঃ রে মাড়োয়ারী, এই গিরামে দেখতিছি মানীর মান তুমিই রাখতি জান। তা দ্যাও, তুমারে ধন্যই করি। ছোটকর্তা টাকার তোড়া পকেটে পুরলেন।

মনে ফুর্তির ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। ঘোড়া তাই দুলকি চালে চলেছে। পায়রাগুলো গোল হয়ে দানা খুঁটতে খুঁটতে বকুম বকুম করছিল, কুকুরটা এখন গুঁপে ময়রার দোকানের সামনে পাতা ধরাটের নীচের ছায়ায় রোদ বাঁচিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বিশ্রাম করছে। ছোটকর্তার ঘোড়া এখন তাদের বিরক্ত করল না। সেই মোরগটা এখন বাঁশের বেড়ার উপর বসে ছিল, সেও আর ভয় পেল না, বরং পরম কৌতূহলে গর্বিত ঘাড়টা নেড়ে সে ছোটকর্তার ঘোড়ার চলার ছন্দটা যেন নিরিখ করতে লাগল।

বাড়িতে পৌছতেই রামকিষ্টো এগিয়ে এল। ঘোড়া থেকে নেমে ছোটকর্তা সেটাকে রামকিষ্টোর হাতে ছেড়ে দিলেন। হঠাৎ শুনলেন বুড়ির ছেলেটা তারস্বরে কাঁদছে। বাবা রে, গলাখানা কী! ছোটকর্তা উঠে গেলেন ঘরে। দেখলেন, খুবই বিরক্ত ভাব।

মুখ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী গো বাবু, এত গোসা হল কার উপরে?

অমনি তার কান্না থেমে গেল। ছোটকর্তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হেসে হাত পা ছুঁড়তে লাগল।

ছোটকর্তা হা-হা করে হেসে উঠলেন। কী রকম পাজী! কোলে উঠবার মতলব!

ছোটকর্তা বললেন, ও শালা, ভাবিছ ঘুঘু বুঝি বারে বারে ধান খাতি আসবে, না? আর তুমারে কোলে নিচ্ছি নে। দারোগারা লোক চরায়ে খায়, আর তুমি শালা এমন বাহাদুর, সেই দারোগারেও চরাতি চাও!

গিরিবালা ঘরে ঢুকে দেখল ছোটকাকা তার খোকার গাল টিপে টিপে আদর করছে আর তার খোকা হাত পা নেড়ে মনের আনন্দে কৎ কৎ করছে।

তাকে দেখে ছোটকর্তা বললেন, মা, তুমার ছেলের ভয়ে কাল সকালেই পালাতি হবে। যেমন ভাবে ও আগোয়ে আসতিছে, ভয় হয় গেরেপ্‌তার হয়ে যাব।

ছোটকর্তা হাসতে হাসতে নিজের ঘরে পোশাক ছাড়তে চললেন। পোশাক ছাড়া হলে রামকিষ্টোকে তেল মাখাতে বললেন। বেশ করে চানটি করে খেতে বসলেন। মেজদির হাতের পিঠে পায়েস, ছোটকর্তার মুখে যেন অমৃতের মত লাগল। খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু গড়িয়েও নিলেন।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সন্ধ্যে প্রায় হয়-হয়। পাছে আবার কোন মায়ায় আটকে পড়ে যান, তাই ছোটকর্তা আর কালবিলম্ব করলেন না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন নবীন তাঁতির বাড়িমুখো। শুধু বড় বউকে বলে গেলেন ফিরতে রাত হবে। বড় বউ বুঝলেন।

বললেন, ভাত তুমার ঘরেই ঢাকা থাকবে। আসে খায়ো কিন্তু।

ছোটকর্তা 'আচ্ছা আচ্ছা' বলে পাশ কাটালেন।

সতের

নবীন তাঁতি হাঁটতে পারে না। ছোটবেলা থেকেই তার পায়ে জোর নেই। সান্নিপাতিক জ্বরবিকার হয়েছিল। প্রাণে বেঁচেছে, পা দুটো বাঁচাতে পারে নি। তা বলে সে অকর্মণ্য নয়। নাম-করা কারিগর সে। তার মত

ঘুড়ি কেউ বানাতে পারে না। শুধু কি ঘুড়ি, কত রকম পুতুল বানায় নবীন, কত ধরনের খেলনা নাচের পুতুল তৈরি করতেও সে বাঘা ওস্তাদ। কিন্তু এসবে এক আধলা রোজগার হয় না তার। দরকারই বা কী? বাবা কিছু টাকা রেখে গিয়েছে। বড় ভাল তাঁতি ছিল সে। তার হাতের সুহাগী শাড়ির খুব চল ছিল সে আমলে। ওয়ারিশ বলতে ওই তো এক নবীন। আর এক বোন ছিল, শান্তিপুরে বিয়ে হয়েছে। নবীনের সেই দিদিরই এক বিধবা মেয়ে দুই ছেলে নিয়ে নবীনের কাছে থাকে।

নবীন বাড়ি থেকে একটু দূরে, নদীর পাড়ে, তার আস্তানা বানিয়েছে। সেইখানেই সে তার যন্ত্রপাতি, পুতুল, খেলনা, ঘুড়ির সরঞ্জাম আর মনোমত সঙ্গী ধান্যেশ্বরীর বোতল নিয়ে পড়ে থাকে।

ছোটকর্তা যখন এলেন, তখন সন্ধ্যে উতরে গিয়েছে। নবীন হ্যাজাগবাতি জ্বেলে পুতুল-নাচের মহড়া দিচ্ছিল। দুটো নতুন পুতুল সে বানিয়েছে। নাম দিয়েছে চন্দ্রাবলী আর চোরা কানাই। নবীনের সুতোর টানে টানে পুতুল দুটো কী সুন্দর নড়ছিল! বিশেষ করে চন্দ্রাবলী। তার চালচলনে সত্যিকার রঙ্গিণী নারীর মতই চটুলতা। ছোটকর্তার খুব মজা লাগল।

বলে উঠলেন, বাহবা নবীন, বাহবা! তুমি যে শেষ পর্যন্ত বিধেতারেউ টেক্কা দিতি শুরু করলে!

ছোটকর্তাকে দেখেই নবীন খুশী হয়ে উঠল। তার নিঃসঙ্গ জীবনে এই একটা মনের মতন মানুষ সে পেয়েছে।

শশব্যস্তে বলে উঠল, আসেন আসেন ছোটবাবু।

ছোটকর্তা বললেন, ব্যস্ত হয়ে না, ব্যস্ত হয়ে না। আইছি যখন, সহজে যাব না। তুমার এই পুতুল দুটো বড় জবর হয়েছে হে, বিশেষ করে ওই মনকাড়া মাগীডে। আহা কী ছৈরৎ! ইচ্ছে করে সারাজীবন জাপটায়ে ধরে পড়ে থাকি।

নবীন হা-হা করে হেসে উঠল। রসিক মানুষ ছাড়া রসের তত্ত্ব বোঝে কেডা?

বলল, ছোটবাবু, উনি চন্দ্রাবলী, বিন্দেবনে অনেকের বুকিই আগুন জ্বালিছেন। ইবার বড় জব্দ। আগুন নিয়ে খেলতি যায়ে ইবারে নিজির বুকি পড়িছে কি না ছ্যাঁকা, তাই বিলেপের আর কুলকিনারা নেই।

অপূর্ব কৌশলে নবীন সুতো ধরে টান দিতেই চন্দ্রাবলী জ্যান্ত মানুষের মতই এক পাক ঘুরে চোরা কানাইয়ের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

তারপর দু হাত জোড় করে কানাইয়ের পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল।

নবীন সঙ্গে সঙ্গে গান ধরল :

ও আমার কেলে সুনা
তুমি রাতে করতে আনাগোনা
এখন হয়ে রাজপিয়াদা
আমারে আর চেনো না।

ছোটকর্তা উচ্ছ্বসিত হয়ে বেড়ে বেড়ে করে তারিফ দিয়ে ঝপ করে এক জায়গায় বসে পড়তেই ফ্যাস্‌স্‌ করে একখানা কৌড়ে ঘুড়ি ফেঁসে গেল। ছোটকর্তা তো মহা অপ্রস্তুত।

বোকার মত বলে উঠলেন, ঘরে যে আর জায়গা রাখো নি কিছু। ছিঁড়ল তো।

ছিঁড়ুক ছোটবাবু, ছিঁড়ুক, ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই।

নবীন ততক্ষণে পুতুল দুটোকে গুটিয়ে রেখে মদের বোতল বের করে ফেলেছে। দুটো গেলাসে পরিপাটি করে ঢেলে একটা গেলাস ছোটকর্তাকে এগিয়ে দিল। তারপর নিজেরটুকু এক চুমুকে সাবাড় করে বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখখানা মুছে ফেলল।

তারপরে ভারী গলায় বলল, বলি, সেই ছড়াডা শুনিছেন তো—

পুড়ুক পুড়ুক ছাওয়ালের মাথা
আরও ছাওয়াল পাব,
আলা তামুক পুড়ে গেলি
কার দরজায় যাব!

তা আমারউ সেই কথা। ঘুন্নি গেলি আবার ঘুন্নি পাব, বানায়ে নেব আরেকখান, ও তো এই হাতের মধ্যিই থাকল। কিন্তু আপনি গেলি, কার দুয়োরে খুঁজতি যাব? পাবই বা কনে?

ছোটকত্তার শিরা উপশিরা দিয়ে মদের তীক্ষ্ণ স্রোত বইতে লেগেছে। নবীনের কথায় মিচকি মিচকি হাসতে লাগলেন।

নরম গলায় বললেন, কী সুখি তুমি রাতদিন এত ঘুন্নি বানাও?

নবীন আরও খানিক মদ ঢালল গেলাসে, ঢালল গলায়। তার চোখ দুটো চকচক করতে লাগল। সুন্দর হাওয়া উঠে আসছে নদীর দিক থেকে। শীতল হাওয়ায় প্রাণ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে।

নবীন ধরা গলায় বলল, ছোটবাবু, তিন রকম জীব আছে জগতে, স্থলচর, জলচর আর খেচর। আপনারা হলেন গে স্থলচর। কত জায়গা ঘোরেন, কত দেশ-বিদেশে যান! কত কী দেখেন! ভগবান আমারে মা'রে রাখিছেন। এ জীবনে স্থলচর হওয়া আর আমার হল না। তাই খেচর হবার সাধ হয়েছে। ঘুন্নি বানাই, আর এই ঘুন্নির সঙ্গে মনডারে বাঁধে দিই। জানেন তো—

নবীন গুনগুন করে গান ধরল,

চিলে করে ঢিলে মিলে
কোঁড়ে মারে টান,
পতঙ্গা উঠে বলে আরও স্থতো আন্।

নবীন বলল, ওই পতঙ্গার সঙ্গে মন বাঁধে স্থতো ছাড়তি থাকি। মনে মনে বাসনা, একদিন উপরে উঠে পতঙ্গা স্থতোর টান আর গেরাহ্যি করবে না, স্থতো কাটে উঠে যাবে উপরে, আরও উপরে, মেঘের দেওয়ালের পাশ কাটায়ে স্বজা ঢুকে পড়বে চাঁদ-তারার রাজ্যে। ওর সঙ্গে আমার মনও যাবে উড়ে। দিনরাত বসে বসে আর ভাল লাগে না ছোটবাবু। আমার তো ডানা নেই, নাহলি নিজিই একদিন উড়োন দিতাম।

নবীনের কথার জন্যেই হোক, কি মদের তেজেই হোক, ছোটকর্তাও উড়ছিলেন এতক্ষণ। নবীনের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন ঠক করে নেমে পড়লেন মাটিতে। আমেজটা নষ্ট হল। ছোটকর্তার মনে হল, নবীনটা সাধক লোক। কী আশ্চর্য, জগৎস্বদ্ধ লোক যখন বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে, প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য, কামড়া-কামড়ি, খেয়োখেয়ি করছে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাতে ব্যস্ত, নবীন তখন ঘুড়ি বানিয়ে আর পুতুলের জগৎ সৃষ্টি করে কাল কাটাচ্ছে! কী, না চাঁদ-তারায় ঘুরে বেড়াবে! এমন লোক কটা হয়!

ছোটকর্তা বললেন, তোমার এই মন যদি জগতের আদ্ধেক লোক পাতো নবীন তো দেখতে দুনিয়ার চিহারা বদলায়ে যাতো।

নবীন বলল, মন বড় জুয়োচোর ছোটবাবু, ওর গতিবিধি কিডা জানতি পারে? ওর কথা ছাড়ান গ্যান। ইবার আপনার কথা কন। আজকাল বড় একটা আসেন না ইদিক। দেশ গাঁ কি ছাড়ে দেলেন?

ছোটকর্তা পরিহাস করলেন, কার কাছে আর আসব কও? ভাবের মানুষ যে ছিল, তিলক কা'টে সে বষ্টমী হল।

নবীনও হাওয়া হালকা করে দিল, বলল, মানষির অভাব আছে নাকি ছোটবাবু? পুরনো যায়, নতুন আসে। কটা চাই আপনার? চান তো একেবারে কচি-কাঁচার সন্ধানউ দিতি পারি।

ছোটকর্তা হেসে ফেললেন। বললেন, বয়েসটা যে চল্লিশ পার হয়ে গিয়েছে নবীন, এই বয়েসে আর কাঁচা রাস্তায় পা বাড়াতি সাহস হয় না, পিছলে পড়ে পা ভাঙলি বুড়ো হাড় আর জুড়া লাগবে না, বুঝিছ? আমাগের এই বাঁধা শড়কই ভাল।

নবীন বলল, কথাডা বলিছেন বড় ভাল। তা বাঁধা শড়কে যাতি চান তাই না হয় যাবেন।

ছোটকর্তা বলল, কাল তো ঠেকে গেলাম সেইখেনেই। কারুর কথাই মনে পড়ল না। এখন অবিশ্যি মনে হচ্ছে পদ্ম কি কুসুমরি একবার কাঁড়ায়ে দেখলিউ হত।

নবীন বলল, সে গুড়ি বালি ছোটবাবু। শুনি তো কুসুম এখন মেদ্দার বনে ফুটতিছে। আর পদ্মরি নাকি মাড়োয়ারীবাবু একবারে পর্দানশীন ঘরের বউ বানায়ে ফেলিছে। শুধু তার হাতে খায় না।

ছোটকর্তা বললেন, ক্যান?

নবীন বলল, পদ্ম যে বাঙালী, মছলিখোর।

ছোটকর্তা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

বললেন, অ্যাঃ, ও-শালা মাড়োয়ারীর ধম্মজ্ঞান তো বড় টনটনে! বাঙ্গালী মাগীর ভাত খাতি মাছের গন্ধ লাগে আর তার জাত খাতি সে আঁসটে গন্ধ বুঝি নাকে ঠেকে না?

নবীন চুপচাপ মদ খেতে লাগল। হঠাৎ ছোটকর্তার একটা জরুরী কথা মনে পড়ল।

বললেন, ওহে নবীন, আসল কথাই ভুলে যাচ্ছিলাম, মাড়োয়ারীর কথায় মনে পড়ল, হ্যাখ, ওই শালা আজ আমারে পঁচিশটে টাকা নজরানা দিয়েছে, আমার একটা নাতি হয়েছে জান তো, মা'জদার মেয়ের ছেলে, তা সে শালার মুখ দেখলাম, এখন কিছু একটা দিতি হয়তো, এই ন্যাও, নজরানার টাকাটা তুমার কাছে রা'খে হ্যাও, আমি কাল ভোরে চলে যাব, তুমি একটা স্যাকরারে দিয়ে ভাল একজুড়া বালা গড়ায়ে দিবা।

নবীনের নেশা ধরেছে। সে চুপচাপ টাকাটা নিয়ে রেখে দিল। তারপর

ধীরে ধীরে ছোটকর্তাও চুপ হয়ে গেলেন। তাদের শিরা-উপশিরায় অনেকবার চাঞ্চল্য জাগল। মাথার পিছনটা দপদপ করতে লাগল। চোখ বুজে আসতে লাগল। নবীনের মনে হল, সে দৌড়বাজিতে যোগ দিয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। ছোটকর্তার মনে হতে লাগল, তিনি নবীনের পতঙ্গা ঘুড়িতে বসে মেঘের উপর ভাসছেন। কিন্তু এত দুলছে ঘুড়িটা স্থির হয়ে বসতে পারছেন না। কানে সোঁ-সোঁ শব্দ হচ্ছে। বাতাস হচ্ছে নাকি? ঘুড়িটা টাল খেতেই ছোটকর্তা মেঝের উপর টলে পড়লেন। গোটা কতক খালি বোতল ধাক্কা লেগে গড়িয়ে পড়ল। ছোটকর্তা উঠে বসতেই নদীর দিকে নজর পড়ল। চাঁদ উঠেছে। জলে তার ছায়া পড়ে ঝিলিমিলি খেলা শুরু হয়েছে। ছোটকর্তার মনে হল, কেউ যেন অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে নাচাচ্ছে। রাত হয়েছে। চাঁদ উঠে পড়েছে যখন, তখন বেশ রাত হয়েছে। এবার বাড়ি যেতে হয়।

ছোটকর্তা উঠে দাঁড়াতেই শরীরটা টলমল করে উঠল। তিনি সামলে নিলেন।

জড়িত কণ্ঠে বললেন, চলি হে, নবীন।

নবীন সাড়া দিল না। সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুমিয়ে ছোটবউও পড়েছিলেন। কিন্তু আচমকা খাটটা নড়ে উঠতে, ধপ করে একটা শব্দ হতেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। আর ঘুম ভাঙতেই তাঁর নাকে ঝাঁজালো মদের গন্ধ ঢুকল। গন্ধটা নাকে ঢুকতেই তাঁর গায়ে পাক দিয়ে উঠল। গায়ে পাক দিয়ে উঠতেই একটা অঘটন ঘটে গেল। এ কী, এ যে তাঁর অত্যন্ত পরিচিত এক অস্বস্তিকর গন্ধ! যে লোকটা এই অসহ্য গন্ধ বয়ে আনত, সেই অনেক অনেক দিন আগে, বোধ হয় বিগত জন্মে, সেই লোকটা, সেই ছোটকর্তা এসেছে নাকি? ধড়মড় করে উঠে বসলেন ছোটবউ। ওমা তাই তো, ওই তো, গরমে এপাশ ওপাশ করছে, সেই যেমন আগে আগে করত!

যে ভারী আবরণটা এতদিন ছোটবউয়ের স্মৃতির উপর জগদ্দলের মত চেপে বসে ছিল, এই পরিচিত ঝাঁজালো গন্ধটা তীক্ষ্ণধার ছুরির মত তাকে ফালা ফালা করে কেটে উড়িয়ে দিল। স্বামীর এত কাছে বসে আবেগের তাড়নায় বুকটা ধুক পুক ধুক পুক করতে শুরু করল তাঁর। অজস্র খুশি এক সঙ্গে

তাঁর নাভিমূল থেকে উঠে এসে কণ্ঠনালিতে আটকে গেল। এইবার দম ফেটে যেন মরে যাবেন ছোটবউ। অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হল তাঁর কণ্ঠার কাছে, না না, বুকের কাছে। আবার মুহূর্তে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এবার একটা বেদনার তীক্ষ্ণ তীর তরতর করে উঠে আসছে। চোখ ভরে আসছে জলে। সর্বশরীর থরথর করে কাঁপছে। ছোটবউ আর পারছেন না, নিজেকে সামলে রাখতে পারছেন না। ভিতরে ঝমঝম বর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে। যে অন্তর শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল, দশ বছর যাবৎ যে প্রান্তর খাঁ-খাঁ করেছে, এখন তা প্রবল বর্ষণে ভিজতে লাগল। কী যন্ত্রণা! কী শান্তি!

ছোটবউ বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলেন, প্রথমে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তারপর জোরে জোরে। কান্নার জোয়ার নেমেছে। ছোটবউ কুটোর মত ভেসে চলেছেন—চলেছেন—চলেছেন।

কান্নার শব্দে ছোটকর্তার তন্দ্রা ছুটে গেল। কে কাঁদে? নবীন? নবীনের চন্দ্রাবলী? না তো। ধড়মড় করে উঠতে গেলেন ছোটকর্তা। পারলেন না। মাথাটা বেশ ভারী। সারাদেহে রিমঝিম। বুকে প্রবল তৃষ্ণা। এক গ্লাস জল পেলে হত।

কান্নার শব্দ তখনও আসছে। পিছন থেকে, পাশ থেকে। ছোটকর্তা বিমূঢ়ের মত দু হাতের তালু দিয়ে মুখখানা ঘষে নিলেন। মুখখানা তখনও চিনচিন করছে। গভীর রাত্রে কাছেপিঠে কোথাও যেন একখানা বড় রেলের ইঞ্জিন এসে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটকর্তার কানে তারই সিঁ-সিঁ আওয়াজ বাজছে।

এবার তিনি পাশ ফিরলেন। পাশ ফিরতেই দেখলেন ছোটবউয়ের ছায়া-ছায়া শরীরটা উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। বাঃ রে, এখানে, এই নবীনের ঘরে ছোটবউ এল কী করে? নাকি, এটা তার বাড়ি? তিনিই বা বাড়ি এলেন কখন? ছোটবউ আগে থাকতেই ছিল নাকি এই খাটে? নাকি, এখন এল?

কাঁদছে কেন ছোটবউ? আজ সে কাঁদছে কেন? আহা, দশ বছর আগে, খোকা মরে যাবার পর, ওকে যদি এমন করে কাঁদাতে পারা যেত, তাহলে আর ছোটবউ অমন উদোম পাগল হয়ে যেত না। পাগল না হলে কবে আবার ওর কোলে খোকা এসে যেত। সবাই তখন কত চেষ্টা করেছিল ছোটবউকে কাঁদাতে। একটি ফোঁটাও তখন কাঁদে নি সে। সত্যিই ওর পোড়াকপাল। হতভাগী!

কেমন এক সমবেদনায় ছোটকর্তার মনটা ভিজে উঠল। চোখ দুটো করকর করতে লাগল।

ছোটকর্তা ছোটবউয়ের পিঠে আস্তে হাত রেখে নরম করে ডাকলেন, ছোটবউ !

সঙ্গে সঙ্গে ছোটবউ তাঁর চওড়া বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আলুথালু মাথা ঘষতে ঘষতে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, ওগো, আমাকে ফেলে যেয়ো না। আমার ভয় করে, ভয় করে, বড্ড ভয় করে।

আহা বেচারী, ছোটকর্তার দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি পরম আদরে ছোটবউয়ের পিঠে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

তারপর গলা ঝেড়ে বললেন, নাঃ, তোরে নিয়েই যাব। তবে ইবার না, আমি যায়ে কোয়াটার ঠিক করে নিই আগে, তারপর আসে নিয়ে যাব। ভয় কী, এখন আর তোর ভয় কী, তুই তো একেবারে ভাল হয়ে গিছিস। কাঁদিস নে, ছোটবউ, আর কাঁদিস নে।

ছোটকর্তার সান্ত্বনা পেয়ে ছোটবউয়ের কান্না ধীরে ধীরে থেমে এল। ছোটকর্তার বিরাট শরীরটা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে তিনি ফোঁপাতে লাগলেন। তারপর একসময় সব-কিছু থেমে গেল। দুজনেই ঢুলে পড়লেন গভীর ঘুমে। এ ঘুমের জাত একেবারে আলাদা।

আঠার

সুধাময়কে নামাবার জন্য বাসখানা থামতেই আবার তার স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। এবার নিয়ে এই আট মাইল রাস্তায় পাঁচবার "সোহাগিনী"র স্টার্ট বন্ধ হয়েছে।

সুধাময় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক, আর তাকে কাদার মধ্যে বাস ঠেলতে হবে না। চার চাকার ঘায়ে পথের কাদা ছিটকে ওর সর্বাঙ্গে মাখামাখি হয়েছে। নতুন কাপড়খানা ফেঁসেছে, জামাটা লাট হয়েছে। জুতোটা খুলে রেখেই এ বাসে চাপা উচিত ছিল তার, সুধাময় এখন সেটা বুঝতে পারছে। কিন্তু এখন আপসোস করে আর কী হবে? এ জুতো দেখে কে এখন বলবে,

এটা কলকেতা থেকে কেনা চীনে বাজারের জুতো? এ জুতোর চেহারা দেখে গ্রামের গঙ্গা মুচির সেই গবদা-গবদা ভোঙা-ভোঙা জুতোগুলোও হয়তো ফ্যাক ফ্যাক করে হাসবে।

যাক, এবার আপদের শান্তি হল। মনে মনে নাক কান মলল সুধাময়। আর বাবা এ বাসে উঠছি নে। খুব শিক্ষে হয়েছে। কিন্তু কণ্ডাক্টারটা করে কী? গেল কোথায়? মাল নামায় না কেন?

অসহিষ্ণু সুধাময় হাঁক পাড়ল, কই হে কণ্ডাক্টার, মাল নামাও।

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। সুধাময় এদিকে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বুনোপাড়াটা রাস্তার উপর থেকেই এখন বেশ দেখা যায়। এত জঙ্গল সাফ করল কে? সুধাময় একটু অবাক হল। আগে ঘন জঙ্গল ছিল বুনোপাড়াকে ঘিরে। দিনে দুপুরে এলেও গা ছমছম করত। বুনোপাড়ার পরই বাজনদারদের পাড়া। বাজনদারপাড়ার সীমানা ছাড়ালেই সুধাময়দের বসত ভিটের এলাকা শুরু। তিরিশ বিঘে জমির উপর বাড়ি আর আম কাঁঠাল সুপারি নারিকেলের বাগান। রাস্তা থেকে সুধাময়দের বাড়ি পৌঁছতে অন্তত দশ মিনিট তো লাগেই। চঞ্চল হয়ে উঠল সুধাময়। কোথায় গেল কণ্ডাক্টার?

বুনোপাড়ার থেকে দুম দুম ট্যাম ট্যাম একটানা একঘেয়ে একটা বাজনার আওয়াজ কানে এসে বাজছে। এ আওয়াজ সুধাময়ের খুব পরিচিত। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে সে। সুধাময় জানে, বুনো সর্দাররা এবার দল বেঁধে শুয়োর মারতে বেরুবে, বুনো শুয়োর। এ তারই প্রস্তুতি। এখন ওরা বাড়ির তৈরি হাড়িয়া খাবে আর দুম দুম ট্যাম ট্যাম বাজনা বাজাবে। কদিন ধরে এইরকম চলবে। তারপর ওরা তীর ধনুক বল্লম টাঙি নিয়ে বেরিয়ে পড়বে দল বেঁধে। গ্রামের জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলবে হল্লায় আর চিৎকারে। কদিন ধরে সমানে তাড়া করে বেড়াবে বুনো শুয়ার, চিতা, বাঘ, যাকে সামনে পাবে। সজারু মারবে, গোসাপ মারবে, হিংস্র অহিংস্র কোন প্রাণীকে বাদ দেবে না। তারপর বড় একটা শুয়োর, দাঁতাল যদি হয় তো আরও ভাল, মারার পর গুষ্টিসুদ্ধ সবাই আয়োজন করবে এক মহাভোজের। দু-তিন দিন ধরে চলবে তার জের। তারপর একদিন বুনো পাড়ার উত্তাল বীররক্তে ভাটা নামবে আর মেয়ে মরদ আবার শান্ত হয়ে ফিরে আসবে সাধারণ কাজকর্মে। সুধাময় জ্ঞান হওয়া অবধি এই দেখে

আসছে। এর মধ্যে কত কী ঘটে গেল দেশে, পৃথিবীর কত যে পরিবর্তন হল, কিন্তু এদের আদিম অভ্যস্ত জীবনের এক তিলও পরিবর্তন হতে দেখল না সুধাময়।

এই তো কলকাতা থেকে আসছে সুধাময়। কাল এমন সময়ও সে খরগতি কলকাতার আধুনিক জীবনস্রোতে দারুণ বেগে ভেসে বেড়াচ্ছিল। আর এখন? একটা নড়বড়ে বাসের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রথম শরতের শ্লথ সকালে সুধাময় আদিম মানুষের শিকারের বাদ্য শুনছে। কলকাতায় অনেক ইংরিজী সিনেমা দেখেছে সুধাময়। তার মনে হল, তারই কোন একটায় দেখা অরণ্যবাসী আফ্রিকানদের জীবনযাত্রায় সে যেন অকস্মাৎ ঢুকে পড়েছে। ড়ুম ড়ুম ট্যাম ট্যাম, ড়ুম ড়ুম ট্যাম ট্যাম। ঠিক সেই সুর, সেই তাল। মাত্র দু শ আড়াই শ মাইলের ব্যবধান, বড় জোর ঘণ্টা দশেকের জার্নি, তার মধ্যেই সুধাময় কেমন সভ্যতার একটা স্তর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আর-একটা স্তরে পৌঁছে গেল!

সুধাময়ের চমক ভাঙল প্যাসেঞ্জারদের চেঁচামেচিতে। ওদের মধ্যে জনা পাঁচেক লোক আঠারোখাদায় যাবে, কুটুমবাড়ি। এখনও পাঁচ-ছয় মাইল বাকী। একে কুটুমবাড়ি, তায় পয়সাওয়ালা কুটুম। বাস ঠেলতে গিয়ে ওদের পাটভাঙা পোশাকও কাদা মেখে লাট হয়ে গেছে। তাই গরম হয়েই ছিল। তার উপর আবার স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। মানে আবার ঠ্যালো। মাথায় রক্ত চড়ে গেল একজনের।

বলি পায়েছো কী, ও মটোরওয়ালা? আবার যে ইস্টাট বন্ধ করে দিলে?

ড্রাইভার স্টীয়ারিংয়ের উপর পা-তুলে নিশ্চিন্তমনে লোহার পিন দিয়ে দাঁত খুঁটছিল। জবাব দিল না।

এই যে, ওগো, ও ডিরাইভার, কানে ছিচকে না ঢুকোলি বুঝি কথা প্রেবেশ করে না?

ড্রাইভার এবারও জবাব দিল না। দাঁত খোঁটা হয়ে গেলে পিচিৎ করে ছ্যাপ ফেলল। তারপর ধীরে সুস্থে পকেট থেকে চিপটে-যাওয়া কাঁচি সিগারেটটা বের করল, দুই মুড়োয় দুবার ফুঁ ফুঁ করল, দেশলাইয়ের জন্য পকেট হাতড়াল, পেল না, কী যেন ভাবল একবার।

তারপর সুধাময়কে ডাক দিল, ও ভদ্দরলোক, আসেন দেখি ইদিক, ম্যাচ আছে?

সুধাময়ের কাছে দেশলাই ছিল না, সিগারেট-জ্বালানো কল ছিল। এগিয়ে তাই জ্বেলে সিগারেটটা ধরিয়ে দিল।

ড্রাইভার তো অবাক।

বলল, বা বা বা, খাসা, ইডা তো ভারি জবর কল রে মশাই! পালেন কনে?

সুধাময় বলল, কলকাতায় কিনেছি।

সিগারেটে জোরে একটা টান মেরে নাক মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ড্রাইভার বলল, আহা, সিগারেটের টেস্টোই বদলায়ে গেছে।

পিছন থেকে আবার গলা শোনা গেল, এই যে ময়নাপাখির বুলি ফুটিছে দেখতিছি, তা এই গভ্‌ভো-যন্তন্না আর কতক্ষণ ভোগ করব, ও মটোরওয়ালা?

ড্রাইভার এবার রাজকীয় ভঙ্গিতে ঘাড় ফেরাল। ভালভাবে যেন প্যাসেঞ্জারদের একবার ওজন করে নিল।

গম্ভীরভাবে বলল, এ আপনাগের বাতো ঘুড়ার গাড়ি না, মটোর। সিডা ভুলে যাবেন না। এসব যন্তরের কারবার, টাইম হলি তারপরে ছাড়বে।

পিছন থেকে কে যেন ভেঙিয়ে উঠল, এঃ, মোটেই চুল নেই তার আবার চুটকির বাহার। গাড়ি চলে কই যে, তার টাইম দেখাতিছ!

ড্রাইভার এবার চটে গেল। বলল, ইডা কুণ্ডু কোম্পানির গাড়ি সিডা মনে রাখবেন। কুণ্ডু কোম্পানির গাড়ি চলে না, এ অপবাদ তার শত্তুরিউ দিতি পারবে না।

আহা-হা, চলার কী ছিরি রে, আদ্দেক পথ তো ঠেলতি ঠেলতিই নিয়ে আলাম।

ড্রাইভার বলল, ইডা মোষ, না, মটোর, তাই শুনি? হাবড়ে পড়লি রাজার মটোরও ঠেলতি হয়। চড়েন তো ছ্যাকড়া, এ সব গাড়ির মর্ম বোঝবেন কী করে?

তারপর সুধাময়কেই যেন সাক্ষী মানল ড্রাইভার।

ও ভদ্দরলোক, আপনিই কন তো কলকাতার লোক কী করে? গাড়ি কাদায় পড়লি ঠ্যালে না?

সুধাময় হাসি চেপে বলল, কাদায় পড়লে হাতি ঠেলতে হয়, আর এ তো মটোর।

ড্রাইভার বলল, শোনেন, একজন বিশিষ্ট ভদ্দরলোকের কথাডা মন দিয়ে

শোনেন একবার। কুণ্ডুবাবু যে বলেন, মানষির উপগার করত্তি নেই, কথাটা ঠিক। এইসব মটোর গাড়িরউ যে-টুকু কৃতজ্ঞতা বোধ আছে, মানষির তাও নেই। গাড়ি যে গাড়ি, জল পেট্রোল খাওয়ালি সে-ও সে কথা ভোলে না, তার প্রিতিদান দেয়, আর দ্যাখেন মানষির ব্যাভার, নিজির স্বচক্ষি দ্যাখেন, এতখানি পথ যে-গাড়ি চড়ে আলেন এখন তারই বদনাম গাচ্ছেন সব। সে গাড়ি নাকি চলে না! আর চলে না তো তোগের আনল কিডা এতদূর টানে?

ড্রাইভার খুব চটেছে। সুধাময়ের মনে হল, এই অবস্থায় ছাত থেকে তার বাক্স বিছানা নামাবার কথাটা খুব মোলায়েম করে বলে ফেলবে কি না?

এমন সময় ড্রাইভার আবার মুখ খুলল।

বোঝলেন, কুণ্ডুবাবু যে বলেন, মানুষ একের নম্বরের স্বাথ্‌থপর, কথাডা ঠিক। নিজির সুবিধেডা পায়ে গেলিই হল, নিজি বাড়ি পৌঁছয়ে গেলিই হল, তারপর যা হয় হোক, থাক্‌ শালা তুই পড়ে। কী কন?

সুধাময়কে আবার সাক্ষী মানল ড্রাইভার। এবং সুধাময়কে সায়ও দিতে হল।

এই হল প্রিকিত ভদ্দরলোকের ব্যাভার। দ্যাখেন, আপনারা সবাই নিজির নিজির স্বচক্ষিই দ্যাখেন।

এমন ট্যাটনের পাল্লায় আগে কখনও পড়ে নি সুধাময়। বাড়ি যাবার জন্য মনটা ছটফট করছে। কৌতূহল ফেটে পড়ছে বুড়ির ছেলেটা দেখবার জন্য। বুড়ির আবার ছেলেও হল, সেই বুড়ির, সাত চড়ে যার মুখ দিয়ে রা বেরত না। বিয়ের আগে দিনরাত যে কাঁদত। সুধাময়ের যে ছিল খেলার সাথী। সুধার থেকে ছয় বছরের ছোট বুড়ি। দুজনে খুব ভাব। দু বছর আগেও সুধাময় বুড়িকে দেখেছে। এখন মা হয়ে কেমন চেহারা হয়েছে? কণ্ডাক্টার ব্যাটা এলে যে বাঁচে সুধাময়।

ড্রাইভার আবার ডাকল।' সুধাময়কে বলল, ভদ্দরলোক কি গাছে ফলে মশাই? ব্যাভার দেখে টের পাওয়া যায়। শুকনো খটখটে রাস্তায় গাড়ি দাঁড়ায়ে আছে, জলে পড়ে নি কেউ, তার মধ্যিই সব বসে আছেন, তারই ঠ্যালা এই, বচনের চোটে তিষ্ঠোনো যাচ্ছে না। সত্যি সত্যিই যদি জলে পড়ত গাড়ি তালি বোধ হয় বাবুরা আমার গলাডাই টিপে ধরতেন।

পিছনের সীটগুলোয় যারা বসে ছিলেন, ড্রাইভার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাদের

উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। আর-একটা চ্যাপ্টানো সিগারেট বের করল পকেট থেকে। টিপে টুপে মেরামত করে নিয়ে দু দিকেই বেশ করে ফুঁ দিয়ে নিল। তারপর সুধাময়কে চোখ মেরে বলল, ও ভদ্দরলোক, আপনার ওই খ্যাচাকলটা জ্বালান দেখি আরেকবার, সিগারেটটা ধরায়ে নিই।

সিগারেটটা ধরিয়ে জোরে জোরে টান মেরে নাক মুখ দিয়ে ড্রাইভার ধোঁয়া ছাড়ল গলগল করে। ডান হাতের দু আঙুলে সিগারেট ধরা ছিল। মাঝে মাঝে তুড়ি মেরে ছাই ঝেড়ে নিচ্ছিল।

বলল, জলে কি পড়ে না গাড়ি? পড়ে। কলকব্জার মন তো। বোঝলেন না? এই আমার মতন পাকা লোকের হাতেও গাড়ি গিয়ে খানার জলে পড়িছে। এই সুহাগিনী, ইনিই পড়িছেন। তাও বরযাত্তির বুঝাই করে। পবহাটির মজুন্দোররা বিয়ে করতি শৈলকুপোয় যাবেন। ভরা বর্ষা। ওনারা আবার কুণ্ডুবাবুগের উকিল। শখ হল মটোরে করে বিয়ে করতি যাবেন। কুণ্ডুবাবুরি ধরলেন, মটোর চাই। কুণ্ডুবাবু আমারে কলেন, জগবন্ধু, আর কারুর উপর আমার বিশ্বেস নেই। গাড়ি আমার আরউ আছে, ডিরাইভারেরউ অভাব নেই। কিন্তু শৈলকুপোর যা রাস্তা, বিশেষ করে এই ভরা বর্ষায়, সুহাগিনী ছাড়া কারুর সাধ্যি নেই এক পা নড়ে। তুমি ছাড়া এসব রাস্তায় কেউ তো গাড়ি চালাতিই পারবে না। তা গেলাম। ফিরবার সময় সুহাগিনী খানায় গিয়ে পড়ল। বুঝে ছাখেন। তিন ঘণ্টা আমরা এক গলা জলে বসে ছিলাম। কিন্তু কেউ টু শব্দ অব্দি করিছে, কেউ বলুক তো। বোঝলেন না, ভদ্দরলোকের চিহারাই অন্যরকম। বোঝলেন এই সুহাগিন—

তোর সুহাগিনীর নিকুচি করি।

গাড়ির দরজা ধড়াম করে খুলে পিছন থেকে জনা চারেক প্যাসেঞ্জার হৈ-হৈ করে ড্রাইভারের কাছে এগিয়ে এল।

—শালা, গাড়ি চালাবার নাম নেই, বসে বসে আমাগের কুষ্টি কাটতিছ! এক চড়ে বদন বিগড়োয়ে দেব।

—এই গাড়ি আজ তুমার ইয়ের মধ্যি ঢুকোয়ে ছাড়ব।

—কানা ছাওয়ালের নাম পদ্মলোচন। ঘাটের মড়া গাড়ি, তার নাম আবার সুহাগিনী। তোর সুহাগিনীর মুখি মারি লাথি।

সুধাময় হকচকিয়ে গেল। দেখল, এক বুড়ো ভদ্রলোক রাগে কাঁপতে কাঁপতে গাড়ির সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, তারপর স্পন্দনহীন শীতল

বনেটে মারলেন ধাঁই ধাঁই করে দুই লাথি। একটা ছোকরা এগিয়ে এসে পক পক করে হর্নটা বাজিয়ে দিল। দু-তিনজনে মিলে গাড়ির বডিতে পাগলের মত দুম দাম থাপ্পড় মারতে লাগল। ড্রাইভারও প্যাসেঞ্জারদের এই আকস্মিক প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবাক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে সম্বিৎ ফিরে পেল। কী, তার গাড়িকে অপমান! স্টার্ট দেওয়া হ্যাণ্ডেলটা নিয়ে সে পর-মুহূর্তেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। মাথার উপর হ্যাণ্ডেলটা চরকির মত বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে গেল কিছুদুর। প্যাসেঞ্জাররা সবাই একটু হকচকিয়ে তফাতে হটে গেল। ড্রাইভার প্রচণ্ড রাগে কখনও লাফাচ্ছে, কখনও দাঁত কিড়মিড় করছে।

ড্রাইভারের সেই তাণ্ডব নৃত্য দেখে সবাই একটু ঘাবড়েও গেল।

কিডা আমার সুহাগিনীর মুখি লাথি মারল, মরদের বাচ্চা হলি মারুক দেখি আমার সামনে! ঠ্যাংখান এখনই খুলে নিচ্ছি। এতক্ষণ কিডা গালা-গালি দিচ্ছিল আমার সুহাগিনীরি, কই, আগোয়ে আস বাপের বিটা হও তো, মুখখানারে একটু পালিশ করে দিই।

ড্রাইভার এক একটা কথা শেষ করে আর মাটিতে ধাঁই ধাঁই হ্যাণ্ডেলের বাড়ি মারে। অপর পক্ষ একেবারে চুপ মেরে গেছে। এমন সময় কানে পৈতে গুঁজে কণ্ডাক্টার এসে হাজির। সে তো 'রণং দেহি' আবহাওয়া দেখে তাজ্জব বনে গেল।

জিজ্ঞাসা করল, বলি ব্যাপারটা কী?

কণ্ডাক্টারকে দেখে ড্রাইভার হুঙ্কার ছাড়ল, এই শালা পঞ্চা, গিছিলি কনে? শালার খায়ে দায়ে কাজ নেই, না দেখা না শুনা, যারে পালাম গাড়িতি তুলে বসালাম। দে, সব পয়সা ফিরোয়ে দে। কুণ্ডুবাবুরি বলে এ লাইনি সার্ভিস বন্ধ করে দিতি হবে।

ক্যান, হল কী?

হবে আবার কি, তুমার মুণ্ডু আর আমার পিণ্ডি। ওই যে প্যাসেঞ্জার তুলিছ, ওনারা সুহাগিনীর মুখি লাথি মারিছেন, এই গাড়ি নাকি ঘাটের মড়া! দে, পয়সা ফেরত দে।

পঞ্চা কণ্ডাক্টার ঘুঘু লোক। ব্যাপারটা আন্দাজ করল।

বলল, দাঁড়াও দাদা, দাঁড়াও। এ হল কলকব্জার ব্যাপার। মাথা গরম করলিউ কাজ হবে না, তড়বড় তড়বড় করলিউ না। বুঝে নিই একটু।

গাড়িটা থামতিই পেটটায় মোচড় দিল। তাই একটু বাগানে ছুটিছিলাম আর তার মধ্যিই এত কাণ্ড! যান যান, ও ভদ্দরলোকরা, জায়গা নিয়ে বসে পড়েন গে যান। গাড়ির মর্ম আপনারা কী বোঝবেন। এ বেডফোর্ড গাড়ি উনিশ শ পাঁচের মডেল। এত ভাল গাড়ি আজকাল পাবেন কনে? বয়েস হয়েছে তো, একটু মিজাজে চলে। আমাগের জগোদার মতন আর কী। এমনিতি মাটির মানুষ, রাগলি পরে মুচিগের কুকুর বলে তফাৎ থাকি। গাড়িটাউ তাই মিজাজ যেদিন ভাল থাকে অক্লেশে চলে, বিগড়লো তো বাস্। সেই গাড়িরি কি যা-তা বলে চটাতি আছে? আসেন আসেন, এখন একটু তোয়াজ করে ঠেলে ঠুলে ইস্টার্টটা করে দেন সবাই। জগোদা, তুমি উঠে বস তুমার সিংহাসনে। তুমি হলে রাজা। ছোট কথায় কান দিলি কি তুমার চলে?

দেখতে-না-দেখতে সব গণ্ডগোল মিটিয়ে দিল কণ্ডাক্টার। সুধাময়ের তোরঙ্গ আর বিছানার বাণ্ডিলটা নামিয়ে দিল। তারপর প্যাসেঞ্জারদের জড়ো করে 'হেঁইও, মারে জোয়ান হেঁইও', 'আউর থোড়া হেঁইও' বলে সোহাগিনীকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল।

সুধাময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। লালচে মোটরখানা বড় বড় কড়ইগাছের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। এখনও লোকগুলো ঠেলছে। এই স্টার্ট হল। শব্দ করে জেগে উঠল সোহাগিনী। গাড়িখানা আর দাঁড়াল না, বেশ জোরেই এগিয়ে গেল কিছুদূর। প্যাসেঞ্জাররা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে, এখনও সবাই উঠতে পারে নি। সুধাময় জানে, গাড়ি দাঁড়াবে না, দাঁড়ালেই স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাবে আবার। তাই চলতি অবস্থাতেই লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে হবে গাড়িতে। এইভাবেই সুধাময় এতখানি পথ এসেছে।

বাড়ি পর্যন্ত এই প্রথম মোটর বাসে এল সুধাময়। দু বছর আগে সে যখন কলকাতায় যায়, তখনও এই লাইনে বাস আসেনি। এবার ঝিনেদায় এসেই বাস পেল। বাসটা ঝড়ঝড়ে পুরনো—একথা সত্যি, বার বার ঠেলতে হয়েছে—তাও সত্যি, তবুও তো ঘণ্টা দেড়েকে এসে পৌঁছেছে, গরুর গাড়িতে অন্তত চার ঘণ্টা লাগত। ঘোড়ার গাড়িতে কমপক্ষেও দু আড়াই ঘণ্টা।

কাঁপতে কাঁপতে কাদা ছিটকাতে ছিটকাতে চোখের আড়ালে চলে গেল সোহাগিনী। এখন আর তাকে খারাপ লাগল না সুধাময়ের। সোহাগিনী আর যাই হোক সভ্যতার কিঙ্করী তো বটে। হোক না সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড।

আমরাও কি এক সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড সভ্যতার মধ্যে বাস করছি না এখন? হঠাৎ এ প্রশ্নটা সুধাময়ের মগজে ঠেলে উঠল। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড সভ্যতা! কথাটা সে ভেবে দেখে নি তো।

ভাববার আগেই সুধাময় দেখল, নরা। ছোট্ট একটা লাঠি নিয়ে লাফাতে লাফাতে কোথায় যেন যাচ্ছিল, সুধাময়কে দেখেই এক ছুটে কাছে এসে পড়ল।

দাদাবাবু, তুমি কি মটোরে আলে?

সুধাময় হেসে বলল, হ্যাঁ। তুই তো দিব্যি বড় হয়ে গিয়েছিস রে!

নরা খুব খুশী হল। বলল, তুমিউ কিন্তুক খুব বাবু হয়ে গেছ।

সুধাময় হা হা করে হেসে উঠল।

বলিস কী রে?

ঠিক বলতিছি, পেত্যয় না হয় আয়নায় দেখে নিও। খুব সুন্দর হইছ তুমি।

সুধাময়ের খুব ভাল লাগল কথাটা। আদর করে নরার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

বলল, চল্ বাড়ি যাই। এই বাক্সটা নিতি পারবি তুই?

নরা ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

উনিশ

এমন পাখি-ডাকা, আলো-হাসা সকালে অনেক দিন ঘুম ভাঙে নি সুধাময়ের। সে আজকাল দেরি করে ওঠে। কলকাতার এই অভ্যাসটার কাছে তার আগেকার গ্রাম্য অভ্যাস হার মেনেছে। সন্ধ্যা হতে-না-হতেই এখানে যেন রাত গভীর হয়ে আসে। ঘুম ছাড়া আর কোন কাজই থাকে না করবার। যেমন পাখিরা, যেমন পশুরা, যেমন সেই সৃষ্টির আদিযুগের গুহবাসী মানুষেরা রাত্রি হলেই মৃতকল্প হত, তেমনি সুধাময়ের গ্রামের লোকরাও। তাই ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতে এরা উঠে পড়ে। যেন দিনের আলো ওরা একটুও অপব্যয় হতে দেবে না।

কিন্তু সুধাময়ের ঘরে, তার বিছানায়, মশারির চালে আলোর প্লাবন বয়ে যেতে থাকলেও সুধার ঘুম ভাঙল না। একবার তার ঘুম ভেঙেছিল বটে। পাখির গান শুনতে পেয়েছিল, আলোর লুটোপুটিও সে ঘুম-জড়ানো চোখে এক নজর দেখে নিয়েছিল। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ল। কলকাতা রাতকে দিন করেছে। মাঝরাতেও সেখানে ঘুম নামে না। তার বাসিন্দারা তাই যখন ইচ্ছে ঘুমতে যায়, যখন খুশি ওঠে।

পাড়ার চায়ের দোকানে রোজকার মতই আড্ডা জমেছে। তর্ক বেধে গেছে প্রচুর। সুধাময় দেখল, সেই আড্ডায় সে অনুপস্থিত বলে নো-চেঞ্জার ছাত্র-নেতা কুঞ্জ ঘোষাল সুধাদের একেবারে কাবু করে ফেলেছে। সি. আর. দাশের নামে যা-নয়-তাই বলে যাচ্ছে। লোকটার জিভে বেজায় ধার। কিছু আটকায় না। দাশ সাহেব নাকি কর্পোরেশনের পলিটিক্সে নোংরামি ঢুকিয়েছেন। সেদিন কর্পোরেশনের সভায় তিনি যে অত বেশী ভোটে নিজের রেজলিউশানগুলো পাস করিয়ে নিলেন, তা নাকি সেরেফ ধাপ্পা দিয়ে। বিরোধী পক্ষের কাউন্সিলারদের এক বাগানবাড়িতে নেমন্তন্ন করেছিলেন দাশসাহেব। মদ আর মাগী সাপ্লাই করে দু রাত দু দিন তাদের আটকে রেখেছিলেন। ভোটের সময় তারা হাজির হতে পারে নি। ইস্, কুঞ্জটা ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবাদ কেউ করছে না কেন? দেশবরেণ্য নেতার নামে এমন হীন কুৎসা রটনা করে যাচ্ছে লোকটা, আর সবাই তা রসিয়ে রসিয়ে শুনছে! সুধাময়ের সারা শরীর কস্‌কস্ করছে রাগে। কিন্তু কী করবে সে? দেখছে সব, শুনছে সব, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারছে না। কিছুতেই পৌঁছতে পারছে না চায়ের দোকানটায়। নাগাল পাচ্ছে না কুঞ্জটার। লোকগুলোই বা কী, ধমক মারছে না কেন লোকটাকে, পিটছে না কেন? দেখছ বেটার আস্পর্ধা!

সামনে কাউন্সিলের ইলেকশন। কুঞ্জরা এমনিভাবে কাদা ছুঁড়ে ছুঁড়ে এমন একটা দেবতাকে মলিন করে দেবে! সাধারণ লোক এইসব কদর্য মন্তব্যের প্রতিবাদ করবে না, কান ভরে শুনবে আর দাঁত বের করে হাসবে! মাথায় রক্ত উঠে গেল সুধাময়ের। বিছানায় চাঁটি মেরে চেঁচিয়ে উঠল, চোপরও রাস্কেল। ঘুম ভেঙে গেল তার। বেশ বেলা হয়েছে। বেশ ঘেমেছে সুধাময়। আর সে ঘুম ভেঙে যেন কাবু হয়ে পড়ল। কোথায় কলকাতা আর কোথায় তার গ্রাম! কিন্তু স্বপ্ন কী এত জীবন্ত হয়?

সুধাময়ের বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকতে লাগল। ভেবে দেখল, স্বরাজ্য পার্টির এই ইলেক্‌শনের মুখে কলকাতা ছাড়াটা তার পক্ষে বুদ্ধির কাজ হয় নি। তাদের মত কর্মীর প্রচুর দরকার এখন। সুধাময় আর যাই হোক, উপস্থিত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে ফাঁকা মাঠে গোল কাউকে দিতে দেবে না।

মনটা উড়ু-উড়ু হয়ে গেল সুধাময়ের।

সেই ফেনাটা এরই মধ্যে থিতিয়ে এল। কলকাতায় বেশ কিছুদিন কাটিয়ে গ্রামের মাটিতে পা দেওয়ামাত্র আবেগের যে ফেনাটা বুজবুজ করে উঠেছিল সুধাময়ের মনে, চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে-না-কাটতেই সে ফেনা মরে গেল। তার ছিটেফোঁটা চিহ্নও রইল না কোনখানে।

কাল যে ঘোরটুকু লেগেছিল, আজ তা কেটে গেছে। গ্রাম নিয়ে অহেতুক মাতামাতি করি আমরা। আমাদের অশেষ কাব্যি রোগের মধ্যে ওটাও একটা। সময়-কাটানো হাই তুলল সুধাময়। ভাবতে বসল।

কাল বাসওয়ালার ক্রিয়াকাণ্ডে বেশ মজাই পেয়েছিল সুধাময়। এখন মনে হচ্ছে ওটা নিছক ভাঁড়ামি। অক্ষম নাট্যকারের রচনা, এমেচারী অভিনেতার পার্ট করা, সস্তা একটা কমিক সিচুয়েশন। কাল যে সুধাময়কেও ওই দৃশ্যে অভিনয় করতে হয়েছে, ড্রাইভারের স্থূল ভাঁড়ামোকে প্রশ্রয় দিয়েছে, এখন সেজন্য বিরক্তিই লাগছে তার। বাস ঠেলে ঠেলে গায়েও ব্যথা ধরে গেছে।

কী যেন হয়েছে সুধাময়ের! খুঁতখুঁত করছে সে। সব জিনিসেই যেন খুঁত ধরতে চাইছে। কাল ঘেমে নেয়ে বাড়িতে পৌছতে-না-পৌছতে সবাই ভিড় করে এল তার পাশে। ঘিরে ধরল তাকে। এক সঙ্গে একশ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল সবাই। এমনিভাবেই এই বাড়ি, প্রবাসী ছেলেদের অভ্যর্থনা করে। চিরকাল করে এসেছে। সুধাময়ও বাপ কাকা কিছুদিন অনুপস্থিতির পর ফিরে এলে, এমনিভাবেই আর পাঁচজনের সঙ্গে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে, এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও। এখন তার মনে হল, এরা অনর্থক বড্ড বেশী চেঁচামেচি করে। মা এসে পাঁচজনের সামনেই আঁচল দিয়ে তার মুখখানা ফস করে মুছে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সুধাময়ের সমস্ত স্নায়ু যেন তার প্রতিবাদ ঘোষণা করল। সুধাময় মুখে কিছু বলল না। মা তো বরাবরই এই কাজ করে। অন্ধের মত ভালবাসে তাকে। সুধাময়ও মাকে খুব ভালবাসে। তবুও কাল, এই প্রথম, সুধাময়ের মনে হল, সব তাতে বাড়াবাড়ি করাই মার স্বভাব।

এদের স্নেহ ভালবাসার প্রকাশ এরা তারস্বরে করতে চায়। যেন পাঁচজনকে জানাতে চায়। এই যে দেখানো-ভাবটা সুধাময় যেন আর বরদাস্ত করতে পারছে না। কলকাতায় এত আদিখ্যেতা নেই।

এবার বাড়িতে এসে সুধাময় বড় অস্বস্তিতে পড়ল। যা দেখে, যা শোনে এখানে, তার মধ্যেই কলকাতা এসে ঝামেলা বাধায়। কলকাতায় তো এমনটি নেই। কলকাতায় তেমনটি হয় না তো।

কলকাতায় থেকে যা বুঝতে পারে নি, গ্রামে এসে তা বুঝল সুধাময়, কলকাতা ছাড়া তার গতি নেই। এই গ্রামের আকাশে বাতাসে জলে যে পুষ্টি ছিল, সুধাময়ের জীবন নিঃশেষে তা শুষে নিয়েছে। গ্রামে তার জন্য আর অবশিষ্ট কিছু নেই। তার বাকী জীবনের, তার বয়স্ক দেহমনের রসদ যদি কেউ এখন সরবরাহ করতে পারে সে কলকাতা।

ঘরে শুয়ে শুয়ে সুধাময় এসব কথা চিন্তা করছিল আর অন্যমনস্কভাবে সিগারেট-লাইটারটা জ্বালাচ্ছিল আর নেবাচ্ছিল। সিগারেট খাবার জন্য মনটা আঁকপাক করছিল। সে ভাবছিল, ব্যাপারটা সমীচীন হবে কি না? বাড়ির কারও তো তেমন কাণ্ডজ্ঞান নেই, প্রাইভেসি-বোধও নেই। হয়তো বাবা কিংবা পিসিমা হুট করে ঢুকে পড়বেন। তার চেয়ে থাক্ এখন, বেড়াতে বেরিয়েই খাবে বরং।

গিরিবালার বাচ্চাটা জোরে কেঁদে উঠতেই সুধাময় চমকে উঠল। ভাবনা চিন্তা ছিঁড়ে গেল কিছুটা।

কী গলা হয়েছে ছেলের, একেবারে শঙ্খের মত। উপমাটা মনে পড়তেই লাফিয়ে উঠল সুধাময়। শঙ্খ! হ্যাঁ, এই তো ভাল একটা নাম পাওয়া গিয়েছে। কাল বড্ড নাম-নাম করছিল বুড়ি। বেশ নাম পাওয়া গিয়েছে। শঙ্খ।

সুধাময় ডাক দিল, বুড়ি, এই বুড়ি, শোন্ শিগ্‌গির, এদিক আয়।

গিরিবালা এল। চাঁপা এল।

সুধাময় বলল, দেখ্ বুড়ি, তোর ছেলের জন্যে একটা ভাল নাম পেয়েছি, শঙ্খ। কেমন নাম?

গিরিবালা তো অবাক। শঙ্খ! ওটা বুঝি খুব ভাল নাম হল?

আর তা ছাড়া, সুধাময় বলল, কেমন মিলে যাবে তোর ছেলের স্বভাবের সঙ্গে। এইমাত্র ওঘরে কেঁদে উঠল তো। আমি এঘর থেকেই চমকে উঠলাম।

ঠিক শঙ্খের আওয়াজের মতই গলা তোর ছেলের, বুঝলি? তাও যে-সে শঙ্খ নয়, একেবারে পাঞ্চজন্য।

সুধাময়ের কথার ঢং একেবারে বদলে গেছে। অন্তত গিরিবালার তাই মনে হল। দাদা আর সে দাদা নেই। একেবারে অন্য দেশের লোক হয়ে গেছে যেন। চেহারা অনেক চৌকশ হয়েছে, বেশভূষা অনেক প্রখর। আর কথা, কী যে বলে বড়দা, কী যে বলল কাল, তার অনেক মানেই বুঝতে পারে নি গিরিবালা। যেমন এখন পারল না। সুধাময় কি তার ছেলেকে বিদ্রূপ করল? নাকি ভালবেসে শঙ্খ বলল? ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না গিরিবালা।

সুধাময় অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরল। কাল যখন বাড়িসুদ্ধ সবাই ওকে নিয়ে মাতামাতি করছে তখন হঠাৎ গিরিবালার মনে হল, সুধাময় যেন তার মধ্যে নেই। কেন যে এমন ধারণা হল তার, তা সে জানে না। সুধাময়ের ত্রুটিটা কোথায় তাও সে ধরতে পারে নি। জ্যেঠামশায়, বাবা, পিসিমা, বড়মা, কাকীমাকে প্রণাম করেছে সুধাময়, গিরিবালাকেও কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে, চাঁপাকে আদর করেছে, গিরিবালার খোকা দেখে তারিফ করেছে, সবই করেছে সুধাময়। তবুও—তবুও কোথায় যেন অদৃশ্য একটা ফাঁক, সূক্ষ্ম একটা ব্যবধান রচনা করে রেখেছিল। সব-কিছুর ওজন যেন ঠিক থাকে, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রেখেছিল সুধাময়। বাড়িসুদ্ধ সবাই যে-ধানের চাল, সুধাময়ও সেই ধানেরই চাল। তবে ওরা সবাই যেখানে ঢেঁকিছাঁটা, সেখানে শুধু সুধাময়ের ছাঁটটাই যেন কলের।

হঠাৎ সুধাময়ের খেয়াল হল, গিরিবালা তো কিছু বলল না।

কী রে, নামটা পছন্দ হল না বুঝি?

চাঁপা টুক করে বলে উঠল, যে ছিরির নাম তার আবার পছন্দ! মানষির নাম আবার শঙ্খ হয় নাকি?

চাঁপার বাচালতায় সুধাময় মনে মনে চটে উঠল। এই হল গ্রামের কুশিক্ষার একটা নমুনা।

তবু সুধাময় রাগ দেখাল না। চাঁপাকে বেশ সংযত হয়েই উপদেশ দিল, ছি চাঁপা, গুরুজনের মুখের ওপর ওভাবে কথা বলতে নেই।

চাঁপা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, তুমি কি আমার শ্বশুর যে গুরুজন হবা? বাড়ির লোক আবার গুরুজন হয় নাকি?

এই আচমকা প্রশ্নে সুধাময় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। গিরিবালা আঁচল চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। সেই হাসিতে কলে-ছাঁটা সুধাময় সাময়িকভাবে পিছু হঠল। পুরনো সুধাময় এগিয়ে এসে প্রাণখোলা হাসিতে ঘর প্রায় ফাটিয়ে ফেলল।

হাসতে হাসতে সুধাময় বলল, ঠিক, ঠিক ভুলেই গিয়েছিলাম। তা নেবে খোবে কী ?

চাঁপা এবার চটে গেল।

বলল, ছোটদের সঙ্গে ইয়ারকি করলি বুঝি দোষ হয় না, না ?

দুমদাম পা ফেলে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সুধাময়কে অমন প্রাণখোলা হাসি হাসতে দেখে গিরিবালার বুক থেকে একটা ভার যেন নেমে গেল। একটা যন্ত্রণার যেন উপশম হল। সত্যি, চেনা লোকের মন বুঝতে না-পারার মত যন্ত্রণা আর নেই। গিরিবালা খুব খুশী হল।

সুধাময় জিজ্ঞাসা করল, কী রে বুড়ি, কথা বলিস নে যে ? নামটা বুঝি পছন্দ হল না তোর ?

গিরিবালা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না দাদা, খুব পছন্দ হয়েছে। বেশ নাম, সুন্দর নামটা।

সুধাময় খুশী হল।

বলল, এসব কলকাতার নাম। তোদের বিষ্টুপদ কি ষষ্ঠীচরণ নয়। বুঝলি ?

গিরিবালা প্রতিবাদ না করে হাসতে লাগল। দাদার এ ভাষায় মারপ্যাঁচ নেই। একথা গিরিবালা বোঝে।

সুধাময় বলতে লাগল, তোর ছেলে হবার খবর বড়মার চিঠিতে পাওয়া ইস্তক আমার অদ্ভুত লেগেছে। আমাদের সেই বুড়ি, সে আবার মা-ও হল! আমি তো ভেবেছিলাম, প্রায় বড়মার মতই দেখতে হয়েছিস বুঝি। কিন্তু কই, তোর তো কিছুই বদলায় নি রে।

গিরিবালা এবারও কথা বলল না, শুধু হাসতে লাগল। চাঁপা মুখ ভার করে এসে দাঁড়াল।

বলল, কারুর যদি ক্ষিদে লাগে থাকে তো সে য্যান মুখি চোখি জল দিয়ে রান্নাঘরে যায়। বড়মা কয়ে দিল।

সুধাময় চাঁপাকে ভেঙিয়ে বলল, আর কারও যদি লাল ফিতের দরকার থাকে তো যেন আমাকে এক ঘটি জল এনে দেয়।

অমনি চাঁপার মানভঞ্জন হয়ে গেল। সুধাময়ের হাঁটু ধরে লাফাতে লাফাতে বলতে লাগল, ও দাদা আনিছ নাকি ফিতে? সত্যি আনিছ? আমারে ছুঁয়ে কও। আমসত্ত্ব খাবা? তেঁতুলির আচার? পিসিমা পিঠে গড়ছে, আনে দেবো?

চাঁপার কাণ্ড দেখে গিরিবালা হাসি আর চাপতে পারে না।

বলল, জল চা'লো দাদা, আগে সেইডেই আনে দে, তারপরে না হয় স্বগ্‌গোড়াই ধরে দিস।

চাঁপা খর খর করে উঠল, আমার কথায় তুই ফোড়ন কাটিস্ ক্যান ক' দিনি? আমি কি তোর পাকা ধানে মই দিইছি?

চাঁপা জল আনতে গেল। হঠাৎ কী খেয়াল হল গিরিবালার, ও-পাড়ার মামাবাড়িটায় একটু বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করল। কতদিন যে যায় নি! আবার কবে হুট করে চলে যেতে হবে। বড়মামীকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে বড়। আসলে ওটা সুধাময়েরই মামাবাড়ি। গিরিবালা সুধাময়কে বলল, যদি আজ নিয়ে যায় সুধাময় তো বড় ভাল হয়।

নিয়ে যাবা, ও দাদা? তা'লি খাওয়াদাওয়া সারেই বেরোয়ে পড়বানে।

সুধাময় রাজী হল। ভালই হল, সে-ও তো সেই কবে গিয়েছিল মামার বাড়ি, তারও এই সঙ্গে দেখাটা হয়ে যাবে। তা ছাড়া করবার মত একটা কাজও পাবে সে। বাড়িতে এসে কিছুই তো করার থাকে না।

দুর্গাবাড়িতে ঘরামি লেগেছে। চাল ছাওয়া হচ্ছে। তার মানে পুজোর বার্তা এসে গেছে। এবার পুজো আশ্বিনের মাঝামাঝি। গিরিবালা থাকবে না তখন। বিয়ের পর একবার মাত্র বাপের বাড়ির পুজো দেখেছে গিরিবালা। তার শ্বশুরবাড়ির দেশে দুর্গোৎসব নিয়ে অত মাতামাতি হয় না। সেখানকার প্রধান উৎসব দোল।

গিরিবালা ফাঁকা মণ্ডপটা দু চোখ ভরে দেখে নিল। ঠাকুরের সিঁদুর-

মাখানো পাটটা একপাশে পড়ে আছে। ঘরের মেঝেয় বিস্তর ইঁদুরের গর্ত হয়েছে। গর্তগুলোর মুখে মাটি উঁচু উঁচু হয়ে আছে। তার উপর চাল থেকে খসা খড়, বাতার টুকরো, দড়ি ঝুর ঝুর ঝরে ঝরে পড়ছে। গিরিবালা ফাঁকা মণ্ডপে গড় হয়ে প্রণাম করল। এ পাশে ভাঁড়ার, তার লাগোয়া পিছনেই ঢাকীদের ঘর। এখনও একটা ঢাক মটকায় বাঁধা আছে। ঢাকীদের ঘরের পিছনে গাব আর কামরাঙাগাছ। সবুজ কামরাঙাগুলো এলোমেলো বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে। কামরাঙাগাছের তলা দিয়ে হাঁটলে এখনও জিভে জল ভরে আসে গিরিবালার।

চারিদিকে আমের বাগান। মণ্ডপের জমিটা সুধাময়দের, তবে দুর্গামণ্ডপটা বারোয়ারী। এ আমের বাগানও সুধাময়দের। মণ্ডপের পিছনেই গন্ধ আমের গাছ। সামনে রাস্তার ধারের গাছটার নাম চুকুড়ে। চিনিটোরা, টুকটুকে, চাপলে, গন্ধ হলুদ, নাইতোলা আমের গাছগুলোয় যেন খুশির মাতন শুরু হয়েছে গিরিবালাদের দেখে। কতদিন পরে আবার ওদের কাছে সে এল! যে গাছটার দিকে গিরিবালা চায় সেটাই যেন ডালপালা দুলিয়ে গিরিবালাকে ইশারায় ডাকে। ও বুড়ি, ও বুড়ি, কুথায় ছিলি রে এতদিন? মণিরে কত বড্ডা হয়ে গেছ! আসো আসো, আমার ছায়ায় এটটু আসে বসো।

গিরিবালার কানে যেন মানুষের স্বরেই সেই ডাক গিয়ে পৌঁছায়। সত্যিই তো, সে কোথায় ছিল এতদিন! যখন সে ছিল সেই ছোট্ট মেয়েটি, তার দাদার হাত ধরে আম কুড়তে আসত। তার সেই কচি কচি পায়ের দাগ বুঝি আমগাছের ঝরা পাতার বুক থেকে এখনও মুছে যায় নি। শুকনো পাতার মর্মরে এখনও বুঝি সেই ধ্বনি বেজে উঠবে কোনখান·থেকে।

ঘোর লেগে গেল যেন গিরিবালার মনে। আম কবে শেষ হয়ে গিয়েছে! কিন্তু গিরিবালা যে স্পষ্ট শুনল, টিপ করে শব্দ হল চাপলে গাছের নীচে। ও যে পরিষ্কার দেখল আমটা নিয়ে কাড়াকাড়ি বেধে গেল এক আট বছরের মেয়ে আর ষোল বছরের দাদার মধ্যে। কে ওই মেয়েটা? বুড়ি না? বুড়িই তো। বুড়ি না হলে অমন সরেশ চোখ আর কার হবে, অন্ধকারের মধ্যে গাছতলার আম আর কার চোখে পড়বে? শেষ পর্যন্ত অবশ্য দাদারই জিত হবে। বুড়ি তা জানেও। দাদার হাতে ব্রহ্মাস্ত্র আছে যে, বেশী ঝগড়া করতে সাহস পায় না সে। সে জানে, একটু তেড়িবেড়ি

করলেই দাদা তাকে সেই বিজন বনে গাছতলায় দাঁড় করিয়ে রেখে সড়সড় করে গাছে উঠে পড়বে। একা একা সেখানে, বাপ রে, কী ভয় ভয়, মরেই যাবে বুড়ি। তাই সব সময় তাকেই আপোস করে চলতে হয়। বড় ভাগটা সব সময়েই দিতে হয় দাদাকে।

সেই বুড়ি ধীরে ধীরে কেমন করে গিরিবালা হয়ে উঠল! পরের বাড়ির বউ হয়ে গেল! ছেলের মা হল! কী সব আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে এমন সব রূপান্তর ঘটল! ব্যবধান রচিত হল গিরিবালা আর বাহিরের মধ্যে! কতকাল সে এমন খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়ায় নি! মনটাকে এমনভাবে খোলা হাওয়ায় মেলে ধরতে পারে নি কতকাল! কত অজস্রবার এই আমের বনে এমনি করে হাওয়ার মাতন লেগেছে, শুরু হয়েছে পাতার নাচন ডালে ডালে, মেঘের ছায়া ঘন হয়ে গাছের নীচে জড়ো হয়েছে, এই কয় বছরে তার কোন হিসেবই রাখে নি গিরিবালা। তবে কি তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, নাকি কোন কারাগারে বন্দিনী হয়ে ছিল গিরিবালা?

তুই কী রে দিদি?

চাঁপার ডাকে গিরিবালার ঘোর কেটে গেল।

হাঁ করে দেখতিছিস কী? ছাখ দিনি মেয়ের কাণ্ড! এতক্ষণ আমরা যে পৌঁছয়ে যাতাম।

সুধাময় বলল, একটু পা চালিয়ে চল বুড়ি, বাজনা শুনছিস নে, শুয়োর মারতে বেরিয়েছে সদ্দাররা, বেলাবেলি ফিরে আসতে হবে।

পা চালিয়ে ওরা যখন মামাবাড়ি পৌঁছল, তখনও বেশ বেলা আছে। কিন্তু মামাবাড়িতে যে কাণ্ড ঘটছে তখন, তা দেখে ওরা হতভম্ব হয়ে গেল।

সে-বাড়িতে পা দিয়েই ওরা দেখতে পেল, মামাত ভাইদের মধ্যে রীতিমত লড়াই বেধে গিয়েছে। বড়মামার দুই ছেলে গদা আর পদা, দুজনেই দারুণ গোঁয়ার। গদা বোধহয় একটু আগেই পদাকে মেরেছে লাঠির বাড়ি। পদার মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে। সেই অবস্থাতেই পদা কোত্থেকে বিরাট এক খাঁড়া এনে বন বন করে ঘোরাচ্ছে পাগলের মত।

আর হুঙ্কার ছাড়ছে, কুথায় গেল ও শালা! আজ ওরে কাটে দু ভাগ করব।

ভাবিছ, পদার রক্তপাত করে পালায়ে বাঁচবা! যেখানেই থাক, জলে স্থলে কি অন্তরীক্ষে, সেখেনের থেকে টানে আনে তোরে আজ দুখান করব।

গদার বউ তাই দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

ওগো কে কুথায় আছ, শিগ্‌গির আসো গো, আমার স্বয়ামিরি কাটে ফেলল গো।

চোপ মাগী—! পদা একলাফে গদার ঘরের সামনে লাফিয়ে পড়ল।

তোর গলাই তা'লি দু ফাঁক করব।

চক্ষের নিমেষে গদার বউ ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিয়ে গোঙাতে লাগল।

বড় মামীর দু পায়ে বাত। ঘর ছেড়ে নড়তে পারেন না। ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে দরজার গোড়ায় এসে চৌকাঠে মাথা খুঁড়ছেন আর ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে যাচ্ছেন, ও গদা, ছোট ভাইয়ের মাথায় বাঁশটা মারার আগে আমারে মারলি নে ক্যান? ও পদা, খাঁড়ার কোপটা আমার গলাতেই আগে বসা। ওরে, আমিই তো আসল দুষি। তোগের যে এই গভ্‌ভে ধরিছি। ভগবান, এত লোকেরে ন্যাও, আমি তুমার পায়ে কী দোষ করিছি!

উঠনের একপাশে থ মেরে দাঁড়িয়ে পড়েছে সুধাময়, গিরিবালা আর চাঁপা। সুধাময় নিশ্চল হয়ে গিয়েছে, গিরিবালার বুক ঢিপ ঢিপ করে কাঁপছে, চাঁপার মুখ চোখ চুপসে গেছে ভয়ে। চোখ কান বুজে দাদাকে চেপে ধরে ঠকঠক করে কাঁপছে।

ওরা দেখল, বড়মামী মাথা ঠুকতে ঠুকতে কপাল ফাটিয়ে ফেললেন। পাগলের মত কেঁদে কেঁদে চেঁচাতে লাগলেন, মা'রে ফ্যাল্, মা'রে ফ্যাল্, ওরে শত্তুররা, আগে আমারে মা'রে ফ্যাল্। আমি তোগের মা, আমি বলতিছি আগে আমারে মা'রে তারপর তুরা কাটাকাটি কর্।

পদা মাকে ধরতে যাচ্ছিল, এমন সময় দূর থেকে গদার গলা পাওয়া গেল।

কী, খাঁড়া দিয়ে কাটবে, দেখি কত বড় খাঁড়াওয়ালা?

পদাও হুঙ্কার দিয়ে উঠল, এই দেখ্‌ তবে। বলেই গদার দিকে ছুটল।

সুধাময় বলল, বুড়ি, চল্।

বলেই বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। একটুখানি এগিয়েছে কি অমনি মামাবাড়ির দিক থেকে 'বাবা গো' বলে কার যেন বুকফাটা চিৎকার শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে মড়াকান্না উঠল। চাঁপাও মুখ গুঁজে পড়ে গেল রাস্তায়।

সুধাময় বলল, কী হল রে বুড়ি?

গিরিবালা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। বলল, ফিট হয়ে গেছে।

সুধাময় বিরক্ত হয়ে ধমক দিল, কাঁদিস নে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে। আচায্যি-বাড়ি চল্, ওর চোখে মুখে জল দিইগে।

কেন যে মরতে এসেছিল মামাবাড়ি!

আচায্যি-বাড়ির ফেদি বসে বসে বসে কাঁথা সেলাই করছিল। ওদের অমন করে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখে সে অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল।

গিরিবালা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ফেদিদি, শিগগির জল আনো। চাঁপা ফিট হয়ে গেছে।

চাঁপার জ্ঞান ফিরেছিল সঙ্গে সঙ্গেই। ফেদি ওকে এক বাটি দুধ খাওয়াল। চাঁপা চাঙ্গা হয়ে উঠল।

ফেদি অবাক হয়ে গিয়েছিল এদের দেখে। কতদিন দেখে নি ওদের। ফেদির বিয়ে হয়েছে তিন বছর। দু বছর সে বিধবাই হয়েছে। বিয়ের পর অষ্টমঙ্গলায় যখন এসেছিল ফেদি, তখন একদিন দেখতে এসেছিল গিরিবালা। তার তখনও বিয়ে হয় নি। চাঁপা কতটুকুই বা ছিল! এই যে সুধাদা, আজ একেবারে জোয়ানমদ্দ হয়ে উঠেছে, এই সুধাদাকেও এত বড় কখনও মনে হয় নি ফেদির। আজ তো বেশ লজ্জা-লজ্জাই লাগছে।

গ্রামের মধ্যে সুন্দরী বলে খুব নাম ছিল ফেদির। সত্যিই সে খুবই সুন্দরী। অমন গড়নপেটন, অমন গায়ের রঙ, অমন মুখ চোখ বড় একটা সহজে চোখে পড়ে না। শ্বশুরবাড়িতে বিয়ের পর যখন গেল ফেদি, যেন মহারাণী এলেন এমন খাতির। কিন্তু বছর না-ঘুরতেই কপাল পুড়ল তার, সিঁথের সিঁদুর, শাঁখা, লোহা—এয়োতির সমস্ত চিহ্ন ঘুচিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এল ফেদি। এক ফুঁয়ে কে যেন ভাগ্যের প্রদীপ নিবিয়ে দিল। জীবনটাও যদি নিবিয়ে দিতে পারা যেত!

ফেদি অবাক হয়ে গিরিবালাকে দেখতে লাগল। কী অদ্ভুত সুন্দরই না দেখতে হয়েছে এখন! অথচ বিয়ের আগে এমন আহা-মরি কিছু ছিল না। ছোটবেলা থেকে ফেদি ওকে দেখেছে। একসঙ্গে খেলা করেছে পুজো-বাড়িতে। খেলেছে সুধাদার সঙ্গেও। তবে সে সব তো আর-এক জন্মের কথা। তখন এই বুড়ি, আজ যে নতুন মাতৃত্বে লাবণ্যবতী, তার তখন এমন

ঢল-ঢল রূপ ছিল না কি? ছিল তো রোগা, কাঠ-কাঠ, সামনের দাঁত কটা একটু উঁচুই ছিল বরং। সেই বুড়ি এখন মা হয়ে যেন জগদ্ধাত্রীর রূপ নিয়ে এসেছে। চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। এই রূপই সার্থক। সে কথা গিরিবালাকে দেখে ফেদির আজ মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও ভাবল, তার জীবনে এ সার্থকতা কখনও আসবে না। কখনওই না। ঈর্ষা ফেদির বুকে এক ছোবল বসাল। পরক্ষণেই লজ্জা পেল সে। কী নীচ মন তার! দুঃখ পেল।

তাড়াতাড়ি ফেদি বলে উঠল, যেন কৈফিয়ত দিল, রোজ ভাবি, তোর খুকারে দেখতি যাব, তা ভরসা তো পাই নে। এ রাক্ষসীর চোখি বিষ, তাই পুড়া মুখ যতটা পারি লুকোয়ে রাখি।

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল ফেদি। ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। গিরি-বালার নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হতে লাগল। যেন ফেদি বিধবা হয়েছে, সে অপরাধ তার। ফেদির ছেলেপুলে হয় নি, গিরিবালার হয়েছে, এর জন্যও যেন সে-ই দোষী। গিরিবালার মনটা খচখচ করতে লাগল। গিরিবালা মনে মনে খুব কষ্ট পেল ফেদির কথা স্মরণ করে। বোকার মত বসে থাকল। পরক্ষণেই খোকার কথা মনে পড়তে মন তার চঞ্চল হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ দেখে নি তাকে, এতক্ষণ আর কখনও তাকে ছেড়েও থাকে নি। এবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলেই হয়।

সুধাময় খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ভাবছে। ভাবছে গদা-পদার কথা। তারই মামাত ভাই। কিন্তু আচার আচরণ দেখলে নরভুক আদিম মানুষ ছাড়া আর-কিছু ভাবতে ইচ্ছে করে না। কেমন স্বচ্ছন্দে হানাহানি করে চলেছে। যেন এরা সব অরণ্যচর। আদিম প্রস্তরযুগের ভয়াল সব মানুষ। গ্রামে সভ্যতা নেই। এখানে দ্রুম দ্রুম বাজনা বাজিয়ে বাজিয়ে এখনও পশু-শিকার চলে। ভাই ভাইয়ের মাথা লক্ষ্য করে খড়্গ তোলে অনায়াসে।

সুধাময়ের হঠাৎ কেমন যেন মনে হল, সে যেন ষোল-সতের শতকের এক বিদেশী পর্যটক। সভ্যতার বার্তা বয়ে এসে পড়েছে অনাবিষ্কৃত কোন ভূখণ্ডে। না না, এ গ্রামের লোক নয় সে। এ দেশেরই লোক নয়। তার দেশ সেই দেশ, যেখানকার মাটিতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রামকৃষ্ণ-দেব, বিবেকানন্দের স্পর্শ মিশে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেখানে ভাস্বর। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতিদিনের নিশ্বাসে নতুন প্রাণ সৃষ্টি হচ্ছে। জ্ঞানে বিজ্ঞানে,

আধুনিকতায়, অগ্রগতিতে সে দেশ পৃথিবীর যে-কোন আলোকপ্রাপ্ত প্রান্তের সমগোত্রীয়। এখানে প্রাণ খুলে সে কথা বলতে পারে না। এ দেশের ভাষা সে জানে না। তার কথা কাউকে সম্ভবত বোঝাতেও পারবে না। ওর ভাষাও এখানে কেউ বুঝবে না।

সুধাময়ের মনে প্রবল এক অস্থিরতা দেখা দিল। যত শীঘ্র পারে, সুধাময় আপন দেশে ফিরে যাবে। সেখানে এক মুহূর্ত সে আলস্যে কাটাতে পারে না। অজস্র কাজ তার জন্য পড়ে আছে। এতক্ষণ কত কাণ্ড ঘটছে কলকাতায়! শোভাযাত্রা বের হচ্ছে। পার্কে পার্কে সভা-সমিতির আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। মডারেট, স্বরাজ্যদল আর 'নো-চেঞ্জারের' মধ্যে পাঞ্জা কষাকষি শুরু হয়ে গিয়েছে। সামনে কাউন্সিলের ইলেকশন। দেশবন্ধুর তেজোদৃপ্ত আওয়াজ এত দূর থেকেও যেন শুনতে পাচ্ছে সুধাময়, "আমরা কাউন্সিলে ঢুকছি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য নয়, ভিতর থেকে গুঁতো মেরে ওদের শাসনতন্ত্র ভেঙে দেবার জন্য।"

চল দাদা, বাড়ি যাই।

গিরিবালার কথায় চমক ভাঙল সুধাময়ের। চেয়ে দেখল আচার্যি-বাড়ির দাওয়ায় বসে বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়ে জেগে জেগেই কলকাতার স্বপ্ন দেখছে।

গিরিবালার কথা শুনে ফেদিও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দেখলেই মনে হয় এতক্ষণ কাঁদছিল ফেদি। বড় বড় গভীর চোখ দুটো এখনও টলমল করছে। নাকের ডগাটা পাকা করমচার মত রাঙা হয়ে উঠেছে।

ফেদি বলল, কালই যাব তোর খুকা দেখতি, বুঝলি?

গিরিবালা একটু থতমত খেয়ে বলল, আচ্ছা।

বাড়ি ফিরেও সুধাময় স্বস্তি পেল না। ঘুরল ফিরল সুধাময়, জোর করে একবার আগের মত মেলামেশা করতে গেল বাড়ির লোকজনের সঙ্গে। রান্নাঘরে গিয়ে বসল মাছভাজা খেতে, অমনি সেটা ওর নিজের কাছেই কেমন আদুরে-গোপালপনা ঠেকল। খুনসুটি করতে গেল গিরিবালার সঙ্গে, কেমন ন্যাকামি-ন্যাকামি লাগল। বাবার কাছে বসতে ইচ্ছে হল না। বাবার কাছে বিশেষ ভিড়তেই চায় না সুধাময়। পড়া আর পরীক্ষার কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বাবার সঙ্গে বলা যায় না। বাবা সংসারের শোচনীয় দুরবস্থার কথা তুলে স্পষ্টই বলেন, সমস্ত সংসার এখন সুধার মুখ চেয়ে বসে

আছে। সুধা যেন পাশটা ভালভাবেই করে। কথাটার মধ্যে মিথ্যে কিছুই নেই। তবু সুধাময়ের যেন ভাল লাগে না। তাই বাবার ঘরের দিকে মাড়াল না সে। না, মা পিসিমার কাছেও নয়। দু-একবার গিরিবালার ছেলেটাকে নেড়ে-চেড়ে আদর করতে গেল, একটুও ভাল লাগল না। বাড়ির বের হতেও আর ইচ্ছে নেই তার। মামাবাড়ি গিয়েই যথেষ্ট আক্কেল হয়েছে।

সন্ধ্যে হল, রাত হল। সন্ধ্যে আর রাতে এখানে তফাত বিশেষ নেই। মেজকর্তা বাড়ি ফিরতেই সুধা যেন বেঁচে গেল। এই একটা লোক বাড়ির মধ্যে এখনও আছেন, যাকে দেখলে সুধাময় খুশী হয়। যার সঙ্গে সে কথা বলে সুখ পায়।

কাল মেজকর্তার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তার সুযোগ হয় নি। আজও সারাদিন বড় ব্যস্ত ছিলেন। এখন সুধাকে পেয়ে যেন বর্তে গেলেন। পরম আগ্রহে মেজকর্তা সুধাময়ের মুখে কলকাতার সব খবরাখবর শুনতে লাগলেন। কাউন্সিলের ইলেকশনের কথা, কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ, স্বরাজ্য পার্টির পত্তন, তাদের কর্মসূচী সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। সব কথার ভাল জবাব দিতে পারল না সুধাময়। অত খুঁটিয়ে, অত তলিয়ে সে কোন ব্যাপার দেখতে পারে না। বিভিন্ন সময়ে সুধাময়ের মনে নানা ধারণা গড়ে ওঠে। সেই সব ধারণার প্রতিফলন সুধাময় যেখানে দেখে, যখন দেখে, যে কাজের মধ্যে দেখে, তার মধ্যেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মন প্রাণ ঢেলে দেয় সে সে-কাজের মধ্যে।

দেড় বছর আগে, দেশে যখন অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল, অফিস কাছারি, ইস্কুল কলেজ বর্জনের হিড়িক জেগেছিল, সুধাময় তখন সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল। সে তখন সরকারী কলেজের ছাত্র। দেশপ্রেম দেখাবার এতবড় সুযোগ সে কিন্তু কাজে লাগাতে পারে নি। বাদ সেধেছিলেন মেজকর্তা। এই নেতিবাচক আন্দোলনের তিনি বিপক্ষে ছিলেন। সেই সময় সুধাময়কে সামলাতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল। মেজকর্তা তখন বলেছিলেন, মূর্খ লোক স্বাধীনতার মর্ম বুঝতে পারে না। বলেছিলেন, স্বাধীনতা অন্তরের জিনিস। কোন বাইরের সামগ্রী নয়। হৈ হৈ করে বড়জোর রাষ্ট্রীয় পতাকা বদল করা যায়। ইউনিয়ন জ্যাকের বদলে তেরঙা ঝাণ্ডা সরকারী দপ্তরের মাথায় উড়ানো যায়, কিন্তু লোককে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করা যায় না।

এই সময় মেজকর্তা এক কড়া চিঠি লিখেছিলেন সুধাময়কে। লিখেছিলেন, যে-সব নেতা মনে করেন, গান্ধী-টুপি মাথায় দিয়ে ঝাণ্ডা ঘাড়ে করে বন্দে-মাতরম্ বলে ঘুরে বেড়ানোতেই দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা—সে সব নেতার কথায় আমার শ্রদ্ধা নেই। তাঁরা অত্যন্ত অদূরদর্শী, সঙ্কীর্ণমনা। আমি মনে করি, একজন ইঞ্জিনীয়ারের প্রয়োজন এই রকম দশটি নেতার চেয়েও বেশী। তুমি যদি সাময়িক উত্তেজনায় তোমার কর্তব্য পালন করতে অপেক্ষাকৃত শ্রমসাধ্য পথটি ছেড়ে গড্ডলিকার সহজ স্রোতে গা ভাসাতে চাও তাহলে শেষ পর্যন্ত দেশের ক্ষতিই করবে বেশী। যে ভাবোচ্ছ্বাসকে তুমি প্রবল বলে মনে করছ, তার পিছনে সত্যিকারের কোন শক্তি নেই, তা মহাসাগরের ঢেউ নয়, ফেনা মাত্র। ও একদিন শুকিয়ে যাবে।

সুধাময় এর পর আর কলেজ অবশ্য ছাড়ে নি। কিন্তু দুটি বছর চোরের মত অপরাধী হয়ে ছিল। তার সহপাঠী বন্ধুরা একে একে বুক ফুলিয়ে বন্দেমাতরম্ বলে কলেজ ছাড়ত আর তাদের অব্যক্ত ধিক্কারে সুধা যেন মরমে মরে যেত। শুধু যেদিন কলেজের সামনে পিকেটিং হত, সেদিন আর সে ক্লাসে ঢুকতে চেষ্টা করত না। পালিয়ে যেত। রাগ হত তার নিজের উপর। রাগ হত তার মেজকাকার উপর। যেন মেজকাকার এই সব ওজর কোন আদর্শের জন্য নয়, যে টাকা সুধার পিছনে ওঁরা ঢালছেন সেটার নিরাপত্তা রক্ষা করাই ওঁদের আসল উদ্দেশ্য। মানসিক দ্বন্দ্বে এই দুটো বছর সুধাময় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তার মত যন্ত্রণা তার অন্য কোন সহপাঠী পায় নি।

তারপর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে দেখল সুধাময়। সত্যিই আন্দোলন একদিন মুখ থুবড়ে পড়ল। আর উঠল না। যে সব নেতা হাত ধরে টেনে টেনে তাদের কলেজের ছাত্রদের পথে বের করেছিলেন তাঁরা আবার নিয়মিত জীবনে ফিরে গেলেন। তার সহপাঠীদের অনেকে আবার ফিরে এল কলেজে। দুটো বছর খামোখা নষ্ট হওয়ায় ইনিয়ে-বিনিয়ে অনুতাপ করতে লাগল। এমন কি এও বলল, তুই বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছিস সুধা।

সুধার কেমন অবাক লেগেছিল। মেজকাকার কথা এমন ভাবে ফলে যাবে সে কখনও ভাবে নি। কিন্তু যখন ফলল তখন মেজকাকার বিচার-বুদ্ধির উপর গভীর শ্রদ্ধা বাড়ল তার। আবার মনের খুব গোপনে যেন

খুব দুঃখও পেল। যেন এমন না হলেই সে খুশী হত। তার কলেজের ছোকরা ইংরেজ প্রোফেসরেরা এই ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করত আর সুধাময় জ্বলে পুড়ে মরত। এদের হাত এড়াবার জন্য সে মরীয়া হয়ে উঠল।

হঠাৎ সে একদিন শুনল, দেশবন্ধুর নতুন সংগ্রাম-পদ্ধতির কথা। কাউন্সিলের ইলেকশন আর বর্জন নয়, এবারে গ্রহণ—কাউন্সিলে ঢুকে ইংরেজের কেশর ধরেই নাড়া দিতে হবে। ভারত-শাসন-আইন অকেজো করে দিতে হবে। তবেই ইংরেজদের তাড়াতে পারা যাবে।

চট করে সুধাময়ের মনে হল, হ্যাঁ, এতদিনে একটা পথ পাওয়া গেল। মনপ্রাণ দিয়ে সমর্থন করল দেশবন্ধুকে। এখন দেশবন্ধুই সুধাময়ের দেবতা।

কংগ্রেসে দুটো দল হয়ে গেল। একদল নো-চেঞ্জার। তাঁরা অসহযোগের আদর্শ আঁকড়ে থাকলেন। দেশবন্ধু আর পণ্ডিত মতিলাল নেহরু আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন স্বরাজ্য পার্টি। নো-চেঞ্জাররা ধিক্কার দিতে লাগল দেশবন্ধুকে। মডারেট দল আগেই কাউন্সিলে ঢুকেছিল। মিনিস্টারি নিয়ে পরিষদীয় রাজনীতিতে হাত পাকাচ্ছিল। এবার মডারেটরা মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। কিন্তু হাসুক মডারেটরা, রটাক কুৎসা নো-চেঞ্জাররা, দেশবন্ধুকে ওরা এঁটে উঠতে পারবেন না। জয় তাঁর হবেই।

কিন্তু তোমার দেশবন্ধুই বা কী করবেন?

মেজকর্তার আচমকা প্রশ্নে সুধাময় থতমত খেয়ে গেল। মেজকর্তার প্রশ্নটা যে তির্যক, তা সে বুঝতে পারল। অথচ সুধাময়ের ধারণা ছিল, মেজকাকা এ খবরে উল্লসিতই হবেন। কই, তাঁর মুখে চোখে বিন্দুমাত্র উৎসাহের আভাসও তো ফুটে উঠতে দেখছে না সুধা।

মেজকাকা বললেন, কী এমন মন্ত্র জানা আছে তোমার দেশবন্ধুর, যাতে তিনি উন্নতির চরম স্তরে পৌঁছে দেবেন দেশের দরিদ্রতম লোকগুলোকে! এই যে সব মূক মূঢ়ের দল জগদ্দল পাথরের মত অনড় হয়ে রয়েছে, যাদের নিয়েই দেশ, কোন্ সঞ্জীবনীর বলে তিনি এদের প্রাণসঞ্চার করবেন, বলতে পার?

সুধাময় যথেষ্ট গরম হয়ে বলল, স্বাধীনতাই সেই সঞ্জীবনী। পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন করতে পারলেই আমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। দেশের প্রাণ আপনি জাগ্রত হবে।

পাগল! মেজকর্তা হাসলেন: এরা সব একই কথা কপচায়। এ বিষয়ে

আমাদের শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে তফাত বিশেষ নেই। দেশের পায়ে শিকল, দেশের প্রাণ, দেশের দুঃখ। কে যে এই সব কথাগুলো আবিষ্কার করেছিল! যে জিনিসের কোনও অস্তিত্ব নেই, সেই ফাঁকা আওয়াজগুলোই আজ মুখে মুখে ফিরছে। তাই নিয়েই যত মাতামাতি চলেছে। এদের কি একবারও এ কথা ভেবে দেখতে ইচ্ছে করে না, যে-কথা ক্রমাগত উচ্চারণ করে চলেছি তার মানে কী?

মেজকর্তার মনে পড়ল, তাঁদের কলেজী জীবনে দেশমাতৃকার এক ছবি ছাপা হয়েছিল। এক সুন্দরী রমণী, তার হাতে পায়ে শিকল। কে একজন তার সামনে ফাঁসিতে লটকে আছে। বোধ হয় ক্ষুদিরাম। একটা লোক সেই ছবিটা বাঁধিয়ে সরা হাতে শীতলা ঠাকরুনের সিধে মাঙার মত করে পয়সা নিয়ে বেড়াত।

অশিক্ষিত সেই লোকটিকে মেজকর্তা বুজরুক বলে ভাবতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের ধারণাই বা কী এমন পরিণত? এ সব বঙ্কিমবাবুর সেই বন্দেমাতরমের এফেক্ট। দেশ এখন পুরোপুরি একটা পৌত্তলিক ধারণায় পরিণত হয়েছে। বললে গলাভরা শোনায়, তাই আমরা বদন ভরে বলি।

যদি জানতাম ব্যাপারটা এত সহজ সরল নয়, অনেক জটিল, দেশোদ্ধার করা কখনোই যায় না, দেশের মানুষের উদ্ধারই করা যায়, তা হলে হয়তো বা কেউ কেউ ভাবতাম, তবে বুঝি স্রেফ তুড়ি মেরেই এ সব কাজ করা যায় না। এর পিছনে যা আছে তার ষোল আনাই বাস্তব সমস্যা। দেশ-শব্দটা যত অসার, দেশবাসী-শব্দটা কিন্তু ততখানিই সারবান। দেশের মধ্যে আছে পাহাড় পর্বত নদী মাঠ বন। আছে পশু পক্ষী মানুষ।

দেশবাসীর মধ্যে শুধু মানুষই আছে, বিচিত্র সব মানুষ। কৃষক আছে, জমিদার আছে, শ্রমিক আছে, চাকুরে আছে, আবার কলকারখানার মালিক আছে। শোষিত আছে, শোষক আছে। শত রকমের অত্যাচার অবিচার আছে। আছে হিংসা বিদ্বেষ পরস্পরের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত। এ সমস্যা জড় মৃত্তিকার নয়, সজীব মানুষের। সমস্যা আছে হাজার রকম—আর্থিক সাংস্কৃতিক দার্শনিক। বড় জটিল ব্যাপার। সম্ভবত এত জটিলতায় দিশেহারা হয়ে যাবার ভয় আমাদের থাকে, এত সব সমস্যার চিন্তা মাথায় ঢুকলে বাক্যস্ফূর্তি না ঘটার আশঙ্কাই থাকে, তাই এই সব জটিলতার মূল্য

অতি বাস্তব এই দেশবাসী-শব্দটাকে উহ্য রেখে 'হ্বং হ্রিং দুর্গা'র কাল্পনিক ধ্যানে নিমগ্ন থাকা পছন্দ করি।

এতে আর যাই হোক, মেজকর্তার বিশ্বাস, লোকে স্বাধীনতা কাকে বলে তার মর্ম কোনদিনই বুঝবে না। যেমন এর আগেও কখনও বোঝে নি। হাজার হাজার বছর ধরে এই ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। শক হুন গ্রীক এসেছে, পাঠান মোগল রাজত্ব করেছে। তারপর তাদের পরমায়ু ফুরলে ইংরাজ ফরাসী পর্তুগীজ ওলন্দাজ এসেছে। ইংরেজের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। কী এসে-যায় তাতে এ-দেশবাসীর? কোনদিন তারা মানুষের মূল্য পায় নি। মানুষের অধিকারে বরাবর তারা বঞ্চিত থেকেছে। স্বাধীনতার আস্বাদ পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে কখনও তারা গ্রহণ করতে পারে নি। তাই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মাথাব্যথাও তাদের নেই।

ইতিহাস আমাদের কিছুমাত্র যদি শিক্ষা দিয়ে থাকে তবে তা এই। কী করবেন গান্ধী, কী করবেন দেশবন্ধু? বড় জোর ইংরাজ তাড়াবেন। তারপর? আবার কোন গান্ধীরাজ বা দাশশাহীর প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু তাতেই কি স্বাধীনতার ফল ভারতের ছত্রিশ কোটি মনুষ্যবৃক্ষে ফলে যাবে? মূলে যেখানে শূন্য, সেখানে ছত্রিশ কোটি শূন্য যোগ হবে মাত্র, আর যোগফলও সেই শূন্যই দাঁড়াবে। অন্তত মেজকর্তার তো তাই দৃঢ় বিশ্বাস।

সুধাময়ের মাথা ঝিম ঝিম করছিল। কতক কথা সে বুঝল, কতক বোঝে নি। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, তাই সব কথা কানেও ঢোকে নি। তবে মেজকাকা যে নিজেও নেতিবাদীই, সেটা যেন আবিষ্কার করল।

তেইশ

এত রোদ্দুরে এতখানি পথ ফেদি বেশ জোরে জোরেই হেঁটে এসেছে। বিশেষ করে গোয়ালা বুড়ীর কাছ থেকে। বুনোরা আজ এদিককার জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলেছে। ডুম ডুম ট্যাম ট্যাম এই একঘেয়ে বাজনাটা আম কাঁঠাল বাঁশ বেত আর নানারকম আগাছা জঙ্গলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে কেমন

এক রহস্যময়, কেমন এক হিংস্র আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। মৃত্যুর পরোয়া নেই। যেন দিকে দিকে ছুটে চলেছে। যেন রটনা করছে, আজ আর নিস্তার নেই। মাঝে মাঝে বনের এদিক ওদিক থেকে হৈ-হৈ চিৎকার ভেসে উঠছে। কখনও কখনও বুনো আশশ্যাওড়া গাছ আর মানুষ-সমান উঁচু নরম আগাছার বুকে প্রবল বিক্ষোভ জাগিয়ে কারা যেন তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। ওদের দেখা যায় না। জানোয়ারও হতে পারে, আবার মানুষও হতে পারে।

ফেদির ভয়-ভয় করছিল। গা-ছমছম করছিল। যদিও সে এতটা পথ একা আসতে সাহস করে নি, এক সেখো সঙ্গে এনেছিল। কিন্তু সে ছোকরা দুর্গাবাড়ির কাছ থেকেই ভেগে পড়েছে। হাটের মাঠে ফুটবল ম্যাচ হবে, তার আকর্ষণেই সে ফেদির হাতছাড়া হয়েছে।

গিরিবালার উঠনে এসে দাঁড়াতেই ভয়ডর এক নিমেষে ফেদির শরীর থেকে শুকনো মাটির মত ঝরে পড়ল। এখানে মানুষের উষ্ণ স্পর্শ পাওয়া গেল। উঠনে বাঁশে-বাঁশে-তারে-তারে-মেলে-দেওয়া কাপড় হাওয়ায় দুলছে। একটা বড় কড়াই উপুড় হয়ে পড়ে আছে। একখানা কোদাল, একটা কুড়ুল, খান কয়েক চ্যালা কাঠ। বাস্‌, এইগুলো চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফেদির ভয় ভাঙল।

গুরু পরিশ্রমে সে এখন শুধু হাঁফাচ্ছে। তাঁর ফরসা সুন্দর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে। থান শাড়ির ভিতর থেকে তার বুক ঘন ঘন দুলে উঠছে। তার চিকন নাক ফুলে ফুলে উঠছে। এলোমেলো চুল মুখে কপালে উড়ে পড়ছে।

বেলা গড়িয়ে এলেও রোদের ঝাঁজ বেশ আছে। বাড়িটা নিস্তব্ধ। প্রাণ আছে বোঝা যায়, সাড়া পাওয়া যায় না। হাতের কাঁথাখানা মুঠো করে ধরে ফেদি গুদোম-ঘরের হাতি-শুঁড় সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল। বড়-বউয়ের ঘরে উঁকি মারল। বাবা, কেমন ঘুম এদের গো! চোরে সর্বস্ব নিয়ে গেলেও বোধ হয় ঘুম ভাঙবে না!

ফেদি গলা বাড়িয়ে সন্তর্পণে ডাকল, ও খুড়ি!

গলা শুকিয়ে যাওয়ায় আওয়াজটা ঠিকমত বের হল না।

আবার ডাকল, ও খুড়ি!

বড়বউ চোখ মেলেই দেখেন ফেদি। ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। দু হাতে চুলে গিঁট দিতে দিতে গলা-ভর্তি ছ্যাপ নিয়ে উঁ-আঁ করে তাকে

বসতে বললেন। তারপর তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে থুথু ফেলে এলেন।

বললেন, আসো মা, আসো। কতদিন তুমারে দেখি নি! কাল যখন বুড়িরা আসে ক'ল তুমার বাড়ি উরা গিছিল, আমি আরউ কলাম, আহা, ওরে আসতি কলিনে ক্যান? স্নুার মুখখানা একবার দ্যাখতাম।

ফেদি ম্লান হেসে বলল, স্নুার মুখ আর স্নুার নেই খুড়ি, একেবারে পিতলের হয়ে গেছে। এ মুখ আর দেখাতি ইচ্ছে করে না।

ফেদির চোখ টলটল করে উঠল। বড়বউয়ের চোখেও জল এসে গেল।

বললেন, বালাই ষাট। বিধেতার যে দিষ্টি নেই মা, নাহলি এমন কপালেউ কি আগুন জ্বালে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেদি বলল, সবই আমার অদিষ্ট। কারে দুষী করব, বল?

বড়বউ কোন কথা না বলে আঁচল দিয়ে ফেদির মুখ মুছিয়ে দিলেন। তারপর একখানা হাতপাখা টেনে ওকে হাওয়া করতে লাগলেন।

ঘর-সংসারের কথা উঠল। ফেদির বাবা মা তীর্থে বেরিয়েছেন। গয়া কাশী বৃন্দাবন ঘুরে বেড়াচ্ছেন সব। আসবার সময়ও প্রায় হয়ে এল ওদের। আজ আসে কি কাল আসে। বাড়িতে আছে ফেদি আর তার বাউণ্ডুলে দাদা সন্তোষ। কাজকর্মে মন নেই, এখন বিয়ে করার শখ চেপেছে। এই নিয়ে বাড়িতে অশান্তি চলছে। শ্বশুরবাড়ি থেকেও কেউ খোঁজ নেয় না ফেদির। অপয়া অলক্ষুণে বউ, কে তার বার্তা নেবে? কোলে একটা গুঁড়ো-গাড়া থাকলেও না হয় কথা ছিল।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় খুড়ি, আগুনি ঝাপ দিই, না হয় জলেই ডুবি আর নয়তো একদলা বিষ খাই।

ফেদি ঝরঝর কেঁদে ফেলল। এই তো মাত্র আঠার-উনিশ বছর বয়েস। কড়ে রাঁড়ির পেরমায়ও নাকি অখণ্ড হয়। সামনের দিকে চাইতে তার ভয়। ভবিষ্যৎ এক রুক্ষ, ধু-ধু মরুভূমি।

তবে আমার কপাল তো, আগুনিউ ছোঁবে না, জলই হয়তো শুকোয়ে যাবে, বিষ হার মানবে।

বড়বড় শিউরে উঠে ফেদির মুখে হাত চাপা দেন।

বলতি নেই মা, ওকথা বলতি নেই।

বড়বউ নিজের বুকের কাছে টেনে আনেন ফেদিকে। দুটো বুকের ব্যথা

কাছাকাছি এগিয়ে আসে। সমবেদনার অদৃশ্য প্রবাহ এক গভীর ক্ষতে প্রলেপ দিতে এগিয়ে যায়। বড়বউয়ের চোখের জল ফেদির মাথায় টপটপ করে ঝরে পড়ে, ফেদির চোখের জলে বড়বউয়ের কোল ভিজে সপসপে হয়ে ওঠে।

ফেদি চোখ মুছে সামলে বসে। তার মুখে অদ্ভুত এক হাসি ফুটে ওঠে। দুখানা মেঘ চিরে শরতের জ্যোৎস্না যে হাসি ফোটায়, সেই হাসি।

বলে, দেখ দিনি, কী কাজে আলাম আর কী করতি বসিছি! ও খুড়ি, বুড়িরি একবার ডাকো তো। ওর ছেলের জন্যি এই দেখ একখান কাঁথা সিলোইছি। কল্কা নকশাডা কেমন উঠিছে?

কাঁথাখানা মেলে ধরল ফেদি। সরু ফোড়ের সুন্দর কাঁথা। বড়বউ খুব তারিফ করলেন।

আহা-হা, এ যে গায় দেবার দোলাই। অতি চমৎকার! যেমন পাড়ির কল্কা তেমন সুন্দর ভিতরের নক্‌শা। এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্। ও বুড়ি, মণি রে, আয় এখেনে। ফেদি আয়েছে। দেখ্ কী আনেছে!

গিরিবালা আর-একটা ঘরে শুয়ে শুয়ে ছেলেকে মাই খাওয়াচ্ছিল। ফেদি এসেছে সে জানে। তার মনের অপরাধবোধটা সে নামাতে পারছিল না, তাই ও-ঘরে যেতে সাহস পাচ্ছিল না। ফেদি যে দৃষ্টি দিয়ে কাল দেখছিল গিরিবালাকে, তাতে প্রশংসা ছিল, ঈর্ষাও ছিল। সে ভাষা কিছু কিছু পড়তে পেরেছিল গিরিবালা, কিছু কিছু অর্থ গ্রহণ করতে পেরেছিল। বড়মার সঙ্গে ফেদি এতক্ষণ ধরে যা বলাবলি করছিল, তাও শুনেছে গিরিবালা। ফেদির জন্য সত্যিই সে দুঃখ পেয়েছে মনে। কিন্তু গিরিবালার কী দোষ? তার স্বামী বেঁচে আছে, ফেদির নেই। তার কোলে ভগবান ছেলে দিয়েছেন, সোনারচাঁদ ছেলে (গিরিবালা চুক চুক করে চুমু খেল, ছেলের গায়ের গন্ধটা শুঁকল) ফেদির কোল খালি রেখেছেন, তা সে কী করবে? তার কী দোষ? গিরিবালার খুব অস্বস্তি লাগছিল।

গিরিবালা জানে, বুঝতে পেরেছে ফেদির মনে কী তীব্র পিপাসা জেগে উঠেছে! এখন খোকাকে ওর সামনে নিয়ে গেলে কিছু হবে না তো, নজর লাগবে না তো? খোকাকে বুকে চেপে ধরল গিরিবালা। পরক্ষণেই তার চোখে এক বঞ্চিতা মাতৃত্বের করুণ দুটি চোখ ভেসে উঠল। গিরিবালা ভাবল, সত্যি, ফেদিদির চোখ দুটো কত সুন্দর! গিরিবালা নিজেকেই চাবুক

মারল যেন। ছিঃ, সে তো বড় স্বার্থপর! ধড়মড় করে উঠে পড়ল। উলঙ্গ শিশুটিকে বুকে নিয়ে সে বড়মার ঘরে ঢুকে পড়ল। ঢোকার আগে সে অবশ্য খোকার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে আলতো করে একটা কামড় দিয়ে নিল। সাবধানের বিনাশ নেই।

ফেদির কোলে গেল না খোকা। কিছুতেই না। বড্ড চেনা-অচেনা হয়েছে। একবার জোর করে কোলে নিল ফেদি, কঠিন আয়াসে বুকে চেপে ধরল। কঠিন স্তনে মাতৃত্ব ফলে নি তার। সুধার ভাণ্ড পূর্ণ হয় নি। তাই তার বুক জুড়াল না। কেঁদে ককিয়ে, শরীরটাকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করল গিরিবালার ছেলে। অপ্রস্তুত ফেদি হার মেনে ক্ষুণ্ণ মনে আবার তাকে গিরিবালার কোলে ফিরিয়ে দিল। ওর কচি মুখে চুমু খাবার একটা বাসনা ফেদির হয়েছিল। কিন্তু ডাকাত ছেলেকে আর ঘাঁটাতে ইচ্ছে করল না। কেমন এক অবসাদ এসে গেছে তার। কিসের জন্য এতটা পথ এসেছিল, এখন আর তা বুঝতে পারছে না। এবার বাড়ি ফিরতে মন চাইছে। কিন্তু এতটা পথ একা ফিরবে কী করে? বেলাও পড়ে আসছে।

ফেদি বলল, খুড়িমা, এবার বাড়ি যাই। একটা লোক দিতি পার একটু আগায়ে দেবে আমারে?

বড়বউ বললেন, সে কী মা, এখনই যাবি?

হ্যাঁ খুড়ি, বাইরি বেরয়ে দেখ, বেলা আর নেই।

ওমা, তাই তো! ও ফুলির মা, পানের বাটাটা আনো দিনি, ফেদিরি একটা পান খাওয়ায়ে দিই। একটুখানি বস্ মা, একটা পান মুখি দে।

ফেদি বলল, বিধবার ঠোঁট কি রাঙ্গা করতি আছে? আচ্ছা, দাও একটা। কিন্তু যাব কার সঙ্গে?

বড়বউ বললেন, দাঁড়া দেখি। ওরে ও নরা!

কেউ সাড়া দিল না। নরা নেই। রামকিষ্টো নেই। ফেদির মুখ শুকিয়ে গেল। তা হলে?

বড়বউ বললেন, ভাবিস ক্যান, ব্যবস্থা একটা করতিছি। ও সুধা, সুধা, বাবা, একটু শোন্।

সুধা বই পড়ছিল তার ঘরে। মার ডাকে এ ঘরে এল।

বড়বউ অনুনয় করে বললেন, মণি রে, ফেদিরি একটু আগায়ে দিবি?

সুধা ভণিতা না করেই বলল, দেব। জামাটা গায়ে দিয়ে আসি।

গাছের মগডালে তখনও আলো। তলায় তলায় সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসছে। দুর্গাবাড়ি ছাড়াতেই সেই ডুম ডুম ডুম ট্যাম ট্যাম ট্যাম বাজনা সজীব হয়ে উঠল। নিমেষের মধ্যে সেই ভয়টা লাফিয়ে পড়ল ফেদির ঘাড়ে। তার বুক-ধুকধুক বেড়ে গেল। সুধাময় মনে মনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। এই ক্লান্তিকর বর্বর অনুষ্ঠান যেন শেষ হবে না কোনদিন। এরা সব মেজকাকার দেশবাসী! হাসি পেল সুধাময়ের। এদের কথা স্মরণ রেখে যদি কাজ করতে হয়, তা হলে তাদের জীবনে কোন কাজেই আর নামা যাবে না।

শুধাদা, শুয়োর!

ফেদি এক চিৎকার দিয়ে সুধাময়কে জড়িয়ে ধরল। চমকে উঠে সুধাময় চেয়ে দেখল একটু দূরে একটা দাঁতাল শুয়োর সর্বাঙ্গে ক্ষত নিয়ে অন্ধকার গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে। ফেদির চিৎকার শুনে শুয়োরটাও চমকে ফিরে দাঁড়াল। সুধাময় দেখল, দু চোখে আগুন জ্বেলে শুয়োর নয়, ভয়ঙ্কর এক মৃত্যু ছুটে আসছে।

সুধাময়ের সমস্ত স্নায়ু এই প্রচণ্ড আকস্মিকতায় শিথিল হয়ে গেল।

সুধাদা, পালাও, পালাও

ফেদির এই আর্ত চিৎকার তার কানে ঢুকল না। ঢুকলেও ফল হত না। এক চুলও নড়তে পারত না। তার দেহ পাথর হয়ে গেছে।

ফেদি রাস্তার ধারে সরে গিয়ে প্রাণপণে সুধাময়ের একখানা হাত ধরে মারল টান। কেউই টাল সামলাতে পারল না। ঢেকির শাকের পাতা দিয়ে মুখ-ঢাকা চোরা নয়ানজুলির মধ্যে হুড়মুড় করে দুজনেই গড়িয়ে পড়ল।

ধাতস্থ হতে বেশীক্ষণ লাগল না সুধাময়ের। দেখল, মরে নি সে। শুয়োরের ধারাল দাঁতে তার দেহটা ফালাফালা হয়ে চিরে যায় নি। শুধু অন্ধকার নালায় পড়ে গেছে। তার উপরে পড়েছে ফেদি। ফেদির দেহটা বেশ ভারী লাগছে। সুধাময়ের পেট আর হাঁটুতে ব্যথা করছে। ফেদি একদম নড়ছে না। সেও তখন নড়তে-চড়তে ভরসা পেল না। কী জানি শুয়োরটা যদি এখনও দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে! ভয়ে আবার প্রাণ উড়ে গেল সুধাময়ের। খিঁচুনি শুরু হল তার মেরুদণ্ডে। উঃ, খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছে আজ। ফেদি না থাকলে প্রাণই যেত। খুব সন্তর্পণে একটু নড়তেই ফেদির পুষ্ট স্তনের

চাপ সুধাময় অনুভব করল। আর সঙ্গে সঙ্গে সুধাময়ের দেহে প্রচণ্ড বেগে বিদ্যুদ্বেগে তরঙ্গ বয়ে গেল। ভীম এক বিস্ফোরণের ঝাঁকুনি সে অনুভব করল। তার দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল। তার মনে অজানা এক আক্ষেপ দেখা দিল। সুধাময়ের যৌবন এই প্রথম এক নারীদেহের আস্বাদ পেল। অপ্রস্তুত সুধাময়ের অজ্ঞাতসারে তার সর্ব অঙ্গ আরও কিছু পাবার আশায় প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। তার অঙ্গে অঙ্গে তীব্রস্বরে বেজে উঠল কামনার দুরন্ত বাঁশরী। মুহূর্তে মুহূর্তে সুধাময়কে এক মধুর মৃত্যু যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল।

ফেদি এতক্ষণ নিশ্চল হয়ে পড়ে ছিল সুধাময়ের শান্ত দেহের উপর। সে দেহে চাঞ্চল্য জাগবার সঙ্গে সঙ্গে সে এমন ধড়মড় করে উঠে সুধাময়ের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বসল যে, সুধাময় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ফেদি তার দিকে একবার তাকাল। সুধাময়ের মনে হল, সে যেন নীরবে তাকে তিরস্কার করল : ছিঃ সুধাদা, তোমার এমন ব্যবহার! সুধাময়ের দেহের কাঁপুনি তখনও থামে নি। তার যেন জ্বর এসেছে উত্তেজনায়।

ফেদি খুব শীতল কণ্ঠে বলল, ওঠ সুধাদা, লাগে নি তো?

সুধার আর কথা বলার অবস্থা নেই। খুব ইতর ভাবছে তাকে ফেদি! খুব খারাপ ভাবছে তাকে! ইচ্ছে হল, ফেদিকে এখানে ফেলে রেখেই সে পিঠটান দেয়। এ মুখ আর দেখাতে চায় না।

যথাসম্ভব গম্ভীরভাবে সুধাময় জিজ্ঞাসা করল, এখান থেকে একা বাড়ি যেতে পারবে?

ফেদি একবার চোখ তুলে চাইল। তারপর শান্ত গলায় বলল, না। চল, একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছয়ে দাও।

ফেদিরের বাড়ি পর্যন্ত নীরবে পার হয়ে গেল দুজন। বাড়ির বাইরে থেকেই ফিরে আসছিল সুধাময়, ফেদির কথায় থমকে দাঁড়াল।

ফেদি ডাকল, সুধাদা, যায়ে না, ভিতরে আসো, কথা আছে।

এইবার সুধাময়ের মন রুখে দাঁড়াল। কী তাকে ভেবেছে ফেদি! লম্পট? বদমায়েস? কী করেছে সে? নয়ানজুলিতে তার যে চিত্তবিভ্রম জেগেছিল তার জন্য সুধাময় একটুও দায়ী নয়। বেশ, ফেদিকে খোলাখুলিই জানিয়ে দেবে সুধাময়। ফেদির দেহের সান্নিধ্যে সুধাময় ওভাবে এসে পড়েছিল

বলেই তার দেহে অমন চঞ্চলতা জেগেছিল। স্বীকার করছি ব্যাপারটা শোভন হয় নি। কিন্তু ফেদি বিশ্বাস করুক ও-ঘটনায় উপর সুধাময়ের কোন হাত ছিল না। সে এতখানি বয়েস পর্যন্ত কোন মেয়েকেই পাপচক্ষে দেখে নি।

সুধাময় ভিতরে ঢুকতেই ফেদি এসে তার হাত চেপে ধরল। এ কী, ফেদিও যে অমনি থরথর করে কাঁপছে! ফেদির গায়ে গা ঠেকামাত্র সুধাময় আবার সেই প্রবল জ্বরের আক্রমণে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। এবার সে একা নয়। দুজনেই একই তাপে তাপিত হচ্ছে।

ফেদি কোন কথা না বলে থরথর-কম্পিত হাতে সুধাময়ের হাত ধরে ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঝনাত করে বাইরের শিকলটা শব্দ করে উঠল। তারপর বন্ধ কপাটের গায়ে মৃদু মৃদু দুলতে লাগল শিকলটা।

চব্বিশ

এ কী হল? এত প্রচণ্ড তৃষ্ণা তার মনে ছিল? এত দাবদাহ তার দেহে? কই, ফেদি তো এর আগে এমনভাবে টের পায় নি! স্বামীর মৃত্যুর পর ওর দেহ আর মনের ক্ষুধা-তৃষ্ণার তেজকে নানা প্রক্রিয়ার মন্দীভূত করে ফেলেছিল ফেদি। কোন কোন মা নিরুপায় হয়ে যেমন তার দামাল সন্তানকে মাদকের নেশায় নির্জীব করে ফেলে রাখে, তেমনি ফেদিও তার কামনা-বাসনাকে তার দেহের আশ্রয়ে পঙ্গু করে ফেলে রেখেছিল। দুটো বছর পার হবার পর ফেদি বুঝি একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিল, বুঝি ভেবেছিল সব চুকে-বুকে গেছে, নিজেকে সে তৈরী করে নিয়েছে এক বর্ণহীন গন্ধহীন স্বাদহীন দীর্ঘ জীবন-যাপনের কঠোর সাধনার জন্য।

কিন্তু এ কী? আকস্মিক এক ঘটনার দুর্বার আঘাতে ফেদির এতদিনের সাধনায় অর্জিত সংযম, বিধবার তপঃক্লিষ্ট শুচিতা—সব ফুৎকারে উড়ে গেল! পরপুরুষের অনধিকার প্রবেশ ঘটল তার দেহের সীমানায়! আর কিনা ফেদিরই আমন্ত্রণে! ছিঃ!

সে কি তবে কাল পাগল হয়ে গিয়েছিল?

অন্যদিন খুব ভোরে ওঠে ফেদি। রোদ ওঠবার আগেই তার সংসারের

কাজ অর্ধেকের বেশী শেষ হয়ে যায়। আজ ফেদিদের অপরিষ্কার উঠনে রোদ এসে গড়াগড়ি খেতে লাগল, তবুও ফেদি ঘরের দরজা খুলল না। বাসী বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে পড়ে রইল। নড়াচড়াও করল না। কোন কিছুই করতে ইচ্ছে যায় না আর। আহা, এখন ঠিক এই মুহূর্তে যদি তার মৃত্যু হত! ভগবান, ভগবান—মনে মনে পরিত্রাহি ডাকতে লাগল ফেদি। বলতে লাগল, যদি কায়মনোবাক্যে তোমার পুজো করে থাকি, তবে মৃত্যু দাও দয়াময়।

দয়াময়কে স্মরণ করামাত্র সুধাময়কে মনে পড়ে গেল ফেদির। ফেদির চিন্তার ভূমি থেকে ভগবানকে কনুইয়ের গুঁতোয় ঠেলে দিল সুধাময়, ফেদির সমগ্র সত্তার দখল নিল নিজে।

ফেদির ভাবনার গতি ঝড়ের বেগ ধারণ করল। দ্রুত, অতি দ্রুত ধেয়ে চলল সুধাময়ের দিকে। চিন্তার এই গতিতে ভর করে ফেদির দেহটাই যেন ছুটে চলল সুধাময়ের দেহে প্রচণ্ডবেগে ঝাঁপিয়ে পড়তে। সুধাদা কাল এই বিছানায় শুয়েছিল। কথাটা মনে পড়ল ফেদির। বিদ্যুদ্বেগে কী এক অপূর্ব সুখাস্বাদ ছড়িয়ে পড়ল তার দেহের কোণে, সঙ্গে সঙ্গে সুধাময়ের স্পর্শ প্রাণময় হয়ে উঠল। ফেদির মনে হতে লাগল, তার সর্বদেহে সুধাময়ের অনভ্যস্ত হাতের ছোঁয়া। দারুণ উত্তেজনায় ফেদির দেহে থরথর-কম্পন শুরু হল। বুক ধুকপুক করতে লাগল। চোখের অতল থেকে এক নতুন সূর্যের যেন উদয় হতে লাগল। শরীরে প্রবল তাপ। নাক, কান, মুখে যেন উত্তাপের হল্কা লাগছে। কামনার প্রবল তৃষ্ণায় ফেদি ছটফট করতে লাগল। উপুড় হয়ে বালিশটা বুকে জড়িয়ে ধরল প্রাণপণে, নিজেকেই যেন ছোবল দিতে লাগল বার বার। আর পারে না ফেদি, এক্ষুনি যেন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়বে। যেন মরে যাবে। মর্ মর্, তুই মর্ হতভাগী। তোর মনে এত পাপ, তোর দেহে এত তাপ, না মরলে তুই জুড়োবি নে। ছিঃ ফেদি, ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

মরবে সে, মরবেই। এই কলঙ্কিত দেহের ভার বয়ে নিজের কাছে ধিক্কৃত, জগতের কাছে ঘৃণ্য হয়ে সে বাঁচতে চায় না। ভগবান, তোমার কাছে এই মিনতি, শুধু এইটুকু কর, মরণকালে সুধাদা যেন শিয়রে এসে একবার দাঁড়ায়, এই হতভাগীর জন্য যেন দু ফোঁটা চোখের জল ফেলে। তা হলে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ নিয়ে ফেদি মরতে পারে। কিন্তু আসবে কি সুধাদা সে সময়!

হঠাৎ ফেদির হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করে কেঁপে কেঁপে উঠল, সুধাদা আজই আসবে যে! এই দুপুরে। না না, অপরাহ্ণে। যখন তার দাদা বাড়ি থাকবে না। যখন খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে তার পড়শীরা ঘুমের কোলে ঢলে পড়বে, সেই সময় সুধাদা চুপি চুপি আসবে। ফেদি যেন দেখতে পাচ্ছে, ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে দিয়ে সচকিত সুধাময় ফেদির বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। সুধাময়ের মুখে-চোখে সেই নিষ্পাপ সুকুমার ঔজ্জ্বল্য আর নেই। সেই অনাবিল আনন্দের ধারা সুধাময়ের সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারায় আর উপছে পড়েছে না। স্বর্গীয় দীপ্তি হারিয়ে ফেলেছে সুধাময়, আর সে কোনদিন মাথা উঁচু করে ফেদিদের উঠনে পা দিতে পারবে না। কখনও আর সুধাময় তাদের বারান্দায় বসে তেমন অনায়াসে বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়ে ভাবালু দৃষ্টি মেলে অন্যমনস্ক হয়ে যেতে পারবে না। সুধাময়ের এই মূর্তিটা খুব ভাল লেগেছিল ফেদির। এই তো পরশুদিনের কথা। অথচ সেই সুধাময় একটি দিনের মধ্যে কী হয়ে গেল? চোরের মত তাকে এখন আসতে হবে। পাপের গোয়েন্দা-ছায়া সব সময় অনুসরণ করতে থাকবে তাকে। যে সুধাময় সুস্থ সবল সদানন্দের প্রতীক ছিল, ফেদির মত অসতীর বিষ-নিশ্বাসে সে এখন মোহগ্রস্ত, অপ্রকৃতিস্থ এক পেশাদার কামুকে পরিণত হয়েছে। এই গ্রামে যার নমুনা নিতান্ত কম নেই।

সুধাময়ের এই অধঃপতনের জন্য কে দায়ী? আমি। ফেদি স্বীকার করল, হ্যাঁ, আমি। সুধাময় কাল রাত্রে তাড়াতাড়ি যখন পালাতে চেয়েছিল, কে তার হাত ধরে আটকে রেখেছিল? কে তাকে আধ-আধ ভাবে বলেছিল, কাল এসো, কাল দুপুরে এসো? আমি বলেছি, আমি—আমি—আমি।

কিন্তু পরিণাম ভেবেছিলে কি? এর পরিণতি কী হতে পারে, ভেবেছিলে? না। না, ভাবি নি। ভাববার অবকাশ কোথায় ছিল কাল? এক ফেদি দুই হয়ে গেল। তারপর যাত্রাদলের সুনীতি-কুনীতির মত তর্ক করতে বসল।

এখন তবে বুঝতে পারল ফেদি, কাল যে অত তাড়া অনুভব করেছিল গিরিবালার ছেলেকে দেখতে যাবার জন্য, সে তা হলে গিরিবালার ছেলের জন্য নয়! না না, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল ফেদি, ঈশ্বর জানেন, আর-কোন উদ্দেশ্য ছিল না আমার। গিরিবালার ছেলেকেই দেখতে চেয়েছিল, তাকেই দেখতে গিয়েছিল সে। কোনও কুমতলব ছিল না। তবে, তবে এ কাণ্ড

কী করে ঘটল? জানি না, জানি না, জানি না। বালিশে মুখ ঘষতে লাগল ফেদি।

ডুম ডুম ট্যাম ট্যাম বাজনাটা ফেদির কানে বেজে উঠল। আহত সেই ভয়ঙ্কর শুয়োরটার চেহারা ভেসে উঠল তার চোখে। বুনোদের হাত থেকে যেমন রেহাই পায় নি সেই দাঁতালটা, বন থেকে বনে তাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে যেমন নিষ্ঠুর উল্লাসে শিকারীরা তাকে শেষ করেছে, ঠিক ফেদিকেও তেমনি-ভাবে কে যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে! তাড়িয়ে তাড়িয়ে তাকে এই পরিণতিতে এনে ফেলেছে। এই ঘটনায় তার সচেতন হাত কোথায়?

ফেদির হ্যাঁচকা টানে সুধাময় নয়ানজুলিতে গড়িয়ে পড়ল। ফেদিও টাল সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ল সুধাময়ের উপরে। প্রচণ্ড ভয়ে ফেদি তখন আধমরা। তার কি তখন অন্য খেয়াল থাকতে পারে? কতক্ষণ এমন ভাবে ছিল সে জানে না। হঠাৎ এক সময়, সেই আচ্ছন্নতার মধ্যেও সে তার স্বামীর পরিচিত উষ্ণতার বিদ্যুৎস্পর্শ পেল। সেই স্পর্শটি পাওয়ামাত্র সে চমকে উঠেছিল। তৎক্ষণাৎ সুধাময়ের দেহ থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিল। একটা নতুন আতঙ্ক আর পুরনো উত্তেজনা তাকে মুহূর্তের জন্য আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। থরথর করে কেঁপে উঠেছিল ফেদি। কিন্তু বিধবার সংযমের রাশ পরিয়ে সে মুহূর্তের মধ্যেই সেই ফাজিল চিত্তচাঞ্চল্যকে বশে এনে ফেলেছিল। সুধাময়ের মুখে বিমূঢ়তা এবং অপরাধের যে মিশ্র ছাপ সে সময় ফুটে উঠেছিল, তা ফেদির দৃষ্টি এড়ায় নি। সুধাময়ের শিশুর মত বিমূঢ়তায় বরং কিছুটা মজাই পেয়েছিল সে। সুধাময় এতই বিব্রত বোধ করছিল যে, ফেদিকে ওখানে ফেলে রেখেই যেন পালিয়ে যাবে। সুধাময় সে কথাটা বলে ফেলতেই চোখে অন্ধকার দেখল ফেদি। সর্বনাশ! সে তাহলে যাবে কী করে একা? তা ছাড়া কী এমন হয়েছে যে সুধাদা এত কিন্তু-কিন্তু করছে! তাই সে যথাসম্ভব সহজভাবেই সুধাময়কে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে বলেছিল।

তারপর সারা পথ তারা দুজনে চুপ করে হাঁটতে লাগল। সুধাদা কথা বলছে না কেন? এত অপরাধী ভাবছে কেন নিজেকে? এই সম্পর্কে ভাবতে গিয়েই যে সত্য অকস্মাৎ আবিষ্কার করে বসল ফেদি, তাইতেই সর্বনাশ ঘটে গেল। সুধাময়ের দেহটা ফেদিকে বুকে ধরে যে তার স্বামীর দেহের ভাষায় তাকে ডাক দিয়েছিল, সুধাময়ের অপরাধবোধের কারণ কি

এই? তবে কি ফেদির দেহে এখনও এমন গুণ আছে যা পুরুষকে টানতে পারে? বিধবা হওয়ার পরেও সে তা হলে ফুরিয়ে যায় নি? এ সব কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন এক চাঞ্চল্য জেগে উঠতে লাগল ফেদির দেহে! কেমন যেন সিরসিরানি! কেমন একটা অস্থিরতা! কিসের যেন প্রত্যাশা! তার সর্বদা ভয় হতে লাগল, এই বুঝি সুধাময়ের অবুঝ পৌরুষ পিছন থেকে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সত্যি, এখন যদি সুধাদা তাকে জড়িয়ে ধরে, তা হলে কী হবে? কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। কেউ না, কেউ না। কী হবে তা হলে? যত এই কথা মনে পড়তে লাগল, ফেদির শরীর তত বেশী কাঁপতে লাগল। পথ আর চলতে পারে না। যেন এক্ষুনি পড়ে যাবে মাটিতে। তবুও যা হোক, নির্বিঘ্নেই বাড়ি পৌঁছল। কিন্তু বাড়ি পৌঁছতে-না-পৌঁছতে তীব্র পিপাসায় ফেদির যৌবনকে জর্জরিত করে ফেলেছে। সে যেন দিনের পর দিন জল না-খেয়ে এক দুস্তর মরু পার হয়ে এসেছে। সামনেই দেখেছে এক জলাশয়। সামনেই সুধাময়। দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান হারিয়ে তাই ফেদি কাল সন্ধ্যায় সেদিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায়, পরিণাম পরিণতি—কিছুই সে ভাবে নি। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার স্বামীকেই কাছে পেয়েছিল। যেটুকু ঘাটতি ছিল, সে তার কল্পনা দিয়ে পূরণ করেছে। তাই সেই সুখকেই তখন অন্তিম সুখ বলে মনে হয়েছিল তার। এখন দেখল, বুঝল, সে সুখ সুখ নয়, কালসাপের দংশন। এখন যা দীর্ঘস্থায়ী তা হচ্ছে যন্ত্রণা, উত্তরোত্তর সুতীব্র পিপাসা। তাই হয়তো ফেদি সুধাময়কে আবার আমন্ত্রণ করে থাকবে।

কিন্তু কাজটা উচিত হয় নি। এখন বুঝতে পেরেছে ফেদি। সুধাদাকে বারণ করে দেবে আসতে। সুধাদা চিরকাল সুধাদাই থাক্। তার নাগর যেন না হয়! ফেদি নিজেকে নষ্ট করেছে, তা করুক। কিন্তু সুধাময়কে নষ্ট করবে না।

কিন্তু কী করে বারণ করবে? চিঠি পাঠাবে? ছিঃ ছিঃ! তাতে শুধু মনের কেলেঙ্কারি কালির অক্ষরে জগতে প্রকাশ হবে। তবে কি আজ আবার যাবে ওদের বাড়ি? কিন্তু কী উপলক্ষে? ফেদি সভয়ে দেখল, পৃথিবীটাকে সে কত জটিল করে ফেলেছে। ফেদি দেখল, সে এরই মধ্যে কতটা অসহায় হয়ে পড়েছে। তবে কি সুধাময়কে বারণ করা যাবে না? সে আসবে? তাকে নিবারণ করা যাবে না? আবার…

না না না, আর না, আর না। যা হবার হয়ে গেছে। ভগবান, ভগবান, এবার রক্ষা কর, রক্ষা কর।

ফেদি বালিশে মুখ গুঁজে অসহ্য যন্ত্রণায় কাঁদতে লাগল।

ঘুম হয় নি, ঘুমতে পারে নি সুধাময়। ঘুমনো কি যায়!

উত্তেজনার প্রবল আবর্তে পড়ে সারারাত হাবুডুবু খেয়েছে সুধাময়। ফেদির অস্তিত্ব অশরীরী অবয়ব ধরে বারে বারে এসেছে, নিরন্তর তাকে স্পর্শ করেছে। সুধাময়ের রোমে রোমে পুলকের শিহরণ জেগেছে। সুধাময় জেগে উঠেছে। আবার হয়তো কখনও ঘুমিয়েছে। ঘুমনোমাত্র ফেদির কমনীয় দেহের সুঘ্রাণে হয়তো সুধাময়ের ঠুনকো ঘুম টুটে গেছে। ফেদির অজস্র চুল যেন অন্ধকার হয়ে সুধাময়কে ঢেকে রেখেছে। তার প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে, হাত বাড়ালেই যেন এই নরম অন্ধকার সে মুঠো করে ধরতে পারবে। আর মুঠিভোর অন্ধকারের গোছা সুধাময় আলতো করে তার নাকের কাছে টেনে আনলেই তার ভিতর থেকে ফেদির চুলের সেই মাতাল গন্ধ বুঝি পাওয়া যাবে। বুঝি সেই চাপ চাপ অন্ধকারের নীচেতেই ফেদির অপরূপ মুখখানা ভেসে উঠবে, হেসে উঠবে। বুঝি তার নরম ওষ্ঠের দুটি পেলব পাপড়ির গুরু চাপ পড়বে সুধাময়ের ঠোঁটে। সুধাময় চমকে উঠল। ফেদির গরম নিশ্বাস কে ফেলল তার গালে? কে? সুধাময়ের রক্তে যেন প্রচণ্ড বেগে বান নামল। প্রতিটি রক্তকণিকা দুরন্ত স্রোতে গা ভাসিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে অনির্দিষ্ট এক লক্ষ্যে ছুটে চলল। কোথায়, কে জানে? উন্মাদ বিদ্যুৎ-তরঙ্গের ছোঁয়া লাগায় তার দেহের কোষে কোষে বাধাবন্ধহীন উচ্ছৃঙ্খল উল্লাস অবিশ্রান্ত নৃত্যে মেতে উঠল। এই বুঝি সুধাময় ফেটে পড়ে, ভেঙে পড়ে। এই বুঝি তার সত্তা রেণু রেণু হয়ে উড়ে যায়। এ কী নিদারুণ, এ কী দুঃসহ, এ কী পরম আনন্দময় এক অভিজ্ঞতা! সুধাময় একে আর ধরে রাখতে পারছে না। ছেড়ে দিতেও মন চায় না।

এক সময় এই প্রবল জোয়ারও স্তিমিত হয়ে এল। অবসাদে ক্লান্ত হল সুধাময়। আর সে চাঞ্চল্য নেই। আর সে বিক্ষোভ নেই। মহা আলোড়নের পর তার বিধ্বস্ত অস্তিত্বে যেন শান্তি ঘোষিত হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়ল সুধাময়।

দু মিনিটও পার হয়েছে কিনা সন্দেহ, কে যেন ধাক্কা দিল সুধাময়ের বক্ষ

দরজায়। ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে গেল তার। এত মৃদু তার দুয়ারে নাড়া দিল কে? ফেদি? চুপিসাড়ে ফেদি এসেছে নাকি? দাঁড়িয়ে আছে বাইরে? কালকের মত থরথর করে কাঁপছে? যে মুহূর্তে দরজা খুলবে সুধাময়, সেই মুহূর্তেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ফেদি? আদরে অস্থির করে দেবে সুধাময়কে সন্ধ্যাবেলার মত? আবার সুধাময় প্রবল তাড়নায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। আবার তার দেহে, তার মনে প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু হল। মাতাল হল রক্ত, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হল। প্রবল চাঞ্চল্যে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিদ্রোহ ঘোষণা করল আবার। অস্থির হয়ে উঠল সুধাময়। কাঁপতে লাগল থরথর করে। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না। অসহায় হয়ে পড়ে রইল বিছানায়। উন্মুখ আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল ফেদির। যেন ওই বন্ধ কপাট ভেদ করেই এসে উপস্থিত হবে সুধাময়ের শয্যায়।

কিন্তু ফেদি এল না। দরজায় আর ধাক্কাও দিল না। এর আগেও সম্ভবত দেয় নি। সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই দেয় নি। সুধাময় ভাবল, সে তবে পাগল হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, পাগলই। নইলে সে কী করে ভাবল, ভাবতে পারল, ফেদি এত রাত্রে ও-পাড়া থেকে বন জঙ্গল ডিঙিয়ে তার দুয়ারে এসে হাজির হয়েছে! সেই ফেদি, ভয়ে যে দিনের আলোতেও একা-একা যেতে পারে না। সুধাময়ই তো তাকে এগিয়ে দিতে গিয়েছিল। আর এগতে গিয়েই তো…

তা ছাড়া ও-পাড়াতে নাই-ই যদি থাকত ফেদি, যদি সে সুধাময়ের পাশের ঘরেই থাকত, তা হলেই কি আসতে পারত?

এতক্ষণ পরে সুধাময়ের জ্ঞান হল, যে সুখস্বপ্নে সে ভাসছিল, সেটি অতি গর্হিত। আর সঙ্গে সঙ্গেই সে যেন সপাৎ করে বিবেকের এক চাবুক খেল। এ কী করেছে সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে! এ তো অন্যায়, এ তো অপরাধ, এ তো পাপ! যদি ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়ে! সর্বনাশ! চোখে অন্ধকার দেখল সুধাময়। ভয়ে ঘেমে উঠল। এখন উপায়? গলা শুকিয়ে গেল তার। বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। কী উপায় এখন? কী করবে সুধাময়? পালিয়ে যাবে কলকাতায়? পালিয়েই কি নিস্তার আছে? সুধাময় দেখল, এমন নিদারুণ এক জালে সে জড়িয়ে পড়েছে, যে জাল কাটবার সাধ্য তার নেই। নেই—একদম নেই। সুধাময় জানে, পাপ কখনও চাপা থাকে না। মা-দিদিমার মুখে কতবার সে কথাটা শুনেছে, নাটক-নভেলে পড়েছে, যাত্রা-থিয়েটারে

দেখেছে। না, পাপ কখনও চাপা থাকে না। আপন মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগল সুধাময়। তার পাপও চাপা থাকবে না। একদিন ফাঁস হয়ে যাবে। হয়তো এর মধ্যেই জেনে গেছে লোকে। ভর-সন্ধ্যেয় সে ফেদির সঙ্গে তাদের বাড়িতে গিয়েছিল। ফেদি তাকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করেছিল। কারও নজরে কি আর তা পড়ে নি? নিশ্চয়ই পড়েছে। সুধাময় ধরা পড়ে গেছে। ফিস-ফিস করে কথাটা কান থেকে কানে ছড়াতে আরম্ভ করেছে। ঘরে ঘরে কানাকানি শুরু হয়ে গেছে। এসব মুখরোচক জিনিসের সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পেলে গ্রামের লোক ছেড়ে কথা কয় না। সকাল হতে না হতেই দ্রুতবেগে কথাটা ছুটবে বিভিন্ন পথে। হাটতলায় পৌঁছে যাবে, তারপর মাতব্বররা, সমাজের রক্ষকর্তারা ছুটে যাবে ফেদির বাড়িতে, আসবে এখানে। হৈ-চৈ হবে। নালিশ, সালিশ, বিচার। কেলেঙ্কারির বাকি থাকবে না কিছু। কী অবস্থা হবে তার? কী অবস্থা হবে এই পরিবারের, বাবার মার পিসিমার মেজকাকার? কী তাকে ভাববে বুড়ি? মা হয়তো এই শোকে মরেই যাবে। সুধাময়ের জীবনের সব আলো নিবে আসতে লাগল। তার মনে হল, সে যেন তাড়া-খাওয়া এক শিকার। সেই বুনো শুয়োরটাই যেন। বন থেকে বনে পালাচ্ছে সে আর গ্রামের লোক ক্ষিপ্ত হয়ে ঝোপঝাড় পিটে তাকে ধরবার জন্য তাড়া করেছে। তাদের হিংস্র চিৎকার শুনতে পাচ্ছে সুধাময়। এ সেই আদিম মানুষের শিকারী চিৎকার। সুধাময়ের কানে উদ্দাম বাজনা বেজে উঠল। ড়ুম ড়ুম ড়ুম—ট্যাম ট্যাম ট্যাম। এর পরিণতি কিসে? সুধাময় বুঝতে পারল, মৃত্যুতে। "পাপের বেতন মৃত্যু"—এই অমোঘ নির্দেশটা সুধাময় কলকাতায় দেখেছে কোন একটা গীর্জার দেওয়ালে। আজ সেটাকে তারই কপালে ঝুলতে দেখল। মৃত্যুই তবে একমাত্র পথ? কিন্তু কেমন মৃত্যু! কলঙ্কের কালি মেখে সে মরবে, তার পরিবারে চিরদিনের জন্য এই অক্ষয় কলঙ্ক চিহ্নিত করে দিয়ে যাবে? সুধাময়ের দম আটকে আসতে লাগল। জল তেষ্টা পেল। তার বুক ফেটে যেতে লাগল।

আর কি কোন পথ নেই? ভাবতে লাগল সুধাময়।

কেন, সে যদি বিয়ে করে ফেদিকে?

উত্তেজনায় বিছানার উপর লাফিয়ে উঠল সুধাময়। যদি সে বিয়ে করে ফেদিকে! বালিশটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল। যদি কেন, নিশ্চয়ই সে বিয়ে

করবে। সব দায়িত্ব মাথা পেতে নেবে। সে না পুরুষ। সে না আধুনিকতার প্রতিনিধি। ফেদি বিধবা, বামুনের মেয়ে। সুধাময় জানে, তার এই কাজে গ্রামে কী প্রবল আলোড়ন উঠবে। বাবা মা পাড়া প্রতিবেশী সবাই বাধা দেবে প্রাণপণে। তা হোক, পরোয়া করবে না সুধাময়। এ কাজে কেমন যেন এক বীরত্ব আছে। সে ফেদিকে নিয়ে কলকাতায় চলে যাবে। সেখানে সংসার পাতবে দুজনে। আবার আলো দেখল সুধাময়। মনোমত এক পথ দেখতে পেল। অবৈধ নারী-সংসর্গের পাপ সে মুক্ত করবে বিবাহের বৈধতার বন্ধন দিয়ে। দৈব দুর্ঘটনায় যে দুটি দেহ পাপের পঙ্কে এসে মিশেছিল, বিয়ে করে, সংসার পেতে সে দুটি মনে তারা প্রেমের পদ্ম ফুটিয়ে তুলবে। এর জন্য যে বিপদই আসুক, সুধাময় মাথা পেতে নেবে। যদি ত্যাজ্যপুত্র হতে হয়, যদি এ পরিবার ছাড়তে হয় জন্মের মত, তাও স্বীকার করে নেবে সুধাময়।

সংকল্পটা নেবার পর সুধাময় দেখল তার মনের গ্লানি কেটে আসছে। নিশানাহীন সমুদ্রে সারারাত তরী বেয়ে সুধাময় যেন ভোরবেলা কোন নতুন দেশের তটরেখা দেখতে পেল। ধীরে ধীরে তার মনে উল্লাসের সঞ্চার হতে লাগল। সুধাময় তখন আরও এক ধাপ আগে পা বাড়াল।

কেউ জানুক আর নাই জানুক, ফেদিকে সে বিয়ে করবেই। আর তার ভয়-ডর নেই। অমনি সুধাময়ের কানে ফেদির কাতর আহ্বান বেজে উঠল। গত সন্ধ্যায় তার বুকে মুখ রেখে অতৃপ্তস্বরে বলেছিল, কাল আসো সুধাদা, দুপুরের পর, আসো। অমনি আবার সুধাময়ের দেহে জোয়ার আসতে লাগল। প্রবল জ্বরের নতুন জোয়ার। ফেদির কাছে যাবার জন্য দুর্বার ইচ্ছটা আবার জেগে উঠল।

হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল সুধাময়।

গ্রামে সুধাময় আর ফেদিকে নিয়ে কম কেলেঙ্কারি হল না। সুধাময় যেমন যেমন ভেবেছিল, ঠিক তেমন তেমন ঘটে গেল। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ল। পিসীমা সুধাময়ের পায়ের উপর মাথা কুটলেন। মা অন্নজল পরিত্যাগ করলেন। বাবা শক্ত পাথর। সুধাময় শুধু মেজকাকার সমর্থন পেল। না পেলেও ক্ষতি ছিল না। মাতার অশ্রুজলে বিচলিত হলে আর সমাজ সংস্কার করা যায় না। বিদ্যাসাগরের মায়ের মত মা কজন লোক পায়! সুধাময়ের একটুখানি আফসোস রইল যে, বিদ্যাসাগরকে

সে এ জিনিসটা দেখাতে পারল না। বোঝাতে পারল না যে, বাঙালী এখনও তাঁকে ভুলে যায় নি। ফেদি বড্ড ভীতু। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কলকাতায় আনতে সুধাময়কে বেশ বেগ পেতে হল। সুধাময়ের বন্ধুরা হৈ-হৈ করে উঠল। কাজের মত কাজ করছে সুধা। কয়েকটা ফক্কড় অবশ্য ফোড়ন কাটতেও ছাড়ল না: ওই রকম বিধবা আমাদেরও যোগাড় করে দে সুধা। অমন বিধবা পেলে আমরাও বিদ্যাসাগরের শিষ্য হয়ে যাই। সুধাময় গম্ভীরভাবে বলল, ফেদি যে সুন্দরী এটা নিতান্তই অ্যাক্‌সিডেন্ট। বিয়েটা বড় নয় সুধাময়ের জীবনে, প্রিন্সিপ্‌ল্‌টাই বড়। বন্ধুরা সবাই হাততালি দিয়ে সমর্থন জানাল। তারাই চাঁদা তুলে বিয়ের এমন আয়োজন করে ফেলল যে, সুধাময় রীতিমত অবাক হয়ে গেল। আরও বিস্ময় বুঝি বাকি ছিল। দেশবন্ধু সেটা পূরণ করলেন। স্বয়ং হাজির হলেন তার বিয়েতে। আশীর্বাদ করলেন। উপহার দিলেন খদ্দরের জাতীয় পতাকা। পরদিন খবরের কাগজে বিয়ের খবরটা ছাপা হয়ে গেল: উদারচেতা যুবক কর্তৃক বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান।

চট করে ঘুম ভেঙে গেল সুধাময়ের। দেখল প্রচুর বেলা হয়েছে। চোখ তখনও জ্বালা করছে তার। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। ঘন ঘন হাই তুলল। এত বেলা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

সকাল যদি বা গেল, দুপুর আর যায় না। সুধাময় অস্থির হয়ে উঠল। এ বাড়িতে এখনও খাওয়া-দাওয়াই হয় নি কারও। লক্ষ্য করল, কত দেরিতে খাওয়া-দাওয়া হয় তাদের বাড়িতে। সময়টা যে কত মূল্যবান বস্তু তা কলকাতার লোকের মত বোঝে না এরা, এই সব পাড়াগেঁয়ে লোকেরা। তাই শুধু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতেই দিন কাবার করে দেয়।

কিছুক্ষণ ছটফটিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে সুধাময় নিজের ঘরে গিয়ে বসল। একখানা বই নিয়ে পাতা উল্টতে লাগল। একবর্ণও পড়তে পারল না। বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দরজা ভেজিয়ে দিল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে শুয়ে টানতে লাগল।

হঠাৎ দুম করে উঠে পড়ল সুধাময়।

রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে হাঁক দিল, মা, তোমাদের রান্না হল?

বড়বউ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। বললেন, ক্যান রে মণি, খিদে পায়েছে?

অসহিষ্ণু সুধাময় জবাব দিল, খিদের আর দোষ কী? কলকাতায় কোন্ কালে আমাদের খাওয়া হয়ে যায়। এতক্ষণ তো আমাদের টিফিন খাওয়ারও সময় হয়ে এল। রান্না হয়ে থাকে বল, চানটা করে নিই।

বড়বউ অপ্রস্তুত হলেন। আহা, বাছার বড্ড খিদে পেয়েছে। কিন্তু মাছ আনতে আজ এত দেরি করে ফেললেন বড়কর্তা যে, এখনও পর্যন্ত মাছটাই রান্না হয় নি। মুড়িঘণ্টা নামল কেবল। মাছটাও পাওয়া গিয়েছে ভালই। মেস বোর্ডিংয়ে কী খায় সুধা কে জানে? কেই বা আছে যত্ন করে খাওয়াবে? তাই পাঁচরকম রাঁধতে বসেছেন বড়বউ। কিন্তু এর মধ্যেই সুধা তাড়া লাগাতে আরম্ভ করেছে।

বড়বউ তাড়াতাড়ি বলেন, বোস্ না এখেনে। দুখোন মাছ ভাজে দিই, খা।

এবার সুধাময় চটে গেল রীতিমত।

বলল, ওসব হাবিজাবি খাওয়ার সময় আমার নেই। ভাত যদি হয়ে থাকে তো দাও। না হলে চিঁড়ে মুড়ি যা থাকে আনো। নিয়মের খাওয়া অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। অনিয়ম এখন সহ্য হবে না। পাংচুয়ালিটির মর্ম তোমরা জীবনেও কখনও বুঝবে না। যাক গে, আমি এখনই চান করে আসছি।

সুধাময় চলে গেল। বড়বউয়ের মনটা বিষণ্ণতায় ভরে উঠল। সুধাই যদি না খেল তবে ছিষ্টির রান্না কার জন্যে! সমস্ত শ্রম বরবাদ হয়ে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ও ফুলির মা, রান্না এখন থো। সুধার আমার খিদে পায়েছে খুব। থাকতি না পারে ছ্যান করতি গেল। আসে পড়ল বলে। তাড়াতাড়ি খানকয়েক মাছ ভাজে দ্যাও। আর ও-বেলার জন্যি সব তুলে রাখ।

আসলে খাওয়ার জন্য অত মাথাব্যাথা পড়ে নি সুধাময়ের। তার তাড়া অন্য কারণে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে এসে কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। দরজায় খিল এঁটে দিল। হ্যাঁ, এইবার সে নির্বিঘ্নে ভাবতে পারবে। যতক্ষণ তার খুশি। কেউ আসবে না তার চিন্তায় ব্যাঘাত জন্মাতে।

ফেদির কাছে যাবার আগে সে সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে নিতে চায়। সুধাময়ের সঙ্কল্প ঠিকই আছে। সে ফেদিকে বিয়ে করবে। এতে

আর নড়চড় নেই। এখন ফেদির মত হলে হয়। সেটা খুব সহজে পাবে বলে সুধাময়ের মনে হচ্ছে না। কলকাতার মেয়ে তো নয়, পাড়াগাঁয়ের কুসংস্কারেই ফেদি হয়তো আচ্ছন্ন। হয়তো সে সুধাময়ের প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি তুলবে। সুধাময় মনে মনে স্থির করল, তখন অকাট্য সব যুক্তি দিয়ে ফেদির অবৈজ্ঞানিক মনে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বীজ বপন করে দেবে। ফেদি তখন বুঝবে, কী অসার সংস্কার সে আঁকড়ে ধরে আছে। তখন নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত করবে ফেদিকে। ফেদি তখন আনন্দের সঙ্গে স্বেচ্ছায় এ বিয়েতে মত দেবে। শুধু বউই নয়, ফেদি হবে তার মন্ত্রশিষ্যাও। এই চিন্তায় বড় সুখ পেল সুধাময়। তার মনে পড়ল, অনেকটা এই রকম ব্যাপার যেন কোন একখানা ইংরাজী ছবিতে ঘটতে দেখেছিল। আদি খ্রীষ্টানদের উপর রোমানদের নিদারুণ নির্যাতনের কাহিনী নিয়েই ছবিখানি তোলা। এক সুন্দরী ক্রীতদাসীর মনে খ্রীষ্টের মাহাত্ম্য প্রচার করতে গিয়ে নবদীক্ষিত এক খ্রীষ্টান যুবককে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল সেই ছবিতে। কিন্তু প্রভুর কৃপায় সব বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে সেই যুবতীকে দীক্ষিত করেছিল। তারপর দুজনের মিলনের মধ্য দিয়ে ছবিটির সমাপ্তি ঘটেছিল। সুধাময় দেখল, সেই যুবকের সঙ্গে তার কেমন মিল হয়ে যাচ্ছে। ফেদিকেও যে সে তার আদর্শে দীক্ষা দিতে পারবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই তার। আদর্শ যে জীবনের থেকেও বড়, একথা ফেদিকে সে বোঝাতে পারবে বলেই তার দৃঢ় বিশ্বাস।

ফেদির সঙ্গে সে চিরকাল সুখে কাটাতে পারবে, ফেদি তার হবে, অথচ কোন কলঙ্কিত পথে চোরের মত তাকে হাঁটতে হবে না, এই সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুধাময়ের কাছে।

ফেদির মনটাই শুধু বদলে দেবে না সুধাময়, সে ঠিক করল বিয়ের পর তার নামটাও বদলে দেবে। ফেদি নামটা যে সুচারু নয়, বিশেষ করে যে মেয়েকে কলকাতায় থাকতে হবে, যে হবে সুধাময়ের বউ, সেটা এখন খেয়াল হল সুধাময়ের।

শুয়ে শুয়ে গা এলিয়ে আসছিল সুধাময়ের। তারপর প্রত্যেকটা সিদ্ধান্ত তার মনোমত হওয়ায় মানসিক উদ্বেগও কমে আসছিল। বড় বড় গোটাকতক হাই তোলবার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি এসে ঘুমের অতলে নিয়ে ফেলল সুধাময়কে।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বেলা শেষ হতে আর অল্পই বাকি। সুধাময়ের শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল। একটা বড় হাই তুলে সে পরম নিশ্চিন্তে হাত পা ছড়িয়ে আবার গা এলিয়ে দিল বিছানায়।

তারপর তার শিথিল মনে যেন বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল। তার না ফেদির কাছে যাবার কথা! সর্বনাশ! বেলা যে আর নেই। সুধাময়ের বুকটা শিনশিন করে উঠল। এক লাফে নেমে পড়ল খাট থেকে। খাবলা খাবলা জল মুখে চোখে ছিটিয়ে দিল। জামাটা গায়ে চাপিয়ে সে দ্রুতপদে বেরিয়ে পড়ল। উর্দ্ধশ্বাসে হাঁটতে লাগল ফেদির বাড়ির দিকে। বুক দুরদুর করছে অজানা এক আশঙ্কায়। যদি না থাকে ফেদি? সুধাময় যেন হাটের মাঝে মনিব্যাগ ভুলে ফেলে এসেছিল, মনে পড়তেই সেটা আনতে ছুটছে। কেন সে ঘুমিয়ে পড়ল এমন করে? এতক্ষণ ধরে কেন ঘুমোল? নিজেকে চাবুক মারতে ইচ্ছে করছে সুধাময়ের।

বেলা থাকতে থাকতেই সুধাময় ফেদির বাড়িতে পৌছল। তাকে দেখতে পেয়েই ফেদির বাবা হুঁকোয় টান মেরে বেদম কাশতে লাগলেন।

কাশিটা কোনমতে সামলে বললেন, আরে কিডা, সুধাময় না? আরে বাপ রে এত বড়ডা হয়ে গেছ? আমি ভাবি কিডা না কিডা? আসো আসো। বস। কবে আলে? থাকবা কদিন?

ফেদির বাবা! কখন এলেন? সুধাময়ের চোখ থেকে ঝপ করে সব আলো নিবে গেল। যে মাটিতে দাঁড়িয়ে ছিল সে, সেটাও সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল। ঠিক এই ব্যাপারটার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল সে। কী কষ্টে যে সামলে নিল সুধাময়, সেই জানে। বোকার মত খানিক হাসতে চেষ্টা করল। আন্দাজে আন্দাজে প্রণাম করল ফেদির বাবাকে। তারপর ধপ করে বসে পড়ল মাটিতেই।

সাড়া পেয়ে ফেদির মা ভিতর থেকে থপথপ করে বেরিয়ে এলেন। বাতে একেবারে কোলাব্যাঙের মত ফুলে গিয়েছেন ফেদির মা।

বললেন, ও মা, সুধা? তাই বল। আমি বলি সুধাময় আবার কিডা?

আবার বোকার মত খানিক হাসতে হল সুধাময়কে। প্রণাম করতে হল ফেদির মার গোদা পায়ে। এককালে ফেদির মতই সুন্দরী ছিলেন তিনি। তাকে দেখে আজ কেউ কি সে কথা বিশ্বাস করবে?

ফেদির মা ডাক দিলেন, ও ফেদি, ছাখ্ আসে, সুধা আয়েছে। আমরাও বাবা আজ দুপুরে আসে পৌঁছলাম। তীথ করতি গিছিলাম। তা তীথই বল আর যাই বল, বাড়ি আসে যেন হাঁফ ছাড়ে বাঁচলাম। ফেদি ক'ল কাল তুমাগের বাড়ি গিছিল। বুড়ির ছাওয়াল নাকি বড় সুন্দর দেখতি হয়েছে? যাব একদিন দেখতি। তা বুড়ি যাবে কবে?

সুধাময় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। ফেদি আছে, কাছাকাছিই আছে। কিন্তু কাছে আর নেই। কাছে হয়ত আসবেই না আজ। আসছেও না। সবাই মিলে সুধাময়কে কেমন বোকা বানিয়ে ছেড়েছে। কী যেন একটা জিজ্ঞাসা করলেন ফেদির মা।

ভাল করে না বুঝেই সুধাময় জবাব দিল, বেশ তো, কালই যাবেন একবার।

ফেদি খুব নরম স্বরে ডাকল, মা, শোন।

ফেদির স্বর সুধাময়ের দেহে যেন ঝঙ্কার তুলল। রোমাঞ্চ হল তার দেহে।

ফেদির মা বললেন, বস বাবা, এট্টু পিস্‌সাদ খায়ে যাও। ও ফেদি, সন্ধ্যে লাগল। পিদিম দে মা। তারপর সুধারে একটু মহাপিস্‌সাদ দে। বেরো না, সুধারে আবার লজ্জা কী?

ফেদি তাকে লজ্জা পাচ্ছে? তাই বেরুচ্ছে না? সুধাময়ের খুব মজা লাগল। ফেদি তো আচ্ছা।

ফেদির বাবা হুঁকো টানতে টানতে আর কাশতে কাশতে দীর্ঘ এক ভ্রমণ-কাহিনী ফেঁদে বসলেন। পথের কষ্ট, পাণ্ডাদের অত্যাচার, আরও নানা ব্যাপার। সব কানেও ঢুকল না সুধাময়ের।

বুঝলে বাবা, খাওয়ার সুখ যদি বল তো তা হল কাশীতি। অ্যাঃ, যেমন মাছ মাংস, তেমন দুধ ঘি আর তেমনিই তরি-তরকারি। কাশীর কাছে কেউ না। ব্যোম ভুলানাথের জায়গা তো। পৃথিবীর বাইরি।

এইটুকু শুধু শুনেছিল সুধাময়। তারপর যে মুহূর্তে ফেদি সন্ধ্যে-বাতি দিতে বেরল, তার মন তার চোখ ফেদির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। কাল সে যেন ভাল করে দেখেই নি ফেদিকে। এখন নতুন করে তাকে দেখতে লাগল সুধাময়। তুলসীতলায় জলের ছিটে দিচ্ছে ফেদি, গলায় আঁচল দিয়ে তাদের দিকে পিছন ফিরে গড় হয়ে প্রণাম করছে, প্রদীপ দেখাচ্ছে। আর এক এক সময় ফেদির দেহের এক-একটা অংশের উপর দৃষ্টি পড়ছে সুধাময়ের। সে মুগ্ধ হয়ে দেখছে। পিঠ, কোমর, নিতম্ব প্রতিটি অংশ ওর কত সুগঠিত, কী অসাধারণ

সুন্দর! ফেদির হাঁটা চলায়, পৈঁঠে বেয়ে এক-একটা ঘরের বারান্দায় ওঠানামায় কত রকম ছন্দ যে ফুটে উঠছে ওর দেহে, তার যেন কোন সীমা সংখ্যা নেই। বুক ঢিপ ঢিপ করছে সুধাময়ের। একবারও কি আজ নিরিবিলিতে দেখা হবে না? একটা কথাও কি বলবে না ফেদি? একটিবারের জন্যও...

সুধাময়কে প্রসাদ খেতে দিল ফেদি। জল দিল। কিন্তু একবারও তার চোখে চোখে চাইল না। সে যে সুধাময়কে চেনে, কোনদিন দেখেছে, ফেদির চালচলনে, মুখ-চোখের ভাবে তা একদম প্রকাশ পেল না। খেতে দেবার সময়েই বোধ হয় নিকটতম সান্নিধ্যে এসেছিল তারা। কিন্তু এই সান্নিধ্যে তো কোন আহ্বান জাগল না? সুধাময় উত্তরোত্তর বোকা বনে যেতে লাগল, উত্তরোত্তর হতাশ হতে লাগল।

তারপর আবার অনেকক্ষণ দেখা পাওয়া গেল না ফেদির। এ পৃথিবীতে ফেদি বলে যেন কেউ নেই, কখনও ছিল না, এমন মনে হতে লাগল সুধাময়ের। তারপর অকস্মাৎ ফেদির আবির্ভাব হল। হাতে তার ছোট একটা পোঁটলা।

ফেদি বলল, এই প্রথম আজ কথা বলল সুধাময়ের সঙ্গে, বাড়ি যাও সুধাদা। এই পিস্‌সাদ ন্যাও। মা দিল। খুড়িরি ব'ল। চল, তুমারে আলোটা ধরে দিই।

এ কেমন কথার ঢঙ ফেদির? এ কেমন কাঠ-কাঠ ব্যবহার? সুধাময় হাত পেতে পোঁটলাটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ফেদির বাবা বললেন, সুধাময়, সুমায়-টুমায় পালি আরেকদিন আসো, কেমন?

সুধাময় ঘাড় নেড়ে এগিয়ে চলল। দরজার মুখে আসতেই ফেদি ফস করে একখানা চিঠি সুধাময়েব হাতে গুঁজে দিয়েই ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। চিঠিখানা মুঠো করে ধরতেই চনচন করে রক্তের বেগ বেড়ে গেল সুধাময়ের। থরথর সেই কাঁপুনি আবার ফিরে এল তার শরীরে। চিঠি নয়, যেন ফেদিকেই মুঠোর মধ্যে পেয়েছে সুধাময়।

এক ছুটে বাড়ি এল সুধাময়, ঢুকে গেল নিভৃতে তার ঘরে, সে কি এই জন্য? তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ পড়বার জন্য? কাঁপা-কাঁপা হাতে দলা-পাকানো চিঠিখানা খুলে পড়েছিল সুধাময়। দু লাইনের চিঠি। পড়া শেষ করে ফ্যাকাশে মুখে সেই থরথর করেই কাঁপতে লাগল আবার। এই দুই কাঁপুনির

মধ্যে কী আকাশ-পাতালই না ব্যবধান! একটা পুলকের শিহর, অন্যটা অসহ্য যন্ত্রণা। ফেদি লিখেছে, 'আসতে লজ্জা হল না? আমার সর্বনাশ করার জন্য এত উৎসাহ কেন?' দুটি মাত্র ছত্র। যেন দুটি শেল। অব্যর্থ লক্ষ্যে তার মর্মে গিয়ে বিঁধল। লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে সুধাময় মৃতপ্রায় হয়ে উঠল।

চিঠির যা ভাষা তাতে একথা স্পষ্ট যে, ফেদি সব দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। 'আসতে লজ্জা হল না?' যেন সুধাময় বিনা আহ্বানে সেখানে গিয়েছে। 'আমার সর্বনাশ করার জন্য এত উৎসাহ কেন?' মিথ্যাবাদী। সুধাময় যেন গর্জন করে উঠল। চিঠিখানাকে উঁচু করে ধরে সে বিড়বিড় করে বলল, একথা বলতে কি একটুও বাধল না? লজ্জা হল না তোমার? আমি কি তোমার হাত ধরে টেনেছিলাম? ঘরে নিয়ে খিল দিয়েছিলাম যে আজ আমার ঘাড়ে সব অপরাধ, সব পাপের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তুমি সতী সাজছ। আমার সম্পর্কে এই তোমার ধারণা! এত খারাপ! অথচ তোমাকে আমি কী ভেবেছিলাম। কত উঁচুতে তুলেছিলাম। আমি কোন পাপ-মন নিয়ে আজ তোমার কাছে যাই নি। আমার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। ঈশ্বর জানেন, একটা আদর্শ নিয়ে তোমার কাছে গিয়েছিলাম। মুহূর্তের দুর্বলতায় যে পাপ করে ফেলেছি, চিরতরে তার থেকে মুক্ত হবার পথ দেখাতে তোমার কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি, তুমি কী! তুমি নীচ, তোমার মন অতি ছোট, কোন মহৎ ধারণা তোমার অন্তরে নেই, তাই তুমি আমাকে এমন যাচ্ছেতাই কথা বলতে পারলে। কিন্তু তুমি যা ভাবছ, আমি তা নই, তা নই। তোমার সর্বনাশ করতে আমি যাই নি। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর। চিঠির একটা কোনা ধরে প্রাণপণে ঝাঁকাতে লাগল সুধাময়। রাগে জ্বলতে লাগল। তার বুকে এক তীব্র যন্ত্রণা বোধ হতে লাগল। ছি-ছি, ফেদি এমন ছোট! এত নীচ, এমন পাজী! আর সেই ফেদিকে নিয়ে সে এক সুখের প্রাসাদ গড়তে শুরু করেছিল! কী বোকা সুধাময়! যদি একা পেত ফেদিকে, তা হলেও না হয় সুধাময় তাকে বোঝাতে পারত, সত্যিই কোন বদ মতলব তার ছিল না। কিন্তু তা তো হবে না। সে আর একা কখনই ফেদির দেখা পাবে না। প্রয়োজনই বা কী? কে ফেদি? একটা অতি বাজে মেয়ে। সুধাময়কে নিয়ে অনায়াসে যেমন কাণ্ড সে করেছে, তেমন কাণ্ড সে আর কারও সঙ্গে করে নি, তার ঠিক কী? সোমত্থ বিধবা, তায় আবার এত রূপ। গ্রামে এই ধরনের লোকেরও অভাব নেই। তারা এতদিন

ওকে আস্ত রেখেছে! হুঁ! চিঠিখানা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলল সুধাময়। পারলে হয়তো ফেদিকেও ছিঁড়ত।

সর্বনাশ হয়েছে তার। ফেদির স্পর্শে সুধাময়ের দেহেই পাপ ঢুকে গেছে। কী করবে সে? কিসে সে পরিত্রাণ পাবে? যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল সুধাময়।

সারারাত ধরে সে এমন ছটফট করল। ভোর হতে-না-হতেই ঠিক করল আজই সে কলকাতায় ফিরে যাবে। আর এখানে থাকবে না। এক মুহূর্তও না।

কিছুতেই থাকল না সুধাময়। বলল, বিশেষ জরুরী কাজ, না গেলেই নয়। গোটা পরিবারকে হতভম্ব বানিয়ে, মার চোখে জল ঝরিয়ে বাড়ির গরুর-গাড়ি করে সে দশটার মধ্যেই রওনা দিল। এ গ্রামের বাতাসে বাতাসে অসভ্য উদ্দামতা, অবিশ্বাস আর প্রবঞ্চনা। এখানে থাকলে আত্মহত্যা ছাড়া পথ থাকবে না। আর না হয় সে পাগল হয়ে যাবে।

বাইরে ফাঁকা রাস্তায় এসে কিছুটা হাঁফ ছাড়ল। সামনে তার সোজা শড়ক। আকাশ অনেক উঁচুতে। পরিসর অনেক বিস্তৃত। দম ফেলবার অবকাশ পেল সুধাময়। বিকাল নাগাদ ঝিনেদা পৌঁছে যাবে। তারপর প্রথম রাত্রে চুয়াডাঙা। কাল এমন সময় সে কলকাতার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কিন্তু ফেদি? ফেদির কথা আবার মনে পড়ল কেন? না না, তার কথা আর ভাববে না সে। কখনও না, কখনও না।

বিকালে ফেদি মাকে সঙ্গে নিয়ে সুধাময়দের বাড়িতে এসে দেখে, সকলেরই মুখ ভার-ভার। সে আর থাকতে পারে নি। কাল বাবা মা হঠাৎ এসে পড়ায় তার মাথা প্রায় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সুধাময় এসে পড়লে কী মনে করবে তাঁরা, যেন ধরা পড়ে যাবে ফেদি, সেই ভাবনায় সে অস্থির হয়ে উঠেছিল। সারাদিন প্রার্থনা করেছিল সুধাময় যেন না আসে। বিকেল প্রায় পেরিয়ে গেলেও যখন সুধাময় এল না, তখন সে একটু হাঁফ ছাড়ল। আর তার একটু পরেই উদ্‌ভ্রান্তের মত সুধাময় এসে হাজির। ফেদির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সুধাময়ের উপর বেজায় রেগে গেল। কী এই লোকটা! আবার আজ এসেছে? ভয় ডর নেই। লালসা তো কম নয় ওর! ঘৃণা হয়েছিল নিজের উপর, ঘৃণা করেছিল সুধাময়কে। তাই জ্ঞানগম্যি হারিয়ে

অমন কড়া একটা চিঠি দিয়েছিল। তারপর সারা রাত ধরে বড় কষ্ট পেয়েছে নিজের মনে। সত্যিই, সুধাদার কী দোষ? দোষী তো সে নিজেই। ভাল কথায় বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তার। কাল অবশ্য সময় ছিল না। তাই সারা দুপুর ধরে ফেদি গুছিয়ে একখানা চিঠি লিখেছে। নিজের দোষ অকপটে স্বীকার করেছে। সুধাদা যেন তাকে ক্ষমা করেন। আর যেন দুজনের দেখা না হয়।

ফেদির মাকে দেখে চোখ ছলছল করে উঠল বড়বউয়ের। খপ করে বসে পড়ল ফেদির মা। আসতে তার বড় কষ্ট হয়েছে।

বললেন, কি লো বউ, কেমন আছিস? মুখখানা ভার ভার ঠেকতিছে ক্যান?

বড়বউ বললেন, আসো দিদি, বস। দুঃখির কথা আর কী কব। সুধা বাড়ি আলো দু বছর পর। তেরাত্তিরও থাকল না, আজ সকালে কলকাতায় চলে গেল। আজকাল কলকাতার বাবু হয়েছে, বাড়ির ভাত আর মুখি রোচে না। এত ব্যাগ্‌গাতা করলাম আর দুটো দিন থাকার জন্যি। তা আমরা তার কিডা? দাসী বাঁদী বই তো নই।

বড়বউ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। .ফদি চমকে উঠল। সুধাদা চলে গেছে? তবে কি তার কারণেই গেল? সেই চিঠিখানা পেয়ে? ফেদির হৃৎপিণ্ডটা শক্ত মুঠিতে কে যেন চেপে ধরল। দম বন্ধ করে কে যেন মেরে ফেলবে তাকে। সুধাদা নেই? আর একবার তার দেখা পেল না? তার মনের কথাটা না শুনেই চলে গেল সুধাদা?

ফেদির মা বললেন, সে কী, কাল যে দেখা হল সুধার সঙ্গে। কতক্ষণ গল্প করল বসে বসে। কই কিছু তো তখন ক'ল না।

বড়বউ চোখ মুছে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, আমাদেরউ কিছু কয়েছে নাকি কাল? সকালে ঘুমির থে উঠেই ক'ল, চললাম। চললাম বললি তো আর অপিক্ষে নেই। সঙ্গে সঙ্গেই পিরায় যায়। কোনমতে দুডো ভাত রাঁধে মুখি তুলে দিলাম। এতদিন পরে আলো, এটটু খাওয়াব-দাওয়াব, তা কপাল।

ফেদি আর সেখানে বসল না। বসতে পারছিল না। চোখ জ্বালা করছে। বুকের খাঁজে লুকনো চিঠিটা বুক যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে। সে চট করে সুধাময়ের ঘরে চলে গেল। দরজাটা কোনমতে ভেজিয়ে দিয়ে পরিত্যক্ত

বিছানার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। মনে মনে প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল, যেন ফেদির মনের আওয়াজ সুধাময়ের কানে গিয়ে পৌঁছবে: ও আমি অন্যায় বলিছি সুধাদা, ও আমার মনের কথা নয়। ও কথা সত্যি নয়, সত্যি নয়।

পঁচিশ

অবশেষে ভূষণ এল।

ঘোড়ায় নয়, চকচকে একখানা সাইকেল চড়ে। ওখানা ভূষণ সদ্য সদ্য কিনেছে। হারকিউলিস বাইক, উইটকপের ঘোড়া-মুখো সীট আর ডানলপের টায়ার টিউব। ভূষণের মতে বাইক সম্পর্কে শেষ কথা এই। বি এস এ কি র‍্যালে কি হাম্বার, ওগুলোও ভাল, কিন্তু ওসব শৌখীন লোকেদের জন্য। তার মত পাড়াগেঁয়ে ডাক্তারের উপযুক্ত সাইকেল এই হারকিউলিস। কাঁচা রাস্তা, মাঠের আল, বেশির ভাগ সময় এইসব পথেই তো তার যাতায়াত। হারকিউলিসের শক্তিই লাগে এ পথে সাইকেল ঠেলতে।

বেশ মৌজেই চালিয়ে আসছিল সাইকেল। বুনো পাড়ার মুখে আসতেই শ্বশুরের সঙ্গে দেখা। একেবারে চোখাচোখি। ভূষণ তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে নেমে পড়ল সাইকেল থেকে। শ্বশুর আর জামাই, দুজনের মুখেই হাসি ফুটে উঠল।

ভূষণ কিঞ্চিৎ মুশকিলে পড়ল। তার সামনে শ্বশুর হাতে সাইকেল। প্রণাম করে কি ভাবে? নাঃ, সাইকেলের সঙ্গে অটোমেটিক একটা স্ট্যাণ্ডও থাকা দরকার। চাবি টিপে দিলাম অমনি দাঁড়িয়ে রইল সাইকেল। ইচ্ছেমত তখন প্রণাম কর কি অসুবিধে হলে জিরিয়ে নাও একটু। কাছাকাছি একটা শক্ত গাছও নেই যে ভূষণ সাইকেলটাকে ঠেস দিয়ে রাখবে। কি আর করে, রাস্তার উপরেই শুইয়ে দিল সাইকেলখানা। প্যাডেলে চাপ লাগায় পিছনের চাকাটা পনপন করে ঘুরতে লাগল একটানা শব্দ তুলে। গোল বেলটা ক্লিলিলিং ক্লিলিলিং শব্দে বেজে উঠল।

মেজকর্তার পায়ের ধুলো নিল ভূষণ।

মেজকর্তা বললেন, খবর সব ভাল তো? বাড়ির সব ভাল আছেন? বেয়ান ঠাকরুণ?

ভূষণ বশংবদের মত ঘাড় নেড়ে সব কথার জবাব দিয়ে গেল। প্যাডেলের কোণায় আর ফুটপিনে কাদা লেগে গিয়েছে। শ্বশুরের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি থাকা সত্ত্বেও ভূষণের মনটা ওই কারণে খুঁত খুঁত করতে লাগল।

মেজকর্তা বেরচ্ছিলেন। বেলা দশটা সাড়ে দশটা। কিন্তু আজ আর বেরুনো হল না। জামাইকে নিয়ে ফিরলেন।

চাঁপার সঙ্গে গিরিবালার একটু খিটিমিটিই বেঁধে গেল। ওটার কোন জ্ঞানগম্যি হল না আজ পর্যন্ত। বিরক্ত হল গিরিবালা।

সে তার তোরঙ্গ গোছাতে বসেছিল। দুদিন ধরে গিরিবালা তার ভাল ভাল জামা কাপড় তোরঙ্গ থেকে বের করে রোদে দিয়ে শুকিয়ে রেখেছে। তোলা আর হয়ে উঠছিল না। আজ জোর করেই বাক্সটা নিয়ে বসল। ভাল ভাল শাড়ী জামা তার নিতান্ত মন্দ নেই। সব উপহার পাওয়া। এ দুখানা তার মার শাড়ী। একখানা মুর্শিদাবাদী, অন্যখানা বেনারসী। মা বোধ হয় বিয়ের সময়েই পেয়েছিল। কিন্তু পরে নি। অন্তত গিরিবালা তার মাকে কখনও এসব পরতে দেখি নি। পাট করে তোলা ছিল। বেনারসীখানার রং একটু জ্বলে গিয়েছে, মুর্শিদাবাদীখানা পোকায় কেটেছে। কলকাতার ভাসুরের দেওয়া জামদানী, যশোরের ভাসুরের দেওয়া কটকি, কাকিমার দেওয়া ভাগলপুরি, শ্বাশুড়ির দেওয়া ফরাসডাঙ্গাই, সব এই বাক্সেই পড়ে থাকে। কখনও পরে না গিরিবালা। এসব তার যক্ষের ধন। মাঝে মাঝে, তাও হয়ত বছরে দু তিনবার বের করে, নেড়েচেড়ে দেখে, রোদে দেয় আবার ঝেড়ে ঝুড়ে তুলে রাখে। বড় জোর নাকের ডগায় ধরে একটু একটু শোঁকে। কালোজিরের গন্ধের সঙ্গে শাড়ির গন্ধ মিশে যে এক অদ্ভুত গন্ধ বের হয় তার ঘ্রাণ বড় ভাল লাগে গিরিবালার।

বাক্স খোলার সময় সে কাউকে কাছে থাকতে দিতে চায় না। কারোর সামনে সে পারতপক্ষে বাক্স খুলতে চায়ও না। একবার শ্বশুর-বাড়িতে বাক্স খুলেই তার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। এক ভাসুর-ঝি তার অমন ভাল টাঙ্গাইলখানা দেখতে নিয়ে আর ফেরৎ দেয় নি। কিছু বলতে সে ভরসা পায় নি। তবে মর্মান্তিক কষ্ট পেয়েছিল।

এসব জিনিস সে পরে না, পরতে পায় না। কোথায় পরবে? শোবার ঘর থেকে রান্নাঘরে তো আর পোশাকী কাপড় পরে যাওয়া যায় না। বিয়ের পর সে কোথাও তো যায় নি। এমন কী পাড়া বেড়াতে কবার গিয়েছে তাও এক আঙুলে গুনে বলে দিতে পারে। বাপের বাড়ি এইবার নিয়ে এই তিন বছরে চারবার এল।

কাজেই ভাল ভাল জিনিষ পরার সুযোগ কই তার। তা না পরুক সে, তার জিনিষ তার কাছেই থাকুক! যেভাবে খুশি। অন্যেরা তাতে হাত দেবে কেন? তাই চাঁপার উপর চটে গিয়েছিল। চাঁপা অবশ্য শাড়িটাড়িতে হাত দেয় নি। তার লোভ গিরিবালার গন্ধদ্রব্যগুলোর দিকে। ওগুলো তো আরও দুষ্প্রাপ্য। সেই বিয়ের সময় এক সেট কে যেন উপহার দিয়েছিল। ফুলশয্যার দিন ভাসুর-ঝিরা তাকে একটু একটু মাখিয়ে নিজেরা খাবলা খাবলা মেখেছিল। ওই সব গায়ে মেখে প্রথম দিকে একটু অস্বস্তি, একটু বাধ বাধ লাগলেও, শেষ পর্যন্ত কিন্তু গিরিবালার কেমন একটা ঘোর লেগে গিয়েছিল। আরও কয়েকবার মাখবার সাধ ছিল। কিন্তু আর একদিনও সে সুযোগ গিরিবালা পায় নি। অনেকগুলো জিনিসও লোপাট হয়ে গেল। মুখে-মাখা সেই হিমানী, তার কৌটোটা আর পাওয়া গেল না, সেই গন্ধ পাউডার, সেটাও গায়েব হয়ে গেল।

তার উপহারের বাক্সটার প্রায় সব খোপগুলোই এখন খালি। এককোনে ছয়কোনা কাঁচের ছিপিওয়ালা একটা 'এসেন্টের' শিশি পড়ে আছে তার খোপে। এককোঁটা এসেন্টও তার মধ্যে নেই। ভাল করে ছিপি না আঁটায় খানিকটা বাক্সে পড়েছে আর খানিকটা উবে গেছে। কিন্তু তার মিষ্টি গন্ধটা এখনও আছে। বাক্সের ডালাটা খুললে এখনও নাকে লাগে। আর, সেই বাক্সের মধ্যে গিরিবালা একটা অগুরুর শিশি কোনমতে ঢুকিয়ে রেখেছে। সেই শিশির প্রতিই চাঁপার লোভ। বড্ড হ্যাংলা হচ্ছে মেয়েটা। সে একমনে বাক্স গুছোচ্ছে আর সেই ফাঁকে অগুরুর শিশিতে হাত বাড়িয়েছে চাঁপা। ভাগ্যি সে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছিল, নইলে নির্ঘাৎ নিয়ে পালাত।

গিরিবালা ধমকে উঠল, এসব জিনিসি তোর কী দরকার, অ্যাঁ। নোলা একেবারে সক্‌সক্‌ করতিছে।

আচমকা ধরা পড়ে চাঁপা প্রথমে থতমত খেয়ে গিয়েছিল। তারপর

অনুনয় বিনয় আরম্ভ করল। তারপর হাতে পায়ে পড়তে লাগল। দেখল দিদি এ ব্যাপারে বড় সেয়ানা।

তুই এমন চামায় ক্যান রে? একটু দেখতি চাচ্ছিলাম, আমি কী খায়ে ফ্যালাতাম।

গিরিবালার মাথায় আগুন চড়ে গেল।

যত বড় মুখ না, তত বড় কথা। লাই পায়ে তুমার বড্ড বাড় বাড়িছে, না। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।

চাঁপার চুল ধরে আচ্ছা করে নেড়ে দিল গিরিবালা।

চাঁপা খরখর করে উঠল, তুই আমার গায়ে হাত তুললি! তোর ওই হাতে পোক না পড়ে তো কী বলিছি। কুড়িকুষ্টি হবে তোর। হবে, হবে, হবে। এই তিন সত্যি করলাম।

গিরিবালা বলল, ছাখ চাঁপা, ইবার সত্যি সত্যি মার খাবি কিন্তু। বড়মায়ে বলে দেব?

চাঁপা বুড়ো আঙুল নাচিয়ে বলল, তুই করবি আমার কলা।

গিরিবালা বিয়ে হয়ে যাবার পর যা করে নি, তাই করল। রাগ সামলাতে না পেরে ঠাস করে চাঁপার গালে এক চড় মেরে বসল। আর তুদিন পরে তো বিয়ে হবে, সভ্যতা শিখল না মেয়েটা। চড় খেয়ে চাঁপা অবাক হয়ে গেল। দিদি যে সত্যি সত্যিই মারবে ও ভাবে নি।

তৎক্ষণাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। সত্যিই দিদি ওকে মারল, মারতে পারল! এই আড়ি আড়ি। জন্মের মত আড়ি। জীবনেও সে আর কথা বলবে না দিদির সঙ্গে।

বাইরে থেকে মেজকর্তা ডাকলেন, চাঁপা।

মেজকাকা এসেছেন। ঠিক হয়েছে। এইবার দেখাচ্ছি দাঁড়াও। বড় হয়ে ভেবেছ, কি না কি হয়েছ। এবার টের পাওয়াচ্ছি। ফোঁপাতে ফোঁপাতে চাঁপা বাইরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এল।

দিদি রে জামাইবাবু!

বলেই ছুট দিল ভিতরের দিকে। গিরিবালা চমকে উঠল। কে? ভূষণ! সে হকচকিয়ে গেল। কি করবে বুঝতে পারল না। ঢকাশ করে বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে দিল। যেন এইভাবেই সে তার সমস্ত অস্থিরতাকে ঢেকে রাখবে। গিরিবালা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। ঘোমটা

চাঁপা ততক্ষণে ভয়ানক চেঁচামেচি করতে লেগেছে।

ও বড় মা, ও পিসীমা, ও কাকীমা, জামাইবাবু আয়েছেন।

ভিতরবাড়ির সাড়াশব্দ মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। চট্‌চট্ করে ঘোমটা উঠতে লাগল সকলের মাথায়। নিঃশব্দে উল্লাসের ঢেউ ছড়িয়ে পড়তে লাগল মনে মনে। জামাই—জামাই এসে গেছে। বাব্বাঃ, কতদিন পরে এল ভূষণ!

খবরটা ছড়িয়ে যেতে দেরি হয় নি। এ-পাড়া ও-পাড়ার পুরুষ মহল দুপুরের আগেই এসে গিয়েছে। বারবাড়িতে বিস্তর তামাক পুড়ছে। জটলা হয়েছে। সরকার মশাই, পুরুত মশাই, খান কবিরাজ, বুদো ভূয়ে—এসেছেন সবাই। ভূষণের কুশল, বাড়ির খবর আগ্রহ করে জিজ্ঞাসা করেছেন, ভূষণের কাজকর্মের খবর নিয়েছেন। ভূষণ কোটচাঁদপুরে আছে শুনে, সেখানে এদের যেসব পরিচিত লোক আছে, তাদের তত্ত্ব-তল্লাশ এরা নিয়েছেন। নানারকম স্মৃতি-কথা শুনিয়েছেন ভূষণকে। সমালোচনাও হয়েছে কোটচাঁদপুরের লোকেদের।

ভূষণ মন দিয়ে সব শুনেছে। অতি বিনীতভাবে দু-এক কথার জবাবও দিয়েছে। সে দেখল, এরা যে কোটচাঁদপুরের কথা বলছেন তার সঙ্গে আসল কোটচাঁদপুরের কোন মিল নেই। অবশ্য ভূষণ সে কথা প্রকাশ করল না। বরং ওদের খুশী করার জন্য দু-একবার ওদের কথাতেই সায় দিয়ে গেল।

ভূষণ এসেছে বলেই তাকে নিয়েই যে এই সভা, সে যে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি, সে সম্পর্কে ভূষণ সচেতন হল। নড়েচড়ে বসল। সময়োচিত গাম্ভীর্য আনবার জন্য ভূষণ নানাভাবে তার মনটাকে নাড়াচাড়া করতে লাগল। তবুও ওর মনে হতে লাগল, না, যথেষ্ট হল না, তেমনভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। মন তাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছে না। হ্যাঁ, হয়েছে। ভূষণ জামাই-জামাই ভাবটাকে এবার একটু পিছনে সরিয়ে দিয়ে তার ডাক্তার সত্তাটাকে সামনে এনে ফেলল। এরা যেন সব আপন আপন 'কেস' বিবৃত করে যাচ্ছেন, আর সে সিম্পটমগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। সরকার মশাই যেভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন, তা দেখে ভূষণের পালসেটিলা থার্টির কথা মনে পড়ছে। বুদো ভূঁয়ের বকবকানিতে মনে হল নাক্সভোমিকার কথা।

বুদো ভূঁয়ে, ভৌমিক, ভোমিকা, আরে এ তো দারুণ মিল! কখনও তো খেয়াল হয় নি। একটা গবেষণার গন্ধ পেয়ে গেল ভূষণ। অন্য লোকের কাছে এটা হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু ভূষণের কাছে এসব সূত্রের মূল্য

অসাধারণ। এই সূত্র ধরে ভূষণ যদি চলতে থাকে গবেষণার জটিল পথে কে জানে সে হোঁচট খেতে খেতে একদিন কোনও এক মহাসত্যে পৌঁছে যাবে কি না। সেই সত্য প্রচার করবে ভূষণ এই পৃথিবীতে। লক্ষ কোটি মানুষ উপকৃত হবে। বুধো ভূঁয়ে, ভৌমিক, ভোমিকা, নাক্সভোমিকা। মানুষ আর ওষুধ বা ওষুধ আর মানুষের সঙ্গে কেমন এক নির্ভেজাল সম্পর্কের সন্ধান পেয়ে গেল ভূষণ। একটা ইঙ্গিত কে যেন তাকে ধরিয়ে দিল। এই যে পৃথিবীর পরিবর্তন হয়েছে, বিবর্তন হয়েছে, শূন্য থেকে বিচিত্র সৃষ্টি, অচেতন থেকে চেতন, জড় থেকে জঙ্গম, কীট থেকে মানব, গুহা থেকে আধুনিকতম শহর—কে জানে, এই রহস্যের চাবি বুধো ভূঁয়ে আর নাক্সভোমিকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের মধ্যে লুকিয়ে আছে কি না? যে বীজ নাক্সভোমিকার জন্ম দিয়েছে সেই বীজই নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বুধো ভূঁয়ে রূপে হয়ত আত্মপ্রকাশ করেছে। একই পারিবারিক বন্ধনে ওরা পড়েছে বাঁধা।

ভূষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুধো ভূঁয়েকে দেখতে লাগল। এ যেন এক নতুন বুধো। নাক্সভোমিকার জ্ঞাতি। মাসতুতো ভাই।

বুধো ভূঁয়ে একগাল হেসে বলল, অমন ভুলুক দিলি হবে কী? এ-বান্দা শুধু মুখি ফেরবে ভাবিছেন? খাওয়া-দাওয়ার একটা ব্যবস্থা করতি হবে ডাক্তার।

বড়কর্তা বললেন, আরে নিশ্চয়, নিশ্চয়। বুধোর আমাগের দৃষ্টিটা বড় সরেশ। মহি, বুধোর কথাটা তো রাখতি হয়। কী বল? তাহলে পরশু, পরশু দুপুরে একবার পদধূলি দেবেন আপনারা।

হ্যাঁ, এই হল পাকা ব্যবস্থা।

সরকার মশায় বলে উঠলেন।

এখন তাহলি উঠা যাক। বেলা যে গড় মারতি লাগিছে।

সভা ভঙ্গ হল। বাইরের ঝামেলা কমল। রান্নাঘরে তখন দারুণ ব্যস্ততা। বড়বউ আর ফুলির মা বিরাট আয়োজন করে বসেছেন। শুভদারও ফুরসত নেই নিরামিষ-ঘরে।

কী খাওয়াবেন জামাইকে? মাছ মাংস খায় না। তবে? বড়বউ ফাঁপরে পড়েছেন। এক-একবার নিরামিষ-ঘরে যাচ্ছেন, পরামর্শ করছেন শুভদার সঙ্গে, আবার এসে রাঁধতে বসছেন। সুধাময় চলে যাওয়ায় মনে যে ব্যথা পেয়েছিলেন, ভূষণ এসে সেটা আপাতত ভুলিয়ে দিয়েছে।

ছোটবউ আঁকড়ে ধরেছেন গিরিবালার ছেলেকে। একমাত্র তিনিই বিরক্ত হয়েছেন ভূষণ আসায়। এত কী তাড়া ভূষণের? এইটুকু কচি ছেলেকে নিয়ে যে যাবে, হ্যাঁ, নিয়ে যেতেই তো এসেছে, এই ছেলে এতদূর পথ যেতে পারে? ওর কি হাড়-গোড় কিছু শক্ত হয়েছে নাকি? ডাক্তার হয়ে এই সামান্য জ্ঞানটুকু হয় নি ভূষণের? গাড়ির ঝাঁকুনিতেই তো হাত-পা ভেঙে যেতে পারে। বালাই ষাট।

ও সওদাগর, তুমি এবার চলে যাবে?

ছোটবউ বিছানায়-শোয়া শিশুটির মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনলেন। তিনি ওর নাম রেখেছেন ধনপতি, ধনপতি সওদাগর। সুন্দর নাম। তা না, কলকাতার বাবু (সুধাময়কে লক্ষ্য করে বললেন) এসে নাম রাখলেন, শঙ্খ। কী ছিরির নাম! আহা!

ধনপতি সওদাগর, ও ধনপতি সওদাগর! তোমার বুঝি কাজ মিটেছে! এই বন্দরের সব বেসাতি বুঝি তোমার সপ্তডিঙায় বোঝাই করে ফেলেছ! এবার দেশে ফিরবে, কেমন? সব কি নিয়েছ?

ছোটবউয়ের মুখের দিকে চেয়ে সে হাসছে। খুব হাসছে, মাঝে মাঝে খলবল খলবল করে উঠছে বিছানায়।

খুব যে ফুর্তি দেখছি। অত হাসি কিসের? ধনপতি সওদাগর সপ্তডিঙা মধুকর! তোমার মধুকরে আমাকে বুঝি নেবে না? নেবে না?

আবার সে হাসছে। খুব হাসছে। চোখ মুখ বেয়ে তার নধর দেহটায় হাসি ছড়িয়ে পড়ছে। মহা উল্লাসে ছোট ছোট হাত দুটো, ছোট ছোট পা দুটো ছুঁড়তে লেগেছে।

বুঝেছি, আমাকে নেবে না। নেমকহারাম, বড্ড নেমকহারাম তুমি।

ছোটবউয়ের বুকে হা-হা-করা এক বাতাস বয়ে গেল। ব্যথায় বেদনায় মুখে এক ছায়া পড়ল। চুপ করে বসে রইলেন, একদৃষ্টে শিশুটির দিকে চেয়ে। সে হাসতেই থাকল।

পাড়াপড়শী মেয়েদের ভিড় হল বিকেলে। বাড়িটা ভরে গেল। পান সাজতে সাজতে ফুলির মার হাত ধরে এল।

চরম বিপদে পড়ল গিরিবালা। তার আর লুকোবার জায়গা রইল না। কী দেলে রে ছেলের মুখ দেখে? ওলো, জামাই দেছে কী?

চাঁপা কোন রকমে ঘুমন্ত ছেলেটাকে হাঁপাতে হাঁপাতে এনে গোয়ালদির কোলে তুলে দিল। শিশুটির একরাশ চুলের ঝুঁটিতে সুন্দর একটা সোনার টিকলি ঝুলছে। চাঁদ। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এবং যথাসম্ভব সন্তর্পণে চাঁদখানা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। বাঃ, বেশ। বেশ হয়েছে। জামাইয়ির নজর আছে গো। আর বেশ ভারীও।

চাঁপা গম্ভীরভাবে বলল, এক ভরি সুনা আছে যে।

গোয়ালদিদি বলল, থাম্ ছুঁড়ি। যেন হরলাল কামারের মা আলেন!

সবাই খিলখিল করে হেসে উঠতেই চাঁপা বেজায় লজ্জা পেয়ে গেল। চটেও গেল।

বলল, আহা, বুড়ির কথার ছিরি শোন।

গোয়ালদিদি ধমক দিল, আমি হলাম বুড়ি আর তুমি খুব যুবো, না? ভাগ্ এখেন থে।

বড়বউ ধমক দিল, তোর এখেনে কী? যা।

গোয়ালদিদি এদিক ওদিক চেয়ে দেখে গিরিবালা ঘোমটা টেনে এক কোণায় জবুথবু হয়ে বসে আছে।

ডাক দিল, ওমা, ও নাতনি, ওখেনে শুবোচুন্নি ঠাকরুনের মত বসে আছিস ক্যান? আমি আরউ ভাবতিছি, নাতজামাইয়ের সঙ্গে বসে গল্প করতিছে বুঝি। এদিক আয়।

গোয়ালদিদিটা কী বল দিনি? গলা তো ঝিনেদা-মাগরোয় পৌছচ্ছে। গিরিবালা যেন মাটিতে মিশে যাবে। ওঘরে বসে রয়েছে না ভূষণ!

ওলো আয় আয়, ভাতার আমাগেরউ ছিল এককালে। সুহাগের ভাত আমরাউ খাইছি। নে, ছাওয়ালডারে কোলে নিয়ে এটটু বস। দেখি তোরে। যাওয়ার বাঁশী তো বাজেই উঠিছে।

গোয়ালদিদির বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

তা নাতজামাই কল কী? সন্তুষ্ট হয়েছে তো। আরে মর্ ছুঁড়ি। সুজা হয়ে বস্ না। নজ্জায় একেবারে পাতাল প্রেবেশ হচ্ছে।

গিরিবালা কী কষ্টে যে সে বেলাটা কাটাল, সেই জানে। সন্ধ্যের মুখে সব বিদায় নিল। খাওয়া-দাওয়া সারতে রাতও কম হল না।

ছেলেটাকে খাইয়ে শুইয়ে রেখে এসেছে বিছানায়। রাত্রে আর উঠবে

না। ভূষণও এতক্ষণ শুয়ে পড়েছে তার জায়গায়। গিরিবালার শুধু বাকী। সাত মাস পরে স্বামীর সঙ্গে সে শোবে।

সারাদিন নানা কাজে আড়াল করে রেখেছিল নিজেকে। দুরন্ত অভিমানকে যেন গুঁজে গুঁজে রেখেছিল। একবারও দেখা হয় নি ভূষণের সঙ্গে। না, এখনও সে দেখা করবে না। সুযোগ পেয়ে অভিমান গিরিবালার মনকে দখল করে বসল। না, সে যাবে না, যাবে না, কিছুতেই ভূষণের ঘরে যাবে না। কেন যাবে? এতদিনের মধ্যে একবারও কি তার খোঁজ নিয়েছে ভূষণ? একদিনের তরেও কি এসে দেখে গেছে খোকন সোনাকে?

দরজার বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল গিরিবালা। চোখ ফেটে জল আসতে লাগল তার। একটা এলোমেলো বাতাস উঠেছে। ছেঁড়া ছেঁড়া জ্যোৎস্নার আলো নেমে এসেছে। গিরিবালা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, বাইরে দাঁড়িয়েই সে রাতটা কাটিয়ে দেবে। ভিতরে যাবে না। তার প্রতিজ্ঞা শেষ হতে না হতেই ঘরের একেবারে ছানচেতে দুটো শেয়াল খ্যাক খ্যাক করে লুটোপুটি শুরু করে দিল। ভয় পেয়ে গিরিবালা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল। তার প্রতিজ্ঞাটাও একটু বদলে নিল। সে তার খোকার পাশে শোবে। ভূষণের সঙ্গে একটিও কথা বলবে না।

ভূষণ দেখল, গিরিবালা হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। দরজায় ঠেস দিয়ে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ওপাশ ঘুরে বিছানায় উঠে খোকার আড়ালে শুয়ে পড়ল। তার দিকে চাইল না, তার সঙ্গে কথাও বলল না। স্পষ্টতই বুঝতে পারল ভূষণ, গিরিবালা রাগ করেছে। হয়ত এর আগে সে আসে নি, আসতে পারে নি, তাই রাগ করেছে।

কিন্তু ভূষণ আসবে কী করে? সে যে এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিল। মশার স্বভাবচরিত্র পর্যবেক্ষণ করছিল। একটা গবেষণা করার ইচ্ছে জেগেছিল। মশা-ই যে ম্যালেরিয়ার কারণ, তা সবাই জানে। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে দেশ-গাঁ উজাড় হয়ে যাচ্ছে। মশা না মারলে ম্যালেরিয়া যাবে না, সে বিষয়েও ভূষণ আর সকলের সঙ্গে একমত। তার অমতটা অন্যখানে। ভূষণ জানে, তার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণী মাত্রেরই এই সৃষ্টিতে এক-একটি ভূমিকা আছে। সম্ভবত মশারও আছে। সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই আছে। অবশ্য সে ভূমিকাটি যে ঠিক কী, ভূষণ তা জানে না। হঠাৎ একদিন সেটা সে আবিষ্কার করে ফেলল। কলেরার সিজিনে দেশের লোক কলেরার ইন্‌জেক্‌শন নিতে চায় না। জোর

করে দিতে গেলেও পালায়। আর হাজারে হাজারে মরে। ভূষণের মনে হয়েছিল, মশার মারফতে কলেরার ইন্‌জেকশন দেওয়াতে পারলে এই সমস্যার সমাধান করা যেমন যায়, মশারও তেমন একটা গতি হয়। এই বিষয়টি নিয়ে গত ছ মাস ধরে সে গবেষণা চালিয়েছে। মূল আবিষ্কার সম্পর্কে কাজ করতে হলে কী কী পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার, এতদিনে মোটামুটি তার একটা খসড়া করে ফেলেছে। যথা, (১) মশাগুলোর রোগ বহন করার ক্ষমতা হরণ করা, (২) কলেরার প্রতিষেধক বহন যাতে করতে পারে তার ব্যবস্থা করা, এবং (৩) একটা মশা কতটুকু ওষুধ বহন করতে পারে সেটা নিরূপণ করা।

কাজটি নিতান্ত সহজ নয়, অথচ দারুণ একটা কাজ। বিশ্বমানবের কল্যাণ এর মধ্যে নিহিত। এমন একটা কাজ ফেলে রেখে ভূষণ নিজের ছেলে- বউয়ের তত্ত্ব নিতে আসবে, এমন সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর করে ঈশ্বর তাকে গড়েন নি।

কিন্তু এসব কথা গিরিবালাকে বোঝাতে যাওয়া খুব সমীচীন বোধ করল না ভূষণ। বিশেষ করে এখন, যখন গিরিবালার ভাবগতিক বিশেষ সুবিধার ঠেকছে না।

ভূষণ পাশ ফিরে চেয়ে দেখল, খোলা জানলা বেয়ে তাদের বিছানায় জ্যোৎস্না নেমে এসেছে। ছেলের পাশে শোয়া গিরিবালাকে সেই জ্যোৎস্নার আলোয় অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে। ভূষণের বেশ ভাল লাগছে। গবেষণা নয়, সাধারণ দু-চারটে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। গিরিবালার পাশে যাবার ইচ্ছেটাও যে ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠছে। কিন্তু অবাধে আজ আর সেখানে যাবার উপায় নেই। মাঝখানে এক বাধা। অপরিচিত এক শিশু। তার ছেলে। ছেলের অস্তিত্ব সম্পর্কে এই প্রথম সচেতন হল ভূষণ। একটু যেন ক্ষুণ্ণ হল। তার আর তার স্ত্রীর মাঝখানে অনধিকার প্রবেশ করেছে ছেলেটা। ছেলেটার বে-আক্কেলে ব্যবহারে কিছুটা ক্ষুব্ধই হল সে।

গিরিবালা মটকা মেরে পড়ে রইল। অপেক্ষা করতে লাগল, ভূষণ কখন ডাকে। মুখে মুখে যতই রাগ দেখাক গিরিবালা, সত্যিই কী তার উপর রাগ করে থাকতে পারে? গিরিবালা জানে, এখনই যদি ফিস ফিস করে ডাকে ভূষণ, কী কিছু না বলে হাতখানা ধরে টানে, সব রাগ, সব অভিমান নিমেষে দূর হয়ে যাবে তার। আজ কী হল সকালে; চাঁপা যখন খবর দিল ভূষণ এসেছে? অভিমানে তার চোখে জল এসে পড়েছিল, এতদিন খোঁজখবর

নেয় নি বলে রাগও হয়েছিল ভূষণের উপর, কিন্তু একেবারে গোপনে তার মনটি লতানে ডগায় ঘাসের ফুল হয়ে সুখের বাতাসে মৃদু মৃদু দুলছিল।

কী আশ্চর্য, একই বিছানায় আমি আর গিরিবালা, কিন্তু আগের সেই নৈকট্য আর নেই। ভূষণ ভাবছিল। কাছাকাছি শুয়ে আছি বটে, কিন্তু সান্নিধ্যে নেই। গিরিবালার গায়ে ভূষণের গা ঠেকছে না। তার চুলের মেঘে বন্দী হচ্ছে না ভূষণের মুখ। তার দেহের তটে আগের মত আর আছড়ে পড়ছে না গিরিবালা ঢেউ হয়ে। এই অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় পরিবর্তন হল কিসের জন্য? এই শিশু, এই শিশু, এই শিশুটির জন্য। এতদিন গিরিবালা আর ভূষণের মধ্যে কেউ ছিল না। আজ থেকে সর্বদা এক তৃতীয় অস্তিত্ব থাকবে। ব্যাপারটা ভূষণের খুব মনঃপূত হল না। ছেলেটার দিকে আড়চোখে একবার চাইল। কী রকম কী রকম যেন! নেংটি ইঁদুরের মত। হাত পা অবয়ব, চোখ মুখ নাক কান সব ছোট্ট ছোট্ট। মানুষের যা যা থাকে সবই আছে ওর, তবুও কেমন বেঢপ বেমানান লাগে। কলকাতায় মেজদার টেবিলে ভূষণ শ্বেতপাথরের তৈরী তাজমহলের মডেল দেখেছে। এখন সে কথা মনে পড়ল। এ-ও যেন সেই রকম একটা মডেলই। মডেল ভূষণ। হাঃ-হাঃ। মনে মনে হাসল ভূষণ। শিশুর প্রতি প্রচ্ছন্ন বীতরাগ কমে এল চট করে। স-কৌতূহল দৃষ্টি মেলে ছেলেকে দেখতে লাগল।

তবে কী ভূষণ রাগ করেছে গিরিবালার উপর? এমন তো হয় না কখনও। এতক্ষণ চুপ করে থাকবার পাত্র সে নয়। নিশ্চয়ই রাগ করেছে। ওই যে নড়ল ভূষণ। গিরিবালা উন্মুখ হয়ে রইল। এবার ডাকবে তাকে। কাছে টানবে। আদর করবে। কিন্তু কই? তবে কী ভূষণ রাগই করেছে? ছেলে দেখে কী খুশি হয় নি সে? গিরিবালার মুখ কালো হয়ে গেল।

আজ ব্যাটাকে মডেল বলে মনে হচ্ছে। ভূষণেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কিন্তু দেখতে দেখতে কেমন বেড়ে যাবে। ধীরে ধীরে একদিন ভূষণের মতই বড় হয়ে উঠবে। তখন ভূষণ আরও এগিয়ে যাবে, অনেক অনেক দূর। ছেলে আর বাবাতে শুরু হবে দৌড়বাজি। একদিন খোকা হয়ত তার বাবার বয়েসটা ধরে ফেলবে, কিন্তু বাবাকে ধরা তার অসাধ্য।

আজ ভূষণের কাছে গিরিবালার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে গিরিবালা। কোন আকর্ষণ নেই তার। গিরিবালার চোখ ফেটে জল এসে

গেল। বেশ, বেশ ত, তাই যদি হয়, সম্পর্ক তুলে দিক ভূষণ। সে আর যাবে না ভূষণের কাছে। কেন যাবে?, কেন?

কীভাবে শুয়ে আছে দেখ। গিরিবালা এমনভাবে ছেলে শুইয়েছে, তাকে ডিঙিয়ে হাত না বাড়ালে গিরিবালার নাগাল পাবার জো নেই। ব্যাপার কী? গিরিবালা কি ছেলের আড়ালে লুকোতে চায়, নাকি ছেলেটাই দখলিস্বত্ব নিয়ে নিয়েছে?

আমার স্বত্বই বা আমি ছাড়ব কেন? এই ভেবে গিরিবালার দিকে হাত বাড়াতেই হঠাৎ কেঁদে উঠল ছেলেটা। চমকে উঠল ভূষণ। চাপ পড়ল নাকি? অপ্রস্তুত হয়ে হাতটা টেনে নিল। কাঁদতেই লাগল ছেলেটা। গিরিবালা সাড়া দেয় না যে। ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? তড়াক করে লাফিয়ে উঠল বিছানায়। ব্যস্ত হয়ে ঝাঁকাতে লাগল গিরিবালাকে।

এই এই, ছাখ না, এত কাঁদছে কেন, অ্যাঁ?

গিরিবালা টের পেল ভূষণের স্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাচ্ছে। কেমন জব্দ? মনে মনে খুশি হয়ে উঠল। ছেলের কান্নায় এখন আর ভয় পায় না সে।

এই, এই, ওঠো না, চাপ-টাপ পড়ল নাকি?

গিরিবালা এবার উঠল। কোলে নিয়ে বসল ছেলেকে। কান্না থামল না।

কী হল ওর বল তো?

ভূষণের এই দুশ্চিন্তায় গিরিবালার রাগ অভিমান ভেসে গেল কোথায়। ছেলেকে উপেক্ষা করছে না ভূষণ। তার জন্য ভাবছে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে। যে সংশয়, যে ভয়, যে উৎকণ্ঠায় এতদিন একা-একা পীড়িত হয়েছে সে, এখন ভূষণও তার ভাগ নিতে এগিয়ে এসেছে। অপূর্ব সুখে গিরিবালার অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল।

সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না না, কিছু হয় নি। ছোট ছেলেরা অমন করেই থাকে।

গিরিবালার বুড়োটে কথার ধরনে চিন্তা দূর হল ভূষণের, সঙ্গে সঙ্গে হাসিও পেল।

ভয় পায় কিনা? স্বপনটপন ছাখে তো, তাই ভয় পায়, ভয় পায়ে কাঁদে ওঠে। কোলে নিলি কি আস্তে আস্তে থাবাতি থাকলি আবার ঘুময়ে পড়ে।

গিরিবালার কথার ধরন দেখে ভূষণের মনে হল, মেট্রন যেমন করে নতুন

নাসকে লেকচার দেয়, তেমনিভাবে গিরিবালাও যেন তাকে বাৎসল্যরস শেখাচ্ছে।

ভূষণও উঠল। গিরিবালার কাছ ঘেঁষে বসল। তার পিঠের উপর আলতো করে মুখটা বারকয়েক ঘষল। খোঁপার নীচটায় গভীরভাবে একটা চুমু খেল। শিরশির করে উঠল গিরিবালার সর্বদেহ। আবেশে চোখ বুঁজে এল, গ্রন্থিগুলো শিথিল হয়ে আসতে লাগল।

আধো আধো স্বরে গিরিবালা বলতে লাগল, এই, অমন করে না, অমন করে না, আমি তা হলি খুকারি ঘুম পাড়াতি পারব না।

ভূষণ কথা শুনল না। গিরিবালার পিঠে নিজের গালটা জোর করে চেপে ধরল। বসে রইল সেইভাবে। গিরিবালা সম্মোহিত হয়ে গেছে। আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

বলতে চেষ্টা করল, আমি, আমি আর পারতিছি নে। শরীর অবশ হয়ে আয়েছে। ছাড়ে দ্যাও, লক্ষীটি, ইবার শুয়ে পড়।

ছেলেটা গিরিবালার কোল থেকে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে কেঁদে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গিরিবালার আবেশের রেশটা কেটে গেল।

ধমক দিল গিরিবালা, হল তো, ইবার তুমি ছেলে সামলাও।

সে তাড়াতাড়ি ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল। দুষ্টু হাসি ঠোঁটে মেখে আড়চোখে গিরিবালা একবার ভূষণের দিকে চাইল। দেখে, ভূষণও বোকার মত মিটি মিটি হাসছে। জ্যোৎস্নার আলোর জোর বেড়েছে। গড়িয়ে পড়েছে ভূষণের চুলে ঠোঁটে গালে। ওর বাকী শরীরটা অন্ধকারে ঢাকা। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে ভূষণকে।

কিন্তু ছেলের কান্না আর থামে না। ভূষণের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে মিনতি করল গিরিবালা।

ওদিক ফিরে শোও দিনি।

তেমনি ফিসফিসিয়ে ভূষণ জিজ্ঞাসা করল, কেন ?

গিরিবালা বলল, খুকা যে দুধ খাবে।

খাক না, আমি দেখি।

ঝলাৎ করে গিরিবালার বুকের রক্ত লাফিয়ে উঠল। মুখ চোখ গরম হল। ভারি অসভ্য তো! দেখে, ভূষণ হাসছে। তার দাঁতের পাটিতে জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়ছে।

না না। তুমি ওদিকে ফের। কাঁদতিছে না?

ভূষণ ওর কানের কাছে মুখ এনে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, তাহলে তুমি খোকার বিছানাটা ওপাশে সরিয়ে দাও।

গিরিবালার বুক ধুকপুক ধুকপুক করে উঠল। চনমন চনমন করে উঠল মন।

ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলতে লাগল, না, না, না। তুমি কি আমার খোঁজখবর নাও?

ঝরঝর করে গিরিবালার চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল।

খানিক পরে দেখা গেল, খোকার বিছানা সরে গিয়েছে গিরিবালার ওপাশে। সে ভূষণের আলিঙ্গনে বাধা পড়ে পরম তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। জ্যোৎস্নার ফিনিক-মারা আলো দুজনের বুক পর্যন্ত এসে পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে।

তেইশ

ওইটুকু শিশু, সে-ও আজ অস্থির হয়ে উঠেছে। কাঁদতে কাঁদতে বেসামাল হয়ে পড়ছে। কোলে কোলে ফিরছে, তবুও তার কান্না থামে না। বড়বউ, শুভদা, গোয়ালদিদি, এমন কি ছোটবউও ওকে শান্ত করতে পারছেন না। গিরিবালার চোখ দিয়েও অবিশ্রান্ত ধারায় জল ঝরছে। কয়েকবার চোখ মুছে সেও ছেলেকে কোলে নিল। কিন্তু সুবিধে করতে পারল না।

তার সর্বাঙ্গে গহনা। মাথায় চাঁদ, হাতে বালা, গলায় হার। সর্বাঙ্গেই মহা বিড়ম্বনা। এই সব কারণেই বড় অস্বস্তি লাগছে তার। কিন্তু কেউ তা বুঝল না।

কে বুঝবে? কেউই তো প্রকৃতিস্থ নেই। বড়কর্তা স্বভাবশান্ত মানুষ। কিন্তু তাঁকেও আজ বিচলিত দেখা যাচ্ছে। কেবল তামাক খাচ্ছেন আর মধ্যে মধ্যে উঠে রামকিষ্টোর কাছে যাচ্ছেন।

রামকিষ্টো বারবাড়ির উঠনে গরুর গাড়ির ছই আঁটছে।

বড়কর্তা এক-একবার তার কাছে যাচ্ছেন আর বলছেন, ও রামকিষ্টো, খুব কষে বাঁধতিছ তো, দেখো পথের মধ্যি আবার যেন খুলে-টুলে না পড়ে।

রামকিষ্টো বলছে, বড়বাবু, ভাবেন ক্যান, খুব মজবুত করে বাঁধছি। এ কাজ কি নতুন করতিছি ?

বড়কর্তা বলছেন, হ্যাঁ, আর ছ্যাখ, খুব সাবধানে নিয়ে যাবা কিন্তু। বেশী ঝাঁকি টাকি না লাগে সেদিক খুব লক্ষ্য রাখবা, বুঝলে ?

রামকিষ্টো একটু হেসে জবাব দিচ্ছে, আমার হাতে গাড়ি, কিচ্ছু চিন্তে করবেন না বড়বাবু, বড়দিদিরি অক্লেশে পৌছয়ে দিয়ে আসব।

বড়কর্তা বলছেন, তা তো বটেই, তুমার জন্যিই তো নিশ্চিন্ত আছি। আর কারুর জন্যি তো ভাবতিছি নে, ওই কচি শিশুটা যাবে তো তাই।

না না, বড়বাবু, কোন চিন্তে নেই। আমি মোষ দুটো নিয়ে যাব তো।

মোষ ! মোষ নিবা নাকি ? না না, ওগের মতিগতি বুঝা ভার। তুমি বরং বলদ দুটোই নিয়ে যাও। বুঝিছ ?

রামকিষ্টো বড়বাবুর মুখের দিকে খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

বড়কর্তা বললেন, বলদ দুটোই নাও বরং।

রামকিষ্টো কথা বাড়াল না। সায় দিয়ে গেল। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। বলদ জুতলি বড়দির বাড়ি পৌছতি পৌছতি রাত হয়ে যাবে।

বলল, তাহলি তাই নেব। বলদই নেব।

বড়কর্তা নিশ্চিন্ত মনে আবার গিয়ে তামাক খেতে লাগলেন। হঠাৎ কী মনে পড়ল, উঠে ঘরে গেলেন। পঞ্জিকাটা খুলে ফেললেন আবার। দশটা পঞ্চান্ন মিনিট গতে যাত্রা নাস্তি। অশ্লেষা। বড় চেন ঘড়িটার ঢাকনা খুলে সময় দেখলেন, এখন সোয়া আটটা। সর্বনাশ, আর যে সময় নেই ! খড়ম খটখট করতে করতে ভিতরে গেলেন।

ও মাজদি, যাত্তারায় বসায়ে দাও। সুমায়-যে আর নেই বললিই হয়।

শুভদা গোটা ছয়েক বিভিন্ন আকারে মাটির হাড়িতে নানা জিনিস ভরছিলেন। এটায় ক্ষীরের ছাঁচ, এটায় আমসত্ব, এটায় নোনা তেঁতুল, এটায় কুলের আচার, এটায় বড়ি, এখন আমচুরগুলো ভরতে পারলেই হয়।

এমন সময় বড়কর্তার গলা শোনা গেল।

ও মাজদি, তাড়াতাড়ি কর।

শুভদা বললেন, এই যে হয়ে আলো। ও বড়বউ, রান্না হয়েছে ?

বড়বউ সাড়া দিলেন, হয়ে আলো। আমি বুড়িরি চ্যানডা করায়ে দিই।

বড়বউ গিরিবালার চুলের গোছায় তেল দিতে বসেছেন। সামনে চাঁপা

বসে আছে। তিনজনের চোখ দিয়েই জল পড়ছে। ফোঁপানি শোনা যাচ্ছে।

বড়বউ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলছেন, খুব সাবধানে ছেলেরা রাখবা মা, একটুও যেন অযত্ন না হয়, অনিয়ম না হয়। গরম ঠাণ্ডা বাঁচায়ে চলবা। যা-তা খায়ে না। তুমার শরীর ভাল না থাকলি ওর শরীরউ খারাপ হবে। যদি ছাখ, বেশী কাঁদতিছে, নাইতি ছেঁকা দিবা। সদিকাশি হলি মাষ-কলাইর তেল গরম করে হাত-পা'র তালো আর কণ্ঠায় মালিশ করে দিবা। ভাল করে তেল মাখায়ে রোজ ছ্যান করাবা, বুঝিছ।

গিরিবালা ফোঁৎ ফোঁৎ ফোঁপাচ্ছিল আর ঘাড় নেড়ে নেড়ে বড়মার কথায় সায় দিচ্ছিল। অবিশ্রান্ত কাঁদতে কাঁদতে তার চোখ রাঙা হয়েছে, আর জল মুছতে মুছতে নাকের ডগা, মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কিছুতেই কান্না থামাতে পারছে না গিরিবালা। কেবলই বুকের ভিতর হু-হু করা এক ঘূর্ণি উঠছে আর চোখ দিয়ে অবিরল ধারা ঝরছে। দুরন্ত এক ধারা।

ছোটবউ অবশেষে অতিকষ্টে শান্ত করেছেন তাকে। তার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে সওদাগর। কাল আর এই কোল ভরবে না। যে সূর্যে এত আলো, এত হাসি আছে কাল আর সে সূর্য উঠবে না। যে বাতাস বইবে কাল, তাতে এত শান্তি লাগবে না। আজ একটু পরেই যেন জীবনের সব উজ্জ্বলতা নিবে যাবে। সব সাধ স্তিমিত হয়ে পড়বে। কোন কাজই থাকবে না আর হাতে।

ঘুমন্ত শিশুর মুখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছেন ছোটবউ। ওই অমিয় মুখে কত সুধা। একটা চুমু খেলেন। ওই ছোট ছোট হাতে কত আকর্ষণ। আরেকটা চুমু খেলেন ছোটবউ। তারপর আরেকটা। আরেকটা—আরেকটা—। আরেকটা।

আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে? পারবে তুমি? একবারও মনে পড়বে না? একবারও না? কখনো না? আমি না থাকলে তোমার অসুবিধা হবে না। তোমার মা তো আছে। অনেক বন্দর আছে তোমার। এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে পাড়ি মারবে সপ্তডিঙায় জয়ের নিশান তুলে। ডিঙা ভিড়াবে আরেক আশ্রয়ে। কিন্তু আমি? আমি কী নিয়ে থাকব? আমার আর কে আছে? কেউ না, কেউ না, কেউ না। হু-হু করে

উঠল ছোটবউয়ের অন্তরখানা। যেন সেই শূন্য বন্দরের কূলে সাগরের আকুতি আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল।

মেজকর্তা গেলেন কোথায়? সেই যে বেরিয়েছেন সকালে, এখনও পাত্তা নেই। এদিকে যে যাত্রা বয়ে যায়। আর অপেক্ষা করা যায় না। ভূষণ আর গিরিবালাকে পাশাপাশি যাত্রাঘটের সামনে বসিয়ে দেওয়া হল। গিরিবালার ফোঁপানি বিষম বেড়ে গেল।

বড়বউ, শুভদা, গোয়ালদিদি আঁচলে চোখ মুছে বার বার করে তাকে সাবধান করতে লাগলেন, ওরে, ও মণি, চুবোও চুবোও, যাওয়ার সুমায় কাঁদে না, কাঁদতি নেই। ওরে ও পাগল, ওতে অমঙ্গল হয়।

একে একে সবাইকে প্রণাম করে উঠে পড়ল ভূষণ। সে এই অবস্থা দেখে যেন চোর বনে গেছে। তার বউকেই তো নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ বাড়ির অবস্থা দেখে মনে হল তার, আদালতের পরোয়ানা নিয়ে যেন অনাথার সম্পত্তি ক্রোক করতেই সে এসেছে। মনে মনে অপ্রস্তুত হল ভূষণ। এ বাড়ি ছাড়তে পারলে এখন বাঁচে। গিরিবালাও সবাইকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। তাঁর গুরুজনরা বাঁ হাতের কড়ে আঙুল কামড়ে কামড়ে সেটা প্রায় ফুলিয়ে দিল।

এমন সময় মেজকর্তা বড় একটা রুইমাছ নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন এসে। কোনখানে মাছ নেই। সেই আঠারোখাদায় বিল থেকে ধরিয়ে আনতে হল।

কিন্তু এ কী! সবাই বিস্মিত হয়ে মেজকর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাঁর দাড়ি কোথায় গেল? পরিষ্কার চাঁছাছোলা গাল। তাঁর চেহারাই বদলে গেছে। মুহূর্তে বাড়িসুদ্ধ সবার ফোঁপানি অবধি বন্ধ হয়ে গেল।

ম্লান হেসে অপ্রস্তুত মেজকর্তা কৈফিয়ত দিলেন, বড্ড জঞ্জাল হয়েছিল, কেটেই ফেললাম।

বাড়ির সকলে গাড়ির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে গোয়ালবাড়ি পর্যন্ত এলেন। গিরিবালা মিনতি করল, ও বড়মা, ও পিসিমা, আমারে খুব তাড়াতাড়ি আবার আনো। লোক পাঠায়ো ও বড়মা, মাথার দিব্যি।

আনব মণি, আনব বইকি, উতলা হয়ে না। ও মুখ কী বেশিদিন না

দেখে থাকা যায়! সাবধানে থাকবা। ছাওয়ালরি খুব যত্নে রাখবা। এর বেশী আর কথা বের হয় না। গলায় সব কথা আটকে যায়।

গোয়ালবাড়ির কাছে এসে সবাই দাঁড়িয়ে পড়লেন। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চললেন মেজকর্তা। নাতি তাঁর বুকে। আজ আসতে বিশেষ আপত্তি করে নি। এই প্রথম তাঁর কাছে ধরা দিল। আ! কী গভীর আনন্দ! কী শান্তি!

নাতিকে বুকে ধরে গাড়ির সঙ্গে অনেক দূর এলেন মেজকর্তা। গিরিবালা বার বার বলল, বাবা, আর না, আর আসবেন না।

কী ভাবে গিরিবালা! একে কোলে করে যে পৃথিবীর শেষ সীমান্ত পর্যন্ত এমনভাবে হাঁটা যায়। কোন ক্লান্তি আসে না, অন্তত মেজকর্তার তাই তো মনে হচ্ছে।

তবু তাকে থামতেই হল। জোড়াপুলের কাছে এসে মেয়ের কোলে তুলে দিলেন নাতিকে। তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন, যতক্ষণ ওদের দেখা যায়। ওই যে জামাইয়ের সাইকেল চিকচিক করতে করতে মিলিয়ে গেল। পথের বাঁকে আড়াল হয়ে গেল গরুর গাড়িটা। আর কী? আর কেন? এবার ফিরুন মেজকর্তা। রোদ এর মধ্যেই প্রায় মাথায় উঠেছে। চারিদিক চেয়ে দেখলেন, কোথাও একটা লোক নেই। খাঁ-খাঁ করছে নিঃসীম এক শূন্যতা। অভ্যাসবশে দাড়িতে হাত দিলেন, হাত গিয়ে থুতনিতে ঠেকল।

সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে গেছে তার। ওই ক্ষুদে ডাকাতটা। সব খালি করে দিয়ে গেছে। মুখটাও, বুকটাও।

হাওয়া এলোমেলো

এক

ইদানীং সে অনুভব করছে, কে যেন তাকে বলছে, অনেকদিন চার পায়ে হেঁটেছ, আর না, এবারে ওঠ। মানুষ চিরকাল চার পায়ে হাঁটে না। তার পা মাত্র দুটোই। এবার দু পায়ে ভর দিতে শেখো।

কিন্তু তা কী সম্ভব? তাকে মাঝে মাঝে বেশ ভাবিত হতে দেখা যায়।

মনের আনন্দে সে বাড়িটা চষে বেড়াচ্ছিল। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে। তার ধারণা, হাতে পায়ে ভর দিয়ে চলা হয়ত অনেক নিরাপদ। আপদ-বিপদ সহজে সে ডেকে আনতে চায় না। বাঁধা পথে চলা অনেক ভাল।

চৌকাঠের কাছে এসে সে থমকে গেল। এই জায়গাটা তাকে বড্ড জ্বালায়। গোটা ঘরে আর কোনও বাধা নেই, কোথাও প্রতিরোধ নেই। তরতর করে সে ঘুরে বেড়ায়। চৌকাঠ পর্যন্ত অনায়াসে আসে। এখান থেকে বাইরে নজর পড়ে তার। কত আলো, কত জায়গা, কত রকম জিনিস সেখানে। লাল, কালো, হলদে, সবুজ, নীল, বেগুনী, গোলাপী, সাদা। কত রকম রঙ! কোনটা চিকচিক করে, কোনটা নড়ে, কোনটা দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। কোনটা শব্দ করে, কোনটা নিঃশব্দ। কারোর প্রতি পক্ষপাত নেই তার। সবার দিকে হাত বাড়ায়। সব চাই তার। সবই তার। কিছুই ফ্যালনা নয়।

ওই যে কী একটা থপ্ করে পড়ল তার সামনে! চট করে তার চোখ দুটো ঘুরে গেল। ওই যে ফুড়ুক করে কী একটা উড়ে এল! বসল দূরে। চট করে সে ঘুরে গেল। ওই যে কেঁউ কেঁউ করে কী যেন একটা ঘুরপাক খেয়ে চলে, খটখট করে ছুটে গেল কী, কোথায় ঠং করে একটা আওয়াজ হল! চটচট করে তার চোখ ঘুরে যাচ্ছে। দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়ছে সে। বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অকারণে চঞ্চল। খুব মজা লাগছে তার। শরীরটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে অমিত উৎসাহে দোলাচ্ছে। হাঁটুতে ভর দিয়ে শরীরটাকে

তুলছে। হাত দুটো বাড়িয়ে আহ্বান জানাচ্ছে। কাছে এস, কাছে এস। আয় আয় আয়।

হঠাৎ তার পিছনে কেমন-দেখতে-কী একটা এসে গেল। মিহি স্বরে ডেকে উঠল, মিঁউ। সে-ও তৎক্ষণাৎ ঘুরে গেল। দারুণ বিস্ময়ে, কৌতূহলে স্ফটিকের মত চোখ দুটো চকচক করতে লাগল। আরে, এটা তো সেই, তার বন্ধুটা। তার কাছে যে প্রায়ই আসে। ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। মিউ মিউ ডাকে। ঘড় ঘড় করে। তড়াক তড়াক লাফ মারে। ওটাকে দেখে সে বেজায় খুশী হল। ডাকল, দাদ্দা, দাদ্দো, দাধদা!

ওই যে ওটা চলতে আরম্ভ করেছে। দাদ্দা! সেও পিছু পিছু চলল। দাদ্দা! দাঁড়াও। যেন ধমক দিল। তার ধমকে কান দিল না সেটা। ঢুকে পড়ল চৌকির নীচে। সে-ও চলল। দাদ্দা! অত জোরে না, আস্তে চল। সে যেন এবার মিনতি করল। তার মিনতিও ব্যর্থ হল। একটু ক্ষুণ্ন হল সে। তবু সে চলল তার পিছু পিছু। যাঃ, কোথায় গেল! চৌকির নীচে অজস্র জিনিস। এক লাফে তার আড়ালে ওটা লুকিয়ে পড়েছে। বিস্মিত হয়ে এধার ওধার চাইল। দাদ্দা! কোথায় তুমি? কেউ সাড়া দিল না। দাদ দাদ্ দা! এই এই, কোথায়? না, কেউ সাড়া দিচ্ছে না। মনটা খারাপ হল তার। বিরস মুখে বসে থাকল চুপ করে।

আরে ওটা কী? ওই যে ওই কোণে চিকচিক করছে! ওই যে, ওই যে, ওই যে। তার চোখ দুটো আবার চকচক করে উঠল। গুটি গুটি সেদিকে এগিয়ে গেল। খপ করে তুলে নিল হাতে। বেশ-শক্ত জিনিসটা মুখে পুরে কামড় দিতে লাগল। মাড়িটা শুলুতে লাগল তার। কামড় দিলেই আরাম লাগছে। চুকচুক করে চুষতে লাগল, চুষতে চুষতে মাঝে মাঝে মাড়ির জোরে চাপ দিতে লাগল। বেশ লাগছে। বেশ লাগছে। এই নতুন কাজে উৎসাহের জোয়ার এল মনে। এতেই মেতে গেল।

হুড়মুড় করে ওদিকে কী পড়তেই সে সচকিত হয়ে উঠল। সে দেখল, তার বন্ধু সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল। হাসি পেল তার। সে আবার বন্ধুকে অনুসরণ করল।

সে দেখল, তার বন্ধু এক লাফে চৌকাঠ ডিঙিয়ে গেল। কিন্তু সে পারল না। কী যে শত্রুতা আছে ওই চৌকাঠটার সঙ্গে, কেন যে সে বারে বারে ওকেই আটকে দেয়, ও তা বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে বেজায় রেগে

যায়। হাঁটু গেড়ে বসে প্রবল আক্রোশে দুহাতে ঝাঁকাতে থাকে চৌকাঠ-টাকে। পারলে যেন উপড়েই ফেলত।

আপাতত এই বাধাটায় সে মোক্ষম ঠেকা ঠেকে পড়েছে। কদিন ধরেই সমানে সে চেষ্টা করছে ওটা পার হতে। চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। ভাবনায় পড়েছে। সে জানে এটা পেরতে না পারলে তার মুক্তি নেই। তার স্বস্তিও নেই।

বাধা সে কম পার হয় নি। এই তো সেদিনও, সে একেবারে নড়তে পারত না। অসহায় হয়ে বন্দী ছিল বিছানার কারাগারে। তখন শুধু হাত পা নেড়ে নেড়েই চলার সাধ মিটিয়েছে। পাশ ফিরতেও পারত না এতদিন, উপুড় হতেও পারে নি। তারপর ধীরে ধীরে তার রক্তে একদিন পিতৃ-পুরুষের চাঞ্চল্য জেগে উঠল। সে অনুভব করতে লাগল, এক তীব্র, এক অশান্ত পিপাসা তার মনে জেগে উঠেছে। তাকে অস্থির করে তুলছে। বাধা ভাঙো। কে যেন তাকে তাগিদ দেয়। বলে, এ তোমার জায়গা নয়। তোমার ভুবন এখানে নয়। সে অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। ওঠো, ওঠো, ওঠো। চল, চল।

কিন্তু কী করে উঠবে সে? কী করে চলবে? তার শক্তি কোথায়? অসম্ভব, তার পক্ষে অন্যের সাহায্য ছাড়া পাশ ফেরা অসম্ভব, উপুড় হওয়া অসম্ভব। পারবে না সে। সে যে কিছুই পারে না। আবার তাগিদ আসে। তাগিদের পর তাগিদ। চেষ্টা কর, চেষ্টা কর। তোমার বাপ-ঠাকুরদা কেউই হার মানে নি। বিদ্রোহ করেছে, সংগ্রাম করেছে। একে একে সব বন্ধন ছিন্ন করেছে। সেই বিদ্রোহের উত্তরাধিকার না তোমার! জন্মসূত্রে তুমি না সৈনিক! বিজয়ী!

ভাল করে মনেও পড়ে না তার, কবে কেমন করে, তার রক্তে বিরামহীন সংগ্রামের প্রবল আহ্বান সে শুনল। টেরও পেল না, তার অজ্ঞাতসারেই কবে সে অসম্ভবকে সম্ভব করবার দুর্দম সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ল। সে বুঝতেও পারল না, তার পরাক্রমে পঞ্চভৌতিক শক্তিকে সে তার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে এরই মধ্যে বাধ্য করেছে। ঠেলতে ঠেলতে সে একদিন কাত হল, উপুড় হল। ক্রমাগত চেষ্টায় সে একদিন মাধ্যাকর্ষণের প্রবল টানকে মিথ্যে করে দিয়ে বিছানায় উঠে বসল। হাতে পায়ে ভর দিয়ে

ঘরময় ঘুরতে লাগল! সীমানাটাকে টেনে টেনে সে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর করে তুলল।

মাতৃজঠরের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পেয়ে সে একদিন বিছানায় এসে বন্দী হয়েছিল। এখন বিছানার সীমানা উত্তীর্ণ হয়ে ঘরের চৌহদ্দিতে বন্দী হয়েছে। এ এক অদ্ভুত খেলা সে খেলছে। বন্দিত্বের দিগন্ত পার হয়ে মুক্তি পাচ্ছে। মুক্তি পেয়েই দেখছে সে আবার নতুন কারার বন্দী। এইভাবেই তো সে এতটা পথ এগল। আর এত পথ এগিয়ে এসে শেষে কিনা ঠেকে গেল চৌকাঠে?

বিরক্ত হল সে। বাইরে ওই যে ওরা হাঁটছে ফিরছে, মা গিয়ে লুকিয়ে থাকছে কোথায়, কিছুতেই সে নাগাল পাচ্ছে না কারও। ওরা সব যে চৌকাঠের ওপারে। ওদের নাগাল এ জীবনে বুঝি সে ধরতে পারবে না। লুকনো সেই জায়গাটায় গিয়ে মাকে বুঝি আর খুঁজে বের করতে পারবে না। যদি সে এই চৌকাঠটা ডিঙতে পারত! অন্তত একবার, একবারও যদি পারত!

না, এ অসম্ভব। এ বাধা সে আর পার হতে পারবে না। কখনই না। হতাশা এল তার। শ্রান্ত হয়ে পড়ল। কোন কিছুই ভাল লাগছে না। খুঁত খুঁত করে কাঁদতে লাগল। খানিকক্ষণ কাঁদল।

হঠাৎ তার হাত পা নিশপিশ করে উঠল। চনমন করে উঠল রক্ত। পুরুষ পুরুষ ধরে যে অতৃপ্তি জন্ম নিয়েছে মানুষের মনে, যে আকাঙ্ক্ষা পাগল করেছে তাকে, সেই অতৃপ্তি, সেই আকাঙ্ক্ষা, সেই তাগিদ প্রবলবেগে গুঁতো মারতে লাগল। অস্থির হয়ে উঠল সে। পাগল হয়ে গেল যেন। চৌকাঠটা দু হাতে ধরে পায়ে ভর দিয়ে একটুখানি তুলে ধরল নিজেকে। ও বাবা, বড্ড টাল। সামলানো দায়। থপ করে বসে পড়ল। খানিক পরে আবার উঠল। আবারও পড়ল। দূর, এ কি পারা যায় নাকি? না, সে পারবে না। সে হার মানছে।

কে হার মানে? আবার তার ভিতরে এক বর্বর তৃষ্ণা জেগে উঠল। তাকে হার মানতে দিল না। আমি যাবই, আমি যাবই, যাবই। যেন প্রতিজ্ঞা নিয়েছে সে। এই প্রতিজ্ঞার কাছে আর সব তুচ্ছ হয়ে গেল। এবার বার বার চেষ্টা করল উঠতে। থপথপ করে পড়লও বার বার। এমনি পড়তে পড়তে উঠতে উঠতে টাল ভাঙল। চৌকাঠ ধরে এক সময় ত্রিভঙ্গ

হয়ে দাঁড়িয়েও পড়ল। হ্যাঁ, পেরেছে। যে পৃথিবী প্রবল বেগে ঘোরে, যে পৃথিবী কাউকে করুণা করে না, তার উপর টেক্কা মারার কৌশল করায়ত্ত হয়েছে তার। এবার সাহস বাড়ল। টাল সামলাতে শিখে ফেলল। বেশ কয়েকবার সে দাঁড়াল। কী ফুর্তি, কী ফুর্তি! প্রচণ্ড উল্লাসে নাচতে লাগল সে। কী মজা, কী মজা! খুব নাচছে। উৎসাহ ফেটে পড়ছে তার নধর দেহে। এখন সে ধরে ধরে দাঁড়াতেই চায়। বারে বারে তাই দাঁড়াচ্ছে।

বারান্দায় তার বন্ধুটা এসে বসেছে। যেই ঝোঁক দিয়ে দেখতে গেল অমনি উল্টে পড়ল বারান্দায়। কী হল! সে ঠিক বুঝতে পারল না। হঠাৎ তার মনে হল, সোঁ করে যেন কোন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। তাই থপ করে মাটিতে পড়ার পর কয়েক মুহূর্ত সে কান্নাকাটি কিছুই করল না। যেন একটু সামলে নিল। পরমুহূর্তেই কান্নার চোটে বাড়ি মাথায় করে তুলল। ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গেছে।

হেঁসেলে হিমশিম খাচ্ছিল গিরিবালা। পিতলের বড় ডেকচিটায় ভাত চড়িয়েছেন বড় জা। পুকুরের পানা তুলতে লোক লেগেছে। ঘরামিরা চাল ছাইছে। জন দশেক লোক খাবে। এই এক ডেকচিতে সকলের ভাত চড়েছে। চাল ফুটে উঠল। ভারী ঢাকনাটা ঢক ঢক করে যেন মাথা কুটতে শুরু করল।

বড় ভাশুর দু খালুই পুঁটিমাছ এনেছেন। গিরিবালা এতক্ষণ ধরে হেঁসেলঘরের এক পাশে বসে সেগুলো কুটছিল। এ কী এক হাতের কাজ! কিন্তু গিরিবালা জানে, এ সব ছোট কাজে কেউ হাত লাগাবে না। বড় জা সেই ঘরেরই অন্য ধারে পা ছড়িয়ে বসে, দুই মেয়ে নিয়ে জমিয়ে গল্প করছেন আর কাজ করছেন। কাজ তো ভারি! যারা পুকুর সাফ করছিল, তারা এক ডাঁই কলমি শাক তুলে দিয়েছে। তিনজনে মিলে তাই বাছতে লেগেছেন। গিরিবালা একবার চেয়ে দেখল, এখনও অর্ধেকও হয় নি।

বড় জা বড় মেয়েকে বললেন, ও চম্পি, ভাতটা একবার ছাখ তো?

চম্পি অসন্তুষ্ট হল।

গোমড়া মুখে বলল, ক্যান, চম্পি ছাখবে ক্যান, বাড়িতি কি আর মনিষ্যি নেই?

ঝাঁ করে গিরিবালার কান লাল হয়ে গেল। কোন্ লক্ষ্যে যে এ বাণ ছোঁড়া, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না তার।

বড় জা বললেন, লোক থাকবে না ক্যান, লোকের মধ্যে তো দেখতিছি এক বাঁদী, এই আমি। আর তো সবার হাতই জুড়া।

গিরিবালা বুঝল, সবার মানে গিরিবালার কথা বলা হল। ওর অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। এই বাড়িতে এসে অবধি সে বড় ভয়ে ভয়ে থাকে। কী জানি কেন, গিরিবালার মনে হয়, এখানকার কেউ তাকে ভাল নজরে দেখে না। বিশেষ করে মেয়েমহল। মুখে কেউ কিছু বলে না। কিন্তু ওদের আড়া-আড়া ছাড়া-ছাড়া ভাব দেখে গিরিবালা বুঝতে পেরেছে, ওকে খুব প্রসন্ন মনে কেউ যেন গ্রহণ করে নি।

গিরিবালা প্রাণপণে পরিশ্রম করে। যে যা বলে করে দেয়। কারোর কোন কথায় থাকে না। সকলের মন জুগিয়ে চলবার চেষ্টা করে। প্রত্যেকের সুবিধে অসুবিধে দেখে। কিন্তু তাকে কেউ দেখে না। এইটেই ওর কাছে খুব আশ্চর্য লাগে। ব্যথাও পায়।

সকাল থেকে উঠেই তার খাটুনি শুরু হয়। একে বাড়িটা বড়, তার উপর ছাড়া-ছাড়া, এ পোঁতায় একখানা ঘর, ও পোঁতায় আরেকখানা, সে পোঁতায় আরেকখানা, এমনি ধারা বাড়ি। ছিরি ছাঁদ সুবিধের ঠেকে না তার কাছে। ছুটোছুটি করতে করতেই প্রাণান্ত হয় তার। তায় এরা বড় অগোছাল। কী রকম যেন! অযত্নে অবহেলায় কত জিনিস যে নষ্ট হয়, সেদিকে কারোর কি লক্ষ্য আছে? কোন কাজ কেউ গুছিয়ে করে না। অথচ বাড়িতে বড় বড় দুটো মেয়ে, চম্পি আর যুথি। বিয়ের বয়স দুজনেরই হয়েছে। চম্পির বিয়ের চেষ্টাও চলছে। কিন্তু ওরা ওদের আড্ডা আর মেজাজ নিয়েই আছে।

চম্পি কলমির বড় বড় ডগাগুলো পুট পুট করে ভাঙতে লাগল। যুথি কোন সাড়াশব্দই দিল না। ডেকচির ঢাকনাটা বার কয়েক ঢকাস ঢকাস করে বড় বড় গুঁতো মারল।

বড় জা বললেন, তাহলি পুড়ুক ভাত, পুড়ে যাক। গভ্ভের সন্তান, সেই কথা শোনে না, কারে আর কী কব?

চম্পি খর খর করে বলে উঠল, বাড়ির মেয়েরা কি চিরটাকাল হাড়ি ঠ্যালবে না কী? যদ্দিন লোক ছিল না, খাটতি তো কসুর করি নি। একটা কাজ হাতে নিয়ে দিন কাবার করার কায়দা আমরা শিক্ষে করি নি।

চম্পির কথা শুনে গিরিবালার চোখ ফেটে জল এসে গেল। এত কাজ করার পরও কেমন সব কথা শুনতে হয় দেখ। গিরিবালা মাছ কোটা

বন্ধ রেখে উঠে গেল। হাতটা বেশ করে ধুয়ে এসে ডেকচির ঢাকনাটা এক পাশে সরিয়ে দিতেই এক বলক ফেন উথলে উঠল, গরম বাষ্প বুজবুজ করে বেরিয়ে গেল। খুন্তি করে গোটাকতক ভাত তুলে এনে টিপে দেখল, হয়ে গেছে। ডেকচির ভিতর ভাতগুলো আস্তে করে ঘুটে খুন্তিটা ঠক ঠক করে ডেকচির কানায় ঠুকল গিরিবালা, তারপর একটা থালার উপর খুন্তিটা রেখে ঢাকনাটা আবার চাপা দিল। এবার ভাত নামাতে হবে। ডালের বোগনোর পাশে ন্যাতা পড়ে ছিল। গিরিবালা সে দুটো তুলে এনে ভাতের ডেকচি নামাতে গেল।

ডেকচিটা কী ভারী! এতটা ভারী তা আগে বুঝতে পারে নি গিরিবালা। প্রথমবার তো তুলতেই পারল না। অপ্রস্তুত হল।

বলল, ও বড়দি, এ যে দেখতিছি বেশ ভার।

ভেবেছিল একথা শুনে কেউ হয়তো হাত লাগাতে আসবে। কিন্তু যে রকম মন দিয়ে কলমির শাক বাছতে আরম্ভ করেছে ওরা, তাতে মনে হয়, ওরই সঙ্গে ওদের বাঁচন মরণ জড়িয়ে আছে।

বড় জা একটা হাই তুলে বললেন, হ্যাঁ, খুব সাবধানে নামাস।

গিরিবালা বড় জার জবাব শুনেই বুঝল, কারও আর হাত লাগাবার কোন ইচ্ছেই নেই। এইবার গিরিবালা ভাবনায় পড়ল। এত ভারী ডেকচি যদি না নামাতে পারে? তবে বড় বে-ইজ্জৎ হয়ে যেতে হবে। ওরা হাসাহাসি করবে। চিরকাল খোঁটা দেবে। পাড়ায় পাড়ায় কথাটা রটে যেতে বিলম্ব হবে না। না, গিরিবালা কথা বলবার সুযোগ দেবে না কাউকে। তার কেমন জেদ চেপে গেল। দাঁতে দাঁত চিপে সে সর্বশক্তি দিয়ে ডেকচিটা তুলে ধরল। তুলতেই বুঝল, গোয়াতুর্মিটা করে খুব ভুল করেছে।

ডেকচির ভারে তার শরীরটা নুইয়ে পড়ল। সবশুদ্ধ উনুনের উপর উল্টে পড়ে বুঝি। গরম ডেকচির তাপ তার গায়ে লাগছে। উনুনটা লক লক জিভ বের করে গিরিবালাকে গ্রাস করার জন্য যেন এগিয়ে আসছে। অদৃশ্য হাতে জোরে টান মারছে। গিরিবালা প্রাণপণ শক্তিতে প্রতিরোধ করতে লাগল। তার পিঠ পেট কোমর টন টন করছে প্রবল চাপে। মনে পুড়ে মরার প্রবল আতঙ্ক। কপালের ঘাম টস টস করে পড়ছে, চোখে এসে ঢুকছে। শরীর থরথর করে কাঁপছে। হাতের পেশী সব যেন পট পট করে ছিঁড়ে যাবে। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। চোখে অন্ধকার দেখল।

আর সেই গাঢ় অন্ধকারে উজ্জ্বল অজস্র সব আলোর বিন্দু ছুটাছুটি করতে লাগল। আর প্রতিরোধ করতে পারছে না গিরিবালা। ডেকচি সমেত সে নিজেও পড়তে শুরু করেছে। আর রক্ষা নেই। এবার হাড়িসুদ্ধ উনুনে পড়বে, সিদ্ধ হয়ে সে মরবে। খোকার কী হবে ? ভূষণ কোথায় ?

ধপ করে গিরিবালা নামিয়ে ফেলল ডেকচিটা। উনুনে নয়, একেবারে ওর পায়ের উপর। একটুখানি ফেন চলকে পড়ল পায়ে। 'উঃ' করে উঠল যন্ত্রণায়। পায়ের আঙুল ছেঁচে গিয়েছে। গরম ফ্যান পড়ে পা জ্বালা করছে। ফোস্কা পড়ে উঠল। মাথাটা যেন টলছে। মুখ টিপে ব্যথা সামলাল। চোখ বুঁজে টাল সামলাল।

বড় জা নির্বিকারভাবে বলে উঠলেন, ও কী, পা-র উপর ফেললি। সাবধানে নামাতি কলাম না! কি ফুস্কা পড়ল না কি ? আর পারি নে বাপু। যাও, একটু আলু ছেঁচে লাগায়ে ছাও।

এমন সময় পরিত্রাহি চিৎকার করে কেঁদে উঠল গিরিবালার খোকা। যেন মাকে ওই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি দিতে ইশারা করে ডাকল।

গিরিবালা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দেখে, খোকা চৌকাঠের বাইরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বারান্দার একেবারে কিনারে চলে এসেছে! আর একটু হলেই উঠনে গড়িয়ে পড়ত। সর্বনাশ! দরজা ডিঙোতে শিখেছে! আর বাঁচানো যাবে না ছেলেকে। কে সর্বদা চোখে চোখে রাখবে। নিজের যন্ত্রণা আর খোকার ভাবনায় সে জেরবার হয়ে ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল। সে আর দাঁড়াতে পারছে না। খাটের উপর খোকাকে নিয়ে শুয়ে পড়ল। ফোস্কার ব্যথায় কাতর হয়ে গোঙাতে লাগল সে।

গিরিবালা ভাতের ডেকচিটা উপুড় না করেই চলে গেল দেখে বড় জা একটু অসন্তুষ্টই হলেন। চম্পিকে একটা ধমকও দিলেন।

ভাত যে এতক্ষণে গলে পিণ্ডি হয়ে গেল, ও চম্পি! কার ছিরাদ্দে দেওয়া হবে শুনি ?

ধমক খেয়ে চম্পি অপমানিত বোধ করল।

কার ছিরাদ্দে আর দেব ?—সে মুখে মুখে জবাব করল, যাই নিজির পিণ্ডি নিজিই সাজাই গে। এ বাড়ির হয়েছে বেশ, এক এক কাজ সারতি জুনা সাতেক করে লোক চাই!

দুম দুম পা ফেলে সে ডেকচিটার কাছে এগিয়ে গেল। ফেন গালতে সেটা সরাতে গেল। কিন্তু নড়াতে পারল না। ও বাবা, এ যে দেখছি জগদ্দল পাথর! ছোট কাকী নামাল কী করে? অবাক হয়ে গেল চম্পি। এই ডেকচি কাকিমার পায়ের উপরে পড়েছে? কী সর্বনাশ, সে পায়ের তো আর কিছু নেই তা হলে। চম্পি ব্যস্ত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি কোনমতে গড়িয়ে টড়িয়ে ফেন ঝরাবার জায়গাতে হাঁড়িটা নিয়ে গেল চম্পি। ডেকচিটাকে ঢাকনা সমেত কাত করে বসিয়ে রেখেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

বাঁ পায়ের আঙুলে আর ডান পায়ের গোড়ালির উপরে ফোস্কা পড়েছে। সেখান থেকে তীব্র যন্ত্রণা উঠে সমস্ত শরীর যেন ছিঁড়ে ফেলছে। বিছানায় শুয়ে খোকাকে মাই খাওয়াচ্ছিল গিরিবালা আর ব্যথার বিষে নিঃশব্দে কাঁদছিল। ওর মনে হচ্ছিল বুঝি জ্বর এসে গেছে।

চম্পি ঘরে ঢুকেই বলল, দেখি কাকিমা, তুমার পা দেখি।

গিরিবালা ধড়মড় করে উঠে বসল। এ আবার কী খেলা! মনে মনে সে শঙ্কিত হল। খাওয়ার ব্যাঘাত ঘটায় খোকাও কেঁদে উঠল।

শোও শোও, শুয়ে পড়। যা করছিলে, কর। আমি পা দুখানা দেখি।

গিরিবালার পায়ের অবস্থা দেখে চম্পি শিউরে উঠল, ই-শ্!

গিরিবালা মনে মনে চটে গেল। আবার আদিখ্যেতা হচ্ছে!

চম্পি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে। বড় অপরাধী বলে মনে হতে লাগল নিজেকে। সেই তো দায়ী। তার বোঝা উচিত ছিল, অত বড় অত ভারী ডেকচি নামানো কারও একার পক্ষে সম্ভব নয়। কেন সে তখন এগিয়ে যায় নি। যদি আজ মারাত্মক কাণ্ড কিছু ঘটে যেত! খুব ফাঁড়া কেটেছে আজ বাড়ির লোকের। আর মাকেও বলিহারি যাই, ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকে নারকেল তেল আর চুন ফেটাতে ফেটাতে চম্পি মায়ের উপর চটে উঠল। ওই যজ্জি রাঁধার হাঁড়ি আজ নামাবার দরকার ছিল কী? না হয় তিন চড়া ভাত হত!

চম্পি তেলে-চুনে মিশিয়ে নিয়ে গিরিবালার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বলল, যাই বল কাকিমা, তুমি লোক সুজা নও। একবার আসো বলে ডাকতি কী হয়েছিল? যদি আথার উপর গিয়ে পড়তে, পুলিশি যে আমাগের হাতে দড়ি দিত। ভাও, লাগায়ে দিই ওষুধটা।

গিরিবালা বিব্রত হয়ে 'না না' করে উঠল।

চম্পি ধমক দিল, থাম।

তারপর জোর করে ব্যথার জায়গায় প্রলেপ লাগিয়ে দিতে লাগল। পাছে আরও ব্যথা লাগে তাই কিছুক্ষণ গিরিবালা সিঁটিয়ে রইল। সে অবাক হয়ে চম্পিকে দেখল খানিকক্ষণ। কই, ওর মুখে তো বিরাগের ছাপ নেই! চোখে মুখে তো আন্তরিকতাই ফুটে বেরচ্ছে। তবে, এর সম্পর্কে তার খারাপ ধারণা হয়েছিল কেন?

চম্পি বলল, ত্যাখ কী? আমার মন পাষাণ কি না?

অপ্রস্তুত হয়ে গিরিবালা ডাঁহা মিথ্যে কথা বলল, ছি-ছি, তুমারে তা ভাবব ক্যান। কোনদিন তা ভাবি নি।

গিরিবালাকে সেদিন আর কাজকর্ম করতে দিল না চম্পি। প্রায় জোর করেই শুইয়ে রাখল বিছানায়। চম্পিকে মনে মনে শত ধন্যবাদ দিল গিরিবালা। তার পায়ে ব্যথা হয়েছে। পায়ের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছে সে। এর উপর কাজকর্ম করতে হলে সে ঠিক মরে যেত। চম্পির মনটা ভালই। সে এতদিন বুঝতে পারে নি।

শ্বশুরবাড়ির প্রায় কাউকেই গিরিবালা বুঝতে পারে না। কেন যে এটাকে বিভুঁই বলে মনে হয়, কে জানে! এখানেও যে-আকাশ, যে-মাটি, তার বাপের বাড়িতেও তো সেই আকাশ, সেই মাটিই। সেই একই রোদ বৃষ্টি ঝড়। তবু বাপের বাড়ির আকাশে যেমন প্রশ্রয়, সে-মাটিতে যেমন স্নেহক্ষরা আশ্রয়, এখানকার আকাশ বাতাস মাটিতে সেই আস্বাদটা কেন পায় না গিরিবালা।

বাপের বাড়ির রোদে কেমন তেজ! আরাম দেয়। এখানকার রোদ তাকে পোড়ায়। এখানকার বৃষ্টি তাকে কেবল হেনস্থাই করে, ঝড় তাকে শাসায়। সে যেন এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছে। এটা যেন তার বিরুদ্ধ পুরী। আর আশ্চর্য, শ্বশুরবাড়ির বিভিন্ন লোকের মুখে মনে যেন এই ভাবটাই লেখা আছে বলে গিরিবালার মনে হয়। সে হাঁফিয়ে ওঠে। মন কেমন করে তার।

কাজের মধ্যে ডুবে থাকে গিরিবালা। বাড়িতে লোক তো কম নয়। শাশুড়ী, বড় জা, দুই ভাশুর-ঝি, ভূষণ, সে, খোকন, দুজন বাইরের কাজ করার

লোক। হ্যাঁ, আরও একজন আছেন, বক্সীমশাই। ইনি যে এ বাড়ির কে তা জানে না গিরিবালা। চুপচাপ থাকেন। দু বেলা দুটো খান আর হুঁকো টানেন। বয়েস কত তাও বোঝা যায় না। রোগা, হাড়-বার-করা শরীরটা। এত লোকের কাজ গিরিবালাকে সামলাতে হয়। দিনরাত কোথা দিয়ে বেরিয়ে যায়, সে বুঝতেও পারে না।

খোকাকে যত্ন করতে বলেছিল বড় মা। কিন্তু কখন করবে? প্রথম প্রথম দিনকতক খুব যত্ন নিয়েছিল গিরিবালা। কিন্তু সেটা নাকি আদিখ্যেতা, সে এই কথাই শুনতে পেল। চাপা কানাকানিও তার কানে গেল: ছেলে যেন এক গিরিবালারই হয়েছে, ত্রিভুবনে আর কারও ছেলে যেন মানুষ হয় নি।

গিরিবালা না হয় জানে না, বোঝে না, কী করে কী করতে হয়। তাই হিমসিম খায়। সামলাতে পারে না। কিন্তু তার শাশুড়ী তো জানেন, বড় জা তো জানেন? তাঁরা কেন কিছু বলেন না? তাঁরা কেন এ ভারটা নেন না? গিরিবালার না হয় ছেলেপুলে হয় নি এর আগে, ওদের তো হয়েছে।

কিন্তু এটা তার বাপের বাড়ি নয়, এখানে বড়মা, পিসিমা, কাকিমা নেই। সহানুভূতি, সমবেদনা নেই। সহযোগিতা নেই। আছে শুধু নিষ্করুণ সমালোচনা, পদে পদে খুঁত ধরার বিকারগ্রস্ত উৎসাহ। শ্বশুরবাড়িটাকে গিরিবালার মনে হয় ফুল-ফলহীন শুধু চোরকাঁটা বিছানো এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র।

তাই গিরিবালা নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে রাখে। এমন কি প্রকাশ্যে সে খোকনের উপরও দৃষ্টি দেয় না। সময়মত খাওয়াতে পারে না, খিদেতে চিৎকার করতে থাকে তার ছেলে। কেঁদে কেঁদে বাড়ি ফাটিয়ে ফেলে। কিন্তু সে অবুঝটা তো বুঝতে পারে না তার মা বন্দী হয়ে আছে সংসারের কাজে। হেঁসেলে কী অন্য কোথাও। হাতের কাজে সে তখন মন বসাতে পারে না। মনে মনে সান্ত্বনা দিতে থাকে, চুপ কর, চুপ কর, বাবা আমার, এই যে হয়ে আলো, হয়ে আলো। কাজ সারবার জন্য সে তাড়াহুড়ো করতে যায় আর গোলমাল করে ফেলে। দেরি হতে থাকে তার। বিরক্ত হয়ে উঠে গিরিবালা। মুণ্ডুপাত করতে থাকে মনে মনে। বড় জা, ভাশুর-ঝি, শাশুড়ী, ভূষণ—কাউকেই সে রেয়াত করে না। নিজেকেও না। এমন কী, কখনও কখনও খোকনকেও ছাড়ে না।

তার একমাত্র সুহৃদ্ এখন রাত। রাত গভীর হলে গিরিবালা বেঁচে যায়। খোকনের উপর অজস্রধারে সে তখন স্নেহ ঢালতে থাকে। ইস্, কী ঘামাচিই

না বেরিয়েছে দেখ ওর সারাটা গায়ে। এ কী, বুকে আবার বিষফোটটা কখন বেরল? চুলে কেমন জট পাকিয়েছে দেখেছ। মা গো, সারা গায়ে ধুলো-মাটি থিগবিগ থিগবিগ করছে। আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয় পরম যত্নে। চুল-গুলো আঁচড়ে দিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এ ঘরে চিরুনি নেই। এত রাত্রে চিরুনিটা আনতে বড় আলস্য লাগে তার। তার চোখেও ঘুম এসে গিয়েছে। যাক, কাল আঁচড়ালেই চলবে। ঘুমন্ত ছেলের মুখে গোটাকতক চুমু খেয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয় তাকে। ছেলেটা দিন দিন কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে। সে-ও ঘুমিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গিরিবালা বড়মা, পিসিমা আর কাকিমার ধমকানি শোনে। তাতে তার রাগ হয় না। সে বরং খুশী হয়। একেবারে নির্বান্ধব সে নয়। আছে আছে, এই পৃথিবীতেই এমন জায়গা আছে, যেখানে তার সান্ত্বনা, আশ্রয় মিলবে। পরম সুখে খোকাকে কোলে টেনে নেয় গিরিবালা।

বুঝি তার ঘুমই এসেছিল। কপালে কার শীতল স্পর্শ পেয়ে সে চমকে উঠল। বড়মা! চোখ মেলে সে অবাক হল। বড় জা। তার পিছনে শাশুড়ী। ধড়মড় করে উঠে বসল গিরিবালা।

বড় জা বললেন, ওলো, তোর যে জ্বর হয়েছে। শুয়ে থাক্, শুয়ে থাক্।

এ তো বড় জা নয়, বড়মা। শরীর জুড়িয়ে গেল তার। চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল।

শোও শোও, পালোয়ানের বিটি। শাশুড়ী বললেন।

এ কোন্ শাশুড়ী!

ভয় নেই মা, সামান্য গা গরম হয়েছে। তাড়শের জ্বর। চম্পির মুখে শুনে আমি তো থরথরায়ে মরি। কী কাণ্ড করিছিলে মা, অল্পের উপর দিয়ে গেছে, তাই রক্ষে। একটু এদিক-ওদিক হলিই একেবারে সব্বনাশের মাথায় বাড়ি। কাঁচা পুয়াতি তুমি, অমন গোঁয়ারতুমি কি করে? ছি-ছি!

গিরিবালাকে কোনদিন বকেন নি এঁরা, আজ বকছেন। কিন্তু কই, গিরিবালার মনে তো তার জন্য কোন কষ্ট হচ্ছে না। সে এতে সুখ পাচ্ছে কেন? তবে কি এ বাড়িতেও স্নেহ আছে, ভালবাসা আছে? তার জন্য দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে ওঠবার মত হৃদয়ও আছে? এ কী আশ্চর্য আবিষ্কার করে ফেলল গিরিবালা! কার মুখ দেখে আজ ঘুম ভেঙেছিল তার!

চম্পি এল এক বাটি দুধ নিয়ে।

কাকিমা খাও।

কিন্তু গিরিবালার খিদে আর নেই। জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই। সে যে অমৃত পেয়েছে আজ। সারা জীবনই এখন না খেয়ে কাটাতে পারে।

দুধের বাটি দেখে তার ছেলে উঠে বসল। কচি কচি হাত বাড়িয়ে, দুলে দুলে বলল, দাদ্দা!

চম্পি হেসে বলল, তবে রে হ্যাংলা! এ তুমার দুধ না। মা খাবে।

চম্পির কথা শুনে ফোকলা মুখে সে হাসতে লাগল।

দাদ্ দাদ্ দা!

হাত দুটো উপরে তুলে ঘোরাতে লাগল।

বড় জা, শাশুড়ী, চম্পি হাসতে লাগল। গিরিবালাও হেসে ফেলল।

শাশুড়ী বললেন, বুঝিছি দাদু, বুঝিছি। খিদে পায়েছে। চল, ছ্যান করে খাবা।

চান করিয়ে, চুল আঁচড়ে, কাজল-টাজল পরিয়ে চম্পি যখন খোকাকে দিয়ে গেল গিরিবালার কোলে, সে তখন তাকে প্রায় চিনতেই পারে না।

চম্পি অনুযোগ করল, কী নোংরা করেই যে এরে রাখ কাকিমা? ছাখ দিন, কেমন রাজপুত্তুরির মত ছাখাচ্ছে এখন। যাই বল বাপু, তুমি বড় ঢিলেঢালা।

তা হয়তো সে একটু আছে। অস্বীকার করছে না গিরিবালা। একেবারে নতুন তো, বাপের বাড়িতে কি এত কাজ করতে হয়েছে নাকি কখনও!

ন্যাও, আজ বাড়া ভাত খাওয়ার কপাল তুমার, পাটে বসে বসে তাই খা ও।

চম্পি হাসল। গিরিবালাও হেসে ফেলল। ঠাট্টা করছে চম্পি। তা করুক। এটা ঠাট্টাই। এতে ঝাঁজ নেই, হুল নেই। শরীরে বেঁধে না, কাতুকুতু দেয়।

বেশ মেয়ে চম্পি। বেশ মেয়ে।

ভূষণের বড়দা বিলাস মেজাজ গরম করেই বাড়ি ফিরলেন। এই দুপুর পর্যন্ত টো-টো করে প্রজার বাড়িতে ঘুরেছেন, এক পয়সা আদায় হয় নি। রোদ লেগে বড় কষ্ট হয়েছে তাঁর। তার উপর খিদে পেয়েছে। এখন একটু

জিরোবেন, তারপর চান করে পুজোয় বসবেন। এক ঘণ্টার আগে পুজো সারা হবে না তাঁর। তারপর খেতে বসবেন। তিনটের আগে আজ আর খাওয়া হবে না।

বাড়িতে পা দিয়েই দুর্ঘটনার কথা শুনলেন। আর শুনেই মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে গাঁক গাঁক করে চেঁচাতে লাগলেন।

বলি ওগো, কনে গেলে, বউমা আস্ত আছে তো ?

শোন কথা! দামিনীর পিত্তি জ্বলে গেল। নিজের জ্বালায় মরছেন তিনি, সংসারের কাজ তার ঘাড়ে, নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই, আর মদ্দ এখন আড়াই পহর বেলায় বাড়ি ঢুকে চিন্তা দেখাচ্ছেন। তিনি জবাব দিলেন না।

বলি, কেউ কথা কয় না ক্যান, চিতেয় উঠিছে নাকি ?

না, এতক্ষণ ওঠে নি, মড়ারা সব শুকচ্ছিল, এতক্ষণে ডোম আলেন, ইবার ওঠবে।

দামিনীর কথা শুনে বিলাস লাফাতে লাগলেন উঠনে।

ওই মুখখানা আছে, তাই করে খাচ্ছ। বুড়ো মাগী বসে বসে খাবে, আর কচি মেয়েটারে দিয়ে আধমনি হাঁড়ি ঠ্যালাবে। ক্যান, গতরখানা তো সাতটা কুমিরিউ শেষ করতি পারে না, উডা নাড়াতি হইছিল কী ?

দামিনী এবার রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে বলল, ছাখ, চাষার মত চ্যাচায়ে না।

বিলাস একেবারে গাড় নিয়ে ছুটে গেলেন।

কী বললি ? আজ তোর ওই মুখ থ্যাঁতা করে দেব।

চাঁপা আর যুথি হাউমাউ করে ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। দামিনী রান্না ফেলে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে গিয়ে খিল দিলেন। ভূষণের মা ভীতু মানুষ। বড় ছেলের হাঁক ডাক শুনে এক কোণায় বসে ইষ্টনাম জপ করতে থাকলেন। চম্পি যুথিকে যাচ্ছেতাই করে বকলেন বিলাস।

হাতিগুলো বসে বসে শুধু গেলবে। হাতিগের পার করতি করতি ফতুর হয়ে গেলাম, তবু পাল শেষ আর হয় না। হাড় যে জুড়বে কবে!

বাবার কথায় চম্পির বুকে যেন শেল বাজল। তার দোষটা কী? সে কী কাকিমার পায়ে হাঁড়িটা চেপে ধরেছে না গরম ফ্যান তার গায়ে ঢেলে দিয়েছে! হাঁড়িটা যে এত ভারি, সে তা জানবে কী করে? কাকিমা

বলতেও তো পারত। একটা ডাক দিলেই সে গিয়ে হাত দিত হাঁড়িতে। এমন তো নয়, সে কাজকর্ম করে না।

এ সবই কাকিমার শয়তানি। ওর ওই আহ্লাদী আহ্লাদী ভাবখান দেখে ওকে যত সাধাসিধে মনে হয়, উনি তা আদৌ নন। ইচ্ছে করেই ও আজ এই ব্যাপারটা ঘটিয়েছে। সবাইকে বকা খাওয়াবার জন্য। আসলে ওর তেমন লেগেছে কি না সে সম্পর্কেই চম্পির এখন সন্দেহ হচ্ছে। ঢং করে গিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে।

রাগে কস্ কস্ করতে করতে গিরিবালার ঘরে গিয়ে উঠল চম্পি।

যতটা পারে বিষ ঢেলে দিল কথায়, তুমারে একা একা ওই হাঁড়ি নামাতি কইছিল কিডা? খুব যে কাজ দ্যাখায়ে আলে? এখন তো বিছানায় আসে উঠিছ। কডা দাসী বাঁদী সঙ্গে পাঠিয়েছে তুমার বাবা? ইবার তাদের দিয়ে কাজ করাও। আমরা পারব না।

কথা তো নয়, গিরিবালার বুকে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ লাথি মেরেই যেন চলে গেল চম্পি। সে ছটফট করতে লাগল অপমানে আর লজ্জায়। জিভে কী তীক্ষ্ণ ধার চম্পির? শুধু শুধু তাকে অপমান করে গেল। বটঠাকুরের চিৎকার শুনে মরমে মরে গিয়েছিল গিরিবালা। এখন চম্পির বাক্যের চোটে সে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা পেল।

এ বাড়িতে গিরিবালা থাকতে পারবে না। আসুক ভূষণ। সব সে বলবে। প্রতিকার চাইবে। ভূষণ যদি কিছু না করে, করবে না বলেই বিশ্বাস, তখন বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলবে তাকে। না যদি পাঠায় তো বাবাকে আসতে লিখে দেবে। কালই চিঠি লিখবে বাবাকে।

দুই

বেলা অনেক হয়েছে। চৈত্রের রোদ দাউ-দাউ করছে। ভূষণ ডাক্তারখানা বন্ধ করি করি করেও করতে পারছিল না। চর ছোলেমানপুরের মনিরুদ্দি সেখের টাকা দিয়ে যাবার কথা আছে। প্রায় তিরিশ টাকা পাবে ভূষণ। ক-টাকা দেবে কে জানে?

ভূষণ তার হিসেবের খাতাখানা খুলে দেখতে লাগল। কোটচাঁদপুর থেকে ডাক্তারখানা তুলে এনেছে ঝিনেদায়। বউ ছেলে বাড়িতে রেখে তার কোটচাঁদপুরে পড়ে থাকা ভাল দেখায় না। ওখানে ওদের নিয়ে যেতে পারলেও কথা ছিল। অবশ্য ঠিকেদার জোসেফ মণ্ডল আর রামগতি কুণ্ডু ওকে সেই পরামর্শ ই দিয়েছিল। ভালমত একখানা বাসা দেখে দেবে, সে-কথাও বলেছিল। জোসেফ তার ঠিকেদারির কাজেও অংশীদার করতে চেয়েছিল ভূষণকে। পরামর্শটা ভালই লেগেছিল ভূষণের।

আর তার জন্য যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হত, তা তো নয়। রোগী দেখার ফাঁকে ফাঁকেই সে ঠিকেদারির তদারক করতে পারত অনায়াসে। কোটচাঁদপুরে তখনও ভালভাবে তার প্র্যাকটিস জমে নি। আর জমবার সময় যখন হল, ভূষণ তখন এমন একটা কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে, যে প্র্যাকটিস তো দূরের কথা, তার নাওয়া খাওয়ার সময় পর্যন্ত সে পায় নি। এত পরিশ্রমের পর, ভূষণ বুঝল কোটচাঁদপুরে মশা যেমন প্রচুর, তা নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ তেমনই কম। না আছে সাজসরঞ্জাম, না বইপত্তর। তার উপর লোকগুলোর মনোভাব তেমন অনুকূল নয়। কতকগুলো ফক্কড় লোক তার পিছনে লেগে গেল। একদিন ডিস্‌পেন্সারিতে এসে দেখল, কে বা কারা ওর দরজার পাল্লায় চকখড়ি দিয়ে বড় বড় কাজ করে 'এম ডি' অর্থাৎ 'মশার ডাক্তার' লিখে রেখে দিয়েছে।

মনে মনে দুঃখ পেলেও, ওসব আমলেই আনে নি ভূষণ। বড় বড় কাজ যারা করে এসব ব্যঙ্গবিদ্রূপ তাদের সইতেই হয়। সে জন্য সে কাতর হল না, কাতর হল অন্য কারণে। তার ইনকাম কমে গেল যে। ওখানে টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে পড়ল। সেই সময় আবার শ্বশুরবাড়ি থেকে বউ ছেলেকে নিয়ে ভূষণ বাড়িতে রেখে এল। তখন সবাই পরামর্শ দিল কোটচাঁদপুর ছেড়ে ঝিনেদায় এসে বসতে। কোটচাঁদপুরে বউ আর কচি ছেলেকে নিয়ে যাওয়া সমীচীন বোধ করল না। বড়দারও মত নেই তাতে। দাদাদের সে খুব মান্য করে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভূষণকে অমন সুযোগটা ছেড়ে আসতে হল।

সুযোগ বই কি? তালিমারা প্যান্ট আর হাত-কাটা কোট পরে জোসেফ এসে যখন বোঝাত, ঠিকেদারি এমন একটা জীবিকা যাতে লোকে সহজেই লাল হয়ে উঠতে পারে, কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা থেকেই জোসেফ এ-কথা

বলছে তখন ভূষণের মুখ চোখ চকচক করে উঠত। ঠিকেদারিতে ঢুকে পড়তে পারলে ভূষণ ভালই করত। লাল হয়ে উঠলে সে কি আর পয়সা নিয়ে রোগী দেখত? কক্ষনো না। একেবারে বিনা পয়সায় চিকিৎসা শুরু করে দিত।

এখনও অবশ্য তাকে বিনা পয়সাতেই রোগী দেখতে হচ্ছে। খাতাটায় চোখ বুলিয়ে দেখল, অধিকাংশ রোগীর কাছেই তার টাকা বাকি। বাকির পরিমাণও কম নয়। শ দুয়েক তো হবেই।

ঝিনেদায় এসে মাস তিনেক বসতে না বসতেই এত টাকা বাকি পড়ে গেল। ভূষণ জানে, ও টাকা আর আদায় হবে না। ওরা দিতে পারবে না টাকা। না, অসৎ নয় এরা, কেউ অসৎ নয়। কিন্তু ভূষণ তো জানে ওদের অবস্থা! কী অপরিসীম দুর্দশা ওদের। বেশীর ভাগই না খেয়ে থাকে। টাকা দেবে কোত্থেকে? তার মধ্যেও ক্ষমতা হলেই ওর টাকা শোধ করতে আসে। পরিমাণ হয়তো সামান্য। যার কাছে দশ টাকা সে হয়তো আট আনা নিয়ে আসে। ভয়ে ভয়ে সেই আট গণ্ডা পয়সা ভূষণের দিকে বাড়িয়ে এইসব জীর্ণশীর্ণ মুখগুলো যখন করুণভাবে চায়, তখন ভূষণ যেন সেই পয়সা নেবার জন্য হাত আর পাততে পারে না। এদের মত মানুষ সত্যিই হয় না। ফসল হলে এরা ফসল দেয়। কিছু না পারলে জন খেটেও টাকা শোধ করতে চায়।

ভূষণ ওদের চেনে, ওদের বোঝে। ওরাও খুব ভালবাসে ডাক্তারবাবুকে। তাই ওই অঞ্চলের নিঃস্ব চাষীদের মধ্যে ভূষণের পসার দ্রুত বেড়ে চলেছে। তারই সঙ্গে তাল রেখে ভূষণের আলমারি খালি হয়ে পড়ছে।

ভূষণ যখন নতুন ডাক্তারখানা খোলে, তখন থাককাটা দুটো বড় বড় আলমারি বানিয়েছিল। থাকে থাকে অজস্র শিশি সাজানো থাকত। প্রত্যেক-টিতে তখন আসল ওষুধ ছিল। সব ওষুধের মাদার টিংচার। 'সিক্স এক্স' থেকে শুরু করে 'থাউজেণ্ড ডাইলিউশনের' সব রকম ওষুধ। মহাত্মা হ্যানি-ম্যানের আপন দেশ জার্মানি থেকে আমদানি করা। হয় 'পাউডার অব মিল্ক' আর না হয় নানা রকম মিষ্টি 'গ্র্যানিউলস্' 'গ্লোবিউলস'-এর সঙ্গে মিশিয়ে পুরিয়া করে ওষুধ দিত ভূষণ। পারতপক্ষে জলের সঙ্গে সে ওষুধ দিতে চাইত না। দিলে যে ক্ষতি হত তা নয়, ওটা ভূষণের আভিজাত্যে বাধত।

ভূষণের এখন বড় দুঃখ, তার আসল ওষুধ এসে ঠেকেছে মাত্র ছোট্ট দুটো হোমিওপ্যাথির বাক্সে। আলমারির শিশিগুলোতে এখন শুধু জল ভর্তি। ভদ্রলোক রোগী এলে আগে যেমন ভূষণ বুক ফুলিয়ে আলমারির ডালা খুলে ফেলত, মনোমত শিশিটা তাক থেকে বের করে এনে রোগীর সামনেই ওষুধ বানিয়ে দিত, এখন আর তা পারে না। এখন শিশিটা বের করে নিয়ে সে ছোট্ট একটু পর্দা-ঘেরা জায়গায় চলে যায়। সেখানে সেই আড়ালে দাঁড়িয়ে, শিশিটা একপাশে রেখে দেয়। তারপর সেই ছোট্ট বাক্স খুলে আসল শিশি বের করে ওষুধ বানায়। এই তঞ্চকতা তার ভাল লাগে না। কিন্তু সে যে বড় ডাক্তার, তার ওষুধ যে অফুরন্ত, সে-কথা বোঝাবার আর তো দ্বিতীয় কোন রাস্তাও নেই। সব থেকে বড় আপসোস ভূষণের এই, জার্মানি থেকে সরাসরি সে আর আজকাল ওষুধ আনাতে পারছে না। কিছুদিন আগে পর্যন্তও আনাতে পেরেছে। খাস জার্মানির বড় ফার্মের খাতায় তার নাম উঠেছিল। সেখান থেকে কত ক্যাটলগ আসত, ব্লটিং পেপার, প্রিন্টিং কার্ড, মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর ক্যালেণ্ডার! গর্বে ভূষণের বুক ফুলে উঠত। প্যাকেটের মোড়ক, চিঠির খাম, টিকিট সমেত টেবিলের উপর এমনভাবে রেখে দিত যেন সহজেই লোকের নজরে পড়ে।

আজ ভূষণ শুধু একজন গেঁয়ো ডাক্তার। জীবনে কিছু করতে না পেরে কিছু লোক যেমন বাড়ি বসে মহেশ ভট্চাযির বই পড়ে 'এম-বি (হোমিও)' হয়ে ওঠে, ভূষণও যেন তাদের গোত্রেরই একজন হয়ে উঠেছে। সে যে একদিন মেডিকেল স্কুলে অ্যালোপ্যাথি পড়তেই ঢুকেছিল, তিন বচ্ছর পড়েছিল, ক্লাসের সেরা ছেলে ছিল, অ্যালোপ্যাথি পড়া ছেড়ে না দিলে যে সে আজ মেরিটের সঙ্গে এল এম এফ হয়ে বেরত, এ কথা তো কেউ জানে না।

না, জানেন। তাঁর শিক্ষক, তাঁর গুরু প্রতাপ মজুমদার জানেন। প্রতাপ মজুমদারের মত অত বড় একজন ডাক্তার অ্যালোপ্যাথি প্রাক্‌টিস্ ছেড়ে হোমিওপ্যাথিতে মন দিলেন। চৌষট্টি টাকা ভিজিট ছিল তাঁর। সোজা কথা। সেই লোক গড়পারে কলেজ খুললেন হোমিওপ্যাথির। ভূষণ এসে তাঁর কলেজে যোগ দিল। প্রতাপবাবুর সেই খুশিতে-ফেটে-পড়া মুখ এখনও যেন দেখতে পায় ভূষণ। গোল্ড মেডেল নিয়ে সে পাশ করেছিল। বিদেশে যাবার বৃত্তিও যোগাড় করে দিয়েছিলেন সার্। আশা করেছিলেন ভূষণ

একদিন কলকাতার নামকরা ডাক্তার হবে। এখনও ভূষণের হাতের পোঁতা একটা গাছ তাঁর কলেজের গেটের পাশে রয়েছে।

তার উপর ভূপতিরও খুব আশা ছিল। ভূপতি তার সেজদা। ভূষণ এরকম একটা লোক খুব কমই দেখেছে। যে সময়ে দেশের লোক বিলাত যাচ্ছে শুধু আই সি এস আর ব্যারিস্টার হয়ে আসতে, সে সময় তার সেজদা জাপানে গেলেন। যন্ত্রবিদ্যা শিখতে পয়সাকড়ি ছিল না তাঁদের। তবুও সেজদা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন।

তা বিলাত না গিয়ে জাপানে কেন? সেজদার দূরদৃষ্টি ছিল, দেশপ্রেমও ছিল। সেজদা বলতেন, ইংরেজ আমাদের দেশটা দখলই করেছে. তার শিল্পসম্ভার বিক্রির একচেটিয়া বাজার করে রাখবে বলে। এখান থেকে সস্তায় কাঁচা মাল কিনবে আর নিজের দেশের কলকারখানায় তাই দিয়ে মাল তৈরি করবে। আবার সেই সব মাল প্রচুর লাভ রেখে আমাদের কাছে এনেই বিক্রি করবে, করছেও। আমাদের গোটা জাতকে চাকর বানিয়ে রাখবে ওরা। রাখছেও। কোটি কোটি টাকা লুঠছে ওরা। লুঠবেও। অন্য কথা ছেড়েই দেওয়া গেল, এ দেশে একটা সূঁচও তৈরি হতে দেবে না ইংরেজরা। চিরকাল ওদের হাত-তোলা হয়ে থাকতে হবে আমাদের। আমরা তা যদি বন্ধ করতে চাই তো শিল্পপ্রতিষ্ঠার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। এ বিষয়ে জাপান আমাদের গুরু। জাপান ইউরোপের কাছ থেকে কী কৌশলে তার বিদ্যা আয়ত্ত করল, কী কৌশলে ইউরোপকে হঠাল, সেই গুরুমারা বিদ্যেটা শেখবার জন্যই সেজদার আগ্রহ ছিল। শিখেও এসেছেন। সেলুলয়েড শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছেন দেশে। এখন ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের উপর নজর পড়েছে তাঁর। এবার ফ্যাক্টরি গড়তে মন দিয়েছেন।

সেই সেজদার খুব ইচ্ছে ছিল, ভূষণ আমেরিকায় যায়। সেখান থেকে ডিগ্রী নিয়ে আসে। টাকাপয়সা যোগাড় করে দিয়েছিলেন তিনি। পাস-পোর্ট হয়ে গিয়েছিল তার। জাহাজের টিকিট, পোশাক-টোশাক কেনাও হয়ে গিয়েছিল। ভূষণ নিজেই সে-সব ভেস্তে দিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে পালিয়ে গিয়েছিল। একেবারে নিরুদ্দেশ। সবাই জানে, ভূষণ মায়ের জন্যই যায় নি, যেতে পারে নি আমেরিকায়। আসল কথা কেউ জানে না। যে জানে সে ভূষণ, আর একজন হয়তো জানে। কিন্তু তার কথা এখন থাক্।

আমেরিকায় না গিয়ে তার যে খুব ক্ষতি হয়েছে, ভূষণ তা মনে করে না। বিদেশী ডিগ্রীতে তার সম্মান বাড়ত। কলকাতায় বসলে তার পসারও হত। কিন্তু কলকাতায় ডাক্তারি করতে তো সে চায় নি। সে গ্রামেই বসতে চেয়েছে। বিদেশী ডিগ্রী নিয়ে এখানে বসলে বেনাবনে মুক্তা ছড়ানোই হত। কিংবা এও তো হতে পারত, তখন আর ভূষণের গ্রামে এসে বসতে মনই চাইত না। সবাই যদি কলকাতায় যাবে, তবে গ্রামে থাকবে কে?

গ্রামের লোকের হাতে পয়সা নেই, ভূষণ তা জানে। এও জানে, এদের চিকিৎসার কত দরকার। অ্যালোপ্যাথী চিকিৎসা ছাড়ার একটা প্রধান কারণও তাই। পয়সা কোথায় যে, দামী দামী সব ওষুধ কিনবে এরা? রোগী দেখলেই তো অসুখ সারবে না। প্রথম থেকেই ভূষণের কিন্তু এই চিন্তা ছিল। এমন একটা চিকিৎসা-পদ্ধতির কথা সে ভাবছিল যা নিতান্ত গরিবও অনায়াসে গ্রহণ করতে পারবে। এই হোমিওপ্যাথিই সে চিকিৎসা। হ্যানিম্যান, মহাত্মা হ্যানিম্যান এ যুগের সেই অশ্বিনীকুমার।

একটা দমকা বাতাস এল। ভূষণের টেবিল থেকে ফরফর করে কতকগুলো হ্যাণ্ডবিল উড়ে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেয়। ভূষণ তাড়াতাড়ি করে সেগুলো গুছিয়ে তুলতে লাগল। ভূষণেরই বিজ্ঞাপন। হাটে হাটে সে যেগুলো ছড়িয়ে দেয়। এগুলো বের করে রেখেছিল মনিরুদ্দীর হাতে দেবে বলে। আর্ত-কল্যাণ চিকিৎসালয়। এটা বড় বড় হরফে লেখা। ভূষণ বিজ্ঞাপনখানায় চোখ বুলিয়ে নিল। ডাঃ ভূষণচন্দ্র বসু, এম-বি, (হোমিও)। এটার হরফও বেশ বড় বড়। বেশ লাগে ছাপার হরফে নিজের নামটা পড়তে। গোল্ড-মেডেলপ্রাপ্ত। গোল্ড মেডেল কী, সে কথা অনেক রোগীই বুঝতে পারে না। তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করে। ফার্স্ট হয়েছিলাম কি না, সে গর্বের সঙ্গে জবাব দেয়। 'ফার্স্ট' কী তাও হয়তো জানে না ওরা, হাঁ করে থাকে। কলকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজের ভূতপূর্ব হাউস ফিজিসিয়ান। এই কথাটা বেশ গালভরা। ভূষণের প্রেস্টিজ বাড়িয়ে দেয়। সাত বৎসরের অভিজ্ঞ চিকিৎসক। না, আর সাত নয় তো, আট— এই নতুন সালে তাঁর অভিজ্ঞতা যে আট বছরে পড়ল। ভূষণ তৎক্ষণাৎ ভুলটা সংশোধন করতে বসে গেল। প্রত্যেকটা বিজ্ঞাপনে কালি দিয়ে সাত কেটে আট বসাতে লাগল। এগুলো ফুরলে আবার নতুন করে ছাপাতে দিতে হবে হ্যাণ্ডবিল।

কিন্তু, কিন্তু সাইনবোর্ডের কী হবে? ওখানেও যে সাত বৎসর লেখা আছে। আবার নতুন করে লিখিয়ে নেবে নাকি? অনর্থক টাকা খরচ হবে আবার। তা হলে উপায়? তার অভিজ্ঞতার বয়স বছর বছরই তো বাড়বে। কিন্তু সাইনবোর্ডে তো অত সহজে আপ-টু-ডেট বসানো যাবে না বছরগুলো। তা হলে। একটা মিথ্যে ধারণা লোকের মনে ঢুকিয়ে দেবে ওই সাইনবোর্ডটা আর নয়তো বছর বছর টাকা খরচ করাবে। আর কি কোনও পথ নেই? এমন কোনও ব্যবস্থা করা যায় না, যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে? মাথায় চিন্তা ঢুকে গেল ভূষণের।

কিন্তু মনিরুদ্দীর হল কী? এতক্ষণেও এল না! আসবে তো, না কী? আর তো দেরিও করতে পারে না সে। বাড়ি যেতে যেতে খুব বেলা হয়ে যাবে। না খেয়ে বসে থাকবে গিরিবালা।

টাকা দুটোর আশা শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিল ভূষণ। ডাক্তারখানা বন্ধ করে সাইকেলে উঠতে যাবার আগে সাইনবোর্ডখানায় একবার নজর পড়ল। সাত বৎসরের অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তাকে যেন জব্দ করার ফন্দি এঁটেছে ওটা। নাঃ, এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

তিন

খেয়াঘাটে এসে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল ভূষণ। খাঁ-খাঁ রোদে একটানা তিন মাইল পথ সাইকেল চালিয়ে এসে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। কলকল করে ঘাম গেঞ্জির নীচে দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। বল্লভ পাটনির ঘরের কাছে, আমবাগানের ছায়ায় এসে সে দাঁড়াল।

বল্লভকে এখন আর নৌকো বাইতে হয় না। নবগঙ্গা মজে এসেছে। এখন এপার ওপার এক বাঁশের সাঁকো তৈরি হয়েছে। আড়াআড়ি বাঁশ পুঁতে পুঁতে তার উপর দিয়ে একখানা করে বাঁশ লম্বালম্বি ফেলে দেওয়া হয়। ওই ল্যাগবেগে বাঁশের উপর দিয়ে সবাই পারাপার করে। আর একখানা করে বাঁশ বাঁধা হয় একটু উপরে, যাতে হাত দিয়ে সেটা ধরে টাল সামলাতে

পারা যায়। বাঁশগুলো শক্ত করে বাঁধাও থাকে না সব সময়। কোন কোন বাঁশ পা পড়া মাত্র বোঁ করে ঘুরে যায়।

আষাঢ় মাসের জল এলে বল্লভকে নদীতে নৌকো নামাতে হয়। কার্তিক মাস পর্যন্ত নৌকো এক রকম করে খেয়া মারতে পারে। অঘ্রাণ মাসেই সব থেকে মুশকিল। এদিকে কাদা, ওদিকে কাদা, মাঝখানের খানিক দূর জল। বল্লভ কষ্টেসৃষ্টে সেটুকুতেই খেয়া মারে। পৌষ মাসে সাঁকোটা বাঁধতেই হয়। জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্যন্ত সেইটেই ভরসা। জোয়ান পুরুষদের বিশেষ অসুবিধে হয় না। সাঁকো তারা অনায়াসেই পার হয়। মুশকিলে পড়ে মেয়েরা,বুড়োরা। প্রতি বছর ভূষণদের ওদিককার ওই কয়েকখানা গ্রামে এই অসুবিধা নিয়ে আলোচনা হয়, দলাদলি হয়। কিন্তু সাঁকোর আর সুরাহা হয় না।

বল্লভ পাটনি বুড়ো হয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই সে ভূষণকে দেখে আসছে। ঘরের দরজায় বসে বসে কড়া তামাক টানছিল। ভূষণকে দেখে হাসল। ভূষণও।

বল্লভ বলল, শুনিছ তো ও ভূষণবাবু, কাল হন্তেকুড়োয় প্রেসিডেণ্টের বাড়ি মিটিং হয়ে গেছে।

ভূষণ বলল, কিসের মিটিং বল্লভ খুড়ো?

বল্লভ গুড়ুক গুড়ুক হুঁকোয় টান মেরে বলল, রাবণের স্বগ্‌গে উঠার সিঁড়ি বাঁধার গো।

ভূষণ বলল, তা যা বলেছ। আমাদের পুল বাঁধা, ওই স্বর্গের সিঁড়ি তৈরির মতই। ও হবেও না।

বল্লভ বলল, ভাল দেখিছ! কাজের বেলা সব অষ্টরম্ভা, গলাবাজিতি দড়। তুমাগের ওই নকুলে বক্সী আবার আমার নামে প্রেসিডেণ্টের কাছে নালিশ করিছে। আমি নাকি কিছু করি নি। করি নে। আরে আমি করব কী? নদীতি জল যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তুমাগের পার করে দিই। একদিনির তরেও কসুর করিছি, বলুক দিনি কেউ? সাঁকো কি আমার বাঁধার কথা! তুমাগের কষ্ট হয়, তাই উজ্জুগ-আয়োজন করে দিই। আমি রাজার চাকর। কাছারির মাইনে খাই। তোগের প্রেসিডেণ্টের আমি ধার ধারি?

বল্লভ চটে গেল। পাকা পাকা মোটা ভুরু উঁচিয়ে যেন নকুলে বক্সীকে শাসাল।

বলল, তুমার প্রেসিডেন্টেরই তো সাঁকো বাঁধার কথা। বাঁধে না ক্যান রে বাপু? নালিশ, বক্সীর বিটার বড় নালিশির গলা হয়েছে!

ভূষণ বলল, আরে, ওর কথা ছেড়ে দাও।

বল্লভ বলল, দুঃখু হয় না, শুনলি? মানুষির মত মানুষ তো দেখি এক ওই ভূপতিবাবুরি। দেশে যদি থাকত, দেখতে এতদিনি এখেনে পাকা পুল বানায়ে ছাড়ত।

ভূষণ সায় দিয়ে গেল। কথাটা ঠিক। গ্রামের যা কিছু উন্নতি হয়েছে, সব সেজদার জন্যে। জাপান থেকে ফিরে কদিনই বা গ্রামে ছিলেন। তার মধ্যেই ছেলেদের জুটিয়ে নিয়ে বন-জঙ্গল কেটে, খানা-ডোবা বুজিয়ে গ্রাম থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল করে দিয়ে গিয়েছিলেন। কাজ ছাড়া সেজদা এক মুহূর্তও থাকতে পারেন না। প্রাইমারি ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করে, ইস্কুলের পাকা বাড়ি গেঁথে দিয়ে গিয়েছেন সেজদা।

আর গ্রামের লোক তার বদলে তাঁকে কী পুরস্কার দিয়েছিল? একঘরে করে রেখেছিল তাঁদের। নকুলে বক্সীর কাকা বিলে বক্সী ছিল সে ঘোঁটের পাণ্ডা। তা একঘরে করে করলেটা কী? নলডাঙার রাজা নিজের ছেলের পৈতেতে নেমন্তন্ন করলেন সেজদাকে। এক পংক্তিতে খেতে বসলেন তাঁকে নিয়ে। বিলে বক্সী কী কম জ্বালিয়েছে তাঁদের! ওর মেয়ে পারুল, না, পারুলের কথা আর ভাববে না ভূষণ। সে এখন পরস্ত্রী। সম্ভবত সুখেই আছে। সুখেই থাক্ সবাই। এ-সংসারের কারো সম্পর্কেই মন্দ ভাবে না ভূষণ। ভাবতে সে পারেও না। তার ধারণা, যা ঘটে ভালর জন্যই ঘটে।

ভূষণ বলল, চলি গো বল্লভ খুড়ো। বেলা হয়েছে।

বল্লভ বলল, হ্যাঁ শোন, মাজার সেই ফিকির ব্যথাটা আবার চাগাল দিয়ে উঠিছে। সুজা হতি পারতিছি নে। কী করি কও দিনি?

ভূষণ বলল, সেই যে তার্পিন তেল এনে দিয়েছিলাম, আছে, না ফুরিয়ে গিয়েছে?

বল্লভ বলল, আছে বোধ হয়।

তা হলে আজ রাতে তাই বেশ করে মালিশ করে দেখ। যদি না কমে কাল একটা ওষুধ দেব।

বলেই ভূষণ ঢালু বেয়ে সাইকেলখানা সাবধানে নামিয়ে নিল। সাঁকোর

কাছে এসে কাঁধে তুলল সাইকেল। তারপর সন্তর্পণে বাঁশের উপর পা দিতেই বাঁশখানা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল।

পায়ের নীচে আর জল দেখা যায় না। শুধু কচুরিপানা আর দামকলমী। নদীটা যেন একটা কঠিন সবুজে জমাট বেঁধে রয়েছে। ওই দূরে, যেখানে খানিকটা জল চিকচিক করছে, সেখানে বঙ্কু জেলে বাঁশ পুঁতে জাল ফেলে রেখেছে। বাঁশের মাথায় মাথায় বক আর মাছরাঙা বসে আছে। আর এপাশে পেতেছে গোটাকতক সাগড়া। চাঁছা বাঁশ দিয়ে তৈরি তিনকোণা সাগড়াগুলোর যে-কটা নদীর পাড়ে পড়ে আছে, সেগুলোকে দূর থেকে দেখলে বড় বড় সিঙাড়া বলেই মনে হয়। ওগুলোর ভিতর বাবলার ডাল ভরে জলে ফেলে দেয় বঙ্কু। বাবলার ডাল খেতে ওর ভিতর মাছ ঢোকে। সকালে গিয়ে সে-সব টেনে সে ডাঙায় তোলে।

ঝিঁঝি দাম, কলমি আর কচুরিপানার উপর তেজাল রোদ পড়ায় অসহ্য এক ভ্যাপসা গরম ছুটছে। আর জল, কাদা আর দামের এক মিশ্র গন্ধ নাকে এসে ঢুকছে ভূষণের। চিলগুলো উড়ছে আর মাঝে মাঝে কাতর স্বরে ডেকে উঠছে। মডিপড়া গরুগুলো একহাঁটু জলে দাঁড়িয়ে শ্রান্ত চোয়ালে পটাস পটাস ঘাস ছিঁড়ছে। একটা জলঢোঁড়া অতিকষ্টে দামের জঙ্গল ঠেলতে ঠেলতে চলে গেল। হা-ম্বা—বাছুর ডেকে উঠল। সদ্যবিয়ানো একটা ছাগী তিনটে বাচ্চা নিয়ে ঘাস খুঁটতে খুঁটতে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সাঁকোটা পার হতে ভূষণ যেন নেয়ে উঠল। সাইকেলটা এরই মধ্যে তেতে উঠেছে। পাড়ে নেমে সাইকেলটা কাঁধ থেকে নামাল ভূষণ। কাঁধটা একটু ডলে নিল। রুমাল বার করে মুখের ঘাম বেশ করে মুছল। তারপর সাইকেলে উঠে চলতে শুরু করল বাড়ির দিকে।

খেয়াঘাট থেকে একটা মাঠ পেরিয়ে গ্রামে ঢুকতেই, মুখেই যে দোতলা কোঠা বাড়িটা পড়ে সেটা ভূষণদেরই জ্ঞাতি পাগলা বোসের বাড়ি। বাড়ির কর্তা বহুদিন যাবৎ পাগল। রাস্তার ধারে, দোতলার ঘরে তালা দিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। গ্রামে কাউকে ঢুকতে দেখলেই তিনি চিৎকার করেন, কে-ও, খাজনা দিয়েছ? ছেলেবেলা থেকেই সে এটা শুনে আসছে। প্রথমে ভয় পেত, আরেকটু বড় হলে সে মজা পেত, এখন বড় কষ্ট হয় তার।

ভূষণের সাইকেলের আওয়াজ পেতেই তিনি জানলার দিকে ফিরে ঝুঁকে পড়লেন। মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করলেন, কে-ও! খাজনা দিয়েছ?

ভূষণ কোন দিকে না চেয়ে এগিয়ে গেল। ওই বাড়িখানার পরেই কৈবর্তপাড়া। চুণ তৈরি করে বাইতিরা। কলি-চুণের ভাঁটিগুলোর পাশে পাশে বিস্তর ঝিনুক শামুক ডাঁই করা হয়েছে। এখানটা একটু সাবধানে পার না হলে সাইকেলের টায়ার ফাটবার আশঙ্কা। যে পরিমাণ ভাঙা শামুক ছড়িয়ে রাখে চারদিকে! ভাঙা শামুকের খোলায় বেজায় ধার। তারপরেই বঙ্কু জেলের বাড়ি। তারপর রাস্তার দু পাশে রাংচিতে আর পাতাবাহারের বন। সেটা পেরুলেই একতলা ইস্কুল বাড়ি। দুদিকে দুটো রাস্তা বেরিয়ে গেল। বাঁয়ের রাস্তা ধরে এগুলেই হরিসভা, আমকাঠালের বন। তারপরেই মাটির পাঁচিল দিয়ে চতুর্দিকে ঘেরা ভূষণদের বাড়ি।

ভূষণ সাইকেল থেকে সদরে নামল। রাঙ্গী গাইটা বাছুরকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। এগিয়ে এসে ভূষণের দিকে গলা বাড়িয়ে দিল। বড্ড আদুরে গাই। ভূষণ সস্নেহে হেসে ওর গলায় হাত বুলিয়ে দিল। তারপর হুড়কো খুলে ভিতরে ঢুকল।

বক্সী মশাই ভূষণকে দেখেই এগিয়ে এলেন। রোগা দড়ি-পাকানো চেহারা। হাঁপানির রোগী। বয়েস হয়েছে বেশ। কত, বলা মুশকিল।

বক্সী মশাই ফিসফিস করে বললেন, ভূষণ, বাড়িতি তো আজ কুরুক্ষেত্তর। খুব ধুম হয়ে গেছে। বাড়ির মেয়েরা ঘরে দরজা আঁটে পড়ে আছেন। রাঁধিছেন কি না কবে কেডা? পেটে দড়ি বাঁধে পড়ে থাক।

ভূষণ অবাক হল। জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কী?

বক্সী মশাই বললেন, আরে, এ-বাড়ি গোলামাল বাধাতি আবার ব্যাপার লাগে নাকি? ছোট বউমা ভাত নামাতি যায়ে বুঝি পা পুড়য়ে ফেলিছেন। বড়বাবু বাড়ি আসে তাই শুনে অ্যাইসা আড়ারাম তাড়ারাম করতি লাগলেন যে, বড়বউ ঘরে গিয়ে দরজা দেলেন। মেয়েগুলোও রাগ করে শুয়ে পড়িছে। ছাখ দিনি কী গেরো, বাড়িাত দুই খালুই মাছ আলো, কনে আরউ ভাবলাম আত্মারাম আজ সধবা হবে, তা না হরি মটর চিবোয়ে আছি। তা না-হয় আমরা চিবোলাম, কিন্তু জনেগের কী হবে? একটু পরেই তো তারা খাই-খাই করে আসে পড়বে নে।

ভূষণের যদিও প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছিল, তবু সে মেজাজটা খারাপ করল না। বক্সী মশাইয়ের রসিকতা সে উপভোগই করল। দুনিয়া সম্পর্কে ভূষণের পরিষ্কার একটা হিসেব আছে। সে কোন ব্যাপারে নালিশ বড় একটা জানায় না। সত্যিই তো, আঁতে ঘা লাগলে, মেয়েদের রাগ হতেই পারে। রাগ হলে ঘরের দরজা দেওয়াটাও মেয়েদের প্রকৃতির বাইরে নয়। এখন দুটো রাস্তা ভূষণের সামনে—এক উপোস দেওয়া; আর দুই রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করা। উপোস দিতে ভূষণ পিছপাও নয়। হাসিমুখেই সে না খেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সে কখন? যখন ঘরে খাবার কিছু থাকে না, তখন? এখন ঘরে যখন খাবার রয়েছে, তখন সে খামাকা কেন শরীরকে কষ্ট দেবে? কেউ যদি রান্না না-ই করে, সে-ই না হয় আজকের মত কাজটা চালিয়ে দেবে।

ভূষণ ভিতরে এসে ক্লিলিলিং করে বেলটা বাজাল, কোন ঘর থেকেই কেউ সাড়া দিল না। তাঁর নিজের ঘরের ডোয়ার ছায়ায় সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে ভিতরে উঠে গেল।

গিরিবালা ঘুমুচ্ছে। তার মুখে খানিকটা যন্ত্রণার ছাপ লেগে আছে। দু চোখের কোণা বয়ে কখন যেন জলের ধারা নেমেছিল, এখন জল নেই, মরা সোতার মত দেখাচ্ছে। কোলের মধ্যে ছেলেটাও ঘুমিয়ে রয়েছে।

ভূষণ একবার উঁকি মেরে গিরিবালার পা-টা দেখে নিল। পোড়ে নি, ফোস্কা পড়েছে পায়ে। ও কিছু না। এক ডোজ আনিকা থার্টি খাইয়ে দিলেই ব্যথার ভাবটা কমে যাবে। ভূষণ নিশ্চিন্ত হল। এখন বরং গিরিবালা ঘুমোক খানিকটা। ভূষণ জামা-কাপড় ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

প্রথমে দেখতে হবে দাদা এখন কোথায়? ভূষণ ভাবল। মার ঘরে গেল। মা একেই ভীতু মানুষ, তারপর আজকের এই হাঁকডাক। নিজের রান্নাবান্না সব সেরে চুপ করে বসে আছেন। ভূষণকে দেখে বুকে বল পেলেন।

ফিসফিস করে বললেন, ও ভূষণ, সব্বনাশ হয়েছে আজ। বউমার পা পুড়িছে। তার উপর বিলেস আজ বড় বউমারে তাই নিয়ে পিরায় মারে আর কি? তাতেপুড়ে আলি, ক্ষিদের তো তোর মুখ শুকয়ে গেছে। খাবি? আমার ভাতগুলোই খায়ে নে।

ভূষণ বলল, তা হলে আপনি খাবেন কী?

বুড়ির দু চোখ ভেসে গেল জলে।

বললেন, আমার আবার খাওয়া। বাড়ির কেউ দাঁতে একটা কুটো কাটল না, আর আমি বুড়ো মাগী দাড়ি জুবড়োয়ে খাই। তা কী হয়?

ভূষণ বলল, আমি ব্যবস্থা করছি, আপনি ভাববেন না। বড়দা কই?

বুড়ি ঠাকুরঘরটা দেখিয়ে দিলেন। ভূষণ উঠে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এল, বিলাস ধ্যানে বসেছেন। বোধ করি চিত্তশুদ্ধিই করছেন।

বিলাসের রাগটা কিছু বেশী। থপ্ করে জ্বলে ওঠেন। ব্যস্তবাগীশ লোক। কিন্তু মনটা বড় ভাল। কারো মনঃকষ্টের কারণ হয়েছেন তিনি, এটা যে-মুহূর্তে বুঝতে পারেন, অমনি প্রায়শ্চিত্ত করার একটা ঝোঁক প্রবল হয়ে ওঠে। ঠাকুরঘরে ঢুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চিত্তশুদ্ধি করেন। রাধাগোবিন্দের শ্রীচরণে আছাড় খেয়ে পড়ে কৃত অপরাধের জন্য মার্জনা চাইতে থাকেন। আজকের দিনটা অনশন চলবে তাঁর।

বড়বউয়ের রাগ পড়ে গিয়েছে। তিনি উঠলেন। তাঁর আবার ক্ষিদেটা কিছু বেশী। ক্ষিদে যত বাড়ে, ততই তাঁর রাগ-অভিমান কমে আসে। ঠাকুরপো এসে গিয়েছে। আহা, বেচারার ক্ষিদে পেয়েছে খুব! সেই সকালে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। মেয়েগুলোও তো কিছু খায় নি।

বউবউ ডাকলেন, চম্পি, ও চম্পি! যুথি, ও যুথি!

যুথি উঠে এল। চম্পি সাড়া দিল না।

বড়বউ বললেন, হেঁসেলে চল্, মাছগুলো বাছে দে। চম্পি গেল কনে?

যুথি গোমড়ামুখে বলল, ঘুমচ্ছে।

বড়বউ বললেন, অবেলায় ঘুমোলি কী চলে? উঠোয়ে দে। কাকা বাড়ি আসে গেছে। ছাখ্ দিনি তোর বাবা গেলেন কনে?

যুথি বলল, বাবা তো সেই কখনের থে ঠাকুরঘরে ঢুকিছেন।

অ্যাঁ, ক'স কী?

বড়বউ তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন, এই রে, পিরাশ্চিত্তির করতি বসল না কি?

বললেন, ছাখ্, ছাখ্, কী করতিছে, দেখে আয়।

বড়গিন্নীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। বিলাসের চিত্তশুদ্ধিকে দামিনীর বড় ভয়। স্বামী যদি সারাদিন না খেয়ে চিত্তশুদ্ধি করতে থাকে তো সতী-

সাধ্বী স্ত্রীর অবস্থা কী দাঁড়ায়! সেটা ভেবেই বড়বউয়ের চোখে অন্ধকার নেমে এল। তাঁকেও যে এখন শুকিয়ে থাকতে হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা আছে তো! দামিনী পারতপক্ষে বিলাসের চিত্তশুদ্ধির কারণ হতে চায় না। গোলমাল এড়িয়ে থাকার চেষ্টাই করে। তবু কখনও কখনও বেধে যায়। এই আজ যেমন হল। কী সাজা বল দিনি?

বড়গিন্নী রান্নাঘরে এসে দেখেন, ভূষণ ওর মধ্যেই একটা গোছগাছ করে ফেলেছে। ভাতের হাঁড়ি সরিয়ে রেখেছে। নেবা উনুনে কাঠ ধরিয়েছে আবার। আধ-সাঁতলানো ডাল চাপিয়ে দিয়েছে। বাড়ুন দিয়ে কলমির জঙ্গল সাফ করছিল, এমন সময় বড়গিন্নী ঘরে ঢুকলেন।

বড়গিন্নী একটানে বাড়নটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করলেন। ধমকে দিলেন ভূষণকে।

অশৈলে রাখ। যাও এখেনের থে। আর কাজ দেখাতি হবে না। ও চম্পি, ওলো যুথি, দেখ্‌সে আয়, তোগের কাকার কাণ্ড।

এতক্ষণে চম্পি উঠে এল। ঘরে ঢুকে একনজর চেয়েই হেসে ফেলল।

মরি মরি, বাড়ুন হাতে কী রূপই তুমার খুলিছে ছোটকাকা! কাকীমা দেখলি ভিরমি খায়ে পড়বে নে!

ভূষণ ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, আহা, বেচারাদের জন্য বড় দুঃখ হচ্ছে। একটা দিন রাগ করে শুয়ে থাকবে। শত্তুররা তা-ও দেবে না।

বড়গিন্নী বলল, রঙ্গের কথা না ভাই। মেয়ে হয়ে জন্মাইছি বলে গণ্ডারের চামড়া তো আর গায় দিই নি। মান-অপমান সকলেরই সুমান।

ভূষণ হেসে ফেলল।

তাই তো আমিও বলছি। তবে এটা দেখা গেল, রাগ পুষে রাখার ভাল সাজ-সরঞ্জাম এ-বাড়িতে নেই। তোমার ওই রোগা শরীরে আর কতটুকু রাগ ধরবে! হ্যাঁ, গতর হবে কুল বক্সীর বউয়ের মত। বসতে তিন কাঠা জায়গা লাগবে, যাতায়াত করতে খান দুয়েক ঘোড়ার গাড়ি লাগবে। নাকে এ-টা একপোয়া ওজনের নথ থাকবে। ওই রকম একজন কেউ যদি রাগে তো সেই হল আসল রাগ। বাড়ির লোক থরহরি কম্পমান, গ্রামের লোক তটস্থ। তাই সকলের সদা-সর্বদা চেষ্টা থাকে, লোকটা যেন না রাগে। তোমাদের হল—

বড়গিন্নী হাসতে হাসতে বললেন, এখন যাও দিনি, আর জ্বালায়ে না।

ওই কুল বক্সীর বউর সঙ্গে পার তো তুমার দাদারে বিয়ে দিয়ে দাও। কুল বক্সীর বউর রাগ আর উনার পিরাশ্চিত্তির, একেবারে রাজযোটক হবে নে।

ভূষণ হাসতে লাগল।

বলল, জনদের ভাত দেবার যোগাড় কর। ওদের চানটান সারা। আর সেই সঙ্গে বক্সী মশাইকেও দিয়ে দাও।

বড়গিন্নী বললেন, তুমিও বসে পড়।

চম্পি বলল, ছোটকাকীমার পা-টা কি দেখিছ?

ভূষণ বলল, হ্যাঁ, ও তেমন কিছু না। ফোস্কা একটু বেশী পড়েছে, এই যা।

চম্পি বলল, পাগলামিটা একবার দ্যাখ দিনি। ওই হাঁড়ি কি একা নামান যায়? আমরা বসে আছি এখেনে। মুখির কথাডা খসালিই তো উঠে গিয়ে ধরতি পারি।

ভূষণ বলল, ভাবিস নে, এখানে, এই উনুনের উপরে একটা ছোট্ট কপিকল খাটিয়ে দেব। আর ওই ডেকচির গায়ে আংটা লাগানো থাকবে। ভাত হয়ে গেলেই আংটার গায়ে একটা শিকল পরিয়ে কপিকলে আটকে দিবি তোরা। তারপর টেনে টেনে নামিয়ে ফেলবি ভাত। অতি সহজেই ভাত নামানো যাবে। ওই ডেগ তো তুচ্ছ, ওর ডবল ডেগও তোর মত লোক অনায়াসে নামাতে পারবে। একাই পারবে। এটা বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে না চললেই দুর্ঘটনা অনিবার্য। দাঁড়া কাল-পরশুর মধ্যেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

আইডিয়াটা হঠাৎ মাথায় এসে গেল ভূষণের। এর সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার কথা ভেবে তার শরীরে রোমাঞ্চ হল।

বড়গিন্নী এক ধমক দিলেন, আরে রাখ। রান্নাঘরে উনি কপিকল টাঙাবেন! যত অশৈলের কথা। আমাগের জন্যি ভাবে তো আর ঘুম হচ্ছে না কারো! বলি, আজ এক মাস ধরে যে বলছি—কাপড় নেই, কাপড় নেই, তা সে বুঝি কানে যাচ্ছে না। ছিঁড়া ধুলি-ধুলি কাপড় পরে সোমত্থ মেয়েরা চোখির উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে বেলায় তো মদ্দগের এত ভাবনা হয় না। রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ি নামাতি উনি কপিকল আনবেন! বলি, মেয়েগুলোন কী কপিকল পরে বেরোবে।

বড়গিন্নীর ধমক খেয়ে ভূষণ একটু বিব্রত হল। কারণ বড়বউদির অভি-

যোগটা সত্যি। অস্বীকার করার উপায় নেই। এই সব অসুবিধাজনক প্রশ্নের সামনে পড়ে গেলে ভূষণ খুব অস্বস্তি বোধ করে। কাপড় কিনতে টাকা লাগে। রোগীদের টাকা দেবার অবস্থা আছে নাকি? এসব কথা বাড়ির মেয়েরা বোঝে না। ওরা বেজায় স্বার্থপর। দুনিয়া রসাতলে যাক, আমার কাপড়টা হয়ে গেলেই হল, এই ওদের মনোভাব। কোন ভাল জিনিস ওরা বোঝে না। বুঝবে না তো। স্বার্থপর যে!

এই যে কপিকলের ব্যাপারটা, এটার কথাই ধরা যাক। যত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বড়গিন্নী করছেন, অমন ফুস করে উড়িয়ে দেবার জিনিস এটা নয়। আমাদের দেশের কোটি কোটি নারী এর সুবিধে ভোগ করবে। হাত দিয়ে গরম হাঁড়ি-কড়াই নামাতে নিত্য যে কত দুর্ঘটনা হয়, কত মেয়ের হাত-পা পোড়ে, যন্ত্রণা পায়, পুড়ে মরে, তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে? সামান্য একটা যন্ত্র, একটা কপিকল ফিট করে দিলেই কিন্তু এসব এড়ানো যায়। নিরন্তর আগুনের তাতে থাকতে থাকতে কত রকম ব্যাধি মেয়েদের, সে-সবও কমে যেতে পারে।

প্রথমে নিজের বাড়িতে পরীক্ষা করে দেখে যদি সুফল পেত ভূষণ, তা হলে চাই কী, এটা পেটেণ্ট করে সে ব্যবসাও ফাঁদতে পারত। "ডাঃ ভূষণচন্দ্র বসু আবিষ্কৃত রান্নাঘরের কপিকল" অথবা ইংরাজীতে "ডাঃ বোসেস্ কুকিং পুলি"। এই কল ব্যবহার করিলে মাতৃজাতি রান্নাঘরের মারাত্মক দুর্ঘটনা এবং অনর্থক পরিশ্রম হইতে চিরতরে মুক্তিলাভ করিবেন। খবরের কাগজে হয়তো ছবি দিয়ে তার আবিষ্কারের কথা ছাপাও হত। ডাঃ বোসেস কুকিং পুলি। ইংরাজী নামটাই ভূষণের বেশী পছন্দ হচ্ছে। কুকিং পুলি। হ্যাঁ, রান্নাঘরের কপি-কল থেকে কুকিং পুলি শুনতে অনেক ভাল। মেড ইন যশোর। যশোরের তৈরি। সেজদার চিরুনি যেমন ভারতবিখ্যাত হয়েছে। যেশোর বেঙ্গল নামটা সেজদার কল্যাণে যেমন দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি তার কুকিং পুলিও একদিন বিখ্যাত হয়ে যেতে পারে। পারে বইকি? মানুষের অসাধ্য কী আছে?

ভূষণ হিসেব কষতে বসল। অবশ্য মুখে মুখে। এটা একেবারেই থাউকো হিসেব। বিস্তারিত সে পরে কষবে। কিন্তু এতেই, এই থাউকো হিসেবেই সে দেখিয়ে দিতে পারে, তার সামান্য একটা আবিষ্কার থেকে

কত টাকা রোজগার হতে পারে। ধরা যাক, বাংলা দেশে এখন চার কোটি লোক আছে। গড়ে দশজন লোক নিয়ে যদি এক-একটা পরিবার ধরা যায়, তা হলে পরিবারের সংখ্যা দাঁড়ায় চল্লিশ লক্ষ। তার মানে চল্লিশ লক্ষটা রান্নাঘর। গুড্। এবার এর থেকে থ্রি-ফোর্থই বাদ দাও। চার ভাগের এক ভাগের হিসেবই ধর। তা হলেও দশ লক্ষ রান্নাঘরে দশ লক্ষ কুকিং পুলি অনায়াসেই বিক্রী হতে পারবে। ভেরি গুড্। ভূষণ খুবই উৎসাহিত বোধ করছে। এখন প্রতি কুকিং পুলিতে যদি সে মাত্র চার আনা লাভ করে, ওনলি ফোর অ্যানাস, ত' হলে কী দাঁড়ায়, আড়াই লক্ষ টাকা। আচ্ছা, তার থেকে আরও না হয় দেড় লক্ষ টাকা বাদ দাও। তা হলেও থাকে নেট একটি লাখ টাকা। এর আর মার নেই। এক লাখ টাকার কোন ধারণাই নেই বড় গিন্নীর। খালি কাপড় কাপড় করছে। আরে, কত কাপড় চাই, তখন ফরমাস ক'র। যেন বড় গিন্নীকেই বলল ভূষণ।

চম্পির খ্যারখেরে আওয়াজে ভূষণের চিন্তা ছিন্ন হল।

ও ছোটকাকা, বালি আনিছ?

ভূষণের উৎসাহটার জোয়ার এবার কিঞ্চিৎ মন্দা পড়ল। মুখের চকচকে ভাবটাও মলিন মলিন হয়ে উঠল। ভূষণ রবিনসনের বালি কিনবে বলেই তো এতক্ষণ মনিরুদ্দীর আশায় বসে ছিল। কিন্তু সে যে এল না।

বলল, আজকের দিনটা চালিয়ে নে মা। কাল এনে দেব।

চম্পি বলল, চালাব কী আমার মুড়ো দিয়ে! খুকার পেটটা খারাপ, দুধ এক ফোঁটাও ধরতিছে না। তুমারে বলে বলে তো হয়রান হয়ে গেলাম। এখন ও বিচারা খাবে কী?

ভূষণ ভাবতে লাগল, এরা নিজেদের সংসারটাকে সমস্ত জগৎ থেকে আলাদা করে দেখে। তাই অভাব অভিযোগ এদের চোখে এত বড় বলে মনে হয়। আমাদের উচিত জগতের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের সংসারটাকে দেখা। তা হলেই এ জ্ঞানটা অন্তত হবে, বালির অভাবে পৃথিবী রসাতলে যাচ্ছে না।

মানুষ কী খায় আর কী পরে, তা দিয়ে মানুষকে বোঝা যায় না চম্পি। মানুষের পরিচয় তার চিন্তায়, তার কর্মে। চম্পিকে মনে মনে বোঝাতে চেষ্টা করল ভূষণ। রবিনসনের বালি সে আনতে পারে নি বলে এরা তার

উপরে চটেছে। আরে, ওটা তো মাত্র একটা পরিবারের, একটা, একটা সাময়িক সমস্যা। ভূষণ মনে-মনেই মন্তব্য করল। কিন্তু সে যে-সমস্যার সমাধানের কথা ভাবছে, তার মধ্যে বৃহত্তর মানবের কল্যাণ নিহিত আছে।

তাই বাজে চিন্তায় মন না দিয়ে, ভূষণ ঘরে উঠে গেল কুকিং পুলির নক্‌শা আঁকতে।

চার

বাসন মাজতে মাজতে চম্পি অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কলুপাড়ায় কাদের বাড়ি যেন বিয়ে। পুকুরের পশ্চিম পাড় দিয়ে সার বেঁধে সব জল সাধতে চলেছে। একটা গলা-চেরা শানাই তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। একটা ঢোল আর কাঁসি তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

চম্পি সেদিকেই চেয়ে ছিল। বগি থালাখানা আধমাজা হয়েছে। আর দু-চারটে ঘষা দিলেই সাফ হয়ে যায়। তবু তার হাত আটকে গেল। শেষ বউটিও এক সময় পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। শানাই কাঁসি ঢোলের আওয়াজও আর শোনা যায় না। তবু হাত তুলে বসে রইল। কাজের উৎসাহটাকে এক নিমেষে কে যেন শুযে বের করে নিয়ে গেছে!

সন্ধ্যে হতে তখনও দেরি আছে। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গরম সারাদিন গ্রাম-খানাকে যেন ভেজেছে। এখন পুকুরের জল থেকে তার ভাপ উঠছে। এখানে তবু তো অনেক ঠাণ্ডা। ঘরের ভিতরে যেন আগুন জ্বলছে।

কিন্তু এই পুকুরের ঘাটও চম্পিকে আর আরাম দিচ্ছে না। অথচ সেই আরামটুকু পাবার জন্যই না বেলা পড়লে সে তাড়াতাড়ি ঘাটে এসে বসে ছিল। এনেছিল বাসনের পাঁজা। বেশ তোড়জোড় করে মাজতেও বসেছিল। এই সময় কলুপাড়ার জলসাধার দলটা তার চোখের উপর দিয়ে বাজনা বাদ্যি বাজিয়ে গাঙের দিকে চলে গেল। আর অমনি একটা দমকা বাতাসের ধাক্কায় চম্পির বুকখানা যেন খালি হয়ে গেল। তার দৃষ্টিতে অপার শূন্যতা নেমে এল।

চম্পি কিছু করছিল না, কিছু দেখছিল না, কিছু শুনছিল না।

অনেকগুলো তে-কাটা মাছ বুজবুজ করে চম্পি ঘাটের যে তাল-গুঁড়িটার উপর বসেছিল তার নীচে ঘুরছিল। সেই মোটা সোটা বেলে মাছটা, চম্পি যার নাম রেখেছে ভোম্বল, একটু একটু করে এগিয়ে এসে জলের তলে চুপচাপ শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। অন্যদিন চম্পি তার সঙ্গে অনেক কথা বলে। গল্প করে। মুঠ মুঠ এঁটো কাঁটা ছড়িয়ে তাকে যত্ন করে খাওয়ায়। ধারে-কাছে যদি কেউ না থাকে তবে মৃদুস্বরে তার কাছে অনেকের নিন্দে করে।

আজ ভোম্বল যে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে, সেদিকে চম্পির নজর পড়ল না। দম দেওয়া পুতুল, হাত পা নাড়ছিল যেন, হঠাৎ দম ফুরতে মাঝপথে এখন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এই গ্রামের আরেকটি মেয়ের বিয়ের ফুল ফুটল। চম্পি খবরটা যেন তার মনকেই দিল। হুস্ করে দীর্ঘশ্বাস তার বুক ঠেলে বেরিয়ে পড়ল। কাদের মেয়ের বিয়ে? কলুপাড়ার 'কাউকে সে চেনে না, তাই বুঝতে পারল না।

নিশ্চয়ই সে আমার চেয়ে ছোট। কলুরা খুব ছোট ছোট মেয়ের বিয়েই দেয়। বড়দিরও খুব ছোট বয়েসে বিয়ে হয়েছে। গৌরীদান করেছিলেন বাবা। মেজদির বয়েস তেরো পেরতেই গ্রামে 'গেল গেল' রব উঠেছিল নাকি! বাবা অন্নজল ত্যাগ করে পাত্তর খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। ভাল একটা জমি বিক্রি করতে হয়েছিল মেজদির বিয়েতে। তাইতে মেজকাকা খুব রাগ করেছিলেন। অনেকদিন ধরে ঝগড়া-ঝাঁটি, অশান্তি চলেছিল। সেজকাকা বা ছোটকাকার মত নন মেজকাকা। পৈতৃক সম্পত্তি সম্পর্কে তাঁর অধিকার-বোধ প্রবল। ভাগের টাকার অধিকার তিনি শেষ পর্যন্ত ছাড়েন নি। তাই ছোটকাকার বিয়েতে পণ নিয়ে সেই টাকা মেজকাকাকে দিয়েছিলেন বাবা। আর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সম্প.ত্ত বেচে মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

তাই তো আমার বিয়ে দেবার জন্য বাবার আর তেমন চাড় নেই।

চম্পি হতাশ হয়ে মনে মনে যেন পুকুরটাকেই শোনাল। ষোল পূর্ণ হয়েছে তার। নিটোল স্বাস্থ্যের জন্য আরও বড় দেখায়। সে কারণে খোঁটা খেতে হয় উঠতে বসতে। সে নাকি হাতি!

চম্পির বয়েস যত বাড়ছে ততই সে গুটিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। পারলে সে পাতালে প্রবেশ করত। কত ছোট জগতে তার এখন ঘোরাফেরা!

এই বাড়িটুকুর মধ্যে! খালি রান্নাঘর আর শোবার ঘর। একমাত্র মুক্তির আস্বাদ সে পায়, এই পুকুরঘাটে এলে।

এ আমারই মতন। নির্দিষ্ট চৌহদ্দির বাইরে যাবার কোন উপায় নেই। আমারও নেই, পুকুর, তোমারও নেই। এক অভাগী যেন আরেক অভাগীকে সমবেদনা জানাল।

চম্পি অভাগী বই কি? এই গ্রামে অবিয়েত আর কোন মেয়ে নেই। তার বয়সী যে মেয়েরা ছিল, কবেই তাদের সিঁথের সিঁদুর উঠেছে। অনেকের কোলে ছেলেমেয়েও এসে গেছে। একমাত্র তারই কোন গতি হল না। তার চেয়ে ছোট অনেক মেয়ে ছিল এই গ্রামে। তাদেরও অনেকে পার হয়েছে। তাদের মা কাকীরা ঘাটে আসে। ঠেস দিয়ে অনেক কথা শোনায়। মার কানে সে সব কথা গেলে চম্পির লাঞ্ছনার আর অন্ত থাকে না।

কথা শোনার মেয়ে চম্পি নয়। সে-ও একদিন জবাব দিয়েছে মুখে মুখে, তর্ক করেছে মার সঙ্গে, ঝগড়া করেছে। বিয়ে যে হচ্ছে না তার, এ যেন তারই দোষ। সে যেন পৃথিবীর ছেলের বাবাদের সঙ্গে আগেভাগে ষড়যন্ত্র করে বসে আছে, যাতে তাকে কেউ পছন্দ না করে। কথার ভাব দেখলে গা জ্বলে যেত চম্পির।

তখন সে ঝগড়া করত, কারণ তখনও তার আশা যায় নি। সে নিয়মিত শিবপূজা করত, গোকাল করত। শিবের মত স্বামী পাবার জন্য 'কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করত। চোদ্দ থেকে পনেরোতে পড়ল, পনেরো উতরে ষোলয়, সেই ষোলও বুঝি যায়!

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চম্পি আশা হারিয়ে ফেলেছে। এই ক বছরে তার গোটা পাঁচেক সম্বন্ধ এসেছিল। একজনও পছন্দ করে নি। প্রতিবার সে পরিপাটি করে সাজতে বসেছে, বিনম্রভাবে এসে বসেছে কয়েকজন অপরিচিত লোকের সামনে, পরীক্ষা দিয়েছে সাধ্যমত। কিন্তু তাকে পছন্দ হয় নি কারও। সে কালো, সে দেখতে ভাল নয়, হাতির মত বড়। সে হাতি।

তারপর কদিন ধরে নিঃশব্দ এক লাঞ্ছনা চলেছে তার উপর। বাবা যেন কেমনভাবে চেয়ে চেয়ে দেখেছেন তাকে, মার শুব্ধ মুখে কি মুখর গঞ্জনা, পাড়াপ্রতিবেশীর মুখে চাপা বিদ্রূপ! কিন্তু উপেক্ষার এক কঠিন বর্ম গায়ে দিয়ে চম্পি ঘুরে বেড়িয়েছে। একটি শরও তার গায়ে বেঁধে

নি। কারণ, তার আশা মরে নি। এমনি করে চারবার সে আত্মরক্ষা করেছে অমিত বিক্রমে।

কিন্তু পাঁচবারের বার আর সে পারে নি। চরম হার সে হেরেছে। তাকে সেবার যারা দেখতে এসেছিল, যুথিকে তাদের বড় পছন্দ হয়েছিল। তারা সেধে লোক পাঠিয়েছিল কয়েকবার যুথির বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। ওদের তরফে আগ্রহ যেমন প্রবল ছিল তাতে নামমাত্র খরচেই যুথিকে পার করা যেত। কিন্তু বাবা তাতেও বাদ সাধল। সে যে যুথির বড়। বড়কে রেখে ছোটর বিয়ে ভাল দেখায় না। তাই শেষ পর্যন্ত এ সম্বন্ধ হাতছাড়া করতে হল।

বাবা আবার তেমন চোখে তার দিকে দিনকতক চাইতে লাগলেন। মার মুখে অব্যক্ত গঞ্জনা ফুটে উঠল। পাড়াপ্রতিবেশীর মুখে চোখে বিদ্রূপের বান ছুটল। তাতেও চম্পি বিচলিত হয় নি। কিন্তু মোক্ষম মার তাকে মারল যুথি। তার চেয়ে দু' বছরের ছোট, তার আপন বোন, যুথি।

যুথির চোখে বিষ ঝরতে লাগল। তার তীব্রতায় অস্থির হয়ে উঠল চম্পি। কি বিদ্বেষ, কি ঘৃণা যুথির দৃষ্টিতে! প্রতিনিয়ত যুথির কটা চামড়া চম্পিকে যেন ছ্যাঁকা দিতে লাগল। ওর গর্বিত ভঙ্গী যেন বলতে লাগল, নিজে তো চিরকাল আইবুড়ো থাকবি, আবার আমার ভবিষ্যৎও খাবি। তোর জীবনে ধিক। তুই মর, তুই মর না।

যুথি তারপর থেকে কোনদিন আর তাকে দিদির সম্মান দেয়নি। সংসারের কাজে কর্মে তার যেটুকু ভাগ, তাও বাঁদীজ্ঞানে চম্পির উপর তুলে দিয়েছে। আগে হলে চম্পি কখনই এসব সহ্য করত না। এখন চম্পি যে আর সে চম্পি নেই। তাই সব অপমান সে এখন হজম করে। চুপচাপই থাকে।

যুথির উপর লোকের এত টান কেন? কি জানে যুথি? জীবনে বইয়ের পাতা ওল্টাল না, সামান্য লিখতে জানে, কিন্তু কি বিশ্রী তার হস্তাক্ষর! একপদও রাঁধতে জানে না, শিল্পকাজের ধারে কাছেও কখনও ঘেঁষে নি। তবু তার দর কত চড়া! কারণ তার রংটা ফরসা।

আর চম্পি কালো। তার চামড়ার রংটুকু ময়লা বলে তার সব গুণ শূন্য হয়ে গেল। বাড়ির স্কুল থেকে সে ছাত্রবৃত্তি পাস করেছিল। পড়াশুনা সে জলপানি পেত। মেয়েদের ইস্কুল ঝিনেদায়। তাই তার লেখাপড়া হল না। মুক্তোর মত হাতের লেখা চম্পির। ক্রোচেটের কাজ শিখেছিল

বস্নিদের সেজ ছেলের বউয়ের হাত পায়ে ধরে। কতরকম রান্না জানে সে। কীর্তনে তার অপূর্ব গলা খোলে। প্রত্যেকটা জিনিস সে শেষ পর্যন্ত শিখতে চেয়েছিল। কোনটাই শেখা হয় নি। সুযোগ পায় নি। এই অজ পাড়াগাঁয়ে কেউ তাকে সাহায্য করে নি। সামান্য উৎসাহও কারো কাছ থেকে পায় নি সে। তবুও সব দিক থেকে সে এই গ্রামের চৌকস মেয়ে। কিন্তু সে কালো। কালো, কালো, কালো। তাই সে কিছু না। কিছু না।

চম্পির এমব্রয়ডারির কাজ দেখিয়ে শ্রীনাথ কাকার মেয়ে সুজাতার বিয়ে হয়ে গেল সেবার। শুধু শ্রীনাথ কাকা কেন, কায়েত পাড়ার অনেক মিঞাই চম্পির হাতের নানা কাজকে নিজের মেয়ের কাজ বলে চালিয়েছেন। তারা সব তরে গেছে। শুধু চম্পি পড়ে আছে। ভগবানের এ কেমন বিচার? নকল জিনিস আসলের চেয়ে ভাল চলে!

অথবা চম্পি যে-গুলোকে এতকাল গুণ বলে মনে করেছে, সে-গুলো কোন গুণই না। বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ের একমাত্র গুণ তার চামড়ার রঙ। সেখানে চম্পি মার খেয়েছে। সে কালো।

এক একটা বিয়ে হয় গ্রামে আর চম্পিকে জানিয়ে দেয় সে কালো। তার বিয়ে হবে না। সে কালো। কালো।

চম্পির কাছে নতুন দিন কোন বার্তা বয়ে আনে না। রাত অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে না। ছয় ঋতুর নিয়ত পরিবর্তন কোন সম্ভাবনার আগমনী গায় না। চম্পি গোকাল পুজো ছেড়ে দিয়েছে। শিব গড়িয়ে আর প্রার্থনা জানায় না। অধিকাংশ সময়েই মুখ বুজে খাটে। কখনো কখনো বিদ্রোহ করে।

শুধু যুথির সঙ্গে এক বিছানায় রোজ রাতে তার যদি শুতে না হত! বিছানার ছোট্ট পরিসরে দুবোনের দুটো দেহ বড় কাছাকাছি এসে পড়ে। দুটো দেহ, না দু প্রস্থ চামড়া। এক প্রস্থ কালো আরেক প্রস্থ বড় ফরসা। তাই চম্পি মরমে মরে যায় তখন।

দূরে আবার সানাইয়ের শব্দ ভেসে উঠল। ওরা জল সেধে ফিরছে। এ কী, এতক্ষণে যে একটাও বাসন মাজা হয় নি। ছিঃ।

চম্পি সম্বিৎ ফিরে তাড়াতাড়ি হাত চালাতে গেল। কে যেন ডাকল, চম্পি না, ও চম্পি। চম্পি ও ঘাটে চোখ ফেরাল। ওমা, শৈলদি যে। বাঃ, বেশ সুন্দর চেহারা হয়েছে ত শৈলদির। কবে এল?

চম্পি একটু হাসল সেদিকে চেয়ে।

বলল, শৈলদি যে, কবে আলে?

শৈল বলল, কাল এসেছি রে। বাবা বললেন, অনেকদিন পরে দেশে যাচ্ছি শৈল, আম কাঁঠাল খেয়ে আসি, যাবি? ওদেরও অমত হল না, চলে এলাম। বাড়ি পরিষ্কার করতেই কাল আর আজ সারাদিন কাটল। তাই একটু গা ধুতে এলাম।

চম্পি বলল, বেশ করিছ। চার, পাঁচ বচ্ছর হয়ে গেল তুমরা আর এ মুখো হও নি। পত্তর পায়ে জানলাম কলকাতায় বিয়ে হল তুমার। তুমার ভাগ্যিটা খুব ভাল শৈলদি। এ গিরামের সক্কলের উপরে তুমি টিক্কা মারিছ। কলকাতায় শ্বশুরবাড়ি কি সুজ্জা কথা!

সঙ্গে সঙ্গে হাত চালাল চম্পি। বাসন অনেক। সন্ধ্যে নেমে এল। অন্ধকার ধীরে ধীরে শৈল আর চম্পির মধ্যে ব্যবধান রচনা করতে লাগল। মুখ চোখ অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। শুধু গলার স্বরে দুজনের অস্তিত্ব ঘোষিত হতে লাগল।

কিছুদিন থাকবা ত শৈলদি? আম কাঁঠাল ফুরোলি যাবা ত?

ও বাবা, তা কি হওয়ার জো আছে রে। সঙ্গে পেয়াদা এসেছে। মাত্র সাতদিনের মেয়াদ। উনি নিজে আসতে পারলেন না ত। আপিসের কাজ। কাজ না ছাই।

খিলখিল করে হাসি বেজে উঠল। শৈলদি হাসছে। শৈলদির হাসি। শৈলদির গলার স্বর চম্পির মত মিষ্টি না। তবু শৈলদির বিয়ে হয়, তার গায়ের রংটা ফরসা। কিন্তু এখন, চম্পি ভাবল, এই ত অন্ধকার নেমেছে, গায়ের রং ঢাকা পড়েছে, এখন পাশাপাশি যদি দাঁড়ায় সে আর শৈলদি, দুজনে যদি শুধু কথা বলে যায়, হাসে, তাহলে কি তার কাছে শৈলদি দাঁড়াতে পারে?

কাজ না ছাই।

শৈল খিলখিল করে হাসল।

আসলে কি জানিস? ওঁর বড় ম্যালেরিয়ার ভয়। তাই বাবাকে ঐ কথা বলে এড়িয়ে গেল।

চম্পিও হেসে উঠল। সুরে বাঁধা সেতারের তরফের তারে যেন নিপুণ আঙুল কে চালিয়ে দিল।

বল কি শৈলদি, জামাইবাবুর এত ম্যালেরিয়ার ভয়!

চম্পি আবার হাসল। সেই অপূর্ব সুরেলা হাসি তরঙ্গে তরঙ্গে যেন পুকুরময় ছড়িয়ে পড়ল। চম্পি অনেকদিন পরে হাসল। কোন সুযোগই সে আজকাল পায় না, যাতে একটু হাসতে পারে। শৈলদিকে শোনাবার জন্যই সে এই হাসি ব্যবহার করেছিল। দেখল তা ব্যর্থ হয় নি।

শৈল নিজেও বুঝি অবাক হল, হাসিতে এত ঝঙ্কার ওঠে! শৈলও হাসল।

শুধু কি ছাই ম্যালেরিয়ার ভয়, ভয় যে কত রকম ওর, কি বলব? পাছে আমি হারিয়ে যাই, সেই ভয়ে লক্ষ্মণ ভাইকে সঙ্গে পাঠিয়েছে।

ম্যালেরিয়া তারে বুঝি ছোঁবে না?

চম্পি আবার হাসল। এখন সে কথায় কথায় হাসবে। হাসছে। সে বুঝেছে শৈলর হাসির রং এর মধ্যেই জ্বলে গেছে। শৈলদিও হাসছে ত, কিন্তু তার কাছে সে হাসি কত ম্যাটমেটে।

চম্পি বলল, নিজির পিরানের দাম আঠারো আনা, আর সব বুঝি নীলামওয়ালা ছ ছ পয়সা।

যা বলেছ ভাই।

শৈল আর চম্পি একসঙ্গে এবার হেসে উঠল।

বউদি, ও বউদি।

সুহাস ব্যস্ত হয়ে ডাক দিল। চম্পির কানে মেয়েলী হাল্কা একটা রিনরিনে সুর বেজে উঠল। শৈলদির দেওর। বাব্বা, ছেলেটার টান ত খুব বউদির উপর।

খিলখিল হাসিতে চম্পি ফেটে পড়ল। কলকাতার লোক ভাবে পাড়াগাঁয়ে বুঝি আর লোক থাকে না।

বলল, ওই ন্যাও শৈলদি তুমার পিয়াদা আইছেন বোধ হয়। গায় আর ম্যালেরিয়া না লাগায়ে উঠে পড়।

শৈল আর চম্পি এমন হাসি হাসতে লাগল যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে শৈলর দেওর চুপ মেরে গেল। শৈল উঠে পড়ল।

শৈল বলল, এসো না ভাই, কাল দুপুরে। একটু কথা বলা যাবে। কে-ই বা আর আছে।

চম্পি জবাব দিল না। সে তখন উৎকর্ণ হয়ে শৈলদির দেওরের ধমকানি শুনছে।

এই সন্ধ্যেয় পুকুরের জলে নাইলে? জ্বর হল বলে তোমার। বাপের বাড়ির সব ভাল বলে কি ম্যালেরিয়াও ভাল?

ছ্যামড়াটার ত বড় পাকা পাকা কথা। মুখ টিপলি বোধ হয় এখনও দুধ বেরয়। কিন্তু কথা বলছে মার্কণ্ড বুড়োর মত।

হঠাৎ চম্পির কানে এল, হাসছিল ও কে বউদি? খুব সুন্দর হাসিটা না?

শৈলর উৎফুল্ল গলাও শুনতে পেল, ও বড় গুণের মেয়ে ঠাকুর পো। ওর অনেক গুণ।

আর কিছু শুনতে পেল না চম্পি। শৈলদির একটা মন্তব্যেই তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে। নিত্যদিনের অবজ্ঞা উপেক্ষা বিদ্বেষ বিদ্রূপের মাঝখানে হঠাৎ এই প্রশংসাটুকু বিধাতাই যেন শৈলদির মুখ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। অনেক, অনেক দিন পরে চম্পির মনের বন্ধ কপাটগুলো খুলে গেল। গুমোট কেটে গেল। খোলা হাওয়া যেন ছুটোছুটি করতে লাগল। একটা অকারণ খুশি ঠেলে ঠেলে উঠছে। মন গুনগুন করে সুর ভাঁজছে।

শৈল যখন চম্পিকে তাদের বাড়িতে যেতে বলেছিল, তখন চম্পি সে-কথার কোন জবাব দেয় নি। কেন না চম্পি কোথাও আর আজকাল যায় না। অথচ আগে এই যুথির মত বয়সেও চম্পি কত ঘুরেছে পাড়ায়। কত মেয়ে তাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েছে। আসন তৈরী শিখবার জন্য। কত মেয়েকে সে যে উলের আসন তৈরী করে দিয়েছে তার ঠিক নেই। তাকে ওরা ডেকে নিত আসন শিখবার জন্য। কিন্তু শিখত না কেউ-ই। টাকা খরচ করে মাল-মশলা কিনত? ভাল ভাল চট, উল, লেসের সুতো, এমব্রয়ডারির সাজ-সরঞ্জাম। তোড়জোড় করে আরম্ভও করত, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। কারোরই কাজে উৎসাহ ছিল না। পরিশ্রম করতে চাইত না। এক ফোঁড় দু ফোঁড় দিয়ে ফেলে রাখত। চম্পি সেই সব অসমাপ্ত কাজ বাড়িতে নিয়ে আসত। রাত জেগে জেগে শেষ করত কাজগুলো। তারপর দিয়ে আসত যার জিনিস তাকে।

আরও একটা কাজ সে করত। ভাল ভাল উল, কাপড়ের টুকরো, লেসের সুতো, কুরুশ কাঁটা সে সরিয়ে ফেলত। টুনি বলে একটা আহ্লাদি মেয়ে ছিল, এই শৈলদিরই খুড়তুত বোন। অকর্মার ধাড়ি। তার একটা কাঁচি সে চুরি করেছিল। টুনি তাকে সন্দেহ করেছিল ঠিকই। চম্পিকে সে মুখে কিছু বলে নি। কিন্তু সব বাড়িতে বলে এসেছিল, চম্পি চোর। তারপর থেকে সবাই তাকে সন্দেহের চোখে দেখত। চম্পি যেদিন সেকথা

জানতে পারল, সেদিন সে মর্মান্তিক চটে গিয়েছিল। অপমানে তার মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। সে চোর! চোর? একে কি চুরি বলে? অমন সুন্দর জিনিসটায় তোর হাতে ত মর্চে ধরত। কোন কাজেই লাগাতিস নে। আমি তাকে কাজে লাগাচ্ছি। আমি চোর হলাম। কিন্তু চম্পির যুক্তিতে জোর থাকত না। তার নিজেরই মনে হত কাজটা ঠিক হয় নি। সে চুরিই করেছে। তাই সে আর কোথাও বের হত না। অনেকবার মনে হয়েছে কাঁচিটা সে না হয় ফেরতই দিয়ে আসবে। টুনিকে বলবে, অন্যমনস্ক-ভাবে নিয়ে এসেছিল। এই নাও ভাই তোমার জিনিস। নষ্ট করি নি। কিন্তু চম্পি তা পারে নি। পারা যায়ও না। টুনি খুব ঠ্যাকারে মেয়ে। আরও অনেক কেলেঙ্কারি সে ছড়াত। তার চেয়ে এই ভাল। না দেওয়াই ভাল। নিইনি ত নিইনি। যার যা ইচ্ছে সে তাই ভাবুক। চম্পি সেধে সেধে ত কারোর বাড়িতে যাচ্ছে না। যাবেও না।

সে আর যায়ও না কোথাও। সেই টুনির বিয়ে হয়েছে। চলে গেছে গ্রাম ছেড়ে। তবুও সে বেরয় না। আজকাল ত বেরতে ইচ্ছেও করে না।

তাই শৈলর ডাকে সে সাড়া দেয় নি। কিন্তু শৈলর মুখে তার অবিমিশ্র প্রশস্তি শোনার পর তার মন ঘুরে গেছে। সে বড় গুণের মেয়ে। গুণের মেয়ে, তার দাম আছে। সে তুচ্ছ নয়, শূন্য নয়, গুণের মেয়ে। সারাদিন গুন গুন করে কথাটা তার কানে বেজেছে। অজস্রবার খুশি করেছে তাকে। বাড়ির প্রত্যেককে, প্রতিটি কাজকে তার আজ অসামান্য বলে মনে হয়েছে।

শৈলদি নিজে ত লোক ভাল, তাই সবাইকে ভাল দেখে। কাজকর্ম সব চুকিয়ে ভিজে গামছায় মুখ মুছতে মুছতে চম্পি ভাবল। বাইরে চেয়ে দেখল রোদ বড় কড়া। এই রোদে যাবে? একবার ভাবল। নাঃ, যাই একবার ঘুরেই আসি। নয়ত আবার কি ভাববে শৈলদি। কতদিন পরে এল দেশে। আর আসবে কি না, দেখা হবে কি না, কে জানে? কত মেয়ের ত বিয়ে হল, গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। তাদের সঙ্গে আর কি দেখা হচ্ছে? একদিন সেও ত চলে যাবে। তার শ্বশুরবাড়ি শৈলদির মত কলকাতায় আর হবে না ত। কোন অজ পাড়াগাঁয়ে তার অন্ন মাপা আছে কে জানে?

ঘুরে ফিরে সেই বিয়ের কথা। চম্পিকে নিশিদিন এই ভাবনা তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই কী সে নিস্তার পাবে না।

একটা কাচা কাপড় পরে চম্পি তৈরী হয়ে নিল। ভিতরের জামা নেই চম্পির। মোটা সেমিজের নিচে তার সবচেয়ে বড় লজ্জা ঢাকা পড়েছে। তার উপর বারবার সে আঁচল টেনে দিচ্ছে। তবু চম্পির মনে হল, না, যথেষ্ট হল না। অনেকদিন বেরয় নি। দ্বিধা পায়ে পায়ে বাধা দিতে লাগল।

মা বললেন, ওরে, তোর ফুলু কাকিমারে কস্ শৈলিরি নিয়ে একদিন যেন আসে। কতদিন যে দেখি নি ওগের। ঠাকুরপোরে জিজ্ঞেস করিস তো তোর সাজে কাকার কোন খবর জানে কি না?

বক্সী বাড়ির ভাঙা দেউড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকতে চম্পির পা আর ওঠে না। বিরাট বড় পাকা দালান বক্সীদের। শরিকের অন্ত নেই। তাই কোন অংশ ভেঙে পড়ছে কোন অংশ চকচক করছে। সবাই থাকেও না দেশে, অনেকে আসেও না। টুনির বাবা ঝিনেদায় বাড়ি করে উঠে গেছেন। কুল বক্সীরা এখন তো ঝিনেদারই লোক। শৈলদির বাবা শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে কলকাতাবাসী হয়েছেন।

পুজোদালানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে চকিতে চম্পির চোখে ছেলেবেলার সেই ধুমধামের ছবিটা ফুটে উঠল। শৈলদির ঠাকুর্দা তখন বেঁচে। কতবার যে যাত্রাগান, ঢপ, কীর্তন শুনতে এসেছে চম্পিরা তার ঠিক ঠিকানা নেই। একবার তো থিয়েটারও হয়েছিল। চম্পির দুর্ভাগ্য সে তখন জ্বরে অচৈতন্য। জীবনের সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে তার।

পুজোদালান পেরিয়ে বাঁ হাতি পারুল পিসিদের মহল। ছোটকাকা তার জন্যে নাকি সন্ন্যেসী হয়ে গিয়েছিলেন। পারুলি তুই তো কাছা খোলালি। ছড়া বেঁধেছিল গ্রামের দুষ্টু ছেলেরা। চম্পির হাসি পেল।

তারপর টুনিদের অংশ। টুনির বিধবা পিসি এখন থাকে। টুনিদের পুবদিকের দালানটা শৈলদিদের। দোতলা বাড়ি। ও বাবা, কত লোক জমেছে বাইরের ঘরে। সুবল কাকা বেশ ফরসা হয়েছেন দেখি। মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। বুকের আঁচলটা আবার টেনে দিল চম্পি। এক সঙ্গে এতগুলো পুরুষের চোখের সামনে দারুণ অস্বস্তিতে পড়ল। কী জানি, শুধু সেমিজ গায়ে পরে বাইরে বেরুলে এত অস্বস্তি কেন হয়। সেমিজের ভিতর লজ্জার অস্তিত্ব অনুক্ষণ যেন বিঁধতে থাকে। বারে বারে মনে হয়, এই বুঝি প্রকাশ হয়ে পড়ল।

সুবল কাকার গম্ভীর আওয়াজ কাকে যেন জিজ্ঞাসা করল, বিলেসদাদার মেয়ে না ?

কে যেন বলল, হ্যাঁ। বিয়ে থা দেচ্ছে না বিলেস। মেয়ে ঘরে পুষে রাখিছে।

মাথাটা নিচু করে চম্পি ভিতরে ঢুকল। তার স্বভাবসিদ্ধ উপেক্ষার বর্মটি সে আজ এঁটে আসে নি, ভুলেই গিয়েছিল। তাই অতর্কিত এই আক্রমণ তার মর্মে গিয়ে বিঁধল। কেন সে মরতে এখানে এল ? উচিত হয় নি।

ফুলু কাকিমা পালঙ্ক খাটে শুয়ে ছিলেন। ঝি তাঁকে ঝালরের পাখার বাতাস করছিল। চম্পিকে দেখে একগাল হেসে ফেললেন।

এস মা এস। থাক থাক, শোয়া মানুষকে আর প্রণাম করে না। এমনিই আশীর্বাদ করি। ভাসুর ঠাকুর, বড়দিদি, খুড়িমা সব ভাল তো ?

ফুলু কাকিমার কথায় চম্পির মনের জ্বালা নিভে গেল। বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ, কিন্তু একটুও দেমাক নেই।

চম্পি একে একে সব কথার জবাব দিল।

ফুলু কাকিমা বললেন, তারপর আমাদের সন্ন্যেসী ঠাকুরের খবর কী ? বিয়ে হয়েছে শুনলাম। বউ কেমন হল ?

ফুলু কাকিমার কথার টানে চম্পিও হেসে ফেলল খিলখিল করে।

শৈলর গলা উপর থেকে শোনা গেল, কে হাসে মা ? চম্পি এসেছে না কী ?

ফুলু কাকিমা বললেন, হ্যাঁ, এই এল। রোদে একেবারে সিদ্ধ হয়ে এসেছে। ঠাণ্ডা হয়েই যাচ্ছে। ওলো চারি, হাতটা একটু জোর করে নাড়। বাছার গায়ে বাতাস লাগুক।

চারি খ্যার খ্যার করে উঠল, আমার গতর তো আর মেসিং নয় বাছা, যে ফরফর করে রাতদিন সমানতালে ঘুরবে। হাতটা এলিয়ে গেছে। যে দেশে ইলেকটেরি নেই, সেই দেশে কী মনিষ্যি আসে গা। রাত্ত হলেই অন্ধকার, সাপের ঘাড়েই পা দিই, কী বিছেতেই কাটে। ভয়ে ভয়ে মরে থাকি। ম্যা গোঃ।

চারির কথা, শৈলদির বরের কথা, ওর সেই ছোকরা দেওরের কথা, সব দেখি এক সুরে বাঁধা। এরা সব কলকাতার লোক।

চুপ কর বাছা, চুপ কর। তোমাকে আনাই ঝকমারি হয়েছে। কালকেই কলকাতায় পাঠিয়ে দেবো।

হ্যাঁ, তাই পাঠ্যে দিও। এই জঙ্গলে আমি থাকতে পারব নি।

জঙ্গল তোমাকে গিলে খাচ্ছে। চুপ কর, এখন একটু কথা বলি। হ্যাঁ, তারপর সন্ন্যেসী ঠাকুরপোর বউ কেমন হল ?

চম্পি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল কাকিমার।

আর ছেলেটাও খুব সুন্দর হয়েছে কাকিমা। অবিকল কাকার মত দেখতে। কী দস্যিপানাই না করে। একটু একটু হাঁটতে শিখেছে তো। এখন সামলান দায়।

ও মা, কতক্ষণ চম্পিকে আর আটকে রাখবে। দয়া করে এখন একবার ছেড়ে দাও।

ফুলু কাকিমা বললেন, যাও মা, যাও। চম্পি চম্পি করে হাঁপিয়ে উঠেছে শৈল। সঙ্গী সাথী তো নেই এখেনে। ছেলে দুটো এল না। শৈলর দেখলাম তবু টান আছে দেশের উপর। বলতেই ও রাজি হয়ে গেল। ওর এক দেওর, সে কখনও পাড়া গাঁ দেখেনি, বললে আমিও যাব। উনি তো খুব খুশি। চলে এলাম সবাই।

মা!

ফুলু কাকিমা এবার চটে উঠলেন।

মেয়ের রকম ছ্যাখ একবার। আমি যেন চম্পিকে খেয়ে ফেলছি। ওকি ভীমনাগের সন্দেশ যে টপাশ করে মুখে পুরে দেব। এতদিন পরে এলাম দেশে, কোথায় লোকজনের সঙ্গে দুটো কথা বলব, তা কী হবার যো আছে। হ্যাঁ, মেয়ের ওই এক ধারা। যাও মা, যাও। নইলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে।

চম্পি খিলখিল করে আবার হেসে উঠল। শৈলদি এখনও সেই আদুরে খুকিটিই আছে।

বেশ হাল্কা মনেই চম্পি সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে গেল উপরে। বাড়িটা অনেকদিন বন্ধ ছিল, ঘরের ভ্যাপসা গন্ধটা এখনও সম্পূর্ণ যায় নি। তার মধ্যে থেকেও বেশ একটা সুগন্ধ পাউডার কি এসেন্সের কে জানে—চম্পির নাকে এসে ঢুকল।

শৈলর ঘরে ঢুকতে গিয়েও চৌকাঠের বাইরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল চম্পি। শৈলদির খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে ও লোকটা কে ? চম্পি বিব্রত হল।

শৈল ডাকল, এসো ভাই চম্পি, ভিতরে এসো। লজ্জা কী, ও আমার দেওর।

সুহাস হাসতে হাসতে বলল, কিম্বা বলতে পারেন বউদির সেই পিয়াদা।

এ সেই কালকের রিনরিনে মেয়েলী গলা। পিয়াদা কথাটা আবার যত্নের কায়দায় বলা হল। চম্পি হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না। জড়সড় হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। তারপর একপাশে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল। কাল সন্ধ্যায় চম্পি সুহাসের গলা শুনে ভেবেছিল, বড়জোর সে বার তের বছরের একটা ছেলে হবে। সে যে এতবড় তা চম্পি স্বপ্নেও ভাবে নি। সামান্য সংশয় থাকলেও সে আজ আসত না। অন্তত এ ভাবে আসত না।

শাড়িটা সেলাই করা, তবে ফরসা আছে এই যা। সেমিজ, সেই ঢিলে সেমিজের অস্বস্তি আবার হাজারগুণ বড় হয়ে দেখা দিল। নিজের সম্পর্কেও অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠল চম্পি। অপরিচিত জোয়ান পুরুষের এত কাছে আসা, এই তার প্রথম। থাকলই বা শৈলদি তার কাছে।

সুহাস উঠে বসল।

বলল, বউদি তোমরা চৌকিতে এসে বস। আমায় চেয়ারটা ছেড়ে দাও।

জড়তাহীন কি পরিষ্কার উচ্চারণ। চম্পি ভাবল, গলাটা ওর মেয়েলী, কিন্তু এত সুন্দরভাবে কথা বলতে পারে, এমন একটা ছেলেও কি এই গ্রামে আছে। চাইব না চাইব না করেও চম্পি লুকিয়ে একবার দেখে নিল। রং খুব ফরসা নয়। মুখ চোখ যে আহামরি তাও না। তবু সুহাসকে খুব সুন্দর লাগল। একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল তার। এত পরিষ্কার কামানো গাল চম্পি আর কারও দেখে   এই গরমেও সে একটা ফিনফিনে পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে আছে। ভিতর থেকে হাতকাটা গেঞ্জির চেহারা আর সুহাসের বুকের, হাতের রং উঁকি মারছে। ধুতিটা পায়ের গোড়ালি অব্দি ঢেকে রয়েছে। সুহাস কত ওজন করে কথা বলে। এক মুহূর্তে চম্পির মনে সুহাসের এই চেহারার একটা শক্ত ছাপ পড়ে গেল। চম্পি তাইতে আরও লজ্জা পেল। ঘামতে লাগল সে।

সুহাস মেঝেতে নেমে এল। এখন চম্পির থেকে তার দূরত্ব দেড় হাতও না। কেমন মৃদু মনোরম এক সৌরভ সুহাসের দেহ থেকে ভেসে এল চম্পির নাকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় এমনি গন্ধই যেন পেয়েছিল। হাঁটুর উপর কাপড় তোলা, গা খালি, বক বক করে বকা গ্রামের যে জোয়ান পুরুষদের

এ যাবৎ দেখেছে চম্পি, তাদের সবাইকে সুহাসের পাশে অকিঞ্চিৎকর, অসভ্য, জংলী ভূত বলে মনে হতে লাগল তার।

বসুন! দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

তাকে আপনি আজ্ঞে করছে সুহাস। গ্রামের মেয়ে, কালো মেয়ে, বয়েস গড়ান আইবুড়ো মেয়ে চম্পিকে এতবড় সম্মান আজ পর্যন্ত কেউ দেয় নি। চম্পির কেবলই মনে হতে লাগল সত্যি সত্যিই এসব ঘটছে ত? না কি দিবাস্বপ্ন দেখছে সে।

আমরা কখন থেকে আপনার অপেক্ষায় বসে আছি।

আমার জন্য এরা অপেক্ষা করছিল, আমার আশায় বসে আছে! চম্পি ভাবল, ঠাট্টা করছে নাকি সুহাস।

জান চম্পি, ঠাকুরপোর তাই কেমন ধারণা হয়েছিল তুমি আসবে না।

সত্যিই তাই। আমি কিন্তু সেই রকমই ভেবেছিলুম।

(সুহাসবাবুরা ভেবেছিলুম বলেন। কলকাতার লোকমাত্রেই নাকি সুন্দরবনের বাঘের মত হালুম হুলুম খেলুম বলে। চম্পি কথাটা শুনেছিল। দেখল মিথ্যে নয়।)

কেন ভেবেছিলুম জানেন, বউদি জানে, আমি মনে মনে যা আশা করি তা হয় না। আমি খুব আশা করছিলুম ত আপনি আসবেন বলে।

(সুহাসবাবু আমাকে আশা করছিলেন! আমাকে! সব মন রাখা কথা! কিন্তু তবুও এমন মন রেখেই বা কটা (মিথ্যে) কথা কজন শুনিয়েছে চম্পিকে? চম্পি কালো, চম্পি হাতি, চম্পি চোর, এমন অজস্র কঠিন সত্যই সে নিত্যদিন শুনে এসেছে। সত্য তাকে শুধু পীড়া দেয়। যন্ত্রণা দেয়। সত্যের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই তার। সে জানে কলকাতা থেকে আগত এই শিক্ষিত মার্জিত সুবেশ তরুণটি তাকে ডাহা মিথ্যে বলছে। আমার জন্য ওঁরা আশা করে বসেছিলেন, অপেক্ষা করছিলেন। কি পদের লোক আমি! একেবারে ইংলণ্ডেশ্বরী! ইংলণ্ডেশ্বরী কথাটা এখনও ভোলে নি চম্পি। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল। দয়াময়ী ইংলণ্ডেশ্বরী যে পথ দিয়া যাইতেন, সেই পথের দুই ধারে আবালবৃদ্ধবণিতা তাঁহার দর্শন লাভের আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিত। এই ইংলণ্ডেশ্বরী কে? সেদিন চম্পি জবাব লিখেছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়া। এখন সুহাসের কথায় মনে হচ্ছে সে-ও বুঝি ওই ইংলণ্ডেশ্বরীর পর্যায়েই উঠে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা

ইহারা আমার দর্শনলাভের আশায় অপেক্ষা করছে। আজগুবি আর কাকে বলে। কলকাতার লোক, বড্ড চালিয়াত হয়। হোক চালিয়াত। বলুক মিথ্যে। তবুও এ মিথ্যে শুনতে ভাল লাগে। চম্পিকে নিয়ে এক রুচিবান পুরুষের যে মিথ্যে বলবারও ইচ্ছে হয়, চম্পির পক্ষে তাই যথেষ্ট। সুহাসের প্রতি কৃতজ্ঞ হল চম্পি। তিনি ওর দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন। সুহাস যেন নীলামওয়ালার ভাড়াটে খদ্দের। সে কিনবে না, কিন্তু ডাক বাড়িয়ে দেবে। যাকে কানাকড়ির মূল্যও কেউ কখনও দেয় নি, তার পক্ষে এটুকুও ত যথেষ্ট।)

চম্পি খুশীই হল।

শৈল বলল, সত্যি ভাই চম্পি। লেখক লোক কি না, কাল সন্ধ্যের অন্ধকারে তোমাকে ত দেখতে পায় নি, শুধু তোমার হাসি শুনেছে। তাইতেই ঠাকুরপোর আমার কবিত্বভাব জেগে উঠেছে। কাল থেকে তোমায় নিয়ে আমাদের দুজনে কেবল কথা হচ্ছে।

(স্বপ্ন স্বপ্ন এ শুধু স্বপ্ন। মিথ্যে এ মিথ্যে, এ ডাহা মিথ্যে। আচ্ছা এখন, এই মুহূর্তে, এই অসম্ভব আজগুবি স্বপ্নটা দেখতে দেখতে আমি মরে যাই না কেন? অনেক উপেক্ষা, অনেক অপমান, অবহেলা, ঘৃণা সয়ে সয়েও যে কারণে বেঁচেছিলাম এতদিন, মনের গভীরতম কোণায় যে আশাটাকে আড়াল করে পালন করেছিলাম একদিন কিছু পাব বলে, এমন কিছু, যা দিনগত দৈন্য গ্লানি উত্তীর্ণ করে আমাকে পৌঁছে দেবে নতুন এক জীবনের হাটে, নতুন দাম ধরা হবে আমার। আজ যদি তা দৈবাৎ পেলাম, যদি বাসনা পূরণ এখানেই হয়ে গেল, তবে হে ভগবান, হে মদনমোহন, হে শিবশঙ্কর হে মা ভগবতী, এতদিন শুদ্ধচিত্তে তোমাদের যে পুজো করেছি আজ তার ফল দাও, আমাকে তোমাদের কোলে টেনে নাও। আমার জীবনে আগামীকাল যেন আর না আসে। কালো, কালো, কালো, আমি কিছু না, কিছু না, এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সত্যের সুতীক্ষ্ণ দাঁতের ফাঁকে, দোহাই তোমাদের, আমাকে আর ঠেলে ফেলে দিয়ো না।)

আপনি গান জানেন, না? নিশ্চয়ই জানেন।

চম্পি এ-কথা শুনতে পেল না। তার মন প্রার্থনায় মগ্ন।

তুমি যে দৈবজ্ঞ হয়ে উঠলে ঠাকুরপো। আমাদের গ্রামে ও-ই যা কিছু জানে।

চম্পির কানে এ কথাও পৌঁছল না। সে দেখল সুহাস আর শৈল ধীরে ধীরে তার কাছ থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। কথা বন্ধ হয়ে গেল ওদের, বোবাদের মত শুধু ঠোঁট নেড়ে যাচ্ছে এখন। ওরা অনেক দূরে চলে গেল। জানালার বাইরে। শূন্যে ভাসছে। প্রখর আলো ঘিরে রয়েছে ওদের। ওর দিকে আঙ্গুল দেখাচ্ছে মাঝে মাঝে। হাসছে। না সুহাসের চোখে, শৈলদির চোখে বিদ্রূপ নেই, অবজ্ঞা নেই। কি যেন তাকে বলল সুহাস। আবার বলল। ওর চোখে বিস্ময়। শৈলদিও তাকে কি যেন বলছে। আবার বলল, আবার, আবার। বোবা হয়ে গেল নাকি দুজনে? না, শুধু ওরা নয়, সমস্ত জগৎ থেকেই শব্দ লুপ্ত হয়েছে। আর কেউ তাকে কুকথা শোনাতে পারবে না। পারলেও সে শুনতে পারবে না। বেশ হয়েছে। নিশ্বাসটা কখন যেন ফুরিয়ে এসেছে। যাক ফুরিয়ে। শব্দ যাক, বাতাস যাক, শৈলদি, সুহাসবাবু, যুথি, বাবা মা, এই সংসার, জগৎ, এই মুহূর্তে ফুরিয়ে যাক। চম্পিও যাক। আর কিছু চাই নে তার।

কিন্তু বড় কষ্ট! বড় কষ্ট! উঃ! বাতাস! বাতাস! এ কী হল? এ কী যন্ত্রণা বুকে! বিরাট একটা পাষাণ তার শ্বাসনালীর মুখে আটকা পড়েছে। উঠছে না সেটা, উঠছে না। থেকে থেকে সহস্র বর্শা যেন চম্পির হৃদ্‌পিণ্ডে একসঙ্গে খোঁচা মারছে। উঃ! উঃ!

চম্পি কি তবে মরছে? এই কি মৃত্যু! এত যন্ত্রণা! না, না, তবে সে মরবে না। মরতে চায় না, চায় না, চায় না। যন্ত্রণার গভীর খাদে পা ফস্কে পড়ে গেল চম্পি।

সুহাসবাবু, সুহাসবাবু, হাতটা বাড়িয়ে দিন, আপনার হাতখানা। তারস্বরে চম্পি যেন ডাকল। কিন্তু সুহাস ত শূন্যে ভাসছে। অত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে পারছে না। অবশেষে আসতে পেরেছে সুহাস। হাতখানা বাড়িয়েও দিল চম্পির দিকে। কিন্তু চম্পি সেটা ধরবার আগেই সুহাস উল্টে গেল। চম্পিও সাঁৎ করে তলিয়ে গেল অন্ধকারে।

পাঁচ

খুব উঁচুতে, খুব উঁচু আকাশের কোল ঘেঁষে, একখানা সাদা মেঘ ভাসছিল। দুধের মত ধপধপে সাদা। আর তার চারপাশে ঢেউ তোলা তোলা ঝালর।

মেঘখানা নিচে নামতে লাগল। নামতে নামতে, নামতে নামতে চম্পির একেবারে মাথার উপরে এসে থেমে গেল। কে যেন তার চারকোণায় দড়ি বেঁধে টান টান করে টাঙিয়ে রেখেছে। ঠিক যেন একখানা মশারির চাঁদোয়া। ওমা, মশারিই তো! পরিষ্কার ধপধপে একটা ঝালরদার মশারি। নেটের মশারি। তাদের বাড়ির লালচে লালচে ময়লা চিমসে গন্ধওয়ালা মশারি নয়। যার সর্বাঙ্গে নানারঙের তালিমারা, যার জায়গায় জায়গায় ঝুঁটি বাঁধা, যার চারকোণায় ছারপোকা মারার রস আর গন্ধ জমা হয়ে আছে, এ সে-মশারি নয়। টনকো নতুন এক নেটের মশারি। এর কোথাও ময়লা নেই ছিঁটে ফোঁটা। একটুও ভ্যাপসা গন্ধ নেই। ভাঁজকরা নেটের ফুটো-গুলো যেন বিলাতী চিনির চৌকো শক্ত দানার মাপে মাপে কাটা।

এ-মশারিতে কারা শোয়? সেই তারা। ছোট বেলায় ঠাকুমার কোলে শুয়ে যাদের গল্প শুনেছে চম্পি, সেই শঙ্খমালা, কাঞ্চনমালা, মণিমালা, রাজ-কন্যারা। সোনার পালঙ্কে, পালকের নরম বিছানায় তারা শুয়ে থাকে। শিয়রে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে। কালপরী নিদ্রাপরী পুরীর উপরে উড়াল দিয়ে যেতে যেতে রাজকন্যার রূপ দেখে থমকে যায়, বলাবলি করে, এই রাজকন্যার যোগ্য বর, উজানী নগরের সেই রূপকুমার। চল আজ মিলন ঘটাই। এই বলে তারা রাজকন্যার চোখে ঘুমের কাজল পরিয়ে পালঙ্ক সমেত তাকে নিয়ে হাজির করে রূপকুমার রাজপুত্রের দেশে। এ-মশারি সেই রাজকন্যা রাজপুত্রদের মশারি।

চম্পি এখানে এল কী করে? সে চোখ ঘুরাতেই আরেক জোড়া ব্যগ্র চোখে তার দৃষ্টি আটকে যায়। এ চোখ চম্পির চেনা। স্বপ্নেই যেন এ মুখ সে দেখেছে। স্বপ্ন ছাড়া এমন সুন্দর একখানা মুখকে তার সান্নিধ্যে আর কে আনবে? এখনও সে স্বপ্নই দেখছে।

চম্পিকে চাইতে দেখে সুন্দর মুখখানা হাসিতে ভরে গেল। দুর্ভাবনা মাখা আয়ত দুটো চোখ নিমেষে পরিষ্কার হয়ে গেল। মুখের হাসি চোখেও ছড়িয়ে পড়ল। তার হাতে একখানা পাখা ছিল। সে প্রাণপণে বাতাস করছিল। তার হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা পাখার ডাঁটের উপর নজর পড়ল চম্পির। বেশ নরম বিছানায় সে শুয়ে আছে। পালকের গদি কী এমনি নরম হয়।

সেই হাসি-হাসি মুখের দিয়ে চেয়ে চম্পির ঠোঁটেও এক হাসি ফুটে উঠল। চম্পি সে হাসি দেখতে পেল না। দেখছিল তাকে, ওই হাসি যার চোখে রামধনুর তরঙ্গ ফুটিয়ে তুলল।

এই যে বউদি, ইনি চোখ মেলেছেন।

চম্পি রিনরিনে মেয়েলী এক গলায় একরাশ উদ্বেগ ফুটে উঠতে শুনল। সঙ্গে সঙ্গে দেখল ও দুটি চোখ থেকে রামধনু রঙ নিমেষে মিলিয়ে গেল। দুটি উজ্জ্বল চোখের তারা তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে চেয়ে রয়েছে। এ চোখ ত সে চেনে, এই মেয়েলী গলাও সে চেনে। এ ত সুহাসবাবু।

সুহাসবাবু তার দিকে এমনভাবে চেয়ে আছেন কেন? সে সুহাসবাবুকে এত কাছে আসতে দিয়েছে কেন? বিব্রত হল চম্পি। ছি ছি। তাড়াতাড়ি উঠতে গেল সে। সঙ্গে সঙ্গে সুহাস তার কপালে হাত দিয়ে শুইয়ে দিল। চম্পির সারা শরীরে উত্তাপের ঢেউ ভেঙে পড়ল। ব্যাপার কী? সে কোথায়?

উঠো না মা, এখন উঠো না। এত গরমে এতখানি পথ এসেছ তো, তাই বোধ হয় মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। শুয়ে থাক এখন। আমি একটু গরম দুধ পাঠিয়ে দিই।

ফুলু কাকিমার গলা। হ্যাঁ, ওই যে তিনি চেয়ারে বসে আছেন। এই যে শৈলদি, তার হাঁটুর কাছে। সে মূর্ছা গিয়েছে নাকি? ছি ছি কী কাণ্ড। ফুলু কাকিমা উঠে গেলেন।

শৈল বলল, আমি আর ঠাকুরপো নিজের মনেই বকে যাচ্ছি। ও একটা কথারও জবাব দেয় না। আমি বলি হল কী? শেষে এই কাণ্ড। বাব্বা! আমি তো ভয়ে মরি।

সুহাস বলল, ভয়ে মরার একটা সুবিধে আছে, হাতে ব্যাথা হয় না। কিন্তু বাতাস করতে করতে আমি যে মারা পড়লাম।

সুহাস হাতের অদ্ভুত মুদ্রা করে বোঝাল ও দুটোর আর কিছু নেই।

ব্যাজার মুখে বলল, আগে জানলে আমিও ভয়েই মরার চেষ্টা করতাম, হাত দুটো বাঁচত।

সুহাসের কথায় সবাই হেসে উঠলেন। চম্পি লজ্জা পেল, তবু সে-ও হাসল।

বলল, আমি এবার উঠব।

সুহাস বলল, উঠবেন উঠুন, কিন্তু দোহাই আর পড়বেন না যেন। আবার যদি পড়েন আমি কিন্তু আর পাখা ঠেলতে পারব না।

চম্পি সলজ্জভাবে উঠে পড়ল। মুখ নীচু করে বসে বসে সে ঘামতে লাগল। সত্যিই বড় রকমের একটা কেলেঙ্কারি সে করে ফেলেছে। কেন সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ছি ছি।

শৈল সুহাসকে ধমক দিল।

ও কী, ভাই ঠাকুরপো, ওভাবে কাউকে বলে নাকি? ছি। না ভাই চম্পি, ওর কথায় কিছু মনে কর না। ঠাকুরপোটা ওই রকমই। রাতদিন সকলের পিছনে লেগে আছে।

সুহাস হাসতে হাসতে বলল, তবে তো আমার গুণের কথা সবই শুনে ফেললেন। আর বাকী রইল না কিছু। বউদির কথা শুনে এখন আমার ধারণা হচ্ছে আপনার গুণপনার যে ফিরিস্তি বউদি দিয়েছে সেটাও বোধহয় এই রকমই সত্যি।

চম্পি সুহাসের কথা শুনে হকচকিয়ে শৈলর দিকে চাইল। ওর বিব্রত চোখমুখ যেন বলে উঠল, কী বলেছ শৈলদি? কী বলাবলি করছিলে তোমরা? চম্পির বুক ধুকপুক করতে লাগল। বিশেষ করে এখন মনে পড়তে লাগল, সে এত বয়েস পর্যন্ত যে-সব দোষ, যে-সব ত্রুটি করেছে, সেই সব অপরাধগুলোর কথা। টুনির সেই কাঁচির ব্যাপারটা কী শৈলদি জানে? ওরা কী তখন এখানে ছিল? না থাকলেই বা কী টুনি হয়ত চিঠি লিখে জানিয়েছে শৈলদিকে? এক মুহূর্তের লোভে চম্পি সেদিন যে কত গুরুতর এক অপরাধ করেছিল, আজ এখন, এই ঘরে সুহাসের সামনে বসে বুঝতে পারছে। সুহাসবাবু কী সে-কথা জেনে ফেলেছেন? কী ভাবছেন তাকে? আপনার গুণপনার যে ফিরিস্তি বউদি দিয়েছে।…কেমন মিহি করে বলল সুহাস। কী কী ফিরিস্তি দিয়েছে। সে বাবার গলার কাঁটা হয়ে বসে

আছে? বারে বারে তার সম্বন্ধ আসছে আর ভেঙে যাচ্ছে? সে কালো, তাই কেউ পছন্দ করছে না? সে অপরাধ কী আমার? সুহাসের কাছে সে আবেদন করল। আর কী বলেছে শৈলদি, কী বলতে পারে আর? সে ঝগড়াটে, যদি মুখ খোলে একবার, কেউ তার মুখের সামনে নাকি দাঁড়াতে পারে না। সত্য বটে, সে অন্যায় কথা সহ্য করতে পারে না, অপমান তার খুবই বাজে, জবাবও দেয়। তা বলে সে গায়ে পড়ে তো কাউকে কিছু বলতে যায় না, বলে না। এই গ্রামের অন্যেরাই বরং সে ব্যাপারে পটু। মর্মান্তিক অপমান তাকে কেউ করলে সে তাকে অল্পে ছেড়ে দেয় না। আপনি, আপনি কী করেন? যদি কেউ আপনাকে অপমান করে? সুহাসকে সে জিজ্ঞাসা করল মনে মনে। এই গ্রামের লোক তাকে কী চোখে দেখে, সবটা না জানলেও সে সম্পর্কে চম্পির নিজস্ব একটা ধারণা আছে। এ তার হীনমন্যতা। আর সেটা সে মেনেই নিয়েছে। কিন্তু সুহাসও কী সেই চোখে তাকে দেখছে?

সেই সুহাস, যে কলকাতার শিক্ষিত মার্জিত ছেলে, যে তাকে আপনি বলে সম্মান দেখায় (জীবনে এই প্রথম একজন তাকে অদ্ভুত সম্মান দেখাচ্ছে, যে তাকে পাখার বাতাস করছে, যে উদ্বিগ্ন চোখে তার মুখের দিকে চেয়েছিল। 'উঠবেন না উঠবেন না, আঃ' এই স্বর সে জীবনে ভুলবে না। সুহাস তার কপালে হাত দিয়ে আবার বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। স্পর্শটা চম্পির কপালে অকস্মাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল। সুহাস কী এখনও ওখানে হাত দিয়ে আছে? ওর হাতটা কোমল, না কর্কশ? জীবনে আর-একবার সে পরপুরুষের স্পর্শ পেয়েছিল। চাকলার কাছারিতে বাসন্তী-পুজোর বিসর্জনের ভিড়ে কোন এক বদমায়েস লোক তার গাল টিপে দিয়েছিল। সে তাকে দেখে নি। অনুভব করেছিল, কী কর্কশ লোকটার হাতটা! সুহাসের হাত কেমন, সে খেয়াল করে নি। কিন্তু সে-স্পর্শের যে-অনুভব তার দেহে লেগে রয়েছে সেটা আদৌ বিরক্তিকর নয়।) হ্যাঁ, যে সুহাস তার মুখের দিকে চেয়েছিল, সে তাকে খারাপ ভাবুক চম্পির মন তা চায় না। সুহাস তার জন্য অপেক্ষা করেছিল। কী বাজে কথাই না বলতে পারেন সুহাসবাবু! কিন্তু দুটি উদ্বিগ্ন চোখ মেলে তার দিকে যে চেয়েছিল সুহাস।

শৈল বলল, এই ত চম্পি আছে, তুমি ওকেই জিজ্ঞেস কর না, আমি বাজে কথা বলছি কি না? ভারি সুন্দর গলা চম্পির। কী ভাল যে গায়!

সুহাস বলল, আমাদের কি সে সৌভাগ্য হবে ?

(সুহাস তার মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়েছিল !)

শৈল বলল, চম্পি ভাই, একখানা গান শোনাবে ?

(যতক্ষণ সে অজ্ঞান হয়েছিল ততক্ষণ ? আচ্ছা, কে ওকে শুইয়ে দিল বিছানায় ? সুহাসবাবু কী ?)

সুহাস বলল, গাইতে পারবেন কী ? ওঁর শরীরটা বিশেষ ভাল নয় বলেই মনে হচ্ছে।

(নিশ্চয়ই সুহাস। সুহাস ছাড়া তার এতবড় গতরখানা কে আর তুলতে পারে বিছানায় ! চম্পি ত একটা হাতি। একটা ঢেঁকি।)

শৈল বলল, চম্পি ও চম্পি !

(যত্ন করে তাকে তুলেছে সুহাস। যত্ন করে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। যত্ন করে পাখার বাতাস করেছে।)

চম্পি, ও চম্পি, কী ভাই কথা বলছ না কেন ?

(যত্ন যত্ন যত্ন। সুহাসের মত একটা লোক, তার মত নগণ্য একটা মেয়ের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেছে। আমি কি তার যোগ্য ? এ কিন্তু সত্যি নয়। আমি বলছি, সত্যি নয়। এ এক মায়ার খেলা।)

এই, এই, কী হয়েছে আপনার ?

সুহাস হঠাৎ চম্পির দুই ডানা ধরে জোরে ঝাঁকানি দিল। চম্পি সম্বিত ফিরে পেল। এ কী ব্যাপার, অ্যাঁ !

সুহাস বলল, কী আবার, শরীর খারাপ করছে না কি ?

চম্পি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না না।

শৈল বলল, তবে ? খুব দুর্বল লাগছে বুঝি ?

চম্পি তেমনি তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

সুহাস বলল, বউদি, তুমি শিগগির দুধটা নিয়ে এস।

শৈল বলল, ঠিক বলেছ।

শৈল ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর চম্পি বুঝল, একা ঘরে সে আর সুহাস। না না, ছি-ছি, কী বিচ্ছিরি ! তক্ষুনি চম্পিও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচে। কিন্তু সে সাহস পেল না। সত্যিই তার তখন বেশ একটু দুর্বল দুর্বল লাগছে। উঠতে গেলে যদি কিছু হয়ে যায় আবার ! তা হলে এই ফাঁকা ঘরে সুহাস আবার...না না, তার চেয়ে বসেই থাক্ চম্পি। কিন্তু

তাতেও যে প্রবল অস্বস্তি লাগছে তার। কান মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। ধুকপুক করছে বুক। চম্পি ঘামতে লাগল। সে সুহাসের দিকে না চেয়েও বুঝল, সুহাস তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। একটু আড়াল পেলে চম্পির যেন সুবিধে হত। কিন্তু তার আর সুহাসের মধ্যে কোন আড়াল নেই। ফাঁকা মাঠে প্রখর সূর্যের আলো যেমন আপন বিক্রমে ঝরে পড়তে থাকে, চম্পির দেহের উপর তেমনিভাবে যেন সুহাসের দৃষ্টি ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ভিতরে পরার জামা চম্পির নেই। হঠাৎ তার মনে পড়ল। একটা ছিল ছিঁড়ে গেছে। সে তো জানত না, সুহাস বলে এমন একজন কেউ এই পৃথিবীতে আছে। সে তো জানত না. তাকে এমন অরক্ষিতভাবে সেই সুহাসের প্রতিরোধহীন দৃষ্টির সামনে পড়তে হবে। আগে জানলে সে হয়ত আসতই না। যদিও আসত, তবে সতর্ক হয়েই আসত, অন্তত কাকিমার জামাটা পরে আসত। শুধু সেমিজে তার যেন লজ্জা ঢাকছে না। কাপড়ের আঁচল দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে বসেছে, তবুও না। কী বিপত্তিতেই না সে পড়েছে।

শৈলদিই বা আসছে না কেন? তার যাবারই বা দরকার ছিল কী?

সত্যি, আপনার চেহারাটায় কিন্তু শিল্পী-শিল্পী ভাব আছে।

সুহাসের হঠাৎ মন্তব্যে চমক খেয়ে চম্পি তার দিকে চাইল। সুহাসের চোখে কিন্তু ঠাট্টা নেই। সেই রামধনুর মায়াও নেই। এ চোখের দিকে তবু চাওয়া যায়। সুহাসের কথা সে বুঝল না। শিল্পী কথাটার কী মানে সে তো জানে না। কখনও শোনে নি। এসব হয়ত কলকাতার কোন কথা। শিল্পী-শিল্পী ভাব? কথাটা শুনে তার পিলসুজের কথা মনে পড়ল। সে কী পিলসুজ? সে কী তবে পিলপে? চম্পি পিলসুজের সঙ্গে তার চেহারাটা কল্পনায় মিলিয়ে নিল। ধ্যাত, হাসি পেল তার। আর আশ্চর্য, এই দুঃসহ অস্বস্তি অনেকখানি কমে গেল।

সুহাস বলল, কী গান জানেন আপনি?

কি গান আবার? সে কি কাউকে শোনাবার মত নাকি? গ্রামের মেয়েদের মধ্যে সে আগে তার গান শোনাত। যা শুনত, তাই গাইতে পারত। শুধু এক বষ্টুমির কাছ থেকে গোটা কতক পদাবলী কীর্তন যত্ন করে শিখেছিল। আর মেজকাকার কাছে যশোরে গিয়ে একবার মাস পাঁচেক ছিল, তখন কাকার কলের গান থেকে কিছু গান শিখে এসেছিল। তাই তখন গাইত চম্পি। তখন তো সে যুথির চেয়েও ছোট। বারকয়েক

বাসর-ঘরে গাইবার জন্য তার ডাক পড়েছিল। গেয়েও ছিল। খুব প্রশংসা পেয়েছিল নয়ন, বনা আর কমলার বরের কাছ থেকেও। ওরা কেউ গানের গ-ও জানত না, তবু এই নিয়ে এককালে গর্ব করত চম্পি। ভগবান তার শাস্তি দিচ্ছেন। ওরা সব্বাই কবেই শ্বশুর ঘর করতে চলে গেছে। আর গুণবতী চম্পি থুবড়ো হয়ে এখনও পড়ে আছে গ্রামে। গান অনেকদিন বন্ধ হয়ে গিয়েছে তার। শৈলদি বুঝি সেই কথাই বলেছে সুহাসকে। হা আমার কপাল!

তবুও তো, শৈলদিই একমাত্র মনে রেখেছে সে কথা। তার কলকাতার দেওরের কাছে বলেছে। সুহাস আন্তরিকভাবে আগ্রহ দেখাচ্ছে। আর কারও বোধ হয় মনেই নেই। চম্পি নিজেও তো ভুলে গিয়েছিল। সে কেমন এক অদ্ভুত প্রেরণা পাচ্ছে যেন। প্রাত্যহিক জীবনের ব্যর্থতা, হতাশা, সংকীর্ণতার গণ্ডি থেকে তার হাত ধরে কে যেন মহত্তর কোন এক জায়গায় তুলে নিয়ে যেতে এসেছে। সে যেন বাক্সের কোণে বহুদিন-পড়ে-থাকা একটা পয়সা। এক পিঠ যার তেলা। ঘসা। এতদিন এই পিঠটা দেখেই সবাই তার মূল্য নির্ধারণ করেছে। আজ শৈলদি এসে সেটা যেন উল্টে দিল। দেখা গেল ওপিঠটা একেবারে অক্ষত রয়েছে। ছাপটা পরিষ্কার পড়া যায়। তাই দেখে সুহাস যেন ভরসা দিচ্ছে, ও পয়সা একেবারে অচল নয়। চলতেও পারে। তাই যেন সে নেড়ে-চেড়ে দেখছে তাকে। চম্পির মত মেয়ের পক্ষে তাই বা কম কী?

সে সলজ্জ হেসে মৃদুস্বরে বলল, শৈলদি খুব বাড়ায়ে বলিছে।

সুহাস বলল, যাক, কথা যখন ফুটেছে তখন সুর বেরুবার ভরসাও আছে।

সুহাস এবার হেসে উঠল। শৈল দুধের বাটি নিয়ে ঢুকে পড়ল।

টেবিলের উপর সেটা রেখে বলল, কী ভাই, হাসি কেন? আমি বাদ পড়লাম বুঝি?

সুহাস হাসতে হাসতে বলল, না বউদি, বাদ যাতে না পড়, এতক্ষণে তো তারই ব্যবস্থা হল। ওর মুখে কথা ফুটেছে।

শৈল ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে চম্পির সঙ্কোচ অনেকখানি কমে গেল। তার সহজ সত্তাটা সে ফিরে পেল। এতক্ষণ পরে তার মনটা সজীব হয়ে উঠল।

শৈল বলল, বেশ হয়েছে। চম্পি ভাই, তুমি দুধটুকু খেয়ে নাও।

চম্পি বলল, না না শৈলদি। দুধ খাব কী?

কিছুতেই সে দুধ খেল না। সে এখন যথেষ্ট সুস্থ হয়ে উঠেছে। অসুস্থই বা কখন ছিল? কেন যে হঠাৎ অমন ভিরমি খেল, সে নিজেই জানে না।

শৈল বলল, একখানা গান তবে শোনাও ভাই। ঠাকুরপো কলকাতার লোক, আমার বাপের বাড়ি যে ফ্যালনা নয়, একটু বুঝে যাক। আমাদের তো ভগবান মেরে রেখেছেন। গলা দিয়ে হাঁড়িচাঁচার আওয়াজ ছাড়া আর কিছু বেরোয় না।

না না শৈলদি, সে সব কি আজকের কথা। গান-টান মাথায় উঠিছে অনেকদিন।

মাথা থেকে গলার দূরত্ব খুব বেশী তো নয়। আর তা ছাড়া কোন জিনিস ওঠাতেই যা কষ্ট, নামাতে তেমন কষ্ট নেই। নিন চট করে নামিয়ে ফেলুন।

কোন ওজর খাটল না চম্পির। তখন গাইতেই মনস্থির করল। অকস্মাৎ তাব প্রাণে প্রবল উৎসাহের জোয়ার এল। অনেকগুলি গান বিস্মৃতির তলা থেকে একসঙ্গে হুটোপুটি করে উঠে এল। একটা উত্তেজনার কম্পন ছড়িয়ে পড়ল তার দেহে। সুহাস সামনে বসে আছে। পাশে শৈলদি। শৈলদি তার দিকে চেয়ে আছে। সুহাসবাবু তার দিকে চেয়ে আছেন। সুহাসবাবুর চোখে সাগ্রহ প্রতীক্ষা। কলকাতায় কত ভাল ভাল গান হয়। কত ভাল গান শোনেন সুহাসবাবু। সে তাকে কী গান শোনাবে? তার গান শুনে মনে মনে তিনি হাসবেন। বন্ধুবান্ধবদের কাছে ঠাট্টা করবেন। ভয় পেয়ে গেল চম্পি। বিব্রত হয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে সব গান সে ভুলে গেল। তার মাথা খালি হয়ে গেল। একটা গানের একটা কলি, একটুকু সুরও সে মনে করতে পারল না। তার সামনে পিছনে আশে পাশে আর-কিছু নেই। এই ঘর নেই, শৈলদি নেই, সে নেই, কেউ নেই। আছে শুধু দুটি উজ্জ্বল চোখের স্থির প্রতীক্ষা। এ দুটি চোখের ইচ্ছা সে পূর্ণ করতে পারছে না। পারবে না, কখনও পারবে না। চোখ বুঁজে নিশ্চল হয়ে বসে রইল। গানগুলো বিদ্যুৎবেগে ছুটোছুটি করতে লেগেছে। চম্পি প্রাণপণে হাতড়াচ্ছে অন্ধের মত। আবছা-আবছা ভেসে উঠছে। আবার টুপ করে ডুব দিচ্ছে অন্তহীন বিস্মৃতির গহ্বরে। কাউকে সে ধরতে পারছে না। চম্পি হার মানল। অসম্ভব। হবে না। সে যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে, হতাশ হয়ে পড়েছে, এমন সময় একটা সুর গুনগুন করে

ধরা দিল তার কাছে। একটা গান মনে পড়ল তার। সে গাইল: মাধব বহুত মিনতি করি তোয়। দেই তুলসী তিল, এ দেহ সমর্পিলুঁ দয়া জনু ন ছোড়বি মোয়। বিদ্যাপতির পদ। অনন্ত বষ্টুমি শিখিয়েছিল তাকে। পুঞ্জীভূত যে আকুতি জমে ছিল, আত্মসমর্পণের যে তীব্র আশা লালিত হয়েছিল চম্পির মনে, অতি সযত্নে, অতিশয় গোপনে, গানের পাখায় বেঁধে চম্পি আজ তাকে মুক্ত করে দিল। তার বুক থেকে একটা ভার, যেন একটা পাষাণ নেমে গেল। চম্পির মন ভরে উঠল আনন্দে। দু চোখের কোণ বেয়ে ধারা নামল।

সুহাসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় যে খাদ নেই, চম্পি এক নজর তার চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছিল। সেই রহস্যচপল চোখ দুটো মুগ্ধ হয়ে গভীর প্রশান্তিতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রামধনু রঙের অদ্ভুত দ্যুতি খেলে বেড়াচ্ছিল দুটি উজ্জ্বল তারায়। চম্পিকে আর-কিছু বলার দরকার হয় নি, বোঝাবার দরকার হয় নি, সে আপনা থেকেই বুঝতে পেরেছিল, এর অর্থ কী? চম্পির খুব ভাল লাগছিল।

এই অনুভূতিটা সে আগে কখনও পায় নি। সুহাসের প্রশংসা—সত্যি-কারের প্রশংসা পাওয়া সহজ কাজ নয়। ওঁরা কলকাতার লোক, কত ভাল ভাল গান শুনেছেন। তা সত্ত্বেও সুহাসের, মানে সুহাসবাবুর ভাল লেগেছে তার গান। একটা শেষ হলে আর-একটা শুনতে চেয়েছেন। সে-ও গেয়ে গেছে মনের আনন্দে। চার-পাঁচটা গান গেয়ে ফেলেছিল চম্পি।

কলকাতায় থাকলে আপনার অনেক আদর হত। সুহাস গদগদ হয়ে বলেছিল। বলেছিল, গান অনেকেই গায়, অনেকেই শেখে, কিন্তু আপনার মত গলা কজনে পায়? এত দরদ কজনের থাকে? আপনার মত এমন সুন্দর গলার জন্যই বোধ হয় এসব গান সৃষ্টি হয়েছিল। প্রশংসার ভারে নুয়ে পড়েছিল চম্পি। খুশিতে আর লজ্জায় সে মুখ তুলতে পারে নি। তবু তার আকাঙ্ক্ষা মেটে নি। বলুক, বলুক সুহাস, আরও কিছু বলুক। সে যেন ঠিক রজনীগন্ধার ডাঁটা, ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে তবু ফুল ফোটাবার আকাঙ্ক্ষা ছাড়ছে না।

এ একটা আশ্চর্য দিন। চম্পির জীবনে এমন দিন আর আসে নি। শুয়ে শুয়ে চম্পি ভাবতে লাগল। ঘুম আসছে না তার। রাত কত হল কে জানে?

যুথি আর সে খাটের উপর শুয়ে আছে। যুথির কাছে শুতে আজ আর তেমন অস্বস্তি লাগছে না। যুথিকে পছন্দ করে যাবার পর থেকে সে মনে মনে যুথিকে তীব্র ঈর্ষা করে এসেছে। যুথির কাছে তার যেন চরমতম পরাজয় হয়েছিল। আজ এখন তার আর তেমন কোন আক্রোশ নেই। যারা যুথিকে পছন্দ করে গিয়েছিল তারা তো অজ গ্রামেরই লোক। এখন সে-কথা মনে পড়ছে চম্পির। সুহাসের মত মার্জিত ভদ্র শিক্ষিত লোককে মুগ্ধ করতে পেরেছে চম্পি। যুথি পারত না। অনেক বড় জয় তার হয়েছে।

কলকাতায় থাকলে আপনার অনেক আদর হত। কী সুন্দর কথাটা! কলকাতা যে সুন্দর জায়গা। সেজকাকারা থাকেন। সেজকাকীমা ওকে তো নিয়ে যেতেও চেয়েছিলেন। সেই যখন তার জলপানি পাওয়ার খবরটা বেরিয়েছিল। তখন সে বেশ ছোট, বছর দশেক বয়েস হবে তার। মা যেতে দিল না। মাকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতে তখন তারও খারাপ লেগেছিল। মন কেমন করেছিল। তা ছাড়া মা আবার সেজকাকীমাকে দেখতে পারত না। মা বলেছিল, তোর সেজ খুড়ীর বাঁদীর দরকার পড়েছে, তাই তোকে নিতে চায়। এই কথা শুনে সে-ও তখন সেজকাকীমার উপর রেগে গিয়েছিল। কলকাতায় থাকলে আপনার অনেক আদর হত। ইস, কী বোকামিই না করেছ চম্পি। কেন তখন গেল না? চম্পির মনটা আজ হায় হায় করে উঠল। কলকাতা তার জীবনে যে এত বড় হয়ে উঠবে, সে-কথা চম্পি তো আজ দুপুর পর্যন্তও বুঝতে পারে নি। সুহাসকে দেখার আগে পর্যন্ত না। সুহাস যে কলকাতার বাসিন্দা, সেই কলকাতা উপযাচক হয়ে চম্পিকে প্রবেশাধিকার দিতে চেয়েছিল। সাধা নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছে চম্পি। আজ তার হা হুতাশ করা ছাড়া উপায় কী?

না হয় সে বাঁদী হয়েই থাকত। এখানেই বা সে কী! বাঁদীই তো। তবু কলকাতায় গেলে সে না-হয় কলকাতার বাঁদী হত। কিন্তু লেখাপড়াটা হত তার। গানটা শিখতে পারত, সেলাই শিখত। এমন অসহায় অবস্থা হত না। আর কিছু যদি না-ও হত, সেজকাকীমার বোনের মত চাকরি করতে পারত সে কোনও ইস্কুলে। এই গ্রামের মত খারাপ জায়গা কলকাতা নয়। পান থেকে চুন খসলে নিন্দে হয় না কারও। গ্রাম কী দেয়, কী দিতে পারে? কোন ভাল শিক্ষা? এক কণাও না। দিতে পারে শুধু

নিন্দে। কলঙ্ক। এই দুটো সামগ্রীই দেদার ফলে গ্রামে। অকাতরে গ্রামের লোক তাই দু হাতে বিলোয়।

আর কলকাতা? কলকাতা গুণের আদর করে। সেই কলকাতার ডাক শুনেও শোনে নি চম্পি। তাই এই গ্রামের দম-আটকানো প্রকৃতি তাকে ক্রমশ ঠেলতে ঠেলতে এক পাঁচিলের গায়ে এনে যেন ঠেসে ধরেছে। আর এগোবার পথ নেই তার। অথচ একদিন এই গ্রাম ছাড়তে হবে ভেবে তার প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছিল।

কলকাতায় থাকলে আপনার অনেক আদর হত! আমার অনেক আদর হত। সুহাসবাবুর চোখে আমার দাম আরও বাড়ত। সুহাসবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হত কী করে? কেন শৈলদি বুঝি তার বাড়িতে আমাকে নিয়ে যেত না? না-হয় সেজকাকীমার বোন মণিকা মাসীর সঙ্গে আমি একদিন যেতাম। তখন আমার পেটেও তো কিছু বিদ্যে থাকত। সুহাস-বাবুর সামনে এমন জবুথবু হয়ে বসে থাকতাম না নিশ্চয়ই। দুকথা গুছিয়ে বলতে পারতাম। এখন যে ওঁর সামনে মুখ খুলতে পারি নে, লজ্জায় প্রায় মরে যাই, সে-তো আমি কিছু জানি নে বলে।

আজ সুহাসবাবু তাকে যখন এগিয়ে দিতে চাইলেন, চম্পি অমনি শিউরে উঠেছিল। কেন? সে কি চায় নি, সুহাসবাবু তার সঙ্গে আসুক। সে এখন মনে করতে পারছে না, তখন তার মন কী চাইছিল! অমন একটা আশ্চর্য সম্ভাবনার কথা ভেবে যে মনে মনে এমনই উত্তেজিত আর সঙ্গে সঙ্গে বিব্রত হয়ে উঠেছিল যে সে-সময়ের কথা তার স্পষ্ট মনে নেই। কিন্তু এখন, সুহাসবাবু নেই, তার উত্তেজনা নেই, সে একটুও বিব্রত বোধ করছে না। এখন তার মনে হচ্ছে সুহাসবাবু তাকে এগিয়ে দিতে এলে সে খুব খুশীই হত। কিন্তু এই গ্রামে, এই হতচ্ছাড়া জায়গায় কী তা হতে পারে? সর্বনাশ! কাল থেকে তা হলে কি গ্রামে আর কান পাতা যেত! তার নিন্দায় আকাশ বাতাস ভরে উঠত না।

তাই তো সে সুহাসবাবুর প্রস্তাবে শিউরে উঠেছিল, একাই চলে এসেছে। কলকাতা হলে সুহাসবাবু নিশ্চয়ই তাকে সেজকাকার বাসায় অক্লেশে পৌঁছে দিতে পারতেন। কেউ কিছু মনে করত না।

গ্রামে আর কলকাতায় কী প্রকাণ্ড তফাত। সেই পার্থক্যটা চম্পি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খতিয়ে দেখতে লাগল। ফুলু কাকিমা আর তার মায়েতে

যে তফাৎ, শৈলদি আর টুনিতে যে তফাৎ, সুহাসবাবু আর এ গ্রামের গা-খালি ভুঁড়িদার পান-বিড়ি-ফোঁকা বিষ্টুপদ, অভয় আর ছনে ঘোষে যে তফাৎ, কলকাতা আর তাদের গ্রামেরও তফাৎ ততটাই। এক লহমায় শৈলদিদের পরিচ্ছন্ন সংসারটার যে ছবি দেখে নিয়েছে চম্পি তার সঙ্গে নিজেদের সংসারটা মিলিয়ে দেখতে লাগল। শৈলদিদের পায়ের নখের যোগ্যও নয় তারা। একটা ঝকঝকে তকতকে সাজান ময়ূরপংখী নাও আর অন্যটা শতচ্ছিদ্র হতকুচ্ছিত তালের ডোঙা। কোন তুলনাই চলে না।

কলকাতা মানে ফুলু কাকিমা, কলকাতা মানে শৈলদি আর সুহাসবাবু। কালোর মধ্যেও যে আলোর টুকরো থাকে, সে শুধু ওদের চোখেই ধরা পড়ে।

ভাগ্যিস্ গিয়েছিল চম্পি। আজ কার মুখ দেখে সকালে উঠেছিল, সে মনে করতে পারল না। না, দিনটা শুরু হয়েছিল অন্যদিনের মতই সাধারণভাবে। কোন বৈচিত্র্য ছিল না, চমক ছিল না। তার সমাপ্তিটাই অসাধারণ। খুব ভাল, মনোমত একটা ভোজ খাওয়া যেন শেষ হয়ে গেছে। চম্পি তবু পাত ছেড়ে ওঠে নি, এখন বসে বসে যেন ভাল ভাল মাছের কাঁটা চুষে চলেছে।

হঠাৎ সে শুনল, ঠাকুমা বিড়বিড় করে পরিচিত সুর আউড়ে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নাম আবৃত্তি করতে লেগেছেন—

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণাসাগর।
জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালি
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি ॥

অ্যাঁ, চমকে উঠল চম্পি। সর্বনাশ! সে কী রাত কাবার করে দিল নাকি? হ্যাঁ, ওই যে ঠাকুমা বড় রকম একটা হাই তুলে একটু থামলেন। ওই যে গুনগুন করে সেই নরম শ্রুতিমধুর সুরটা একটানা স্রোতের মত আবার বইতে লাগল—

হরি নাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে
বিফল মনুষ্যজন্ম যায় দিনে দিনে
দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণচরণারবৃন্দে।

সেই জ্ঞান হওয়া ইস্তক শুনে শুনে সমস্ত পদগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে।

ঠাকুমার সাড়া পেয়ে তার মনের ঘুমন্ত সুরটাও জেগে উঠল। দিন গেল মিছে কাজে, রাত্রি গেল নিদ্রে! আজকের দিনটা, না আজকের নয়, কালকের দিনটা তো তার মিছে যায় নি, রাতটাও নিদ্রায় কাটে নি। বছরের পর বছর যে মাঠে বৃষ্টি পড়ে নি, কাল বুঝি তাতে এক পসলা করুণার ধারা ঝরেছে। মনে মনে গুনগুন করল চম্পি, কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণাসাগর! কেন তার চোখে হঠাৎ হঠাৎ এমন জল আসে? হাত দুটো জোড় করে, চিত হয়ে শুয়ে শুয়েই চম্পি প্রণাম করল। কতদিন পরে সে এই অন্ধকার ভোরে ঠাকুরকে প্রণাম করবার অভ্যাসটা ফিরিয়ে আনল। তার মনে সারারাত যে চিন্তাগুলো এত তোলপাড় করল, তাকে জাগিয়ে রাখল, তারা এই অষ্টোত্তরশত নামের সুরের স্রোতে কোথায় যে ভেসে গেল কে জানে?

চম্পি এক সময় দেখল, ঠাকুমার গুনগুনানির সঙ্গে সে-ও কখন সমস্বরে গলা মিলিয়ে দিয়েছে:

> কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারেতে আইনু
> মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হৈনু।
> ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাঙি পড়ে
> কালরূপে সংসারেতে 'পক্ষ' বাসা করে॥

ঠাকুমা পক্ষীকে বার বার 'পক্ষ' বলে এসেছেন, আশ্চর্য, চম্পিও 'পক্ষ'-ই বলে গেল। সে যেন সম্মোহিত হয়ে গেছে। ঠাকুমার গুণগুণ স্রোত তাকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, সে গা ঢেলে দিয়ে সেই দিকেই ভেসে চলেছে। চম্পির গলা পেয়ে এক মুহূর্তের জন্য ঠাকুমা বুঝি থেমেছিলেন, তারপর আবার তার সুরের স্রোত ছেড়ে দিলেন। দুজনের গলা এক সুরে মিলে এক স্রোতে ভেসে চলল:

যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দৈবকীর উদরে মথুরাতে দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করে বাসুদেব রাখি আইল নন্দের মন্দিরে নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন······

ছয়

সারাটা দিন, এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও, চম্পির মেজাজটা খুব ভাল ছিল। দেহ মনে যেন উৎসাহের ঢল নেমেছে তার। বাড়ির কাজ সারতে একটুও বিরক্ত লাগে নি। ভাল লেগেছে নাদুস-নুদুস ভাইটাকে কোলে নিয়ে আদর করতে। এইটুকু ছেলে, কিন্তু কত যে তার বুদ্ধি না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ডাক তো একবার শঙ্খ বলে, ছাখ কী করে? থপ থপ করে টলতে টলতে এগিয়ে আসবে, জড়িয়ে ধরবে তোমায়। তখন তুমি কি তাকে বুকে না তুলে পার? চুমু না খেয়ে পার? আজ চম্পির আদর যেন আর ফুরায় না। আদরে আদরে ক্লান্ত করে সে শঙ্খকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

আর সে যা করেছে বাড়ির কেউ তা জানে না। চম্পি জানে আর তার মনই জানে। গুন গুন করে গান গেয়েছে সারাদিন। মনে মনে একজনকে শুধু গান শুনিয়ে গেছে। কী সুর বাজে, মম হৃদিমাঝে, আমি জানি, আমার মনই জানে। মেজকাকার যশোরের বাড়িতে শোনা কলের গানের গান। আঙুরবালার গাওয়া। সুন্দর গানখানা। হঠাৎ লাফিয়ে উঠল চম্পির মন। শুধু কি ওই গানখানাই? মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর, নম নম। ইন্দুবালার গান। মোর শিওরে বসিয়া চুপি চুপি চুপি মেলিলে নয়ন। এই লাইনটা মনে আসতেই কাল দুপুরে শৈলদির বাড়ির ছবিটা মনে পড়ে গেল। চম্পির শিয়রে চুপি চুপি একজন নয়ন মেলে বসে ছিল। ছবিটা হঠাৎ ভেসে উঠে চকিতে মিলিয়ে গেল। তার বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। সে বড় লজ্জা পেল। সচকিত হয়ে চারিদিকে চেয়ে নিল। কেউ টের পেল নাকি?

সারাদিন এমন করে কাটল তার। কাজে অকাজে আজ গান মনে পড়েছে শুধু। সকালে সাজি ভরে ফুল তুলতে গেছে, অমনি নীহারবালার গান একটা গুন গুন করে উঠল মনে। সারা সকালটি বসে বসে সাধের মালাটি গেঁথেছি, পরাব বলিয়া তোমার গলায়, মালাটি আমার গেঁথেছি। পরাব

বলিয়া তোমার গলায়…বার বার এই কলিটা তার মনে ফিরে ফিরে এসেছে। যেন ভারী এক ভ্রমর বারে বারে ছোট্ট একটা ফুলের উপর বসতে চেষ্টা করছে, সেই ভ্রমরের ভারে ফুলটা নুয়ে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সে যেন আবার চট করে ফুল ছেড়ে উড়তে লেগেছে। পরাব বলিয়া তোমার গলায়…কার গলায় মালা পরাতে চায় চম্পি? বুকে আবার কাঁপন ধরে। কারও না কারও না। সে কারও গলায় মালা পরাতে চাইছে না, সে একটা গান গাইছে শুধু, না, তাও না, গানটা আপনা থেকেই বাজছে তার মনে। চম্পি তার কী করবে! কিন্তু আজ তার মনে শুধু এই গানগুলোই বা বেজে উঠছে কেন? চম্পি তা জানে না। সত্যি জানে না।

এ গানগুলো তার গতকাল মনে পড়ে নি। ভাগ্যিস মনে পড়ে নি! নইলে কাল হয়তো সে গেয়েই দিত কোনটা। কী হত তা হলে! বিশ্রী ব্যাপার হত। মুখ টিপে টিপে হাসতেন সুহাসবাবু। হাসত শৈলদি। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, কালপেঁচার শখের বাহার আছে! বামন হয়ে চাঁদে হাত! কিন্তু এ-গানগুলো কি আমি বানাইছি! তর্ক তুলল চম্পি। রেকর্ডের গান যেমন শুনিছি, তেমনি গাইছি। ও তো ফাঁকা কৈফিয়ৎ। চম্পি আবার নিজেকে বলল। গানগুলো কী তোমার কথাই বলে নি! এবার সে চুপ করে গেল। এ কথার কী জবাব হতে পারে? জবাব নেই। বেশ, সে না-হয় আর কখনও কারও সামনে গাইবে না। না, কক্ষণও গাইবে না।

সারাদিন ধরে বারে বারে চম্পি নানা পথ ঘুরে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছে। খাওয়া-দাওয়া সারা হলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল সে। চেয়ে দেখল, বেশ রোদ। । আজ একটু বেলা পড়লে সে শৈলদির বাড়ি যাবে, তবে বেশীক্ষণ বসবে না। চম্পি তোরঙ্গটা খুলে দেখল, একখানাও ভাল কাপড় নেই তার। কাল সে নিতান্ত পেত্নীর মত গিয়ে হাজির হয়েছিল শৈলদির বাড়িতে। কাপড়ের সেলাই দুটো ঢাকা দেবার জন্য অনেক চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হয়েছিল কাল। এটা ঢাকা পড়ে তো ওটা বেরিয়ে যায়। তার বার বার মনে হয়েছিল, সুহাসবাবুর একাগ্র দৃষ্টি যেন ওই ছেঁড়া জায়গাটাতেই আটকে গেছে। ফাটা ছাদে বৃষ্টির জল যেমন আটকে যায়, গড়িয়ে নর্দমায় না যেতে পেরে যেমন ঘরের মেঝেয় চুঁইয়ে পড়ে, সুহাসের দৃষ্টিও যেন তেমনি করেই আটকে গেছে চম্পির কাপড়ের ছেঁড়া জায়গার

সেলাইতে, তা যেন আর গড়িয়ে অন্য কোথাও যেতে পারবে না, এবার ছেঁড়ার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়বে তার ত্বকের উপর। কাল এমন আশঙ্কাই দেখা দিয়েছিল চম্পির মনে। তাই প্রবল অস্বস্তি চোর কাঁটার মত বিঁধছিল কাল। না, আজ সে আর ছেঁড়া কাপড় পরে যাবে না।

বরঞ্চ ছোটকাকীমার কাছ থেকে একখানা ভাল শাড়ি চেয়ে নেবে। জামাও চাইবে একটা। আর যাওয়ার আগে সাবান মেখে গা-টাও ধুয়ে নেবে। কাল বড় ঘেমেছিল সে। সুহাসবাবুর অত কাছাকাছি বসে তার ঘাম-প্যাচপেচে শরীরটা নিয়ে সে বড় বিব্রত হয়ে পড়েছিল। তোরঙ্গে তার একখানা সাবান লুকনো ছিল। বড়দাদা মাস কয়েক আগে যখন বাড়ি এসেছিল, সেই সময় চম্পি সাবানখানা চুরি করে সরিয়ে রেখেছিল। ঘিয়ে রঙের একখানা সাবান। বঙ্গলক্ষ্মী টার্কিশ বাথ। এ পর্যন্ত একদিনও সে ওটা ব্যবহার করে নি। আজ সে সাবান মেখে গা ধোবে।

কিন্তু সাবানখানা গেল কোথায়? তোরঙ্গ ওলট-পালট করেও চম্পি সাবান পেল না। বাঃ রে! কে নেবে সে সাবান? কে নিল? একবার, দুবার, তিনবার, সে বাক্স হাতড়াল। পেল না। কাপড়-চোপড়ের ভাঁজের মধ্যে নেই তো। চম্পি নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করা নানান রকম কাপড়ের টুকরো, গরম জামা, সেলাইয়ের বাক্স, সব নামিয়ে নামিয়ে হাতড়ে হাতড়ে দেখল। না, নেই। চম্পির চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল প্রায়। কোথায় রাখল সে? নাকি কেউ গাপ করেছে? জিনিসটা সামান্য এক টুকরো সাবান হতে পারে, কিন্তু চম্পির কাছে ওর মূল্যই অসাধারণ। শখের জিনিস বলতে ওইটুকুই তার সম্বল ছিল। কতদিন তার মনে হয়েছে, একটু মাখি। কিন্তু অযথা জিনিসটা খরচ করতে সে চায় নি। বেশ একটা মৃদু গন্ধ ছিল। বারকয়েক শুঁকে শুঁকে সে আবার সেটা বাক্সবন্দী করে রেখে দিয়েছিল। আজ তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। শূন্য চোখে সে খোলা তোরঙ্গের ডালার দিকে চেয়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে খসখস শব্দ পেয়ে তার সম্বিত ফিরে এল। দেখল, যুথি গা ধুয়ে ছোটকাকীমার ভাল একটা জামা আর লাল টুকটুকে একটা সিল্কের কাপড় পরে আয়নার সামনে এসে চুল আঁচড়াতে বসল।

চম্পি একটু অবাক হল। যুথি যে হঠাৎ পটের বিবি সাজতে বসল! বাব্বাঃ, ঢঙ কত! আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতবার করে মুখখানা দেখছে!

রূপের গরবে মাটিতে আর পা পড়ে না। তা রূপসী এখন যাচ্ছেন কোথায়? ভাবল একবার জিজ্ঞেস করে। কিন্তু করল না।

যুথি নিজেই বলল, যাই, শৈলদির বাড়ির থে এক পাক ঘুরে আসি গে।

ও, তাই বল! শৈলদির বাড়ি যাওয়া হবে। তাই এত পরী সাজার ঘটা! চম্পির বুকে ঈর্ষা কুট করে একটু কামড়ে দিল। ভাবল, বাব্বা, কী হিংসুটে মেয়ে। কাল ওই যে আমি গিয়েছি শৈলদির বাড়ি, অমনি ওরও আজ যাবার তাড়া পড়ল। পরের জামা-কাপড় পরে সাজের বাহার খুলতে লজ্জা করে না! অমন সাজের গলায় দড়ি। যাও না, ও বাড়িতে একবার। ওরা সব কলকাতার লোক। চটকে ভোলে না। যাও, খানকতক গান শুনিয়ে এস। গান! কুল্লোর মত গলা যুথির। চিৎকার ছাড়া আর-কিছু বেরয় না।

হঠাৎ চম্পির সন্দেহ হল। যুথির গা হাত পা মুখ এত চকচক করছে কেন? সে উঠে যুথির গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

চম্পি জিজ্ঞেস করল, আমার সাবান নিইছিস?

যুথি চমকে উঠল। পরক্ষণেই সামলে নিল। পরম উপেক্ষাভরে চম্পির দিকে চাইল। তারপর কোন কথা না বলে, ঠোঁটটা একটু উল্টে দিয়ে আয়নার দিকে চেয়ে সিঁথি ঠিক করতে লাগল। চম্পির সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল।

বলল, মুখি কি পোক পড়িছে? কথার জবাব দিস নে ক্যান? ক্যান আমার সাবান চুরি করলি?

যুথি তেমনি অবজ্ঞাভরে বলল, খায়ে তো আর ফেলি নি। একটুখানি মাখিছি।

তাই বা মাখবি ক্যান? ও কী তোর জিনিস?

না, তুমার জিনিস। শ্বশুরবাড়ির থে আনিছ যে! যুথি খ্যারখ্যার করে উঠল।

চম্পি এতক্ষণ রাগে কাঁপছিল। এবার আর সামলাতে পারল না। ঠাস করে যুথির গালে মারল এক চড়।

চড় খেয়ে সাপের মত ফোঁস করে উঠল যুথি। হারামজাদি, কালকুশি, পেঁচি, তুই আমারে মারলি? তুই ও সাবান কনে পালি? দাদার বাক্সর থে তুই চুরি করিস নি? আমি আর জানি নে কিছু, না? পেত্নী কুথাকার! তোর ওই হাত খসে পড়ুক। মর্ মর্ তুই।

চম্পির ইচ্ছে হল, গলা টিপে মেরে ফেলে যুথিকে। ও হচ্ছে জন্মশত্রু।

কিন্তু চম্পি কিছু করার আগেই যুথি বেরিয়ে গেল দুম দুম করে। চম্পি দুঃখে, অপমানে ঈর্ষায় জ্বলতে লাগল। ও আমার শত্তুর, শত্তুর, শত্তুর! চম্পির চোখ দিয়ে যেন আগুনের হল্কা বেরতে লাগল।

যুথি বেরিয়ে যাবার কিছু পরেই রণমূর্তি হয়ে মা ঢুকলেন। পিছনে যুথি।

দামিনী যেন চম্পির উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

ওরে ও ঢেঁকি, তুই ওরে মারলি! তোর আস্পদ্দা বাড়ে গেছে! বলি ও কাল, তুমি পার হবা কবে?

কপাল চাপড়াতে লাগলেন দামিনী।

চম্পি বলল, ও আমার সাবান চুরি করিছে ক্যান?

তোর সাবান? যুথি চেঁচাল।

চম্পিও চেঁচিয়ে উঠল তোর সাবান ওটা? চোরের মার বড় গলা।

তুই চোর, তুই চোর, তুই চোর। যুথি মার আড়াল থেকে বিষ ঢালতে লাগল।

দামিনী যুথির পক্ষ নিয়ে লড়তে লাগলেন।

যে না 'সুপ', বেহ্মদতিরাউ দাঁতকপাটি লাগে, ওতে আর সাবান ঘষে না। মারতি হয় গালে ঠাস ঠাস করে দুই চড়। কাজের কাজ নেই, হাতির দিনরাত ঝগড়া! আসুক আজ বাড়ি, কাল সকালে উঠে যার মুখ দেখব, হাড়ি ডোম মুদ্দফরাস, তার হাতেই সঁপে দিয়ে পাপেরে বিদেয় করতি কব। আর সহ্য হয় না।

চম্পির শরীরে তরল আগুন কে যেন ঢেলে দিচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলে মরছে চম্পি।

কাঁপতে কাঁপতে বলল, আমি তো তুমার দু চোখের বিষ। তুমার সুহাগী মেয়ের দোষটা তাই তুমার চোখি পড়ে না। মা হয়েও একচোখো দৃষ্টি তুমার। উপরে আরেকজন আছেন, সব দেখতিছেন। বিচার তিনিই করবেন।

কী হারামজাদী!

দামিনী ছুটে এসে চুল ধরলেন চম্পির। কী হারামজাদী! তুই শাপমন্যি দিস মারে!

গুম গুম করে চম্পির পিঠে কিল মারতে থাকেন।

তুমার আস্পদ্দা দেখি সীমা ছাড়ায়ে গেছে?

দু হাতে চম্পির চুল ধরে পাগলের মত ঝাঁকাতে থাকেন দামিনী। চম্পি আর প্রতিবাদ করে না। পালাতে চেষ্টা করে না। সমস্ত শরীর শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকে অবাধ্য মোষের মত। নীরবে মার খেতে থাকে।

(মার, মার, মেরে ফ্যাল। একেবারে শেষ করে দ্যাও আমারে। তা হলে সব অপমান, জ্বালা, যন্ত্রণার হাত থেকে একেবারে রেহাই পাই।)

হারামজাদী মেয়ে, গলায় পাথর হয়ে বসিছে। নড়ানো যায় না। অ্যাদ্দিন বিয়ে হলি যে দু-তিন ছেলের মা হতি। তা এমন মেয়েই পেটে ধরিছি, গলার কাঁটা।

(তুমি আমাকে পেটে ধরেছ, সে দোষও আমার! ধরলে কেন আমাকে পেটে। আমি তোমার হাতে পায়ে ধরে সেধেছিলাম—ওগো, আমায় পেটে ধর।)

গিরামে আর কান পাতা যায় না। কারুর কাছে মুখ দেখানো যায় না। চিন্তায় চিন্তায় ঘুম ছুটে গেছে, এই কালের জন্যি।

(তোমার চোখে আমি রোজ গিয়ে খোঁচা মারি, তাই তোমার ঘুম হয় না।)

মর্ মর্, মর্। তুই মরলি আমার হাড় জুড়োয়।

(হ্যাঁ, আমি মরব। ঠিক বলেছ। আমি মরব। মরলে শুধু তুমি নও মা, একা তুমি নও, আমিও জুড়োব।)

এত যে কটু কথা শুনল চম্পি, এত মার খেল, অথচ আশ্চর্য, একটা টুঁ শব্দ করল না। দামিনী হাঁপিয়ে উঠলেন, তার বুক ধুকপুক করতে লাগল নিদারুণ পরিশ্রমে। এত বড় একটা মেয়েকে মারা কি কম পরিশ্রম! গলগল করে ঘাম বেরতে লাগল তার। দেহটা অস্থির অস্থির করতে লাগল তার। যুথি নেই। সে শৈলদির বাড়ি হাঁটা দিয়েছে। একটু পাখার বাতাস খেতে পারলে হত। খুঁটি হেলান দিয়ে তিনি দাওয়ায় বসে পড়লেন। শরীরটা থরথর করছে। যুথির উপর রেগে গেলেন। কাজের সময় রাজনন্দিনীকে কখনও পাওয়া যায় না। চম্পি অবশ্য কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে যেন পাথরের মূর্তি একটা। তা ওকে ঠেঙিয়ে আবার ওর কাছ থেকে তো বাতাস খেতে চাওয়া যায় না। হাজার হোক, চক্ষুলজ্জা আছে তো। তিনি সেই দাওয়াতেই আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন।

এই আমি, চম্পি।

সন্ধ্যার অন্ধকারে, পুকুর ঘাটের একগলা জলে দাঁড়িয়ে চম্পি ভাবল, এই তা হলে আমি। সকলের গলার কাঁটা, পরিবারের অনাবশ্যক এক বোঝা। সংসারের অবাঞ্ছিত এক জঞ্জাল। আমার জন্যে কারও চোখে ঘুম নেই, কারও মনে শান্তি নেই। কোথাও ছিটেফোঁটাও স্নেহ-ভালবাসা নেই। ভবিষ্যতে আলোর ইশারা নেই। আমার রঙ যেমন কালো, ভবিষ্যৎটাও তাই।

অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। জন্মক্ষণে কে যেন প্রকাণ্ড একটা দোয়াত উপুড় করে চম্পির অদৃষ্টের লিখনের উপর কালি ঢেলে দিয়েছিল। সেই কালি ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে, এখন গড়িয়ে পড়েছে পুকুরে। পুকুরের জল তাই গাঢ় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। এক আঁজলা জল উপরে তুলে চম্পি আস্তে ছেড়ে দিল। জল নয়, কালি। আবার এক আঁজলা জল নিয়ে ওর হাতের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে দেখল। সব মিশে একাকার হয়ে গেছে। সবই যে অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যে অনায়াসে মিশে যেতে পারবে চম্পি। চিরতরে। সেই ভাল। সবাই তো চায়। জটিল সমস্যা সে সৃষ্টি করেছে তাদের সংসারে—না, সমস্যা সে সৃষ্টি করে নি, করেছে তার অদৃষ্ট। একই বাবা একই মা তার আর যুথির, একই ঔরসে, একই গর্ভে তার আর যুথির জন্ম, তবু কেন তার ত্বকে এত কালি, আর যুথির ত্বকে এত সোনা? কেন? এ যে তার অদৃষ্ট। মেজদিও ত কালো ছিল, বড়দির রঙও এমন আহা মরি কিছু নয়, তবু বিয়ে কী তাঁদের আটকেছে? না। কারণ তখন মেয়ে বিয়ে দেবার মত টাকা ছিল বাবার। তবে তার বেলাতেই বা এমন পৃথক ফল হল কেন? অদৃষ্ট। তার রঙও কালো, তার বাবার টাকাও ফুরিয়ে গেল। বেশ মজা। সবই তার দোষ। তার ছাড়া আর কার? দোষ তার অদৃষ্টের।

পুকুরের কোন ঘাটেই এখন কেউ নেই। থাকলেও ক্ষতি ছিল না। কারও নজরে সে পড়ত না। সে যে আপন রঙে মিশে গেছে। ঠিক এমনি মিশে মিশেই সে একেবারে পুকুরের তলে পৌছে যাবে। সে আর কাউকে বিরক্ত করবে না, বার বার অশান্তির কারণ হবে না, কারও অন্যায় গঞ্জনাও আর সইতে হবে না তাকে।

পুকুরের একেবারে নীচে, গহন তলে, চির অন্ধকারে তার জন্যে এক শান্তিময় বিছানা পাতা আছে। সেই ছায়ায় তার মনের জ্বালা জুড়বে।

যুথি নিষ্কণ্টক হবে। সাবান মাখার ভাগীদার আর কেউ থাকবে না। পথ আটকে থাকবে না কেউ। দেখতে আসবে যুথিকে, এবার যখন যুথিকে দেখতে আসবে কেউ, দেখামাত্র পছন্দ করে যাবে। চম্পির মত একশ গণ্ডা আজে-বাজে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না যুথিকে। কী সব বোকার মত প্রশ্ন! পায়েসে কতখানি নুন দিতে হয়? চম্পির মনে পড়ল দ্বিতীয়বার তাকে যারা দেখতে এসেছিল, এক দোজবরে পাত্রের জন্য, তাদের মধ্যে একজন, এক হাড়গিলে, বোধ হয় বরের বন্ধু, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল : বল দিনি, পায়েসে কতখানি নুন দিতে হয়? চম্পির তখন মনে হয়েছিল, ঠাস করে তার গালে এক চড় মারে। সেবার সেই দোজ-বরে পাত্তরও চম্পিকে পছন্দ করে নি। করেছিল, তবে নগদ চার হাজার টাকা আর কুড়ি ভরি সোনা চেয়েছিল। হায় রে, কালো হওয়া কি এতই অপরাধ যে, দোজবরেও টাকার খাঁই ছাড়ে না!

চম্পি আর একটু গভীর জলে নেমে গেল। থুতনি পর্যন্ত ডুবল তার। শ্যাওলার গন্ধ নাকে এসে লাগছে। একটা ছোট্ট মাছ কুটুস করে তার গলায় কামড় বসিয়ে পালিয়ে গেল।

কালো আর ফরসায় কতটা তফাত? কতক্ষণ সে তফাত থাকে? চম্পির বড় জানতে ইচ্ছে করে। জানতে ইচ্ছে করে, যে-লোক ফরসা মেয়ে ফরসা মেয়ে করে পাগল, সে যখন তার বউয়ের পাশে রাত্রে এসে শোয়, ঘরের আলো যখন নিবে যায়, তখনও কি কালোয় ফরসায় তফাত বোঝা যায়? কী জানি? হয় তো যায়। যাক, তাতে যুথির অসুবিধা হবার কথা নয়। ওর রঙের জোরটা আছে। ওকে হয়ত কেউ কোন প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করবে না। দেখবে আর পছন্দ করবে। দাবি-দাওয়াও বিশেষ কিছু করবে না। যুথির বিয়ে হয়ে যাবে।

চম্পি নিঃশব্দে সাঁতার কাটতে লাগল। জলে বিন্দুমাত্রও শব্দ তুলল না। ওর শরীরের পাশ থেকে অজস্র ঢেউ গোল গোল দাগ তুলে, বড় হতে হতে পাড়ে গিয়ে আছাড় খেতে লাগল। চম্পি বুঝতে পারল ঢেউগুলো যাচ্ছে। দেখতে পেল না। ও জানে, এমনিভাবেই ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। আচ্ছা, ঢেউগুলো এমন ডাঙা লক্ষ্য করে ছোটে কেন? ওরাও কি ডাঙার আশ্রয় কামনা করে? চম্পি দেখেছে, জলে হাত দেওয়া মাত্র কী নিদারুণ

আলোড়ন ওঠে! যেন আগের মুহূর্তের ঢেউগুলোকে কেউ আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছিল, চম্পি তাদের মুক্ত করে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল চতুর্দিকের ডাঙা লক্ষ্য করে। ভয় পেলে শঙ্খ যেমন তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ছোট কাকীমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এই ঢেউগুলো পাড়ের মাটিতে গিয়ে ঠিক তেমনিভাবেই আছড়ে পড়ে। শঙ্খ, হ্যাঁ, শঙ্খ তাকে ভালবাসে। কালো বলে সে কখনও মুখ ফিরিয়ে নেয় না। শিশু কিনা! ও তো এখন দেবতারই সামিল।

মাঝ পুকুরে চলে এল চম্পি। বাড়ির দিকে তাকাল। পাড়টা বেশ উঁচু। বাড়ির সবটা দেখা যায় না। ওদের আর ছোটকাকার ঘরের চাল দেখা যাচ্ছে। আর কিছু না। দূরে কোথায় যেন কীর্তন হচ্ছে, হয় ত জেলেপাড়ায় কিংবা বাইতিপাড়ায়। অস্পষ্ট গানের রেশ ভেসে আসছে। যুথি কখনই এখানে আসতে পারবে না। ও সাঁতার দিতেই পারে না। কিছুই পারে না যুথি। দরকারই বা কী? ফরসা মেয়েদের কিছুই শেখবার দরকার করে না। রঙেই পার পেয়ে যায়।

চম্পি টুপ করে ডুবে গেল। প্রথমে সে চেয়েই ছিল। তরল একটা কালো ভুবনের মধ্য দিয়ে সে তলিয়ে যাচ্ছে কেমন অনায়াসে। কোন জোর লাগছে না তার। উপরটা তবু কিছুটা ফিকে ছিল। ক্রমশই একটা ভারী নিদারুণ হিংস্র অন্ধকার চারপাশ থেকে বিরাট জোরে চেপে ধরল চম্পিকে। চম্পি একবার বুড়বুড়ি কাটল। তার দম আটকে আসছে। আসুক। বুকের উপর অসহ্য চাপ পড়ছে। পড়ুক। চোখ দুটো ক্রমেই ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চম্পি ঝটাপটি শুরু করল। জলের তলে অশরীরী যে কালো রাক্ষসটা আছে, চম্পি তার বুকে দু পা দিয়ে ক্রমাগত লাথি মারতে লাগল। দু হাতে প্রাণপণে হাঁচোড়-পাঁচোড় করতে শুরু করল। সেই অন্ধকার কবন্ধ ক্রমাগত প্রবল শক্তিতে চম্পিকে চাপ দিচ্ছে। তার ভিতরটা যেন ফেটে পড়বে। আর চম্পি এখন ক্রমাগত তার কবল থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। উপরে উঠবার চেষ্টা করছে। কতক্ষণ ধরে এমনি সংগ্রাম চলল—দু মিনিট, দশ মিনিট, এক ঘণ্টা, এক যুগ—চম্পি জানে না। শুধু তার মনে হল, সে হেরে যাচ্ছে, সে তলিয়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে কয়েকবার জলে লাথি মারতেই ভুস করে ভেসে উঠল চম্পি। কয়েকবার খাবি খেল। হুস হুস করে বাতাস টানল বার কয়েক। একবার এক খাবলা জল ঢুকে গেল নাকে

মুখে। নাকের ভিতর দিয়ে ঘিলু পর্যন্ত কে যেন সুতীক্ষ্ণ তলোয়ার ঢুকিয়ে দিল। খক খক করে কাশতে লাগল। তারপর অতিশয় ক্লান্ত দেহটাকে কোনক্রমে ভাসিয়ে ভাসিয়ে এনে ঘাটের তালগুঁড়িটার উপর আছড়ে ফেলল। তখনও সে বেজায় হাঁফাচ্ছে।

চিৎ হয়ে শুয়ে চম্পি দেখতে লাগল, আকাশে এর মধ্যেই কখন তারা ফুটেছে। অজস্র তারা। আকন্দ ফুলের ভারি তীব্র গন্ধ ভেসে আসছে নাকে। গোটা পুকুরটা স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে সামনে। তাকে আশ্রয় দিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে এক জমাট অন্ধকার। কিন্তু সেখানে যেতে পারল না চম্পি। তবে সে কোথায় যাবে? ফিরে যাবে সংসারে? অপ্রেম অনাদরের মধ্যে? এখানে, এই ঘাটের তাল গুঁড়িতে পিঠ ঠেকিয়ে, চিরকাল তো সে এমনিভাবে শুয়ে থাকতে পারবে না!

জল ঢুকে কান কটকট করছে তার। শীত লাগতে শুরু করেছে। চোখ জ্বালা করছে। মাথাটা টিপটিপ করছে। ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়ল চম্পি। ওর যা কিছু ক্ষমতা ছিল পুকুরের তলার সেই কবন্ধটা যেন তা টিপে বের করে নিয়েছে। চম্পি যেন খোসাটুকু নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে।

চম্পি মরতে পারল না। ডুবতে পারল না। সে যে ভাল সাঁতার জানে। গ্রামের কোন মেয়েই সাঁতারে তার সঙ্গে পারে না। ভাল করে সাঁতার শিখেছিল সে, তাই তার ডোবা আর হল না। কেন এমন ভাল সাঁতার শিখেছিল সে?

এখন চম্পির অগত্যা বাড়ি ফেরা ছাড়া আর উপায় কী? আবার তাকে ফিরতে হবে লাঞ্ছনা গঞ্জনার মধ্যে। চাপা ঘৃণার মধ্যে। অসহায়ভাবে বাঁধা মার খেতে হবে ততদিন, যতদিন না স্বাভাবিক মৃত্যু এসে তাকে কোলে ঠাঁই দেয়। অপমৃত্যু স্বেচ্ছায় সে আর ঘটাতে যাবে না। ওতে বড় যন্ত্রণা আজই সে টের পেয়েছে। সে বড় বিকট। বড় ভয়ঙ্কর। না না, ও পথ আর মাড়াবে না চম্পি।

আত্মহত্যাতেও তার রুচি নেই, সংসারে ফিরতেও তার আগ্রহ নেই। নিজের অসহায়তা যে কী পরিমাণ বড়, চম্পি সেই কথাই ভাবতে লাগল। সে যেন ধোপার কুকুর। যার ঘরও নেই ঘাটও নেই। সে যেমন মরেও নেই, তেমনি বেঁচেও নেই। সে নিরন্তর এক অপমৃত্যুর মধ্যেই যেন বেঁচে আছে। ছিলও তাই। এই অবস্থা তো সে মেনেই নিয়েছিল। যাবতীয় আশা

ভরসা জলাঞ্জলি দিয়ে পীড়াদায়ক বর্তমানের সঙ্গেই তো সে সন্ধি করেছিল। তার মধ্যে থেকেই উনিশ-বিশ রকমফের বের করে নিয়েছিল। নতুন দুঃখ না পাওয়াকেই সে সুখ নাম দিয়েছিল।

বেশ ছিল চম্পি। কিন্তু হঠাৎ তার মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল। শৈল—শৈলদি এর জন্য দায়ী। আর—আর—হ্যাঁ তিনিও দায়ী। সকাল থেকে মনে মনে যে এত গান সে গেয়েছে, শুনিয়েছে একজনকে, সে একজন কে? শৈলদি? না। তবে? না, তার নাম উচ্চারণ করবে না চম্পি। নিজেকেও সে শোনাতে চায় না। সেটা রূপকথার কাহিনী হয়েই থাক্।

আগাগোড়া ব্যাপারটাই কি রূপকথার মত নয়? যে-ঘটনা জীবনে ঘটে না, তাই তো রূপকথা। কল্পনায় যার জন্ম, কল্পনায় যার বসবাস। চম্পির রূপ নেই, কিন্তু গুণ ত আছে। কতদিন চম্পি কল্পনা করেছে, সেই গুণ দিয়েই সে মুগ্ধ করবে তার মনের মত মানুষকে। সে যেমন যেমন কল্পনা করেছে ঠিক অবিকল তারই রূপ দিয়েছে সুহাস। সুহাসের মুগ্ধ নয়ন, (সই লো, ও দুটি নয়ন, আমার আসা-যাওয়ার পথে কেন তাকায় অনুক্ষণ! সত্যি কি সুহাস অনুক্ষণ চেয়েছিল তার দিকে?) আজ তো যায় নি চম্পি, ভাবছে কি তার কথা? সুহাসের কথা, সুহাসের ব্যবহার চম্পির কল্পনাকে মূর্ত করে তুলেছে। সুহাস কি তবে তার মনের মত মানুষ? এ কথা যে চিন্তা করাও হাস্যকর। কোথায় সুহাস আর কোথায় চম্পি! সুহাস আকাশের চাঁদ আর চম্পি পুকুরের শ্যাওলা। চাঁদ আকাশে থাকে। সে হয়তো জানেও না তার অপার করুণা আলো হয়ে পাড়াগাঁয়ের পুকুরে জন্মানো এক শ্যাওলার গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কত শত সহস্র জায়গাতেই তো চাঁদের কিরণ পড়ে। চাঁদ কি তার হিসেব রাখে। কিরণ ছড়ানোই যে চাঁদের অভ্যাস। তা বলে শ্যাওলা যদি সেই আলো পেয়ে ভাবে, চাঁদ আমার, তার এই কিরণ সে শুধু আমাকেই দিচ্ছে, তবে সে কি পাগলামি নয়? চম্পি তো পাগল হয় নি। ভাল কথা বলা, ভদ্রতা জানানো, সুহাসের অভ্যাস। মন রেখে কথা বলা সুহাসের অভ্যাস। সেই অভ্যাসকে যদি চম্পি অন্য কিছু বলে ভাবে—বয়ে গেছে চম্পির অন্য কিছু ভাবতে। সে কি নিজের ওজন বোঝে না?

বোঝে যদি তবে যুথি শৈলদির বাড়ি যাবে শুনে সে অমন ক্ষেপে উঠল কেন? কক্ষনো না, কক্ষনো না। শৈলদির বাড়িতে যাবে বলে সে যুথির

উপর রাগ করে নি। রেগেছে যুথি তার সাবানটা চুরি করেছে বলে। রেগেছে যুথি চম্পিকে তাচ্ছিল্য করেছে বলে। আর দেখলে না, মেয়েটা কেমন হ্যাংলা! ছোটকাকীমার কাছ থেকে কাপড় জামা ভিক্ষে করে রূপের বাহার খুলেছে। এই কাঙালপনা দেখতে পারে না চম্পি। তুই যে এমন মোহিনী সেজে চললি, কাকে ভোলাবি? তোর ওই ধার করা সাজ দেখে সে ভবি ভুলবে না। অমন অনেক সাজ ওরা নিত্য দেখে। কলকাতায় তোর মত সাজ দাসী-বাঁদীরাও করে। যদি রেগে থাকে চম্পি তো এই সব কারণেই রেগেছে।

যার যার ওজন তার নিজেরই বুঝে চলাই উচিত। অন্তত চম্পি তো তাই মনে করে।

ঝপাং করে পুকুরে একটা মাছ ঘাই মেরে উঠল। চম্পির থেকে বেশী দূরে নয়।

চম্পি চমকে উঠল। অনেকক্ষণ ঘাটে এসেছে সে। এবার তাকে উঠতে হবে। চম্পি এবার মাঝ পুকুরে যেতে চাইল। ওখানে এখন ত আর তেমন অন্ধকার নেই। সে যদি ডুবেই যেত, কী হত তা হলে? নিশ্চয়ই আরও খানিকটা পর থেকে খোঁজাখুঁজি সুরু হত। পুকুরঘাটেও লোক জড় হত। কী করে জানত তারা, চম্পি ডুবে মরেছে? কেউ ত তাকে ঘাটে আসতে দেখে নি। চম্পির মনে হল, সে যেন জলের তলায় শুয়ে শুয়ে সব কিছু দেখতে পাচ্ছে। লোকগুলো সব হন্তদন্ত হয়ে খুঁজছে তাকে। কে যেন টর্চের আলো ফেলল। কে যেন বলে উঠল, আরে, এ ঘড়াটা কার!

চম্পির হঠাৎ ঘড়ার কথা মনে হল। এই যে ঘাটের পাশে পড়ে রয়েছে ঘড়াটা। এটা দেখেই লোকে বুঝত, চম্পি কী সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছে। ঘড়ার কথা মনেই পড়ে নি তার। তখন এটার কথা মনে থাকলে চম্পিকে আর ভেসে উঠতে হত না। ঘড়া নিয়েই সে ডুবত। হয়তো কোমরে, নয় গলায় বেঁধে নিত ঘড়াটা।

তা হলে কী হত! সর্ব্বনাশ! চম্পির ভয়চকিত কল্পনা একটা নিদারুণ ভয়াবহ ছবি তার চোখে ফুটিয়ে তুলল। সে যতবার ভেসে উঠতে চাইছে এই ঘড়া, অতি শান্ত নিরীহ এই ভরণের পাত্রটি উৎকট এক হিংস্র উল্লাসে ততবার তার টুঁটি টিপে টিপে দাবিয়ে দিচ্ছে তাকে পুকুরের তলায়। সেখানে আলো নেই, বাতাস নেই, নিস্তার নেই। এতক্ষণে চম্পি ভয় পেল। সাংঘাতিক ভয়। তার দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল

কপালে। ধড়াস ধড়াস করে হৃৎপিণ্ড আছড়ে পড়তে লাগল। ভয়ে সে ঘড়াটা আর স্পর্শও করতে পারছে না।

না না না, এমন উৎকট, এমন ভয়াল, করাল, হিংস্র মৃত্যুতে তার অভিলাষ নেই। এর থেকে এমন বিড়ম্বিত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকাও ভাল। আর কিছু না হোক, সুহাসের সঙ্গে একবার দেখা ত হতে পারে।

আজও ত সে যেতে পারত। কিন্তু গেল না কেন? যুথি গেল বলে? গেলই বা যুথি। তার সঙ্গে চম্পির কী। যুথি না হয় শৈলদির সঙ্গে গল্প করত। তার শাড়ি গহনা নেড়ে চেড়ে দেখত। যা বরাবর করে এসেছে যুথি। এই ত ওর আরেকটা বদভ্যেস। গ্রামের কোন মেয়ে বাইরে থেকে এলেই যুথি সেখানে ছুটে যায়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আসে, কখানা শাড়ি, কটা গয়না সে পেয়েছে। তারপর কদিন ধরে সবিস্তারে তার বর্ণনা চলে বাড়িতে। বলতে বলতে যুথির লোভাতুর কণ্ঠ দিয়ে যেন লালা ঝরে পড়ে। ওটা এমনই হ্যাংলা। যুথি ঠিক শৈলদির বাক্স খুলে বসত। আর নড়ত না সেখান থেকে।

আর চম্পি কী করত? বসে থাকত সুহাসবাবুর সামনে। শুধু সে আর সুহাস। সুহাস একটার পর একটা ফরমায়েশ করত। চম্পি প্রাণ ঢেলে উজাড় করে দিত তার মজুত গানের পুঁজি। আজ অনেক গান জমেছে তার মনে। প্রশংসা ঝরে পড়ত সুহাসের গলা থেকে, অজস্র বকুল ফুল যেমন আপন অভ্যাসে ঝরে পড়ে। ধন্য হয়ে যেত চম্পি। তার জীবনের অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠত।

দুর, এসব কী ভাবছে সে? এসব কী এখানে ঘটে! হয়ত কলকাতায় ঘটে। পাড়াগাঁয়ে অনাত্মীয় কোন যুবকের সামনে বসে কোন বয়স্থা মেয়ে গান শোনাতে পারে নাকি? চম্পি কি একা ঢুকতে সাহস পেত, যে-ঘরে শুধু সুহাস আছে? সে মাসিমার কাছে বসে থাকত। ফুলু মাসিমা যদি তার গান শুনতে চাইতেন, তা হলেই চম্পি কৃতার্থ হয়ে যেত। চম্পি ফুলু মাসিমার সামনে বসেই বরং অনেক স্বচ্ছন্দে তার গানকে ঠিক জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পারত। কেন সে তা হলে আজ গেল না? একটা অমূল্য দিন সে নষ্ট করে ফেলল নিজের দোষে? চম্পির মনটা হু-হু করে উঠল। সে বোকা, সে বোকা, সে বড় বোকা। তুচ্ছ একটা সাবানই তার কাছে এত বড় হল!

তুটি মেয়ে গল্প করতে করতে পুকুর পাড় দিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে হেসে উঠছে তারা। তাদের কথায় তাদের হাসিতে চম্পির ভয় কাটল। এতক্ষণ ঘড়াটা ছুঁতে পর্যন্ত সাহস হয় নি তার। এবার সে ঘড়াটা টেনে নিল। অনেকক্ষণ সে ভিজে কাপড়ে আছে। উপরের দিকটা অনেকটা শুকিয়ে গিয়েছে। মাথাটা ভার ভার লাগছে। ঘড়ায় জল ভরে চম্পি উপরে উঠে এল।

মেয়ে তুটো বুঝি তাদের বাড়ির দিকেই আসছে।

একজন হাসতে হাসতে বলে উঠল, সাবধান, সাপে খাতি পারে?

এটা ত যুথি। চম্পি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে চাইল।

আরেকজন জবাব দিল, আর তোমাদের গায়ের গন্ধে বুঝি সাপ পালায়। তোমরা বেজি নাকি।

এ ত সুহাসবাবু। ধক করে বুকে ধাক্কা খেল চম্পি। ওদিকে খিলখিল করে হাসতে হাসতে যুথি বুঝি গড়িয়েই পড়বে।

সাত

চম্পিকে ওরা কেউ দেখল না। না সুহাস, না যুথি।

অথচ চম্পি ওদের এত কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হুঁশ থাকলে না দেখার কোন কথা নয়। ঘাটের পাড় থেকে ওদের পাছ-তুয়ার এমন কিছু দূর নয়, মাঝখানে ফাঁকা রাস্তাটা শুধু, সেটা প্রায় ডিঙি মেরেই পার হওয়া যায়। তারা-ভরা আকাশ এমন কিছু অন্ধকারও নয়, পুকুরপাড়ের আকন্দ গাছগুলোও এমন বৃহৎ বনস্পতি নয় যে তার আড়ালে ঢাকা পড়বে চম্পি।

চম্পি দাঁড়িয়েই থাকল। ভরা ঘড়াটা কাঁখে চম্পির সেই নিথর নিশ্চল মূর্তি যদি কেউ দেখত তখন, তা হলে নিশ্চয়ই মনে করত, কেউ বুঝি বা পাষাণের এক প্রতিমা গড়িয়ে রেখে গেছে। চম্পি নিজেই শুধু জমে যায় নি, সারাদিন ধরে যে সুন্দর মূর্তিখানি সে অতি যত্নে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিল সেটিও জমে পাথর হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগেও তার মাথা দপদপ করছিল, শীত-শীত করছিল, একটা চাপা অশ্বস্তি শিরশির করে তার

সর্বশরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ভরা ঘড়াটা বেজায় ভারি ঠেকছিল। এখন তার আর কোন বোধ নেই।

বোধ থাকলে তার চোখের উপর সুহাস আর যুথি যে বেহায়াপনাটা করল, যে রকম ঢলাঢলি করল দুজনে, চম্পি তা কি সহ্য করতে পারত? ঈর্ষায় সে জ্বলে যেত না? লজ্জায় নুয়ে পড়ত না? ঘৃণায় তার মনটা তিত বিষ হয়ে উঠত না? সে সব কিছুই হল না। চম্পির রক্ত-মাংসের শরীরটা মুহূর্তের মধ্যে ঢালাই-করা এক সীসের মূর্তি হয়ে গেল।

তাই, সুহাস গদগদ হয়ে যুথির হাত একবার যখন নিজের মুঠিতে চেপে ধরল, সমস্ত সোহাগ গলায় ঢেলে দিয়ে সুহাস যখন যুথিকে বলল, 'তোমার মত এত সুন্দর আমি আর দেখি নি যুথি, কি নরম তোমার হাত, এই কথা বলে সুহাস যখন যুথিকে একটু টানল, আর ঘোর-লাগা যুথি যখন তার বুকের কাছে এগিয়ে গেল, সুহাসের দুখানা হাত যুথির মুখখানাকে ধীরে ধীরে তুলে ধরল আর সুহাসের মুখখানা সেই নির্জন পৃথিবীতে একটিমাত্র লক্ষ্যে চিলের মত ছোঁ মেরে নেমে এল, আর যুথি 'যাঃ অসভ্য' বলে চট করে সরে গেল, তার পর কেমন জড়ানো জড়ানো স্বরে বলল, 'কাল দুপুরে যাব', সুহাস বুঝি সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়েছিল, তার আগেই যুথি বাড়ির ভিতরে বিদ্যুৎ-বেগে ঢুকে পড়ায় সে হাত দুখানা বাতাসে চক্কর কেটে মালিকের দু পাশে যেন ডানা গুটিয়েই বসে পড়ল, তখন (এসব দেখা সত্ত্বেও) চম্পি একটুও চঞ্চল হল না। অথবা এসব কিছুই ঘটে নি। কে যেন একজন এসেছিল তাদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত, ওই যে দুলে দুলে পুকুরপাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ঘাট ফাঁকা, পথ ফাঁকা, সব ফাঁকা। সব ফাঁকা। ফাঁকির খেলা। এ পৃথিবীতে সুহাস বলে কোন ভদ্রলোক নেই, কলকাতা বলে কোন উদার শহর নেই, বিশ্বাস বলে ভাল বলে কোন বস্তু নেই।

তবে চম্পি আর খামখা এখানে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? ভারী মন, ভারী ঘড়া বয়ে সীসের পা ফেলতে ফেলতে চম্পি বাড়ি ফিরল। বুঝতে পারল, এত বোঝা বইবার আর শক্তি নেই তার। ঘড়াটা কোনক্রমে নামাল। তবুও পাষাণ ভারটা সে কোনমতেই শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না। তার মাথায়, কাঁধে বুকে হাতে পায়ে এই রকম ভারী ঘড়ার শত শত

ওজন কে যেন চাপিয়ে দিয়েছে। তাই পৈঠা বেয়ে উপরে উঠতে তার হাঁফ ধরছে, কাপড় ছাড়তে হাত উঠছে না।

অসাড় ভাবটাও ক্রমেই কেটে উঠেছে চম্পির। সেটা যত কাটছে ততই বাঁধভাঙা যন্ত্রণার বন্যা প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করছে চম্পিকে। চম্পির দেহে যেন আর কোন অংশ নেই, শুধু মাথা আর বুক। মাথা বুঝি এই ছিঁড়ে পড়ল আর বুকে এমন ভারী সব ওজন চাপানো যে শ্বাস টানতেও লাগছে।

কোনক্রমে একটা মাদুর বিছিয়ে চম্পি শুয়ে পড়ল।

খুব ভুগল চম্পি। দেড় মাস তাকে নিয়ে যমে-মানুষে লড়াই চলেছিল। শেষ পর্যন্ত ভূষণই জয়ী হল। চম্পির বয়েস কম, স্বাস্থ্য ভাল। তাই ডবল নিউমোনিয়া এত সহজে ওকে কাবু করতে পারল। চম্পিকে নিয়ে পঁয়তাল্লিশটে দিন এ বাড়ির লোকের যে কি ভাবে কেটেছে, তা ভগবানই জানেন। দামিনী খাওয়াদাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। হত্যে দিয়েছিলেন মদনমোহনতলায়, মঙ্গলচণ্ডীর থানে, পীর সাহেবের দরগায়। যুথি রাতের পর রাত জেগে চম্পির কপালে জলপটি দিয়েছে, বুকে পুরনো-ঘি-মাখা আকন্দপাতার সেঁক। বাতাস করেছে শিওরে বসে। ঠাকুমা ইষ্টনাম জপ করেছেন, ঠাকুরতলার মাটি এনে চম্পির কপালে মাখিয়ে দিয়েছেন, অঝোর ধারায় কেঁদেছেন। গিরিবালা সংসারের সব ঝুঁকি সামলেছে, পথ্যি রেঁধে, ফলের রস করে খাইয়েছে চম্পিকে। বিলাস মাঝে মাঝে টাকার ধান্ধায় ঘুরেছেন। মাঝে মাঝে চম্পির রোগশয্যায় এসে বসেছেন। বিকারের ঘোরে ভুল বকেছে চম্পি, দাঁত কিড়মিড় করেছে আর বিলাস চম্পির মুখের কাছে মুখ নিয়ে, 'ও মা, কী বলছ, কষ্ট হচ্ছে, এই যে আমি, তুমার বাবা, চিনতি পারতিছ না, ও মা চম্পি, চম্পু, হায় হায়, আমার এমন মেয়ের হল কী? ওগো, ও ভূষণ, ও যুথি, মা, বউমা, শিগগির আসো তুমরা, হায় হায় আমার মা বুঝি যায়' বলে এমনভাবে কপাল বুক চাপড়াতে শুরু করেছিলেন যে, তাঁকে সামলাতে বাড়ির লোক অস্থির হয়ে পড়েছে। আর জ্বালাতন করে মেরেছে শঙ্খ। দিদ্‌দি, দিদ্‌দি করে ছুটে গেছে চম্পির কাছে। বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অসতর্ক মুহূর্তে, চম্পির গায়ের কাঁথা টান মেরে ফেলে দিয়েছে, ওষুধের শিশি ভেঙে ফেলেছে, পুরিয়া মুখে পুরে দিয়েছে।

তবু ভাল, বেঁচে উঠল চম্পি। দু মাসের মাথায়, বালাম চালের ওজন

করা ভাত আর মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে অন্নপথ্য করল। গায়ে বল পেতে আরও মাস দুয়েক কাটল।

অমন নিটোল স্বাস্থ্য ছিল চম্পির, কলো রঙের উপর ছিল লাবণ্যের স্নিগ্ধ পালিশ। দুটোই হাতছাড়া হল তার। আর যে অমিত প্রাণশক্তিটুকু ছিল, সেটাও যেন চিড় খেয়েছে। কেমন জবুথবু মেরে গেল চম্পি। নড়তে-চড়তে বিশেষ চায় না। বললে কাজকর্ম করে, না হলে চুপচাপ বসে থাকে। কোন কিছুই যেন তার কাছে সাড়া জাগায় না।

অনেক সময় মনে হয়, সে বুঝি কিছু ভাবছে। আসলে কিছুই ভাবে না সে। ভাবতেও পারে না। একটার পর একটা দিন নিঃশব্দে ঝরে যায়। মাস যায়। ঋতু বদল হয়। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, তারপর শরৎ, হেমন্ত, শীত আসে। চলে যায়। বসন্ত হাতছানি দেয়। গ্রামের আরও একটা মেয়ের বিয়ে হয়। শানাইয়ের আর্তস্বর বাতাসে উঠে ভাসতে ভাসতে চম্পির কাছাকাছি আসে। কিন্তুর চম্পির মনের দেউড়িতে বল্টু লাগানো ভারী কপাট বন্ধ হয়ে গেছে। বিরাট তালায় মরচে ধরে উঠেছে। কোন কিছুই তা ভেদ করতে পারে না।

আট

গিরিবালারও মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়, তার মনটা কি অসাড় হয়ে পড়ছে? সংসারের কাজে সে সুখ পাচ্ছে না কেন?

সুখ পাওয়ার কী এমন আছে সংসারে যে, সে সুখ পাবে?

উনুনে আগুন দিয়ে বসে আছে সে। বড়-জা ভাসুরের আশায় এতক্ষণ বসে থেকে থেকে এইমাত্র উঠলেন। ঘরে চাল বাড়ন্ত হয়েছে। ভাসুরকে বলে বলে দু কসে ফেনা জমে গেছে বড়-জায়ের। এক প্রজার কাছে ধান পাওনা আছে, সেখানেই ধর্ণা মারতে গেছেন বিলাস। ভূষণ যথারীতি বেরিয়েছে ডাক্তারখানায়।

ডাক্তারখানায় তার যাওয়া-আসাই সার। ঘর-ভাড়ার টাকাও জোটাতে পারে নি। তাই আগেকার ঘরটা এক বছর পরে ছেড়ে দিতে হয়েছে।

সোনার মেডেল বাঁধা দিয়ে আগের ভাড়া মিটিয়েছিল ভূষণ। এখন অন্য একটা ছোট ঘরে নাকি আবার ডাক্তারখানা খুলেছে। এক দরজির দোকানের আধখানা নামমাত্র ভাড়ায় পেয়ে গেছে ভূষণ।

ভূষণ গিরিবালাকে বলেছিল, ভালই হল। দরজির খদ্দেরদের রোগব্যাধি হলে ভূষণের ওখানে ওষুধ খেতে আসবে আর ভূষণের রোগীরা জামা-পিরেন বানাবে ওই দরজির কাছ থেকে। পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা—ভূষণ গিরিবালাকে বুঝিয়েছিল, এ-যুগে বেঁচে থাকার এই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পথ। হাতে হাতে উদাহরণও দেখিয়েছিল ভূষণ। দরজির ছেলের অসুখ করলে ভূষণ তাকে সারিয়ে তুলল। তার কদিন বাদেই দরজি শম্ভুর জন্য একটা জামা বানিয়ে দিয়েছিল। খুব উৎসাহ বোধ করেছিল ভূষণ। এমনিভাবে চললে আর ভাবনা থাকে না। কিন্তু সহযোগিতার এমন জাজ্বল্যমান উদাহরণ ভূষণ খুব বেশী দিতে পারে নি। সত্যি বলতে কী, উদাহরণ ওই একটাতে এসেই ঠেকে গিয়েছিল। সম্ভবত দরজির বাড়িতে অসুখবিসুখ আর কারও হয় নি।

আর হতও যদি কারো অসুখ তাহলেই বা কী এমন চতুর্বর্গ ফল হত শুনি, বড়জোর শম্ভুর আর একটা জামা হত। তাতে কী সংসারের পেট ভরতো! এই জিনিসটা ভূষণ কেন যে বোঝে না, গিরিবালা শত চেষ্টা করেও বুঝতে পারে না।

এই যে, আজ একদানা চাল নেই ঘরে, উনুনে আগুন দিয়ে চুপচাপ বসে আছে গিরিবালা, কখন বট্‌ঠাকুর আনবেন চাল, তারপর রান্না হবে, এ ব্যাপারটা কি ভূষণ কোনদিনই বুঝবে না! নিজেকে নিয়েই মেতে আছে। দু বেলা ভাতও যদি না জোটে তবে ও ছাতার নাড়ি টিপে হবেটা কী? কিন্তু এ কথা ভূষণকে বলাই বিপদ। সঙ্গে সঙ্গে ভূষণ এমন একটা ব্যবসা ফেঁদে বসবে, তার জের সামলাতে অস্থির কাণ্ড।

ব্যবসাই কি এর মধ্যে কম করল ভূষণ! মাছের ব্যবসা করতে গিয়ে দেড়শ টাকা গুনাগার এই তো সেদিন দিল। গিরিবালার গহনা বন্ধক দিয়ে টাকা এনে কাকে যেন দিল আর সে লোকটা টাকা নিয়ে উধাও। ভূষণ সে টাকা উদ্ধারের কোন ব্যবস্থাও করল না। গিরিবালা বার দুয়েক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, পুলিসে-টুলিসে খবর দিয়েছে নাকি ভূষণ।

ভূষণ অবাক হয়ে বলেছিল, পুলিস! পুলিস টাকা উদ্ধার করে দেবে,

তবেই হয়েছে। কখনও দিয়েছে শুনেছ? আর তা ছাড়া সে ব্যাটা টাকা চুরি করে কত যে লোকসান দিল সেটাও একবার ভেবে দেখ। ব্যবসাটা টিঁকিয়ে রাখতে পারলে অমন কত দেড়শ টাকা ও তো মাসে মাসে রোজগার করতে পারত। চুরি করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটা নিজের জরিমানা নিজেই করেছে।

ব্যাস্, হয়ে গেল মাছের ব্যবসা। তারপর ঠিকেদারি করবে বলে দিন কতক লাফাল ভূষণ। চম্পির অসুখটা হতে আর সেদিকে মন দিতে পারে নি। এখন গিরিবালা দেখছে, কদিন ধরে ভূষণ আবার কে জানে কী সব হিসেব কষতে লেগেছে। কী যে এবারে তার মাথায় খেলছে ভূষণই জানে।

অভাব অনটনের সংসারে ভূষণ যে পয়সা আনতে পারছে না, বউ-ছেলেকে খাওয়ানোর মত রোজকার যে তার নেই, এ কথা স্পষ্ট করে না বললেও বড়-জা ঠারে-ঠোরে জানাতে কসুর করেন না। আর লজ্জায় দুঃখে গিরিবালার মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। কখনও কখনও তার মনে হয় ভূষণকে এসব বলে। কিন্তু ভয় পায়। যদি চটে যায় ভূষণ! তাই ত সে সব কিছু সহ্য করে যায়।

কিন্তু কাঁহাতক আর সহ্যই বা হয়! আজ মনে মনে গরম হয়ে উঠল গিরিবালা। এতখানি বেলা হল, এখনও পর্য্যন্ত সে কিচ্ছু মুখে দিতে পারে নি। চম্পি আর বড়-জাও তাই। কিছু খুদ ছিল ঘরে, সকালে তাই দিয়ে জাউ রেঁধেছিল। বটঠাকুর, ভূষণ, বোসমশাই আর যুথি তাই খানিকটা করে খেয়েছেন। শঙ্খকেও একটুখানি দিয়েছিল। আর একটু তার জন্য তুলে রেখেছিল। একটু আগেই ক্ষিধের চোটে চেঁচাচ্ছিল শঙ্খ। জাউ আর মুখে তুলল না। অতিকষ্টে তাই তাকে গিরিবালা ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। ঘুম ভাঙলেই তো খাই-খাই করবে, তখন কী দেবে গিরিবালা? দুধ যেটুকু হয় তাতে শঙ্খর পুরো পেট ভরে না।

হঠাৎ বড় ভাসুরের গলা শুনল গিরিবালা। বিলাস চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়িতে ঢুকছেন।

ওগো, কনে গেল সব? শোন, সব্বনাশ হয়েছে।

গিরিবালার বুক ধক করে উঠল। কী সর্ব্বনাশ আবার হল? বুক দুর দুর করতে লাগল তার।

দামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তাড়াতাড়ি। যুথিও বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

দামিনী একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে! কী হয়েছে!

চম্পিরি একজন দেখতি আয়েছেন যে! ইস্কুলি বসায়ে রাখে আইছি। অতি সজ্জন ব্যক্তি। তা ন্যাও, ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা কর।

গিরিবালা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বাব্বাঃ, বট্ঠাকুরের কথার ছিরিই আলাদা।

বল কী?

দামিনী যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

কই, সকালে ত জানাও নি।

জানাব কী, এর আর জানাব কী?

বিলাস চটে উঠলেন।

আমি কি নিজিই জানতাম! ভাদড়ায় যাব বলে ত বেরলাম। বক্সী-বাড়ির কাছাকাছি যাতিই দেখা হয়ে গেল ওর সঙ্গে। বলি চিনা চিনা ঠ্যাকছে, মানুষটা কিডা। উনিউ দেখি হাঁ করে আমার মুখির দিকি চায়ে আছেন। হঠাৎ মনে পড়ল কাজিপাড়ার মামাগের ওখেনে দেখিছি। বলতিই বললেন, হ্যাঁ। আমারেও চেনলেন। আমাগের সঙ্গে কেমন যেন কুটুম্বিতেও আছে। মামাগের সম্পর্কে ভাই হন উনি। বললেন, ওর ভাইপোর জন্যি কনে যেন পাত্রী দেখতি আইছিলেন। তা সে মেয়ে পছন্দ হয় নি। আমার বয়স্থা মেয়ে আছে শুনে দেখতি চালেন।

গড় গড় করে বলে গেলেন বিলাস। দামিনী হাসবেন কি কাঁদবেন বুঝতে পারলেন না।

বললেন, তা এতক্ষণ করছিলে কী? ছিলে কনে?

কেন, ইস্কুল বাড়িতি বসে ছিলাম। বেশ ঠাণ্ডা ত জায়গাটা, আর নিরিবিলি। দুকথা আলোচনা হল শাস্তর নিয়ে। ভাগবত-টাগবত বেশ পড়া আছে বুঝলাম। আমার সেই উদ্ধবতত্ত্বটাও শুনোয়ে দিলাম—বুঝলে? সেই যে গো শান্তিপুরির গুঁসাইরি যা দিয়ে পাড় করিছিলাম সিবার মনে নেই!

দামিনীর সর্বশরীর তেলে-বেগুনে জ্বলে গেল। ইচ্ছে হল গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েন। লোকটাকে নিয়ে যে কী করবেন দামিনী বুঝতে পারলেন না। সারাটা জীবন তাঁকে এমনিভাবে জ্বলিয়ে যাচ্ছে বিলাস। ধান আনতে বের হল, জানে এক বিন্দু দানা নেই ঘরে, তা না করে পথের মধ্য থেকে লোক জুটিয়ে শাস্তর আলোচনা হচ্ছে এতক্ষণ ধরে। আবার বলে, মেয়ে ছাখাও। দেড় পহর বেলা হল। এখন কী করবেন দামিনী? মাথা খুঁড়ে মরবেন?

শাস্তর তো সবাই পড়ে। আপন মনেই বলে চলেছেন বিলাস, মম বোঝে কয়জন? সেইটেই হল গিয়ে কথা। সেটা বুঝতি হবে। বলি, রাধা নয়, চন্দ্রাবলী নয়, ললিতা-বিশাখা নয়, জোর দিচ্ছি উদ্ধবের উপর। কেন?

রাখ দিনি তুমার উদ্ধব। এই ভরদুপুরি অশৈলে আর বাড়ায়ে না। যে উদ্ধবকে এখন আনিছ, তার ব্যবস্থা কর।

বিলাস বললেন, ব্যবস্থা ত করবা তুমরা। চম্পিরি একটু সাজায়ে গুজোয়ে রাখ। আমি একটু পরেই ওঁরে নিয়ে আসতিছি।

দামিনী হতাশ হয়ে বললেন, তা হলিই কি হবে? খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করতি হবে না? সে কাজ করবে কিড়া?

বিলাস এবার চটে গেলেন, কও কী, বাড়িতি এতগুলোন মেয়েলোক থাকতি, কুটুম-সাক্ষাতের খাওয়ানোর ব্যবস্থা আমারে করতি হবে? হাতে কি সব কুড়িকুষ্টি হইছে?

দামিনী বললেন, ঘরে কি কিছু আছে যে ব্যবস্থা করব? বলি জিনিস-পত্তর আনে দিবা ত।

বিলাস গাঁক গাঁক করে উঠলেন, যেদিনির থে তুমি আইছ সেদিনির থে ঘরে কি কিছু থাকবার জো আছে!

দামিনী জবাব না দিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। বিলাস কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করে হঠাৎ যুথিকে বললেন, যুথি, ধামাটা আন্ দিনি।

সে ধামা এনে দিতেই বিলাস হন হন করে পুকুরপাড় দিয়ে কলুপাড়ার দিকে রওনা দিলেন।

ভূষণ যখন বাড়িতে এসে পৌঁছল তখন খাওয়াদাওয়া সেরে বগলাকান্তবাবু একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন। ভূষণ তার সঙ্গে আলাপ করে গেল।

বগলাকান্তবাবুর বয়স বছর চল্লিশেক হবে। মাথায় টাক। দিব্যি ভুঁড়ি। বেশ মোটাসোটা মানুষটি।

বিকেল নাগাদ মেয়ে দেখানোর বন্দোবস্ত করা হল। সাবান মেখে চান করল চম্পি। সেই সাবান, যুথির সঙ্গে যা নিয়ে একদিন তার ঝগড়া হয়েছিল। গিরিবালা আর যুথি সাজিয়ে দিল তাকে। কাকীমার কাপড়ে বেশভূষা করতে আজ আর চম্পির মনে লাগল না। ভীরু পায়ে এসে সে বগলাকান্তবাবুর সামনের আসনে বসল। মুখ নিচু করে।

বগলাকান্ত চম্পির স্বাস্থ্যখানা দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

একগাল হেসে বললেন, বেড়ে স্বাস্থ্য বটে বিলাসবাবু, আপনার মেয়ের। হ্যাঁ, গেরস্ত বাড়ির বউ, গড়নপেটন ত হওয়া চাই এমনি ধারাই। যাতে সব চোট সামলাতি পারে। ওসব ফঙ্গবেনে ধরনের মেয়ে মশাই আমাগের বাড়ির দুচক্ষির বিষ।

বিলাস বগলাকান্তের কথা শুনে মোহিত হয়ে গেলেন। কালো রঙের কথা তুলে বগলা যে তাঁদের অপ্রস্তুত করছেন না, চম্পির অন্তত একটা জিনিসও তাঁর ভাল লেগেছে, বিলাস এতেই খুশী।

হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, এ যা দেখতিছেন এ ত মার আমার অর্ধেক স্বাস্থ্য। ডবল নিমোনিয়ায় পঁয়তাল্লিশ দিন ভুগিছে। ফিরে যে পাব সে আশা ত ছাড়েই দিছিলাম। তারপরে মার আগের স্বাস্থ্য আর ফিরে আসে নি। ভাল খাতি পায় না, ভাল যত্ন পায় না ত।

পাবে পাবে, বিলাসবাবু।

বগলাকান্তবাবু হাসতে লাগলেন।

আমাগের বাড়ির বউগের খাবার অভাব হয় না। এই দুর্বছরেও চারটে গুলা একেবারে ধানে ভরা। দুটো পুকুরি মাছ আর আটটা দুধেল গাই। খাক না কিডা কত খাবে। বগলা বিশ্বেসের খাবার অভাব হয় না। আপনার কাজিপাড়ার মামাগের জিজ্ঞেস করে ছ্যাখবেন। আর যত্নের কথা! হাঃ হাঃ হাঃ। বাড়ির বউ আমাগের মাথার মণি। ঘরের লক্ষ্মী যে মশাই। জিজ্ঞেস করবেন আপনার মামারে। বগলা বিশ্বেসের কথা এক বর্ণও যদি মিথ্যে হয়!

বিলাস একেবারে গলে গেলেন। সমানে দু হাত কচলাতে লাগলেন।

বললেন, আমার মেয়ে আপনাগের ঘরে পড়বে, আমার কী এমন ভাগ্যি।

কেউ বলতি পারে না সে কথা। বগলাবাবু বললেন—যে যার কপালে খায়। আপনার মেয়ের কপালে যদি আমাগের বাড়ির অন্ন মাপা থাকে, তবে সে কি কেউ ঠ্যাকাতি পারবে? আপনিউ পারবেন না, আমিউ না, এমন কি আমার ভাইপোডাউ না। ভবিতব্য মশাই, সবই ভবিতব্য।

সে তো ঠিক, সে তো ঠিক।—বিলাস সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করলেন।

বগলাকান্ত বললেন, যদি কিছু মনে না করেন তো আপনার মেয়ের হাতখানা একবার দেখি। আমার আবার ওসব চর্চা আছে কিনা। মেয়ে দেখতি আসে বাজে ফাৎরামো আমি পছন্দ করি নে। চুল ছ্যাখা, দাঁত ছ্যাখা। কী সব অসভ্যতা! এ কী গোহাটায় আইছি যে, দাঁত ছ্যাখব!

বগলাকান্তের কথার ধরনে অন্দরে বাইরে হাসির ধুম পড়ে গেল।

বগলাকান্ত বললেন, তবে হ্যাঁ, যিডা দ্যাখার সিডা দেখতি হবে বইকি; স্বাস্থ্যটা ছ্যাখলাম, ইবার ভাগ্য-রেখাটা ছ্যাখা হলিই চুকে গেল। দেখি তুমার হাতখানা?

বগলাকান্তবাবু প্রথমে চম্পির ডান হাতখানা চিত করে নিজের বাঁ হাতের তালুর উপর রাখলেন। বার দুয়েক মোলয়েম করে টিপলেন। এমনভাবেই টিপলেন যে চম্পির শরীর সিরসির করে উঠল। মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। চম্পির পাঞ্জাটা তারপর উলটে দিলেন। আবার বার দুয়েক টিপলেন। প্রত্যেকটি আঙুলের ডগা দেখলেন। তারপর পাঞ্জাটা আবার উলটে দিলেন। করতলের রেখাগুলো দেখলেন। বার তিনেক চম্পির আঙুলগুলো মুড়ে দিলেন। এমনিভাবে ডান হাত দেখা হল। তারপর বাঁ হাত দেখা হল। তারপর একসঙ্গে দুখানা হাত দেখা হল। অপরিচিত পুরুষের হাতের টিপুনি খেতে খেতে চম্পির হাত ঘেমে উঠল। বুক থরথর করে কাঁপতে লাগল। হাত দেখার পালা শেষ হতে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

বগলাকান্তবাবু এতক্ষণ তন্ময় হয়ে হাত দেখছিলেন। এবার বিলাসের দিকে চেয়ে হাসলেন।

বললেন, আপনার মেয়ের লক্ষণ খুব ভাল। যে-ঘরেই যাক সুখী হবে।

বিলাসের চোখ ছলছল করে উঠল।

বললেন, কিন্তু ওরে কোনঁ ঘরে দিবার মত সামর্থ্যই যে আমার নেই।

বগলাকান্তবাবু বললেন, ভবিতব্যের উপর হাত আছে কার? যে ঘরে

যাওয়া ওর কপালে লিখা আছে সে ঘরে ও যাবেই। আপনি আমি চাই আর না-চাই। হ্যাঁ, আমাগের বংশের আর-একটা নিয়ম আছে।

বলেই পকেটে হাত দিয়ে এক জোড়া সোনার বালা বের করলেন।

বললেন, এই বালা যদি আপনার মেয়ের হাতে ঢোকে তবেই জানলেন, মেয়ের আশীর্বাদ হয়ে গেল। তারপর আপনারা গিয়ে ছেলে, তার বাড়ি-ঘর দেখে আসে যে-দিন ধার্য করবেন, সেই দিনি আসে আমরা বিধিমতে আমাগের ঘরের বউ তুলে নিয়ে যাব। দেখি তুমার হাত।

চম্পি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। দামিনী না, বিলাস না, কেউ না। অমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটে নাকি? এমন লোকও আছে নাকি? ইনি মানুষ না দেবতা?

চম্পি একখানা হাত বাড়িয়ে দিল। অনেক দিন পরে তার মনে আবার চঞ্চলতা দেখা দিল। বগলাকান্তবাবু একটা বালা নিয়ে চম্পির হাতে পরাতে লাগলেন। বালার মাপটা কিছু ছোট। বগলাকান্তবাবু চম্পির হাত টিপে টিপে নানা কসরত করে নিপুণভাবে বালা পরাতে লাগলেন। চম্পি টের পেল বগলাকান্তবাবুর হাতের তালুও ঘেমে উঠছে। একটা চাপা উল্লাসে ওই বয়স্ক হাত দুটোও থরথর করে কাঁপতে লেগেছে। চম্পির চোখও হঠাৎ একবার বগলাকান্তবাবুর চোখে পড়ল। সেখানেও যেন দুটো আগুনের শিখা জ্বলছে।

নয়

বাসর হয়েছে ভূষণের ঘরে। সন্ধ্যের মুখেই লগ্ন ছিল, কাজকর্ম তাই তাড়াতাড়িই চুকেছে।

চম্পির বড়দি কমলা বরের কাছে বিশেষ ঘেঁষতে পারে নি। চম্পির বিয়ে উপলক্ষে বাপের বাড়ি এসে ইস্তক সে নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে। কোলের ছেলেটার একগা জ্বর। হামই উঠল বুঝি। বারে বারে ফিট হচ্ছে। বোনের বিয়ে মাথায় উঠল কমলার। ছেলে সামলাতেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মেজ মেয়ে বিমলাই যা বাসর জমাবার চেষ্টা করছিল। গিরিবালার ইচ্ছে করছিল, সেও বিমলার সঙ্গে যোগ দেয়। নিজের বিয়েতে সে ছিল কনে। আমোদ করার কোন সুযোগ ছিল না তার। এবারে যদিও একটা সুযোগ এসেছিল, কিন্তু সেটা কাজে লাগাতে বাধ-বাধ ঠেকছিল। বয়েসটা কম হলে হবে কী, সম্পর্কে সে ত গুরুজন। তা ছাড়া বিমলা একবার ত ডাকলও না তাকে। তাই আত্মীয়-স্বজনের ঝক্কি সে সামাল দিয়েছে, আর ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়েছে বাসরে। এরা বড় স্বার্থপর। আমোদে আহ্লাদে তাকে বড় একটা ভাগ দিতে চায় না। কিন্তু নেবার বেলায় ত ভুল হয় না। তখন ত—ছোটকাকীমা তুমার বেনারসীটা দেখি, তুমার টায়রাটা একবার ত্থাও ত—সোহাগ একেবারে উথলে ওঠে। মনে মনে খুব চটেছে গিরিবালা। সকলের উপরেই সে চটে গেল।

চটার কারণও আছে। চম্পির গলার ওই যে মপচেনটা, ওটা গড়াতে ভূষণ গিরিবালার পাটিহারটা নিয়ে গিয়েছে। ছয় ভরির হার। সোজা নয়। চম্পির মপচেন হয়েছে আর বরের বোতাম আংটি। হারটা বের করে দেবার সময় ভূষণের বাগ্মিতার গুণে গিরিবালার মনটা বেশ উদার হয়েই উঠেছিল। সে একরকম স্বেচ্ছাতেই খসিয়ে দিয়েছিল পাঁজরার একখানা হাড়। বড় জা দিন দুয়েক খুব প্রশংসা করলেন। গিরিবালা কৃতার্থ হয়ে গেল। ভাবল, এবার বুঝি সে অদৃশ্য অবরোধ ভেদ করে এদের অন্তরে ঢুকে পড়তে পারল।

কিন্তু তা ভুল। কতবড় ভুল, গিরিবালা বুঝতে পারল ভাসুরঝিরা এলে। গিরিবালা দেখল, ঝাঁকের পাখিরা কেমন ঝাঁকে মিশে গেল। সে আগেও যেমন একটা পাঁচিলের বাইরে ছিল, এখনও সেই বাইরেই রয়ে গেল। মাঝখান থেকে ভালমানুষি করতে গিয়ে সে তার অমন সুন্দর হারটা খোয়াল। আর কি অমন হার তার হবে! বাসরের দরজা দিয়ে সে যতবার ভিতরে উঁকি দিয়েছে, সেই হৈ-চৈ, বদরসিকতা, প্রগল্‌ভতা ছাপিয়ে হ্যাজাগের-তীব্র-আলোয়-ঠিকরে-পড়া চম্পির গলার মপচেনের দীপ্তি তার চোখে এসে বার বার বিঁধেছে। আর গিরিবালার মন পাটিহারের শোকে হু-হু করে উঠেছে। সে তো এদের কেউ না, তবে কেন সে এই লোকসানটা ঘটাল!

বাড়িটা লোকে ভর্তি হয়ে গেছে। সুখ-শান্তি একেবারে নষ্ট হয়েছে। যশোরের মেজ'জার সঙ্গে রাতদিন ঝগড়া চলছে বড়জা আর তার মেজ মেয়ের। গিরিবালা এই পরিবেশে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কে কার ছেলেকে চুরি করে মাছ খাওয়াল, কে মিষ্টি সরাল, কে কাকে অপমান করল, তাই নিয়ে ঝগড়া। বিয়ের আগের দিন বাসরঘরের জন্য কার ঘর ছেড়ে দেওয়া উচিত, এই নিয়ে এমন ধুমতাল বেধে গেল যে, মেজ-জা একদিকে চলে যাবার জন্য বাক্স গোছাতে বসলেন, অন্যদিকে বিমলা তার বরকে গাড়ি ডাকবার জন্য ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। ওদিকে বিলাস লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চুল ছিঁড়ে, মুখ দিয়ে ফেনা তুলে, দামিনীর চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুললেন। দামিনী ঘরে গিয়ে খিল দিলেন, বিলাস ঢুকলেন ঠাকুরঘরে। ভূষণ আর বক্সীমশাই মাঝে পড়ে অতিকষ্টে সে ঝামেলা সামাল দিল। মাঝখান থেকে গিরিবালার ঘরখানা কদিনের জন্য হাতছাড়া হল। শঙ্খকে নিয়ে গিরিবালাকে আশ্রয় নিতে হল ভাঁড়ারঘরের একপাশে।

এত কাণ্ড যে ঘটে যাচ্ছে বাড়িতে, তার আঁচ একজনের গায়ে কিন্তু একটুও লাগল না। সে চম্পি। সে আশ্চর্য শান্ত, আশ্চর্য ধীর। আজ এই বাসরঘরের কোন চাঞ্চল্য তাকে স্পর্শই করছে না যেন।

সেই আশীর্বাদের দিনই সে যা একটু চঞ্চল হয়েছিল। কিন্তু বিলাস আর বোসমশাই পাত্তরকে আশীর্বাদ করে এসে যখন জানালেন, পাত্তর বগলাকান্ত নিজেই, তখন বাড়িতে তা নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য সোরগোল, ঘোঁট ইত্যাদি চললেও চম্পি আশ্চর্যরকম শান্তই হয়ে গেল। বরং এই রকম কিছু না হলেই সে যেন অস্বস্তিতে ভুগত। এখন যেন সে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করল। হ্যাঁ, এ আর স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, কোন হুঁশিয়ার শহুরে যুবকের ছলনা নয়। এ হচ্ছে এক বৃদ্ধ তেজ-বরের অমোঘ সিদ্ধান্ত। বেশ ভেবেচিন্তে, যাচাই বাছাই করে চম্পির হাতে বালা পরিয়ে দিয়ে গেছেন বগলাকান্ত বিশ্বাস। চম্পির বিশ্বাস হয়েছে, এবার তার গতি হল। সব সংশয় মিটে গেছে তার, তাই সে এত শান্ত, এত ধীর।

বিলাস অবশ্য আশীর্বাদ করে ফিরে এসে কৈফিয়ত একটা দিয়েছিলেন। খুব বেশী বাজে কথা নাকি বলে নি বগলাকান্ত। চারটে গোলা সত্যিই

আছে বাড়িতে, দুটো পুকুর, গোটাকতক আম-কাঁঠালের বাগান। বড় রকমের তেজারতি কারবার আছে তার। আর আছে আগেকার দুই পক্ষের দুই ছেলে। বড়টার বয়েস তেরো, ছোটটার সাত। দুই পক্ষই এই দুটো চিহ্ন রেখে গত হয়েছেন। কোনরকম বদ দোষ নেই তার, আর নেই ভাইপো। ওইটুকু যা ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন বগলাকান্ত। স্বভাবত একটু লাজুকপ্রকৃতির কিনা, নিজের জন্য মেয়ে দেখতে এসেছেন ওকথা বলতে লজ্জা পেয়েছিলেন। আর কী রকম সজ্জন ব্যক্তি! পাঁচ শো টাকা বিলাসের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন আসবার সময়। শুভকাজের ব্যয়নির্বাহের জন্য। চম্পি সুখেই থাকবে।

দামিনী বড় রকমের একটা কাঁদুনির তোড়জোড় করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সব শুনে দামিনীর কান্না মাঝপথেই বন্ধ হয়েছিল। এ চম্পির শিব-পুজোর ফল। শিবের মতই বর হল চম্পির। ভবিতব্য কে খণ্ডাতে পারে!

বাসরঘরের ক্রিয়াকাণ্ড আরও কতক্ষণ চলত কে জানে? বিমলার ঢাকন-ঢোকন, কড়ি খেলানো শেষ হল। পাড়ার গুটি পাঁচেক এয়ো নানা রকমে জামাই-ঠকানো প্যাঁচ একে একে ঝাড়ল। যুথি রূপের বাহার খুলে বারকয়েক বগলাবাবুর গায়ে হাসতে হাসতে ঢলে ঢলে পড়ল। অবশেষে বক্সী-বাড়ির বালবিধবা ক্ষ্যান্তদিদি আসরে নামলেন।

বললেন, ও বর, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকলি তো বিয়ে করতি আইছ। বলি যুবতী কনে সামলাতি পার কেমন দেখি? কোলে তোল দিনি? এ মুখির মিষ্টি ও মুখি তুলে ছ্যাও।

এতক্ষণ কী আজেবাজে একঘেয়ে মস্করা সব হচ্ছিল। বিরক্ত লাগছিল বগলাকান্তবাবুর। প্রথমবার তাঁর যখন বিয়ে হয়, তখন বোধ হয় চম্পির জন্মই হয় নি। তখনও এই একই ধরনের রসিকতা সব হয়েছিল। সব যেন একই ছকে কাটা। তবুও তখন বয়েস ছিল কম, টাক ছিল না, ভুঁড়ি ছিল না, প্রথম বিয়ে, বেশ ভালই লেগেছিল। কে যেন গালে ঠোনাও মেরেছিল। দ্বিতীয় বিয়ের বয়েসও তো প্রায় বছর দশেক হল। তখনও বগলাকান্তবাবুকে এই একই রসিকতার তাড়না সহ্য করতে হয়ে-ছিল। এবারও তাই। সেই কারণেই এতক্ষণ কোন উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। ক্ষ্যান্তদিদির কথায় নড়েচড়ে বসলেন। হ্যাঁ, এতক্ষণে তবু একটা

কাজের কথা শোনা গেল। চম্পির হাত দুটো খুব নরম, মনে পড়ল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে নিরিবিলি পাবার জন্য মনটা আনচান করে উঠল। আর কতক্ষণ জ্বালাবে এরা!

বগলাবাবু বললেন, অনেক হয়েছে, ইবারে বিশ্রাম চাই। আপনারা ক্ষ্যামা দ্যান।

ক্ষ্যান্তদিদি বললেন, ওলো, বুড়োর যে আর তর সচ্ছে না। অব্যেসটা বুঝি চাড়া দিয়ে উঠতিছে। তা হবে না, পরীক্ষে দিতি হবে। না হলে ছাড়ব ক্যান? এই গ্যাঁট হয়ে বসলাম সব।

সবাই খিলখিল হেসে এর গায়ে ও গড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিমলা মুখ টিপে হেসে বলল, ন্যাও ভাই ন্যাও, এইটেতে পাস করলিই ছুটি।

বগলাকান্তবাবু বৃথা বাক্যব্যয় না করে জড়সড় চম্পিকে টেনে নিলেন কোলে। এত লোকের চোখের সামনে সে অস্বস্তিতে, লজ্জায় বিরক্তিতে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। একটা সন্দেশ কামড় দিয়ে বগলাকান্তবাবু বাকীটা চম্পির মুখে জোর করে গুঁজে দিলেন। গালের মধ্যে গুচ্চের আবর্জনা নিয়ে চম্পি মুখখানা গোঁজ করে থাকল। ঘরে হাসির ধুম উঠল। ক্ষ্যান্তদিদির মনের ক্ষিধে চোখে গিয়ে জড় হল।

এক গা জ্বালা নিয়ে সে বলে উঠল, চল্ বিমলি, চল্। চম্পির চোখ যেমন ঢুলে আসতিছে তাতে মনে হয় বুড়োর কোলে ঢলে পড়তে আর দেরি নেই। ওরে, চল্ সব। ত্বরা করে যার যার বাড়ি হাঁটা দে। আমরা এখন থাকলি ওগের গায় ফুস্কা পড়বেনে, কী বল গো বর?

সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। চম্পি সরে বসল। তারও ওদের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। এতক্ষণে তার ভয় ঢুকল মনে। এ সুহাস নয়, (হঠাৎ তার সুহাসের কথা মনে পড়ল) যে ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলেই তাকে নিস্তার দেবে। বগলাকান্তবাবু উঠলেন, দরজাটা বন্ধ করলেন।

গরদের জামাটা খুলতে খুলতে বললেন, কতক্ষণ আর সঙ সেজে বসে থাকা যায়?

গেঞ্জিটাও খুলে ফেললেন একটানে। লোমভর্তি একটা দেহ আর নিটোল এক ভুঁড়ি নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করল।

উঃ, কী গরম!

বগলাকান্তবাবু খাটের ধারেতে পা ঝুলিয়ে বসে একখানা হাতপাখা টেনে নিয়ে জোরে জোরে হাওয়া খেতে লাগলেন।

বাবা, কী ঘামাচিই না ফুটিছে! চিটপিটোয়ে অস্থির করে ছাড়ল।

বগলাকান্তবাবু পাখার ডাঁটিটা দিয়ে ঘ্যাস ঘ্যাস করে পিঠের ঘামাচি মারতে লাগলেন, চম্পি শীতল দুটি চোখ তুলে দেখতে লাগল। বগলাকান্তের বুকে গোছা গোছা লোম, কানের নাকের ফুটো দিয়েও রোমের গুচ্ছ বেরিয়েছে। কিছু পাকা কিছু কাঁচা। বুক থেকে রোমের একটা সরল রেখা বেরিয়ে স্ফীত উদরের উপর দিয়ে নেমে গেছে। অজস্র ছাগলের পাল যেন দূর কোন নদীর পাড় বেয়ে নামতে শুরু করেছে। বগলাকান্ত-বাবুর কোঁখে কাপড় পরার দাগ। ডানার উপর ছুলি। গা-ভর্তি ঘামাচি। কিছুই তার নজর এড়াল না।

কী গো লজ্জাবতী!

বগলাকান্তের আকস্মিক সম্ভাষণে চমকে উঠল চম্পি।

কী গো, মুখটুখ খোল। বলি পছন্দ হইছে তো?

চম্পি জবাব দিল না।

কোনও অভাবই রাখব না তুমার। কত শাড়ি চাও, কত গয়না চাও। বগলা বিশ্বেসের অভাব নেই কিছু। তার যা কিছু আছে, সবই তো তুমার। আমি তো এখন ও চরণের দাস। দেহি পদপল্লবমুদারম্। হেঁ-হেঁ-হেঁ। বুঝিছ। হেঁ-হেঁ। যে-মুহূর্তে তুমারে দেখিছি, সেই তখনের থেই কিনা গুলাম হয়ে গিইছি। বেশ শরীরখান তুমার। এই রকমই আমার পছন্দ। হেঁ-হেঁ হেঁ-হেঁ-হেঁ। বুড়ো বলে ব্যাজার হইছ না কি? পুরনো চাল আর পুরনো বর, ওই যে কী যেন বলে, হেঁ-হেঁ-হেঁ, তাই। বুঝিছ। আসো, আসো, কাছে আসো। ভাবতিছ বুড়ো বর, আরে বুড়ো কি বয়েসে করে?

বলেই চম্পিকে আবার কাছে টেনে নিলেন। তাঁর বুকের ঘাম চম্পির মুখে ঠেকল। আগ্রহও দেখাল না সে। বিন্দুমাত্র বাধাও দিল না।

বগলাকান্তবাবু সেই রাত্রেই স্বামিত্বের স্বাক্ষর রাখতে যখন অতিমাত্রায় উদ্যোগী হয়ে উঠলেন, চম্পি তখনও বাধা দেয় নি। সে বুঝেই গেছে এখানে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা অবান্তর। বহুদিন আগে একটা টিকটিকি তার গায়ে থপ করে পড়েছিল। বগলাকান্ত সেই ছোট্ট একটা টিকটিকি নয়, তার মনে

হল, একটা বিরাটকায় গিরগিটি যেন সারা রাত ধরে তার শরীরের নানা জায়গায় মহোৎসাহে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ডিম পেড়ে পেড়ে তার শরীরটা অপবিত্র করে দিচ্ছে। তার গা ঘিনঘিন করে উঠল। অপ্রবৃত্তির একটা দারুণ অস্বস্তি তাকে সর্বক্ষণ পীড়া দিতে লাগল।

চম্পি বুঝতে পারল, তার আগামী জীবনের বহু রাত্রি যেভাবে কাটবে, এটা তারই একটা মহড়ামাত্র। সে ভেঙে পড়ল না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেও দেখা গেল না তাকে। সে এটাকে মেনে নিল। ভবিতব্যকে কে খণ্ডাতে পারে? তার দেহে প্রতিরাত্রে সরীসৃপ বিচরণ করবে, ক্ষমতার পরিচয় দেবার জন্য বিকৃত উল্লাসে অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে উঠবে, অশ্লীল নৃত্য করবে, এই তো তার বিধিলিপি। এই লোকটি মহানুভব, সন্দেহ নেই। তবু তো কালো বলে তাকে পায়ে ঠেলে নি। তাই তো সে পার পেল।

না, সে শিরে করাঘাত করবে না, কাউকে দোষারোপ করবে না। একবার ত সে অতল জলে ডুবে মরতে স্বেচ্ছায় গিয়েও ছিল। তবে আর তার ভয়টা কিসের? চম্পি জানে, এবার তার আর ফেরার উপায় নেই। দরকারই বা কী?

অশেষ উপদ্রব সহ্য করার পরও, ওরই মধ্যে চম্পি যেন কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর যখন জাগল তখন ওর মনটা ঘষা কাঁচের মত হয়ে উঠেছে। অনভ্যস্ত পরিবেশ তাকে খুব বেশী পীড়া দিল না। নতুন তোশক, নতুন বালিশ, নতুন চাদর, নতুন মশারি। কেমন টানটান মশারিটা। মাড়ের গন্ধের সঙ্গে আশেপাশে ছড়ানো ফুলের গন্ধ মিলে অদ্ভুত এক গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে। নাকে এই নতুন গন্ধ এসে লাগছে। অজগরগর্জন সৃষ্টি করছে পাশে-শোয়া ওই লোকটির নাক। ওই লোকটাই তোমার স্বামী।—চম্পি পরিচয় করাচ্ছে নিজের সঙ্গেই। এমন নরম বিছানায় আর কখনও শোয় নি চম্পি। না, শুয়েছিল। এর চাইতেও বোধ হয় সে বিছানা আরও নরম ছিল। শৈলদিদের বাড়ি। চম্পি এখন নিজের বাড়িতেই শুয়ে আছে। ছোটকাকার ঘরে। বরশয্যায় দানে-পাওয়া নতুন বিছানার উপরে। সে আর একা নয় এখন। পাশে তার বর। বরের একখানা হাত তার বুকের উপর এসে পড়েছে। চম্পি নির্বিকারভাবে হাতখানা নামিয়ে রাখল। উনুনের পাড়ে যেন একখানা চ্যালাকাঠ সরিয়ে রাখল।

তার পর সে নিঃশব্দে উঠে বসল। সন্তর্পণে বাইরে চলে এল। ভোর হয়েছে। আলো ফোটে নি। কেউ ওঠে নি। খুঁটি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চম্পি। সেই খুঁটির ভিতরটার মত চম্পির মনটাও নিরেট শূন্য দিয়ে ভরা। কোথাও বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই। না আকাশে, না এই বাড়িতে, না চম্পির মনে।

খুট করে কে যেন কোন্ ঘরের দরজা খুলল। চম্পি চমকে উঠল। শঙ্খ! কী করে যেন দরজা খুলে ভাঁড়ারঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। কাকীমা বোধ হয় ঘুমুচ্ছে এখনও।

চম্পিকে দেখতে পেল। একগাল হাসি ফুটল তার মুখে।

ডাকল চম্পিকে, দিদি আয়।

চম্পির বুকের মধ্যে এতক্ষণ পরে, শঙ্খের ডাক শুনে, একটা মোচড় দিয়ে উঠল। সে প্রায় ছুটে গিয়ে শঙ্খকে বুকে তুলে নিল। শঙ্খ তার নাকের ফুল ধরে, হার ধরে, কানের মাকড়ি ধরে টানাটানি করতে লাগল। এগুলো আগে তো দেখে নি সে। খুব মজা লাগল তার।

বলল, দিদি পালা।

বেড়াতে যাবার বায়না। পাড়া বেড়াতে শিখেছে শঙ্খ। চম্পি ওকে চুমু খেল। কোলে তুলে পুকুরপাড়ে এল। ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। চম্পির শরীর যেন জুড়িয়ে আসছে। শঙ্খ সমানে তার গহনা ধরে টান দিয়ে চলেছে।

শঙ্খ বলল, দিদি বউ।

দু বছরের ছেলে সব বোঝে। চম্পি হাসল। মনটা কিছু হালকা হল তার। কদিন ধরে মনে গুমোট ছিল। কথাবার্তা বন্ধই করে দিয়েছিল চম্পি। শঙ্খকেও সে কাল থেকে পাত্তা দেয় নি।

বলল, শঙ্খ, আমি চলে যাব রে।

শঙ্খ বলল, না, যাব না। যাব্‌ব।

চম্পি বলল, আমি চলে গেলে, তুই কাঁদবি?

কান্‌ব। দিদি যাব না। কান্‌ব।

শঙ্খকে বুকে চেপে ধরে কেঁদে ফেলল চম্পি। এতক্ষণ পরে সে কাঁদবার অবকাশ পেল।—তুই কাঁদবি, আমি জানি।

আর-কেউ কাঁদবে না। কেউ না। সবাই নিস্তার পেয়ে গেল। আমি

তো চক্ষুশূল ছিলাম সবার। এবার দেখিস ওরা সুখে থাকবে। মনে মনে শঙ্খকে শোনাল চম্পি। প্রতিজ্ঞা করল, আর আমি আসব না এ-বাড়িতে। চম্পির বুক ঠেলে জমাট কান্না বেরতে শুরু করেছে। আর আসব না এখানে। কোনদিন না। কক্ষনো না, কক্ষনো না। আমি জানি, বুঝতে পেরেছি, কেউ আমাকে দেখতে পারে না।

চম্পির চোখে জল দেখে শঙ্খ কচি কচি দুটো হাত দিয়ে তার চোখ দুটো চেপে ধরল।

বলল, ছাট ছাট, কানে না। মাব্‌ব না। কানে না। দুট্টু মাব্‌ব। দিদি ভাল। দিদি মাব্‌ব না।

চম্পি বলল, তোর কাছেই শুধু আমি ভাল। তুই-ই শুধু আমারে ভাল দেখিস। আর-কেউ দেখে না। না বাপ, না মা। দেখিস নি আমারে কেমন ঠেলে দিল! বেশ, আমিও আর জীবন থাকতি এদিকি মাড়াব না।

চম্পি এবারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তার পরনে বেনারসীর চেলি। চেলির খুঁটে বরের গরদের চাদর বাঁধা। সে আষ্টে-পিষ্ঠে বাঁধা পড়ে গেছে। তার কপালে, সিঁথিতে অনভ্যস্ত সিঁদুর। এখনও তা সামান্য ঘষা খেলেই উঠে যায়। বিয়ের রাত্রেই বগলাবাবুর আংটি মোটা করে যে-সিঁদুর চম্পির কপালে ঘষে দিয়েছিল তা এখনও সুস্থির হয়ে বসতে শেখে নি।

কিছুক্ষণ কাঁদার পর সুস্থ হল চম্পি। বেশীক্ষণ আর ঘাটে বসল না। দুজনে মিলে হাত মুখ ধুল। তার পর ফিরে এল বাড়িতে।

গিরিবালা অস্থির হয়ে উঠেছিল শঙ্খকে না দেখে। আনাচ কানাচ খুঁজে দেখছিল। এখন চম্পির কোলে তাকে দেখে নিশ্চিন্ত হল।

হেসে বলল, ওমা, তুমার কাছে আছে? আমি আরউ ভাবেই বাঁচি নে। বলি, গেল কুথায়? ওরে পালে কনে?

চম্পি বলল, ও তো দেখি দরজা খুলে বেরয়ে পড়িছিল। তাই এট্টু পুকুরপাড়ের থে ঘুরে আলাম।

শঙ্খ মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গিরিবালা বলল, বেশ তো ছিলে এতক্ষণ। এখন বুঝি ঘুড়া দেখে খুড়া হলে?

চম্পি ভাঁড়ারের পৈঠের উপর বসে পড়ল। ধীরে ধীরে বাড়িটা জেগে উঠতে লাগল।

যাবার সময় একটুও কাঁদল না চম্পি। এক মুঠো ইঁদুরের মাটি উলটোমুখ করে মার আঁচলে ফেলে বেশ স্পষ্ট করে বলল, মা, এতদিন তুমার যা খাইছিলাম পরছিলাম, এই সব শোধ করে গেলাম। দোষ ঘাট যদি কিছু করে থাকি তো মাপ করে দিয়ো। বলেই গটগট করে পালকিতে গিয়ে উঠল। কারও মুখের দিকে সে চাইল না। কারও জন্য এক ফোঁটা জলও পড়ল না তার চোখ থেকে। ওর বড়দি, মেজদি, মা, কাকীমা, ঠাকুমা বিকাল থেকেই ফোঁপাতে ফোঁপাতে অস্থির হয়ে উঠেছেন। এমন কী তার বাবার চোখও শুকনো ছিল না। শুধু ভেজে নি চম্পির চোখ। সে সঙ্গে ঝি নিয়ে যেতেও কিছুতে রাজী হল না। একাই গেল শ্বশুরবাড়ি।

ব্যাপারটা এতই অস্বাভাবিক যে, প্রথম চোটে সবাই থ মেরে গিয়েছিলেন। ফোঁপানি-টোপানি সব বন্ধ হয়ে গেল। ধাক্কা একটু সামলে নেবার পরই বাড়ির মেয়েরা গোল হয়ে বসে জিভের লাগাম খুলে দিলেন।

যশোরের মেজবউই প্রথম মুখ খুললেন, ধন্যি বেহায়া বাবা, আজকালকার মেয়ে।

বিমলা বলল, আমি তো কাঁদে ফাটে পড়িছিলাম। এ-বাড়ির থে বেরতি পা যেন ওঠে না। বাবা কাকারা কোন রকমে পাঁজা-কুলা করে পালকির মধ্যি তুলে দিইলেন। আর এ মেয়ে একেবারে গটগটায়ে গিয়ে পালকিতে উঠলেন।

দামিনীর কান্না অনেকক্ষণ শুকিয়ে গিয়েছিল। চম্পির ভাবসাব দেখে তাঁর আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছে।

কপাল চাপড়ে বললেন, আর শুনলে কথা! এতদিন যা খাওয়াইছি পরাইছি তা এক মুঠো ইঁদুরির মাটি দিয়েই শোধ করে গেল?

তা ও-ব্যাপারে আর চম্পির দোষ কী? উটা তো নিয়ম। সবারই পালতি হয়।

কমলার কথা শুনে দামিনী বললেন, তা ওইভাবে কেউ বলে না কি? মা তুমার ধার শুধলাম, এ কথা কী মুখ দিয়ে বেরতি চায়? তুই নিজি কতখানি চোখির জল ফেলিছিলি মনে করে ছাখ্।

দামিনী হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন।

বললেন, বাপ-মার ঋণ কী কেউ শোধ করতি পারে? সিবার নিমুনিয়া হল। যমে-মানুষি টানাটানি। একটা মাস চোখির পাতা এক করতি

পারি নি। তেজবরের হাতে তুলি দিতি হল বলে বুক আমার ফাটে গিয়েছে। জোর করে যে এ পাত্তর হাতছাড়া করব, তার পর? আর যদি পাত্তর না জোটে, তখন? তাই তো আমি শেষ পর্যন্ত মত দিছিলাম। আর সেই বরের বাড়ি যাবার বেলায় তুই নাচতি নাচতি গিয়ে পালকিতে উঠলি? আমাগের জন্যি পরানও পুড়ল না একটু? কী নেমকহারাম মেয়েই পেটে ধরিছিলাম বাবা।

তা চম্পির কান্না বিমলা পুষিয়ে দিল যাবার সময়। পাড়ার লোক প্রায় জড়ো করে ফেলে আর কী! কদিনের মধ্যে যশোরের সবাইও চলে গেলেন। কমলা থাকল কিছুদিনের জন্য। ছেলে সুস্থ হলে যাবে।

দশ

ভূষণ এর মধ্যে একখানা চিঠি পেল ভূপতির। অতি সংক্ষিপ্ত চিঠি। কিন্তু অতি স্পষ্ট।

ভূপতি লিখেছেন:

শুনিলাম দেশে বসিয়া কিছুই করিতে পারিতেছ না। এইভাবে সময় নষ্ট কর, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। পত্রপাঠ কলিকাতায় চলিয়া আইস। তোমার জন্য একটা ভাল কাজ যোগাড় করিয়াছি। শ্রীহট্টে যাইতে হইবে। একটি চা-বাগান কেনা হইয়াছে। ওই বাগানের ডাক্তারের চাকুরিটি তোমাকে দেওয়া হইতেছে। আশা করি, তোমাদের সকলের কুশল।

আঃ তোমার সেজদা

এর জন্য তৈরী ছিল না ভূষণ। অপ্রত্যাশিত এই ডাকটা পেয়ে তার রক্তে চঞ্চলতা জেগে উঠল। কিন্তু ফ্যাসাদ বাধল গিরিবালাকে নিয়ে। সিলেটের কথা শুনলেই সে ভয় পায়। দুদিন লাগে যেতে। সেখানে সহায়-সম্বল কে আছে? বিপদে আপদে কে দেখবে? যত সব বাজে চিন্তা গিরিবালার। ভূষণ কখনও সিলেটে যায় নি। তবুও এমন পরিষ্কার সব বর্ণনা দিতে লাগল সিলেটের যে, গিরিবালার মনও শেষ পর্যন্ত ভিজে উঠল।

গিরিবালা নরম হল অন্য কারণে। এই সিলেট যাওয়া উপলক্ষ্য করে ভূষণ তার মতামত চাইছে। তার মানে তাকে উপেক্ষা করছে না ভূষণ। শুধু তাই নয়। রোজ রাত্রে তারা পরামর্শ করছে। গিরিবালা একটু কথা বলে বাঁচছে তার সঙ্গে। ভূষণের সঙ্গে দুটো কথা বলার জন্য, পাঁচটা খোশগল্প করার জন্য গিরিবালা লালায়িত হয়ে থাকে। কিন্তু তার এই সামান্য দাবিটুকুও ভূষণ মেটাতে পারে না।

সকালে বেরিয়ে যায়, আসে বেলা তিন প্রহরে। বিশ্রাম চান খাওয়া-দাওয়া সেরে সে একটু গড়ায়। দিনে তো কথা বলার কোন সুযোগই হয় না। রাত্রেও কী হয়? অনেক রাতে গিরিবালা যখন কাজকর্ম সেরে শুতে আসে, ততক্ষণে ভূষণের নাক ডাকা শুরু হয়ে যায়। ক্বচিৎ কখনও ভূষণকে জাগন্ত অবস্থাতেও পেয়েছে গিরিবালা। তবুও কথা বলার সুযোগ সে পায় নি। ভূষণ তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নানারকম হিসেব কষায়। তখন কথা বলতে গেলে খেঁকিয়ে উঠেছে ভূষণ।

এই এখন, সেজ ভাসুরের চিঠিখানা আসবার পর থেকে, গিরিবালা দেখছে তার দর বেড়ে গেছে। ভূষণ অনেক রাত পর্যন্ত পরামর্শ করে তার সঙ্গে। তার মতামত চায়। সে ভয় পেলে তাকে সাহস দেয়, তার চোখে সচ্ছল এক সংসারের রঙিন স্বপ্ন তুলে ধরে।

গিরিবালা টের পাচ্ছিল, সে অনুভব করছিল, ভূষণ আর তার মধ্যে ভালবাসার যে উষ্ণ স্রোতটা বয়ে যেত, সেটা যেন ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। কেমন একটা ব্যবধানের পাঁচিল যেন দুজনকে আলাদা করে দিচ্ছিল।

এখন, এই সিলেট যাবার প্রস্তাব আসার পর থেকে, গিরিবালা যেন আবার একটু একটু করে ফিরে পাচ্ছে আগের ভূষণকে।

দেশে কিছু করে উঠতে পারল না বলে যে ভূষণ দেশ ছেড়ে শ্রীহট্ট যেতে মন করল, তা কিন্তু নয়। এখানে সে যে কিছুই করতে পারে নি, সে কথা সত্য নয়। অল্প সময়ের মধ্যে সে পসার জমিয়ে নিয়েছিল। তার যশ ছড়িয়ে পড়েছিল। ডাক আসতে শুরু করেছিল দূর দূর গ্রাম থেকেও।

চিকিৎসা করাটাই তার আয়ত্তের মধ্যে আছে। সেটা তার দায়িত্ব,

সে তাই প্রাণপণে চিকিৎসা করে গিয়েছে। তার বদলে পয়সা সে অবশ্য পায় নি। পেয়েছে খুবই সামান্য। প্রায় না-পাওয়াই। তবে তার জন্য ভূষণকে দায়ী করা বৃথা। কারণ টাকা দেবার কথা তার রোগীদের, তারা তাদের কর্তব্য পালন করে নি, করতে পারে নি।

তা হলে কি এটা বলা ঠিক হবে, তুমি কিছুই করতে পারছ না দেশে? ভূষণ, তুমি কিছুই করতে পার নি। না-না, তা কেন? ভূষণ নিজের মনকেই বলল, তার যা সাধ্য তা করেছে। শত অসুবিধা, উপেক্ষা এবং উপহাস সহ্য করেও সে কি জনহিতের জন্য নানারকম আবিষ্কারের চেষ্টা করে নি? সে কি ডাক্তারি ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে টাকা রোজগারের চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়েছে কখনও? কখনও না। কস্মিনকালেও সে ক্ষান্ত দিত না।

না, ব্যাপারটা তা নয়। ব্যর্থ হয়ে অথবা অভাবের তাড়নায় সে দেশ ছাড়ছে না। ব্যর্থতা কাকে বলে ভূষণ জানে না। ভূষণের দুনিয়ায় অভাব বলে কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তবে যে সে ভূপতির চিঠি পাওয়ামাত্র যাব যাব বলে নেচে উঠল, তা সম্পূর্ণ অন্য কারণে। ভূষণের রক্তে প্রচণ্ড এক নেশা আছে। চঞ্চলতার নেশা। এই নেশা কখনও তাকে সুস্থির থাকতে দেয় নি। তাকে শুধু ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এই নেশা তাকে দিওয়ানা বানিয়েছে, সন্ন্যাসী করে ছেড়েছে। সংসার পাতার পর অনেক দিন ঘুমিয়ে ছিল সেটা। সেজদার চিঠিখানা সেই ঘুমন্ত নেশাটাকে যেন উসকে দিল। জাগিয়ে দিল। আর ভূষণের কাছে এই বহুদিনের অভ্যস্ত সীমানায় চলাফেরা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হতে লাগল।

সত্যি বলতে কী, যেদিন ভূপতির চিঠিখানা হাতে পেয়েছে ভূষণ, সেই দিনই সে শ্রীহট্টের অজানা এক চা-বাগানে চলে গেছে। এই যে যে-ভূষণকে সবাই এখানে দেখছে, সেটা কিন্তু আসল ভূষণ নয়, তার খোলস।

কিন্তু খোলসটাই বা অনর্থক একটা মাস এখানে পড়ে থাকল কেন? ভূষণ মনে মনে তাতেই বিরক্ত হয়ে উঠল। ভূষণ যে তাড়াতাড়ি যেতে পারছে না, বলাই বাহুল্য, তার প্রধানতম কারণ গিরিবালা। গিরিবালা খুব বেগ দিয়েছে তাকে। অচেনা জায়গায় যেতে তার বড় ভয়। আরে, অচেনা বলে কিছু আছে নাকি জগতে? আজ যে অচেনা, কাল সে-সব লোক

অন্তরঙ্গ। কিন্তু কূপমণ্ডুক গিরিবালা, জগতের কোন কিছুই দেখে নি, তাই কিছুই সে জানে না।

যা হোক, অনেক কষ্টে সে শেষ পর্যন্ত বোঝাতে পেরেছে গিরিবালাকে। গিরিবালার ভয় যে অনেকটা ভেঙেছে, ভূষণ এতেই খুশী। আর সে অনর্থক বিলম্ব করতে চায় না।

ভূষণের মন বলছে, ওই চা-বাগানে গেলেই তার অনেক স্বপ্ন সফল হবে। প্রথমত, বাঁধা একটা রোজগার থাকায় সংসারের ভাবনা তাকে ভাবতে হবে না। নিশ্চিন্ত মনে সে তার অসমাপ্ত গবেষণাগুলো একে একে শেষ করে ফেলতে পারবে।

আপাতত, সে স্থির করল, তার দুটো ওষুধের আলমারির একটা (অপেক্ষাকৃত খারাপ যেটা) বিক্রি করে দেবে। বাকীটা বাড়িতে এনে রাখবে। সাইকেলটা সে নিয়েই যাবে সঙ্গে করে। আলমারির খদ্দেরও পেয়ে গিয়েছে ভূষণ। মহিন্দির কম্পাউণ্ডার সরকারী হাসপাতাল থেকে পেনশন নিয়ে এখন ডাক্তার হয়ে বসতে চায়। বুড়ো বড় কঞ্জুষ। প্রথমে দামটা এতই কম হেঁকেছিল যে, ভূষণ পত্রপাঠ তাকে বিদায় করে দিয়েছিল। তারপর ভূষণ দেখল, আলমারির খদ্দের জোটানো শক্ত। শেষ পর্যন্ত মহিন্দির বুড়োই দাঁও মারল। ষাট টাকার ভাল কাঠের আলমারি বিক্রি হল মাত্র পঁচিশ টাকায়। যাক, তার জন্য ভূষণ হা-হুতাশ করল না। বরং ভালই হল, সে ভাবল, তবু তো ওষুধই থাকবে ওর ভিতর।

বাস্, এখন সে মুক্ত। এবার সে কলকাতায় যাবে। সেজদার কাছ থেকে নির্দেশ নেবে। তারপরে চলে যাবে শ্রীহট্ট। হ্যাঁ, আর-একটা কাজ বাকী। কলকাতায় যাবার আগে গিরিবালাকে তার বাপের বাড়িতে রেখে যাবে। ফিরতি পথে এসে ওদের নিয়ে যাবে সে। বাস্, সব ব্যবস্থা পাকা। তবে সামান্য একটা কাজ বাকী আছে। কিছু টাকা সংগ্রহ করা। ভূষণের কলকাতায় যাওয়া, গিরিবালাদের শ্বশুরবাড়ি পাঠানো, এমনি সব কাজের জন্য কিছু টাকার দরকার। ভূষণ প্রথমে ওর পাওনা টাকা আদায়ের চেষ্টা করল, পারল না। ধার পাওয়া সম্ভব নয়, সে জানে। আলমারি বেচে সে অবশ্য কিছু পেল। কিন্তু আরও কিছু চাই তো। শেষ পর্যন্ত অগতির গতি, গিরিবালার গহনায় হাত দেওয়া ছাড়া আর উপায় দেখল না ভূষণ।

কিন্তু প্রস্তাবটা সরাসরি গিরিবালার কাছে পেশ করা খুব সহজ ঠেকল না। কারণ বাক্সের গহনা যা ছিল, গিরিবালা তা ধরে দিয়েছে কয়েকবার, মাছের ব্যবসা, কণ্ট্রাক্টারি, ডাক্তারখানার বাকী ভাড়া এবং দোকানের দেনা শোধ, স্পির বিয়ে—এই সব নানান খাতে গিরিবালার তোলা গহনাগুলো একে একে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কোনবার গিরিবালা স্বেচ্ছায় দিয়েছে 'সুদ সমেত আসল' ফেরত পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে। মাছের ব্যবসার সময় ভূষণ যখন গিরিবালার আর্মলেট জোড়া নেয়, তখন বলেছিল, লাভের টাকা দিয়ে (ভূষণ তখন হিসেব করে দেখেছিল, একশো টাকা লাগালে আড়াইশো টাকা ঘরে আসছে) আর্মলেট তো ফিরিয়ে দেওয়া হবেই গিরিবালাকে, তার উপর সুদ হিসেবেও একটা গহনা দেওয়া হবে তাকে, তার যা পছন্দ।

গিরিবালা আপত্তি করে নি, আর্মলেট জোড়া বের করে দিয়েছিল। গিনি-বসানো আর্মলেট। গিরিবালা বলেছিল, সুদের টাকায় তাকে একছড়া মটরমালা গড়িয়ে দিতে হবে, দেশী স্যাকরার গড়ানো হলে চলবে না, কলকাতার বি সরকারের দোকানের জিনিস চাই। ভূষণ তাতেই ঘাড় নেড়েছিল।

সেই কোন্ ছোটবেলায় গিরিবালা বি সরকারের মটরমালা দেখেছিল, সে-কথা বড় হয়েও ভুলতে পারে নি। সে তখন ডোমারে। বাবার কর্মস্থলে। তখন তার মা-ও বেঁচে। হঠাৎ একদিন সাজ-সাজ রব পড়ে গেল সেখানে। ম্যানেজারবাবুর বড় মেয়ে লাবণ্যর মুখে গিরিবালা শুনল, "পুজো স্পেশাল" আসবে। পূজা স্পেশাল কী, অজ গ্রামের মেয়ে গিরিবালা তা জানত না। লাবণ্যই বলল, সে নাকি দারুণ জিনিস। আসলে রেলগাড়ি, কিন্তু প্যাসেঞ্জার যায় না তাতে। গাড়িগুলো সব দোকান-পসারে ভর্তি। ম্যাজিক, বাইস্কোপ, কাপড়, পোশাক, গহনা, কলকাতার খাবার, মনোহারি জিনিসে ঠাসা। সত্যিই তাই পূজা স্পেশাল দেখে গিরিবালার গ্রাম্য নাবালিকা চোখে যেন স্বপ্ন নেমে এসেছিল। মনে মনে সে ট্রেনসুদ্ধ সব জিনিস নিতে ইচ্ছে করেছিল। তবে সব চাইতে তার মন কেড়েছিল বি সরকারের দোকানের মটরমালা। সেদিন জিনিসটা কিনতে পারে নি সে। পারে নি বলেই মটরমালা পাবার বাসনা এত অক্ষয় হয়ে আছে।

ভূষণ এ কথা জানত। এ কথাও জানত, গিরিবালার আর্মলেট-বেচা টাকায় তিন থেকে চার চালান মাছ আনতে পারলেই লাভের টাকা থেকে অনায়াসে মটরমালা গড়িয়ে দেওয়া যাবে। ফাঁকা কথা বলবার লোক নয় ভূষণ।

দস্তুরমত হিসেব কষে সে বুঝিয়ে দিতে পারে, ব্যবসাটা চালু করতে পারলে, সাত পেটি করে মাছ দৈনিক চালান আনতে পারলে, সামান্য মাত্র লাভে সে-সব বিক্রি করলেও মাস গেলে দেড় হাজার টাকা লাভ থাকত তার। তার থেকে আরও পাঁচশ টাকা বাদই দিয়ে দাও না হয়, তবুও ত এক হাজার টাকার কোনমতেই মার ছিল না। আর ব্যবসাটা গিরিবালার নামেই খুলেছিল ভূষণ। শুধু মাছ কেন, গিরিবালার গহনা বেচে যে ব্যবসাই করেছে ভূষণ, তার "প্রোপ্রাইটার" গিরিবালাকেই করেছে। লাভ হলে গিরিবালারই হত। প্রতিবারই কোন-না-কোন বিভ্রাটে ব্যবসাগুলো লোকসানে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই গিরিবালার কোন গহনাই স্বস্থানে ফিরে আসে নি।

চম্পির বিয়ের সময়েও গিরিবালা অবশ্য তাদের মুখরক্ষা করেছে। যদিও জানে ভূষণ, গিরিবালা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে তাতে। তবুও না হয় চম্পির বিয়েতে স্বার্থত্যাগের একটা আনন্দ ছিল। এখন যে কারণে ভূষণকে গিরিবালার গহনা চাইতে হবে, তাতে ত লাভের আশাও নেই, মহৎ হবার আনন্দও নেই।

দিতে কি রাজী হবে গিরিবালা? কী ভাবে পাড়া যায় কথাটা?

ভূষণ শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল। অন্যদিন, এতক্ষণ তার নাক ডাকা শুরু হয়ে যায়। আজ চোখের পাতা আর এক হতে চাইছে না। যাবার জন্য ছটফট করছে তার মন। সময় ত আর মোটেই নেই। অথচ এদিকে সে পাথেয়ই জোগাড় করে উঠতে পারছে না। সাংঘাতিক সমস্যায় পড়ে গিয়েছে ভূষণ।

গিরিবালা কাজকর্ম সেরে ঘরে এসে যখন ঢুকল, তখনও লজ্জা যেন জিউলির আঠার মত তার সারা গায়ে লেপ্টে আছে। বড় জায়ের চোখকে শেষ পর্যন্ত সে আর ফাঁকি দিতে পারল না। তার রকমসকম দেখে বড় জায়ের বুঝি সন্দেহ হয়েছিল। একটু আগে এমন জেরা করতে শুরু করলেন যে, গিরিবালা লজ্জায় মুখ নামিয়ে সবই স্বীকার করে ফেলল।

দামিনী হাসতে হাসতে বললেন, তা ভাল। ঠাকুরপোরে বলিছিস ত?

গিরিবালা কথা বলল না, মুখ নিচু করে এঁটো থালে আঁকিবুকি কাটতে লাগল।

দামিনী ধমক দিলেন, ও কী করিস ! থালে আঁক কাটে না, দিনা হয়। এমনিই ত ধার-দিনার সীমা-সংখ্যা নেই।

তারপর তিনি নরম গলায় আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন।

বললেন, ওরে ও বুকা মাধাই, এ-কথা লুকোয়ে রাখিছিলি ক্যান ? ও কি চাপা থাকে ?

গিরিবালা বলতে পারল না, সে নিজেও বুঝতে পারে নি আগে। দামিনীর আজকের ব্যবহার খুব ভাল লাগল গিরিবালার। মাঝে মাঝে এদের ব্যবহারে-আচরণে খুবই ধাঁধা লেগে যায় গিরিবালার। সে বুঝে উঠতে পারে না, এদের কোন্ মূর্তিটা আসল ! কখনও এদের ভাব দেখে ব্যথা পায়, কখনও আনন্দে ভাসে। এ-বাড়ির লোকগুলো যেন একটা দেহের খাপে দুটো করে রূপ ভরে রেখেছে। একটা যদি রণচণ্ডী, তাহলে অন্যটা জগদ্ধাত্রী।

গিরিবালা ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারল, ভূষণ জেগে আছে। নইলে তার নাক ডাকছে না কেন ? তার কেমন যেন মনে হতে লাগল, বড় জায়ের মত ভূষণও বুঝি টের পেয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা। সে আর ভাল করে ভূষণের দিকে চাইল না। সোজা নিজের জায়গায় উঠে গিয়ে শঙ্খকে কোলে তুলে নিল। তার কাঁথাটা বদলে দিতে না দিতেই সে উঁ-আঁ করে উঠে পড়ল। বড্ড পাজী হয়েছে ছেলেটা। আগে কেমন সারারাত ঘুমোত। এখন দিনে ত বটেই, রাত্রেও তার দৌরাত্ম্যির শেষ হয় না যেন। মাঝে মাঝে গিরিবালার মনে হয়, ও বুঝি ক্লান্ত হতে জানে না।

শঙ্খ খুঁতখুঁত করছে আর হাত দিয়ে গিরিবালার কাপড় টানছে। তার আর তর সইছে না কিছুতে। গিরিবালার মনে মনে হাসি পেল। দাঁড়া বাবা, দাঁড়া। একটু সবুর কর্। উঃ, কী যে করে ! একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে। বাবা, বাবা !

ক্লান্ত গিরিবালা সেমিজের বোতাম খুলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। শঙ্খ গুঁতো মেরে, ঢুঁ মেরে গিরিবালাকে অস্থির করে তুলে হঠাৎ কাম্য বস্তুটির নাগাল পেল। তখন শান্ত হয়ে চুকচুক করে মাই খেতে লাগল। গিরিবালা তার সারা গায়ে মাথায় আদরের হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মনে মনে বলতে লাগল, বুড়ো খুকা, এখন ত আমারে তিষ্ঠতিউ দ্যাও না, এর পর ভাগিদার জুটলি কী করবা ?

যে সন্দেহ গিরিবালার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল, দামিনীর মুখে প্রকাশ্যে তার সমর্থন পেয়ে সে প্রথম দিকে হকচকিয়ে গিয়েছিল। সেই ভাবটা কাটলে গিরিবালার শরীরে একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে থরথর করে তাকে খানিকটা কাঁপিয়ে দিল। পরমুহূর্তেই পুরনো কথা মনে পড়ল। আতঙ্কে তৎক্ষণাৎ তার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।

গিরিবালার ভয় আরও বাড়ল বিদেশে যাওয়ার কথা ভেবে। আগের-বার সে ত বাপের বাড়িতে ছিল, আপনার লোকেদের মধ্যে, তাই সে অমন ধকলটা সহ্য করতে পেরেছিল। এবার সে কোন্ মগের মুলুকে যাচ্ছে! কেউ থাকবে না সেখানে, কেউ দেখাশোনা করতে পারবে না··· না না, সেখানে গেলে আর বাঁচবে না গিরিবালা। সেই ভয়ঙ্কর দিনটা যখন আসবে, তখন···তখন গিরিবালা মরেই যাবে।

কেন তাকে এই অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিল ভূষণ! এই সমস্ত গণ্ডগোল পাকাবার জন্য সে বার বার ভূষণকেই দায়ী করতে লাগল।

কী, ঘুমিয়ে গেলে নাকি?

ভূষণের আওয়াজ পেতেই গিরিবালা নড়ে-চড়ে শুল। আবার সোহাগ জানানো হচ্ছে। গিরিবালা চটল না কিন্তু। তার ভালই লাগল। সেই মুহূর্তে এমনও ভাবল, ভূষণকে দেবে নাকি খবরটা! খবরটা শুনলে সেও কি গিরিবালার মত হকচকিয়ে যাবে? একটা জিনিস লক্ষ্য করল গিরিবালা, শঙ্খের বেলাতে এই সব ব্যাপারে সে যে-রকম লজ্জাবতী লতা গোছের ছিল, এবারে আর ঠিক তেমনটি নেই। শঙ্খ তার লজ্জার ভার অনেকটা লাঘব করে দিয়েছে। শঙ্খের বেলায় তার লজ্জাটা যত প্রবল ছিল, ভয় বা আতঙ্ক ততটা ছিল না। ব্যথা উঠবার পর সে ভয়ে কাবু হয়ে পড়েছিল। সেই ভয়াবহ যন্ত্রণার আভাস মাত্রও তার স্মৃতিতে নেই এখন। আছে প্রবল আতঙ্কের সেই অনুভূতিটা। আজ খবরটা প্রকাশ হবার পর সে লজ্জা পেয়েছিল ঠিকই। তবে তার পরিমাণ সামান্যই। আসলে তার ঘাড়ে এখন ভয়ই চেপে বসেছে।

এর আগেরবার কি ভূষণকে গোপন কথাটি জানাবার বাসনা তার মনে কখনও হয়েছিল? ও বাবা, সে বলে তখন পাতালে লুকোতে পারলে বাঁচে! স্বামীর সঙ্গে প্রথম রাত্রিবাসের পর গিরিবালা পরদিন সকালে যেমন কারও সামনে মুখ তুলতে পারে নি লজ্জায়, তেমনি লজ্জা

পেয়েছিল শঙ্খ হবার বেলায়, প্রথম যখন ব্যাপারটা ধরা পড়ল তার কাছে। মানুষের কত পরিবর্তন হয়! আশ্চর্য!

এবার ব্যাপারটা এত সহজ ঠেকবে তার কাছে, গিরিবালা তা আগে ভাবতে পারে নি। ভূষণের কাছে খবরটা দেবার কথা এখন সে কত সহজে ভাবতে পারছে।

ভূষণ বলল, কী গো, কথা বলছ না কেন? শোন, তোমার সঙ্গে একটা জরুরি পরামর্শ আছে।

ভূষণ গিরিবালার দিকে একটু সরে গেল। ভূষণও কি টের পেয়েছে নাকি? গিরিবালা উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ভূষণ বলল, ভাখ, আলমারি বেচা টাকা আজ তো পেলাম। মাত্তর পঁচিশ টাকা পাওয়া গেল। ওতে ত সব খরচ কুলোবে না। আমি কলকাতায় যাব, তোমাকে রেখে আসব তোমার বাবার বাড়িতে। তারপর ধর, এতদিন পরে আবার যাচ্ছ ওখানে, তোমার হাতেও ত কিছু টাকার দরকার। জামা-কাপড়ও কিনতে হবে কিছু। যতক্ষণ এখানে আছি, ততক্ষণ শুধু তোমার আমার কাপড় কিনলেই ত চলবে না—মা, বউদি, যুথি, বড়দা ওদেরও ত কারো কাপড়-চোপড় নেই, তাও ত কিনতে হবে। বাগানে গিয়ে পৌছতে পারলে অবিশ্যি আর কোন ভাবনা থাকবে না।

ভূষণ শেষ কথাটা খুব জোর দিয়েই বলল।

কারণ, সেখানে ত বাঁধা মাইনের সংসার। আজ দু টাকা পেলাম ত দু দিন নট-কিচ্ছু এমন ত নয়। এ একেবারে ফার্স্ট ডে অব দি মন্‌থ্‌, পয়লা তারিখেই একসঙ্গে সব টাকা পেয়ে যাচ্ছ তুমি। তারপর যেমন ইচ্ছে, যত ইচ্ছে খরচ কর। মাইনের চাকরির এই একটা মস্ত সুবিধে। টাকা-পয়সার ভাবনা ভাবতে হয় না। ফুরিয়ে গেল টাকা, তাতেও পরোয়া নেই, আবার মাস পয়লায় তুমি পেয়ে যাচ্ছ টাকা। যেমন খুশি খরচ কর। ব্যবসা-বাণিজ্যে এই সুবিধেটা কিন্তু নেই।

গিরিবালা অনেক আশা করে মুকিয়ে ছিল, না-জানি কী বলবে ভূষণ! ও হরি, শেষ পর্যন্ত এই কথা!

গিরিবালা ফস করে বলে বসল, এতই যদি চাকরিতি সুবিধে, তা এতদিন চাকরি-বাকরি নিলে না ক্যান?

এ আবার কী কথা? ভূষণ হকচকিয়ে গেল। সহসা কথা জোগাল না

তার মুখে। সাধে কি মেয়েলোক বলে! ভূষণ একটু অবজ্ঞার ভাব নিয়ে এ কথার জবাব দেবার জন্য তৈরী হল।

কিন্তু তার আগেই সুর নরম করে ফেলল গিরিবালা। ভূষণের একখানা হাত সে কাছে টেনে নিল। দু হাতে সেখানা শক্ত করে চেপে ধরল।

বলল, ওখেনে আর যায়ে কাজ নেই। পরের চাকরি করে হবেটা কী। এখেনেই তুমার যথেষ্ট পসার হবে, তুমি দেখে নিয়ো। ভাসুর ঠাকুরিরি তুমি বরং জানায়ে দ্যাও, উনারা অন্য লোক দেখে নেবেন।

ভূষণ বলল, পাগল, তা আবার হয় নাকি! চিঠি লিখে দিয়েছি যাব বলে। আমার আশায় সেজদা বসে আছেন। এখন কি আর না গেলে হয়? তা ছাড়া এ তো পরের চাকরি নয়। সেজদারাই ও-বাগানখানা কিনে ফেলেছেন। খুব বিশ্বাসী লোক চান তিনি।

গিরিবালা চটে গেল।

তুমি ছাড়াউ ঢের বিশ্বাসী লোক আছে ওঁর। তুমি না গেলি আর বাগানের কাজ যেন চলবে না!

গিরিবালার চোখ ফেটে জল আসে আর কী? আসল কথাটা বোঝে না কেন ভূষণ? এই অবস্থায় গিরিবালা ওই নির্বান্ধব দেশে গেলে কি বাঁচবে? কক্ষনো না। ভূষণ কি চায় যে, গিরিবালা ওই ওখানে গিয়ে অক্কা পাক! ভূষণ গিরিবালাকে মোটেই ভালবাসে না, এক ফোঁটাও না। সে দেখেছে, ভূষণের কাছে দুনিয়াসুদ্ধ সকলেরই দাম আছে। দাম নেই শুধু গিরিবালার। দাদার কথা রাখবার জন্য সে শ্রীহট্টে ছুটবে, কিন্তু গিরিবালার অনুরোধ, অনুনয়, মিনতি সে দু পায়ে মাড়াতে কসুর করবে না। গিরিবালার মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে করে, সবাই কি তাদের বউকে ভূষণের মত এত তাচ্ছিল্য করে।

গিরিবালা ধীরে ধীরে হাতের মুঠি আলগা করে দিল। ভূষণের ভারী হাতখানা নোঙর ছাড়া হয়ে গিরিবালার পায়ের উপর দিয়ে পিছলে বিছানায় গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে ও-পাশ ফিরে শুল। শঙ্খর গায়ে হাত রেখে সে মনের জ্বালা জুড়তে চেষ্টা করল।

গিরিবালা এত আপত্তি করছে কেন? ভূষণ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। একেবারে পাগলের মত আবোল-তাবোল বকছে। অনেক-ক্ষণ ধরে বোঝাতে বোঝাতে গিরিবালা শেষ পর্যন্ত নরম হয়। সায় দেয়

ভূষণের কথায়। কিন্তু গিরিবালা আবার পরের দিনই মত পাল্টায়। এ এক আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছে ভূষণ। আর কী করে যে সে গিরিবালাকে বোঝাবে, ভূষণ তা ভেবে পেল না। সে হতাশ হয়ে চুপ করে শুয়ে রইল।

ভূষণের নিজের ইচ্ছের কথা সে না হয় ছেড়েই দিল। যদিও আর এক মুহূর্তের জন্যও তার এখানে থাকবার ইচ্ছে নেই। তবুও না-হয় গিরিবালার মুখ চেয়ে নিজের ইচ্ছেটা দমন করল (বিয়ে-থা করলে কোনও লোকই আর জীবনে মহৎ কাজ করতে পারে না), কিন্তু গিরিবালা একথাটা কেন বুঝছে না, সেজদার সিদ্ধান্ত মানেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এর আর নড়চড় হয় না। আমেরিকায় ডাক্তারি পড়তে না গিয়ে সে একবার সেজদার আদেশ অমান্য করেছে, দ্বিতীয়বার আর তার পুনরাবৃত্তি করবার হিম্মত ভূষণের নেই। তা ছাড়া সেজদা আবার যে তাকে ডাকবেন, তার উপর কাজের ভার চাপাবেন, তার আগের অপরাধ মার্জনা করবেন, এই জিনিসটাই তার কাছে অভাবনীয়। এ-সুযোগ সে কী ছাড়তে পারে? গিরিবালাকে রাতের পর রাত একথা বোঝাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সবই দেখি ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। ধ্যুৎ! ভূষণ বড় বিরক্ত বোধ করল।

কিন্তু সে হাল ছাড়ল না।

বলল, আচ্ছা তোমার সত্যিকারের আপত্তিটা কোথায়, একটু খোলসা করে বল ত।

গিরিবালা জবাবও দিল না। পাশও ফিরল না। তবে সে একটু খুশী হল এই ভেবে, তাকে একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়েও দিতে পারছে না ভূষণ। গিরিবালা যদি বোঝে, ভূষণ তাকে পাত্তা দিচ্ছে, তাহলে আপনা থেকেই তার মন খুশী হয়ে ওঠে। একটু সাধুক না তাকে।

ভূষণ বলল, না, সত্যি, রাগের কথা নয়। খোলসা করে বলই না, কিসের এত আপত্তি তোমার?

এতক্ষণে গিরিবালা আবার এ-পাশে ফিরল।

বলল, আমার শরীর খারাপ হয়েছে। এ অবস্থায় অতদূর যাওয়া ঠিক হবে না।

ভূষণ কথাটা ধরতে পারল না। ভাবল গিরিবালা নূতন প্যাঁচ কষছে।

দিব্যি ত আছে গিরিবালা। ইদানীং বরং আরও চেকনাই ছাড়ছে। শরীর খারাপ! হুঁঃ!

ভূষণ হাল্কাভাবে বলল, ও-শরীরের আবার খারাপ হল কোথায়, তাও ত বুঝি নে।

অ্যাঁ, খোঁটা দিচ্ছে ভূষণ! তার মানে প্রকারান্তরে তাকে মিথ্যাবাদী বলা হচ্ছে। বেজায় চটে গেল গিরিবালা।

বলল, বুঝবা কী করে? তুমি কি কোনও দিন আমারে বুঝবার চিষ্টা করিচ? আমার সুখ-অসুখ কিছুই ত তুমার চোখি পড়ে না। ভাব, আমি বুকা, কিছুই বুঝি নে। সব বুঝি। বুঝেউ কিছু বলি নে। তেমন তেমন কারুর পাল্লায় পড়লি বুঝতে ঠ্যালাখানা।

ভূষণ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আহা-হা, এত রাত্রে আবার গোলমাল বাড়ানো কেন? কী হয়েছে, তাই বল না। আজেবাজে কথা বলে লাভ কী?

গিরিবালা রাগে ফুলতে লাগল।

আমি একটা কথা বললিই তো তুমার গায় ফুস্কা পড়ে। আমার আর সহ্য হয় না। ছ্যাখ, আমারে বাপের বাড়ি পাঠায়ে দ্যাও। দিয়ে যেখেনে ইচ্ছে সেখেনে যাও।

এবার ভূষণ ঘাবড়ে গেল। এত রাগতে সে গিরিবালাকে কখনও দেখে নি। গিরিবালা ততক্ষণে ফোঁৎ ফোঁৎ করতে লেগেছে। এ ত আচ্ছা ফ্যাসাদ! এত রাত্রে, কোথায় অল্প কথায় কাজ সারতে গেল ভূষণ, ফল হল উল্টো।

যথাসম্ভব মোলায়েম গলায় বলল, ছ্যাখ, তোমার মনে ব্যথা দেবার জন্য আমি ওকথা বলি নি। তোমার শরীর খারাপ বললে কিনা, আমি তাড়াতাড়ি সেইটেই জানতে চাইছিলাম।

গিরিবালা চুপ করে গেল। তার অভিমান তখনও যায় নি।

বলল, আমার কথা ত তুমার বিশ্বাস হবে না। তুমি বরং কাল বড়দিরি জিজ্ঞেস করে নিও।

ভূষণ খুব নরম দেখে গিরিবালাকে খুব কাছে টেনে নিল।

বলল, এটা কি একটা কথা হল! তোমার কথা তোমার মুখ দিয়ে শুনতেই আমার ভাল লাগে।

ওরে বাস রে! কথার কায়দা কত! ভূষণের বলার ঢঙে গিরিবালা হেসে ফেলল। হঠাৎ তার লজ্জাও হল। ইতস্তত করল খানিক।

তারপর বলল, যাও, একথা বলা যায় না, বুঝে নিতি হয়।

বলেই ভূষণের বুকে মুখ লুকল।

ফিসফিস করে বলল, তুমি কী রকম ডাক্তার গো, ঘরের লোকের রোগ বুঝি তুমার চোখি ধরা পড়ে না?

এগার

গিরিবালা বুঝি এত আনন্দ আর কখনও পায় নি। অথচ নৌকো চড়ার ভয় তার বরাবরের। কিন্তু আজ, এই পরিষ্কার চকচকে দিনটিতে নৌকোয় চড়তে তার তেমন ভয় হচ্ছে না ত।

অথচ সকালে বাড়ি থেকে ওরা যখন বিদায় নেয়, গিরিবালার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। শাশুড়ী শঙ্খকে বুকে নিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন। যেন কেউ মারাটারা গেছে এমনি ভাবখানা তাঁর। বড় জা কেঁদেছেন গিরিবালাকে বুকে চেপে ধরে। গিরিবালা নিজেও কেঁদেছে। না কেঁদে পারে নি। এবার একটানা তিন বছর ছিল এই বাড়িতে। এ বাড়ির সব-কিছুই তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

যতদিন এ বাড়িতে ছিল, ততদিন এর অবহেলা, এর উপেক্ষা তার প্রাণে বড় বাজত। এই বাড়িতে এসেই গিরিবালা টের পায় অভাব কাকে বলে। বাপের বাড়িতে তাকে কখনও না খেয়ে থাকতে হয় নি, চালের পিত্যেশে উনুন কোলে করে বসে থাকতে হয় নি। এ বাড়িতে ওসব যেন ইদানীং নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠেছিল। ঈর্ষা দ্বেষ কাকে বলে, এ বাড়িতে এসে তার পরিচয়ও পেয়েছে গিরিবালা। তার শখ-সাধের শাড়িগুলো একখানা একখানা করে ছিঁড়েছে, গহনাগুলো এক এক করে অদৃশ্য হয়েছে। অনেক সময় পালাই পালাই করে তার মন অস্থির হয়ে উঠেছে। তবু কী আশ্চর্য, এ বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় হলে দেখল, সে খুব কষ্ট পাচ্ছে। বাপের বাড়ি ছেড়ে আসবার সময় সে যেমন কষ্ট পেয়েছিল, অবিকল তেমনই ব্যথা।

যে-যুথিকে সে দেখতে পারত না মোটে, সেই যুথির জন্যও সে দেখল তার প্রাণ পুড়ছে। আর মনে পড়ল চম্পির কথা। দুরন্ত অভিমানী সেই মেয়েটা, যে বিয়ের পর বিদায় নেবার সময় এক ফোঁটা কাঁদে নি, যে অষ্টমঙ্গলায় এসে দু দিনের মাথায় আবার ফিরে গিয়েছে শ্বশুরবাড়ি, আর আসেও নি, চিঠি-চাপাটিও লেখে নি।

নৌকো একটু দুলে উঠতেই গিরিবালা চমক খেল। দেখল একটা পুলের তলা দিয়ে নৌকোটা যাচ্ছে। একটু আগেই ছেড়েছে নৌকোখানা। ঝিনেদার সীমানা এখনও ছাড়ায় নি।

ভূষণও খুব খুশী। তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অবশেষে সে অনড় জীবনের শিকড় ছিঁড়তে পেরেছে। বেরিয়ে পড়েছে পথে। এখন আপাতত সে শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছে গিরিবালাদের রাখতে। ওখান থেকে সে যাবে কলকাতায়। সেখান থেকে শ্রীহট্ট। শ্রীহট্ট যাবার আগে সে এসে গিরিবালাদের নিয়ে যাবে শ্বশুরবাড়ি থেকে। এই ঠিক করেছে ভূষণ। এতে সে গিরিবালার সম্মতিও পেয়েছে।

পুলের তলা দিয়ে ওরা যাচ্ছে আর উপর দিয়ে যাচ্ছে বেতো ঘোড়ার এক্কা। ভূষণের চোখের উপর দিয়েই এই পুলটা তৈরী হয়েছে। দেখতে দেখতে বছর পঁচিশেক হয়ে গেল।

ভূষণ গিরিবালাকে বলল, এই পুলের উপর দিয়ে চম্পির শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়।

গিরিবালা অমনি ছইয়ের বাইরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ভূষণ বলল, এই পুলটা কে বানিয়েছেন জান? যতীনদা। বাঘা যতীন।

গিরিবালা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ভূষণের দিকে। যতীন নামে তার কোন ভাসুর আছে, সে ত তা শোনে নি এর আগে।

ভূষণ বলল, বাঘা যতীনের নাম শোন নি?

গিরিবালা ঘাড় নেড়ে জানাল, না। ভূষণ তার অজ্ঞতায় হাসতে লাগল।

বলল, দেশসুদ্ধু ছেলেবুড়ো তাঁর নাম জানে, আর তুমি জান না? তুমি কী গো?

গিরিবালা এবার সত্যিই লজ্জা পেল।

জিজ্ঞাসা করল, কী করেন ভাসুর ঠাকুর?

ভাসুর ঠাকুর !

ভূষণের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল।

কার কথা বলছ ?

আহা, ভূষণ যেন কী। নাম করতে পারে নাকি গিরিবালা ?

ওই যে তুমার যে দাদার কথা বলতিছ। যিনি এই পুল বানায়েছেন।

শোনামাত্র ভূষণ হা-হা করে হাসিতে ফেটে পড়ল।

ভাসুর ঠাকুর। বাঘা যতীন ভাসুর ঠাকুর। হা-হা-হা।

গিরিবালা আরও বোকা বনে গেল। কেন, উল্টোপাল্টা কিছু বলেছে না কি সে ?

কিছুক্ষণ পরে হাসি থামাল ভূষণ।

বলল, তা বলেছ ভাল। ভাসুর ঠাকুরই বটে। একদিক দিয়ে কথাটা কিন্তু ঠিক। আপন-পর ভেদ ছিল না ত তাঁর কাছে।

ভূষণ গম্ভীর হয়ে গেল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। তার মন স্মৃতির পাখায় ভর করে পিছিয়ে চলল।

বলল, জানো, ওঁরা সব দারুণ লোক। দেশকে উদ্ধার করার ব্রত নিয়ে ওঁরা এসেছিলেন। দেশের কাজেই আত্মোৎসর্গ করেছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ভূষণ। নৌকোটা বাঁক নিয়েছে ততক্ষণে। পুলটা চোখের আড়াল হয়ে গিয়েছে।

ভূষণ ধীরে ধীরে বলতে লাগল, আমরা তখন ইস্কুলে পড়ি। যশোর-ঝিনেদা রেলের ঝিনেদার স্টেশন-মাস্টারি করেন মেজদা। আমি সেই বাসাতেই তখন থাকি। পাশের বাসাতেই থাকেন যতীনদা। ওঁর বউকে বউদি বলতাম। বড় মেয়ের কথাও মনে আছে আমার। মহেশপুরে বিয়ে হয়েছিল তার। নাম ছিল আশা। এতদিনে নিশ্চয়ই সে মস্ত গিন্নীবান্নি হয়ে উঠেছে। যতীনদা তখন কন্ট্রাক্টারি করেন। ওই যে পুলের কথা বললাম, ওই শৈলকুপো যাওয়ার পুলটা তখন তৈরি করছেন তিনি। অমন দশাসই চেহারা আমি আর দেখি নি। হাফপ্যাণ্ট হাফশার্ট পরে, সোলার টুপি মাথায় দিয়ে কাজকর্ম তদারক করে বেড়াচ্ছেন, তাঁর এই চেহারাটাই সর্বক্ষণ চোখে ভাসে আমার। বাঘা নাম হয়েছিল কেন জান ?

ভূষণ একটু থামল। তার গলাটা ভারী হয়ে এসেছে। সাফ করে নিল গলাটা।

বলল, শুধু হাতে, গাড়ুর বাড়ি মেরে তিনি বাঘ মেরেছিলেন। বাঁ হাতের কনুই বাঘের মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে ডান হাতে গাড়ু ধরে মেরেছিলেন ঘাই। তাতেই আস্ত একটা বাঘ অক্কা পেয়েছিল। আমরা তাঁর কনুইয়ে বাঘের কামড়ের দাগ দেখেছি। আমাদের তিনি ব্যায়াম শেখাতেন। মাঝে মাঝে আবার মজাও দেখতেন। আমাদের চিত করে ফেলে দিতেন মেঝেয়, তারপর চেয়ারে বসে এক পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে এক এক করে আমাদের পেট ঠেসে ধরতেন, বলতেন, ওঠ্, উঠে পড়্। কিন্তু তাঁর সঙ্গে গায়ের জোরে আমরা পারব কেন! কেউই আমরা উঠতে পারতাম না। তিনি বলতেন, হাল ছাড়িস নে, শক্তি সঞ্চয় কর্। এমনি করে আমাদের সবাইকে যারা বুটের চাপে দাবিয়ে রেখেছে, তাদের ত একদিন উল্টে ফেলে দিতে হবে। গায়ে জোর কর্, গায়ে জোর কর্। তখন আমরা ছোট। ওসব হেঁয়ালির কথা কি বুঝি! তবু তাঁর কথা শুনে আমরা পরমানন্দে শরীর তৈরি করতে লেগে গিয়েছিলাম। তারপর একদিন শুনি যতীনদা উধাও। কেউ তাঁর কোনও খোঁজই পেল না। বউদিরা বাসা তুলে দিয়ে বোধ হয় বাপের বাড়িই চলে গেলেন। তার প্রায় এক বছর পরে একদিন কী হৈ-হৈ। শুনলাম, বালেশ্বরে জন চারেক সাগরেদ নিয়ে যতীনদা ইংরেজদের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

ভূষণ চুপ করল। বর্ষা অকালে শেষ হয়ে আসছে নাকি? আকাশ যেন এরই মধ্যে শরতের আগমনী-বার্তা শোনাতে শুরু করেছে। এই চকচকে রোদ, মুহূর্তে একটা জলভরা কালচে মেঘ তাকে একটুক্ষণের জন্য ঢেকে দিয়ে ভেসে চলে গেল। জলো হাওয়া বইছে। ভরা নদী, এখানে ওখানে দু-চারটে করে লাল শালুক মুখ বাড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে ভিখারী চিল করুণ স্বরে ডাক দিয়ে জেলেদের কাছে কাছে উড়ে বেড়াচ্ছে।

সব দুঃখ বেদনা ছাপিয়েও আনন্দের রঙ গিরিবালার মনে লাগছে। সে এটা চেপে রাখতে পারছে না কিছুতেই। শঙ্খ সেই থেকে ঘুমুচ্ছে। ভূষণ উদাস চোখে ভাবছে। একটা মাঝি হাল ধরে বসে তামাক খাচ্ছে। কড়া তামাকের গন্ধ ছইয়ের ভিতর ঘুরপাক মারছে। অন্য মাঝিটা নদীর পাড় দিয়ে গুণ টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কখনও তাকে দেখা যায়, কখনও সে মিলিয়ে যায়।

ধোপাঘাটের বাঁক পার হয়ে এসেছে তারা। পরহাটির কাছে এসে

পড়েছে। ওই যে ওপারে ছলিমুল্লা চৌধুরীর বিরাট বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। নদীর ভিতর থেকে বাড়িটা যেন গেঁথে তোলা হয়েছে। কে ছলিমুল্লা চৌধুরী, কতকালের বাড়ি এটা, তা জানে না গিরিবালা। এই গ্রামের নামটাও সে শুনেছে, মনে নেই। কিন্তু ছলিমুল্লা চৌধুরীর বাড়ি তার মনে অক্ষয়ভাবে খোদাই হয়ে গেছে। বাড়িটা দেখে কেমন যেন গা-ছমছম করে গিরিবালার। সেই ছোটবেলাতেও করত, এখনও করছে।

বাকড়ির বাঁকে গিয়ে মাঝিরা নৌকো বাঁধল। একটু জিরোবে ওরা। খাবে। তারপর ছাড়বে নৌকো। বাপের বাড়ির ঘাটে পৌছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। গাড়িতে গেলেই হত। ভূষণও প্রথমে তাই ভেবেছিল। কিন্তু এই নৌকোখানা যার, সে-ই বাদ সাধল। সে বুঝি ভূষণের রোগী। অনেক চিকিৎসা করেছে ভূষণ। ওরা পয়সাকড়ি দিতে পারে নি। ভূষণ দেশ ছেড়ে চলে যাবে শুনে জলভরা চোখে দেখা করতে এসেছিল তার সঙ্গে। তারাই জোর করল, গতরে খেটে ভূষণের ঋণ কিছুটা শোধ দেবে বলে।

ভূষণ ওদের খাওয়াতে নিয়ে গেল। গিরিবালার মনও অস্থির হয়ে উঠেছে। এখনও অনেকটা পথ বাকী। বাকড়ি ছাড়ালে হরিশঙ্করপুর। মাধববাবুর বাঁধানো ঘাট। এখানকার ইস্কুলে সুধাময় পড়ত। তার ছোট মামা ছিলেন হেডমাস্টার। তারপর পড়বে বোসেদের ঘাট। কে পি বোসের অ্যালজেবরা না কী, সেই তাদের ঘাট। কে পি বোসকেও চেনে না গিরিবালা, অ্যালজেবরা সাপ কি ব্যাঙ তাও জানে না, তবু শিশুকাল থেকে যতবার এই পথে সে গিয়েছে, ততবার কথাটা শুনেছে। শুনতে শুনতে তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

হরিশঙ্করপুর ছাড়ালে আরপারে মধুপুরের ঘাট। কুঠির সাহেবের মেম থাকে সেখানে। সেই হল অর্ধেক পথ। মধুপুরের পর গোবিন্দপুর, সুতুলে, ওপারে কড়ইতলা। কড়ইতলার কালী খুব জাগ্রত। কড়ইতলার পর পলেনপুর, তারপর পাইকপাড়া। পাইকপাড়ার উল্টোপারে লোহাজাঙ্গা। গোপাল বিশ্বেসদের বাড়ি। ঘাটের উপরই নবীন তাঁতির ঘরখানা। অনেক সময় নৌকোর থেকে তার গানও শোনা যায়। ছোটকাকার খুব বন্ধু। এই লোহাজাঙ্গার ঘাট পার হয়ে খানিকটা এলেই তাদের গ্রামের কামারদের ঘাট।

ভূষণরা গেল যে সেই গেলই। ফেরার ত নামগন্ধও নেই। নৌকো

বাঁধা থাকায় হাওয়া চলছে না। গলগল করে ঘামছে গিরিবালা। শশ্বও উঠে পড়ল। সে ত প্রায় চান করে উঠেছে। গিরিবালা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

এমন সময় ভূষণ রসগোল্লা, দই, চিঁড়ে, সবরি কলা নিয়ে হাজির হল।

বলল, খিদে পেয়েছে নাকি? এস, এগুলো খেয়ে নিই।

পাগল হয়েছে নাকি ভূষণ! মুসলমানের নৌকোয় চড়েছে না তারা। ভূষণের কোন বাছবিচার নেই, সে খাক। গিরিবালা বাড়ি গিয়ে চানটান না করে একটা দানাও কিছু মুখে দেবে না।

মুখে বলল, তুমি খাও। আমার খিদে পায় নি।

বলেই গিরিবালা একপাশে শুয়ে পড়ল। শুতে-না-শুতেই ঘুম এসে গেল তার।

গিরিবালার বাপের বাড়ির ঘাটে যখন ওদের নৌকো লাগল, তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। বর্ষাকালের লম্বা বেলা শেষ হতে বেশ সময় লাগে। ঠিক ওদের নৌকোর পাশ ঘেঁষেই আরেকখানা ছইখোলা নৌকো বেগে এসে ঘাটে লাগল।

উত্তেজিতভাবে কারা তাতে কী সব বলাবলি করছে।

একজন বলল, মুক্তার মিঞা যখন রেফারী হইছে তখনই জানি নাড়ে শালারা আজ জেতবে।

আর-একজন বলল, জেতান বের করে দিতাম, শালা পীর মহম্মদ আমাগের ফকবেডারে যদি ঘায়েল না করত।

এক মাঘে শীত পালায় না, ওই পীর মহম্মদের ঠ্যাংউ ভাঙব, এই তোরে কলাম।

শালারা আজ ত খেলতি আসে নি, কা'জে বাধাতি আইছিল। লাঠি-সোটা নিয়ে কেউ ম্যাচ খ্যালাতি আসে!

আসুক না ইবার আমাগের মঠে, পুঁতে ফ্যালব শালাগের।

চলেক, গুপাল খুড়রি আজ ত জানাই ব্যাপারটা।

গোটা কতক ছেলে লাফিয়ে লাফিয়ে নামল নৌকো থেকে। একজনের হাতে একটা ফুটবল। কানে বিড়ি গোঁজা।

সে ছোকরা গিরিবালাকে দেখেই থমকে দাঁড়াল।

আরে বাস্, এ যে দেহি বড়দিদি। একেবারে দুগ্‌গো ঠাকরুনির মত চিহারা করে ফেলিছ যে!

বলেই ফুটবল বগলে করেই টিপিস করে একটা প্রণাম করল গিরিবালাকে।

গিরিবালা বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, অ মা, নরা! কত বড়ডা হয়ে গিছিস! গিছিলি কনে?

নরা ভূষণের দিকে একবার চেয়ে গর্বের সঙ্গে জবাব দিল, ম্যাচ খেলতি। আজ মধুপুর পলেনপুর খেলা ছিল কিনা। পলেনপুব আমাগেরে হায়ার করে নিয়ে গিছিল।

গিরিবালার খুশিভরা অবাক চোখের সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল নরা।

বারো

ইস্কুলের ছুটি অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। মাস্টার মশাইরা সকলেই চলে গিয়েছেন। সাগব অ্যাবাডোমির হেডমাস্টারের ঘবখানা ছাড়া ইস্কুলবাড়িব আর সব ঘরের দরজা বন্ধ করে শ্রীকণ্ঠ বেহারা বারান্দায় বসে ঢুলছিল। মেজবাবু কখন বাড়ি যাবেন কে জানে?

ইস্কুলের মাঠে খেলাব তোড়জোড় শুরু হয়েছে। হঠাৎ ইস্কুলের ঘণ্টায় ঢং করে শব্দ হতেই ধড়মড় করে জেগে উঠল শ্রীকণ্ঠ। দেখল, কেউ কোথাও নেই, ঘণ্টাটা দুলছে। নীচে একখানা ঝামা ইট পড়ে আছে। শ্রীকণ্ঠ বেজায় চটে গেল। দৌড়ে নীচে নেমে এল, আনাচ-কানাচ খুঁজল, কাউকে পেল না।

খেলার মাঠের দিকে এগিয়ে যেতেই থার্ড ক্লাসের গোটা আষ্টেক ছেলে ওকে দেখে তালি বাজিয়ে গান গাইতে শুরু করে দিল: 'ড়সবতী তু কুঁয়াডে যাউছি, পাযেতে খড়মড গলাতে চন্দ্রহাড় নাকেতে বেসড় ঝুলাউছি।'

শ্রীকণ্ঠ কটকের লোক। কিন্তু ও বুড়ো হয়ে গেল এ-অঞ্চলেই। আগে ও পালকি বইত। তারপর বহুদিন ধরে হরিশঙ্করপুর ইস্কুলে দপ্তরীর কাজ করেছে। বয়েস হলে কাজ ছেড়ে বাড়িতে বসে ছিল। শেষে এই ইস্কুল-টার পত্তন হতে, বছর তিনেক ধরে এখানকার কাজেই লেগে আছে।

হরিশঙ্করপুরের ইস্কুলটা ছিল বড়। হাই ইস্কুল। আর সাগর অ্যাকাডেমি হচ্ছে এম-ই—মিডিল ইস্কুল। মেজবাবু হেডমাস্টারও বটেন, সেক্রেটারিও বটেন। তা মেজবাবুর সম্পর্কে কোন নালিশ নেই শ্রীকণ্ঠের। তার অভিযোগ এই ইস্কুলের যত হতভাগা বদমায়েশ, গুণ্ডা, বাঁদর ছেলেদের বিরুদ্ধে। সুযোগ পেলেই ওরা শ্রীকণ্ঠকে ক্ষেপিয়ে মারে।

শ্রীকণ্ঠ তাড়া করতেই ওরা দৌড়ে পালাল। তবে আবার একটু দূরে গিয়ে হাততালি দিতে দিতে গান শুরু করল: 'ডসবতী তু কুঁয়াড়ে যাউছি, পায়েতে খড়মড় গলাতে চন্দ্রহাড় নাকেতে বেসড় ঝুলাউছি।'

শ্রীকণ্ঠ খানিকক্ষণ ছুটাছুটি করে শ্রান্ত হয়ে হার মানল। বিড় বিড় করে বকতে বকতে ফিরে এল। নালিশ করবার জন্য মেজকর্তার ঘরে ঢুকে দেখল, একখানা খোলা চিঠি চাপা দিয়ে রেখে মেজকর্তা গম্ভীরভাবে কী যেন ভাবছেন। শ্রীকণ্ঠ তাঁকে আর বিরক্ত না করে বাইরে গিয়ে বসল।

মেজকর্তা দুখানা চিঠি পেয়েছেন সেদিন। একখানা ডিস্ট্রিক্ট ইস্কুল ইন্সপেক্টারের, আর-একখানা সুধাময়ের। ইন্সপেক্টারের চিঠিখানা পড়ে বিরক্ত হয়েছেন তিনি। বিরক্ত হবার কারণও আছে। এত খেটে ইস্কুলটা গড়ে তুলতে চাইছেন তিনি, কিন্তু একটার পর একটা প্রতিবন্ধক এসে তাকে কাহিল করে দিচ্ছে। মকর বিশ্বেসই যদিও সব থেকে বেশী টাকা দিয়েছে, তবুও মেজকর্তা গ্রামের আরও অনেকের কাছ থেকে এর জন্য সাহায্য আদায় করেছেন। কেউ জমি দিয়েছে, কেউ বাঁশ-খড়, কেউ বা শারীরিক পরিশ্রম। সাহায্য কেউ কি করতে চায়! এদেশের লোক ঘেঁটুপুজোয়, মনসাপুজোয় ঘটা করে টাকা খরচ করে, এমন কী সরস্বতীপুজোতেও কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালতে রাজী, কিন্তু ইস্কুল গড়ার ব্যাপারে উপুড়হস্ত করতে চায় না। যা হোক তবুও ত কিছু কিছু তাদের কাছ থেকেও আদায় করেছেন। কিন্তু মেদ্দা ছাহেবের ব্যবহারেই সব থেকে বেশী আঘাত পেয়েছেন মেজকর্তা। মেজকর্তার এই কাজে শরিক হয় নি মেদ্দা।

মেজকর্তার ইচ্ছা ছিল, সবাইকে নিয়েই এই ইস্কুলটা গড়ে তুলবেন। এম-ই ইস্কুল নয়, মেজকর্তার ইচ্ছে ছিল একেবারে হাই ইস্কুলের ভিত পত্তন করা। গোপাল বিশ্বাসের ইচ্ছে ছিল না, মেদ্দা ছায়েবকে এর মধ্যে মাথা

গলাতে দেয়। কিন্তু মেজকর্তার দৃঢ়তা এবং মকর বিশ্বেসের চাপে গোপালও শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছিল।

মেজকর্তা তারপর মেদ্দার কাছে গিয়ে প্রস্তাবটা করেন। একটা ইস্কুলের যে দরকার তাঁদের গ্রামে, মেদ্দা ছাহেব সে-কথা স্বীকার করেছিলেন। এও জানিয়েছিলেন যে, এমন একটা বাসনা মেদ্দা ছাহেবের মনে বহুকাল থেকেই আছে। শুনে উৎসাহ বোধ করছিলেন মেজকর্তা। অনেক আলোচনা, অনেক বৈঠক হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই দাঁড়াল না। মেদ্দা ছাহেব একটার পর একটা এমন সব শর্ত করতে লাগলেন, যার কোন মানে নেই। তুচ্ছ সমস্ত ব্যাপার এদের কাছে দারুণ গুরুত্ব নিয়ে হাজির হতে লাগল।

প্রথম ফ্যাকড়া উঠল নাম নিয়ে। সাগর অ্যাকাডেমি নামটা মেদ্দা ছাহেবের পছন্দ নয়। মেদ্দা ছাহেব স্পষ্টাস্পষ্টি মেজকর্তাকে কিছু বলেন নি। কিন্তু নানান রকমে তাঁর আপত্তিটা বুঝিয়ে দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তা কী করে হয়? মকর বিশ্বেস টাকা দিয়ে ইস্কুল করে দিচ্ছেন তাঁর বাবার নামে। এই শর্ত মেনে নিয়েই মেজকর্তা কাজে হাত দিয়েছেন। অনেক দূর এগিয়েও গিয়েছেন। এখন তাঁকে কী করে বলা যায় যে ইস্কুলের নামটা বদলে দিতে হবে? আর তাতে রাজীই বা হবেন কেন তিনি?

দ্বিতীয় ফ্যাকড়া মেদ্দা তুলেছিলেন ইস্কুলের কমিটি বানাবার ব্যাপারে। তিনি বললেন, ইস্কুল কমিটির মেম্বর অর্ধেক হবে মুসলমান আর বাকী অর্ধেক হবে হিন্দু। আবার হিন্দুদের সংখ্যার ভিতর সিডিউল্ড কাস্টও থাকা চাই।

মেদ্দা ছাহেবের এই প্রস্তাবে গোপালরা খুব গরম হয়ে গেল। মেজকর্তা আকাশ থেকে পড়লেন। এরা যে এর মধ্যে রাজনীতি ঢুকিয়ে ফেলবে, মেজকর্তা সেটা বুঝতে পারেন নি। তাঁর ইচ্ছে ছিল বাছা বাছা কজন লোক নিয়ে ইস্কুল কমিটিটা তৈরি করবেন। ইস্কুলের উন্নতিই হবে এই কমিটির আদি এবং অকৃত্রিম উদ্দেশ্য। মেদ্দা ছাহেবকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন মেজকর্তা। বলেছিলেন, এটা ইস্কুল, ইউনিয়ন বোর্ড নয়, জেলা বোর্ড নয়, কি কাউন্সিলও নয়। ইস্কুল কমিটিতে বেছে-গুছে লোক নিলেই কাজ ভাল হবে।

মেদ্দা ছাহেব সে কথায় ভোলেন নি। বলেছিলেন, তিনি যে কাজই করুন না কেন, মোছলেম দুনিয়ার খেদমত যেন তাতে হওয়া চাই। মোছলেম স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কোন কাজ তিনি জান গেলেও করতে পারবেন না। মেদ্দা এও শুনিয়েছিলেন, এখন মোছলেম দুনিয়ার ঘুম ভাঙতে লেগেছে। নিজেদের অধিকার সম্মান ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁরা খুব সচেতন হয়ে উঠেছেন। বিশেষ যে সব ছোকরা লেখাপড়া শিখছে, তারা। মেদ্দা মাতব্বর হলে কী হবে, কৌমের রায়ের বিরুদ্ধে যাবার কোন ক্ষমতা তার নেই।

আসলে এসব কথা যে মেদ্দার নয়, তার জামাইয়ের, সে কথা বুঝতে দেরি হয় নি মেজকর্তার। মেদ্দাকে তিনি দীর্ঘকাল ধরে চেনেন। তাঁর দুঃখ লাগল, মেদ্দার মত লোকও এই রকম গোটা কতক অসার বুলি পাখী-পড়ার মত করে বলতে শুরু করেছে। আবার তাও কার কাছে? না, তাঁরই কাছে। মেদ্দার জামাই, ওই ফটিক মিঞার সঙ্গেও তার কথা হয়েছে। ছোকরা এখন নামের আগে মৌলভী লিখতে শুরু করেছে। বয়েসে সুধার চেয়ে বড হবে না, কিন্তু এবং মধ্যে সুর গজিয়ে দিব্যি ভারিক্কী হয়ে উঠেছে। ফটকে মিঞা বললে বিরক্ত হয় এখন। এখন সে মৌলভী মোদাব্বের হোসেন। চালু নাম মোক্তার মিঞা।

ওই মোক্তার মিঞাই এখন প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলের মুসলমান-সমাজের মাতব্বর। মেদ্দা ধীরে ধীরে শিখণ্ডীতে পরিণত হচ্ছে। সেই ছোকরাই সি আর দাশের দোহাই পেড়ে গেল মেজকর্তার কাছে। শুনিয়ে গেল হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের কথা। সি আর দাশ নাকি স্বরাজ্য চুক্তিতে কবুল করেছেন, হিন্দু-মুসলমানের স্বতন্ত্রভাবে অধিকার আদায়ের হক আছে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকার করেছেন ব্যারিস্টার নেতা সি আর দাশ। কাজেই সে চুক্তি ইস্কুল কমিটির বেলাতেই বা মান্য করা হবে না কেন? মোক্তার মিঞা মেজকর্তাকে প্রশ্ন করেছিল। তবে কি সি আর দাশের চুক্তি ভুয়া? নাকি হিন্দুরা এখন কথার খেলাপ করছে?

প্রশ্নটার পিছনে জোর ছিল। মেজকর্তা মোক্তার মিঞার মুনশিয়ানা দেখে চমৎকৃতও হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক রাজনৈতিক অবিমৃষ্যকারিতার মারাত্মক পরিণামের কথা ভেবে শঙ্কিতও বোধ করছিলেন। দাশ সাহেব

ইলেকশনের বৈতরণী পার হতে গিয়ে যে বিষবৃক্ষের চারায় সার জল ঢেলেছিলেন, এই দু বছরে তার শিকড় কত দূরে প্রসারিত হয়েছে! অ্যাঁ! দাশ সাহেবের মত ব্যক্তিত্বকেও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপোস করতে হল। কী পেলেন তিনি? কাউন্সিলে একচ্ছত্র মেজরিটি। কিসের জন্য? দলবদ্ধভাবে গবর্নরের কাউন্সিলে বাধা সৃষ্টির জন্য।

মেজকর্তা যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছেন। এই দু বছরে কী করলেন দেশবন্ধু? মন্ত্রীদের বেতন যাতে না বাড়ে, শুধু তাই নিয়ে হৈ-চৈ। এর পরিবর্তে কী দিতে হল? সাম্প্রদায়িকতার বাঘের মুখে মাংসের টুকরো। যে আন্দোলন মানুষের মন থেকে এই হিংস্র বাঘকে চিরতরে তাড়িয়ে দিত, তেমন কোন আন্দোলন গড়ে উঠল না কেন? না, তা হলে যে জনতার প্রিয় হওয়া যেত না। অনেক অপ্রীতিকর সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হত যে। ভেল্কি দেখানো যেত না। তাই কোন নেতাই তো সেদিকে পা বাড়ালেন না।

মেজকর্তা আপন মনেই বললেন, সে আন্দোলনে যে উত্তেজনা নেই। উত্তেজনা না ছড়ালে কোন আন্দোলন যে গড়ে তোলাও যায় না। তাতে যে ঘটা করে লোক জমানো যায় না। আর এই অনড় অথর্ব সমাজটার মূল ধরে যে নাড়া দিতে হত তাতে। মেজকর্তা ভাবলেন, তাতে প্রিয় হওয়ার চাইতে অপ্রিয় হওয়ার ভয়ই যে বেশী।

একটা সোজা কথা কেন আমরা ভুলে যাই! বার বার নিজেকেই বলেছেন মেজকর্তা। ভিত যদি আলগা থাকে, তা হলে তার উপর ইমারত গড়ে যত রঙই লাগাই না কেন, সে ইমারতের আয়ু বেশী হতে পারে না। নোনা ইঁটে কি মজবুত দালান বানানো যায়? আমরা হিন্দু, আমরা মুসলমান, আমরা খ্রীষ্টান, আমরা উচ্চবর্ণ, আমরা নিম্নবর্ণ, এই যদি আমাদের পুঁজির প্রধান কড়ি হয়, তবে কতদূর যেতে পারি আমরা? মেজকর্তা অন্তত তার হদিস জানেন না।

আকর থেকে লোহা এনে, সমস্ত আবর্জনা থেকে লোহাটুকু যেমন নিষ্কাশন করে ইস্পাত বানাতে হয়, তেমনি করে সাম্প্রদায়িকতার আবর্জনার মধ্য থেকে ব্যক্তি মানুষকে নিষ্কাশিত করে আনতে পারলে তবেই স্বাধীন সমাজ পত্তন করা সম্ভব। সে বিষয়ে মেজকর্তার মনে কোন দ্বিধা নেই। নেই বলেই তো বুড়ো বয়সের শক্তিটুকু একত্র করে একটা চেষ্টায় নেমেছিলেন। সব দিক থেকে বাধা পেয়ে পেয়ে এখন কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠছেন।

মেজকর্তার ইচ্ছে ছিল, সংস্কারমুক্ত শিক্ষার একটা ঘাঁটি তৈরি করবেন। যে শিক্ষা মানুষকে মানুষের মূল্যে গ্রহণ করবার প্রেরণা জোগাবে, সেই শিক্ষা বিতরণের চেষ্টা করবেন।

তাঁর কলেজী জীবনের চাপা-পড়া স্মৃতি বহুদিন পরে তাঁকে আবার হাতছানি দিয়ে ডাকতে শুরু করেছিল। বার বার শুধু তাঁর দুটি লোকের কথা স্মরণ হতে থাকে। ডিরোজিও আর বিদ্যাসাগর। দুজনেই শিক্ষা-দাতা। শেষ কথা বলার বাতিক ওঁদের কারোরই ছিল না। শিখবার প্রবৃত্তিকে উস্কে দিয়েই ওঁরা কাজ শেষ করেছেন। ওঁদের জ্বালিয়ে-দেওয়া মশালের আলোই আজ আমাদের এতদূরে এগিয়ে এনেছে। মেজকর্তা ভাবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, সে আলো আরও চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা আর হচ্ছে না।

তাই তো তিনি শেষ পর্যন্ত মকর বিশ্বেসের প্রস্তাবে রাজী হয়ে পড়লেন। ইচ্ছে ছিল সকলকে নিয়ে পথ চলবেন। পারলেন কই?

মেদ্দারা সরে পড়ল। সরেই শুধু পড়ল না, মেজকর্তা ইস্কুল খোলবার এক বছরের মধ্যেই মেদ্দারা, একটু দূরে, মোছলেম মিডল মাদ্রাসা খুলল খুব হৈ-চৈ করে। এস ডি ও মুনির হোসেন সাহেবকে নিয়ে উদ্বোধন করাল মোক্তার মিঞা। এস ডি ও সাহেবকে করল প্রেসিডেন্ট, নিজে সেক্রেটারি হল। দশ হাজার টাকা মোছলেম কৌমের তরক্কির জন্য এককালীন দান করে মেদ্দা সরকারের সুনজরে পড়ে গেল। খুব গুজব, এই বছরের নিউ ইয়ারে মেদ্দা যাতে খান সাহেব খেতাব পান এস ডি ও তার জন্য সরকারের কাছে খুব দরবার চালাচ্ছেন। খেতাব পাবার পর হজ্জ্ করতে যাবেন মেদ্দা সাহেব।

কিন্তু এখন, এই নির্জন বিকালে, ছুটির পর ইস্কুলে বসে বসে সেজন্য বিরক্ত হয়ে ওঠেন নি মেজকর্তা। মেদ্দা ছাহেব খেতাব পান, হজ্জে যান, এমন কী মাদ্রাসা খোলার জন্য খয়রাত করাতেও তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ মেজকর্তার অন্তরে নেই। তিনি দুঃখ পেয়েছেন, শঙ্কিতও হয়ে উঠেছেন, একথা সত্য। তবে সে অন্য কারণে। দুনিয়ার হাওয়া যেভাবে বদলাচ্ছে, তা দেখেই কিছুটা হতাশা বোধ করছেন তিনি।

সমস্ত বিচার বিবেচনা ত্যাগ করে সরকার এখন মুসলমান-সমাজকে

মাথায় তুলে নাচতে শুরু করেছেন। পরিণাম ভাল নয় বলেই শঙ্কা জাগছে মেজকর্তার। এ গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রেষারেষি প্রকাশ্য বিরোধিতায় এসে দাঁড়াবে, এ কখনও ভাবেন নি মেজকর্তা।

মুসলমান-সমাজ নতুন প্রভু ইংরেজদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। এখন দ্রুত সে দূরত্ব কমাতে তারা উঠে-পড়ে লেগেছে। হিন্দু-সমাজ পুরনো প্রভু মুসলমানদের বিকল্প বলেই ইংরাজদের কাছে সরে এসেছিল। তাদের ভালমন্দ দোষগুণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেকদিন ধরে আত্মসাৎ করেছে হিন্দু-সমাজ। ইংরাজী-শিক্ষায় শিক্ষিত, নিতান্ত চাকুরিনির্ভর এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি হয়ে উঠেছে হিন্দু-সমাজের মধ্যে। বিশেষ করে বেবানীদের জন্মভূমি এই বাংলাদেশে। কী অদ্ভুত এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়! বিপরীত ভাবধারার শত স্রোতে ভাসা।

মাঝে মাঝে অবাক লাগে মেজকর্তার। ইয়োরোপে একদিন শিল্পবিপ্লব হল, ফরাসী-বিপ্লব হল। পুরাতন কাঠামো ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল এক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। চিন্তায়, কর্মে জীবিকার্জনের উপায়ে যারা একেবারেই নতুন। পৃথিবীর রঙই যারা বদলে দিল। মানুষ সম্পর্কে ধারণার ভূগোল অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামির সংকীর্ণ সীমানা পেরিয়ে বৃহত্তর পরিধিতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। যুক্তি, বিবেক, বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে মানুষের নতুন মূল্য নির্ধারিত হল। ইয়োরোপের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই হল নতুন অর্ঘ্য।

আর আমরাও মধ্যবিত্ত। মেজকর্তা নিজেকে শোনাতে লাগলেন। অতীতের কিছুই বর্জন করি নি আমরা। শুধু একটা নতুন কুর্তা গায়ে চাপিয়ে পুরনো চেহারা ঢাকা দিয়েছি। ইংরেজের মারফত আমরা এই মধ্যবিত্তয়ানা পেয়েছি। যেন মেকেঞ্জি লায়ালের নীলামখানা থেকে কেনা পুরনো সোফা কৌচ দিয়ে মানসচেতনার চণ্ডী-মণ্ডপটা সাজিয়েছি শুধু। তাই আমাদের ব্রাহ্মণত্ব ঘোচে নি, হিন্দুয়ানি যায় নি। তাই প্রতিবেশী হিসেবে বাস করেও মুসলমানদের আমরা মানুষ বলে ভাবতে শিখি নি। এবার মুসলমানও মধ্যবিত্ত হয়ে উঠছে। স্কুল কলেজে ইংরেজী বিদ্যায় হাতেখড়ি নিচ্ছে। আর তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব যত না জাগছে, মুসলমানত্ব তার চেয়েও দারুণ বেগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। উঠতির মুখে সদ্য-লব্ধ সাম্রাজ্য হাতে রাখার জন্য ইংরেজ এককালে হিন্দুতোষণ শুরু করেছিল। এখন পড়তির মুখে এসে

সেই সাম্রাজ্য কোন মতে টিঁকিয়ে রাখবার জন্য সেই ইংরেজ আজ মহোৎসাহে মুসলমান-তোয়াজ শুরু করেছে। স্বদেশ থেকে মানব-প্রেম, ন্যায়, নিরপেক্ষতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এসে ইংরেজ এদেশে বিভেদ, বিদ্বেষ আর ঘৃণার বীজ বপন করছে। অদৃষ্টের কী নিদারুণ পরিহাস!

টেবিলের উপর যে সরকারী চিঠিখানা পড়ে ছিল, সেদিকে চেয়ে তিক্ত হাসি হাসলেন মেজকর্তা।

ডিস্ট্রিক্ট ইস্কুল ইন্সপেক্টার লিখেছেন, আপনার ইস্কুলকে সরকারী স্বীকৃতি আপাতত দেওয়া সম্ভব হইল না। তজ্জন্য দুঃখিত। দুইটি কারণে এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইল:

(১) আপনাদের গ্রামেরই একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, মোসলেম মিডল মাদ্রাসাকে এবার স্বীকৃতি দিতে হইয়াছে। কারণ মাইনরিটি কমিউনিটির মধ্যে শিক্ষার প্রসারের অগ্রাধিকার দানই বর্তমান সরকারী নীতি।

এবং (২) আপনার কমিটি যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বমূলক নয় বলিয়াও আমরা মনে করি। কমিটির পুনর্গঠন সম্পর্কে আপনারা বিবেচনা করিবেন, আশা করি। নিবেদন ইতি, রায় সাহেব আর সি মিত্র, ডি আই অব স্কুলস্।

মেজকর্তা চিঠিখানা আরেকবার পড়ে বিরক্ত হয়ে ড্রয়ারে রেখে দিলেন। এমনই ইস্কুলের অনুমতিও পাওয়া গেল না। বেশ! মেজকর্তা ভাবলেন, কড়া একখানা জবাব বানিয়ে সংবাদে ছাপাতে হবে। আর ইস্কুলটাকে এ বছরই হাই ইস্কুলের স্ট্যাণ্ডার্ডে তুলে দিতে হবে। আমার ছাত্ররা নিজের জোরেই দাঁড়াতে পারবে। দু বছরের মধ্যেও যদি সরকারী স্বীকৃতি না পাই, তবে ছেলেদের হরিশঙ্করপুরের ইস্কুল থেকে পরীক্ষা দেওয়াব। তারপর ধর্না দেব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাছে। আশু মুখুজ্জের দ্বারস্থ হব।

তুমি মেরে আমাকে উড়িয়ে দেবে ভেবেছ! পারবে না। চিঠিখানার উদ্দেশে মেজকর্তা বেশ জোরেই কথাগুলো বলে উঠলেন।

শ্রীকণ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকল।

মেজকর্তা বললেন, কী চাই রে?

শ্রীকণ্ঠ বলল, আপুনি ডাকিলা না কি?

মেজকর্তা বললেন, না তো। হ্যাঁ, শোন্, আমার দেরি হবে, তুই বাড়ি যা। চাবিটা আমাকে দিয়ে যা। লণ্ঠনটা জ্বেলে দিয়ে যাস।

ইস্কুল ইন্সপেক্টারের চিঠিখানা পড়ে মেজকর্তা বিরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সুধাময়ের সুদীর্ঘ চিঠিখানা তাঁকে ভাবিত করে তুলল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ইস্কুলের মাঠে আর ছেলে নেই একটাও। বাজার করে নিয়ে অনেকে হাঠতলা থেকে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে। কারও কারও কথাবার্তা কানে এসে লাগছে। চেহারাগুলো ধীরে ধীরে স্পষ্টতা হারিয়ে ফেলছে। শ্রীকণ্ঠ যাবার সময় লণ্ঠনটা হাতের কাছে রেখে গিয়েছিল। মেজকর্তা সেটা উস্কে নিলেন। তামাক খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। কিন্তু এখানে কোন সরঞ্জাম নেই।

তিন বছর বাড়ি আসে নি সুধাময়। বড়দা, মেজদি, বড় বউ ওর বিয়ের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। মেজকর্তারও ইচ্ছে, সুধাময় এবার বিয়ে করুক। কিন্তু কোথায় সুধাময়? সেই কবে পরীক্ষায় পাস করার খবর দিয়ে লিখেছিল, চাকরির চেষ্টায় সে ব্যস্ত, তাই আসতে পারবে না। তার অনেক দিন বাদে লিখল, শত চেষ্টাতেও চাকরি যোগাড় করতে পারছে না। তারপর কিছুদিন বাদে লিখল, আসাম বেঙ্গল রেলে একটা কাজ পেয়ে সে লামডিং চলল। হঠাৎ কাজে চলে যাওয়ায় বাড়ি আসার সময় পেল না। দু মাস না-যেতেই সে কাজ গেল, সে কথাও জানিয়েছিল কলকাতায় এসে। ব্যস্, আর তার কোন পাত্তাই নেই। কারও চিঠির জবাব দেয় না। কী করছে না-করছে, সে সবও কিছু লেখে না। মেজকর্তা এবার ওকে বিশেষ করে আসতে লিখেছিলেন। আসতে বলার কারণ কী তাও জানিয়েছিলেন। তারই জবাব দিয়েছে সুধাময়। মেজকর্তা প্রায় দু মাস আগে চিঠিখানা লিখেছিলেন আর তার জবাব পেলেন আজ।

সুধাময় স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত বিয়ে করার বাসনা তার নেই। কারণ নিদারুণ অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের মধ্যে সে বাস করছে। কোন চাকরিই সে আর যোগাড় করতে পারে নি এর মধ্যে। পারবে কি না, তাও জানে না। এমতাবস্থায় বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। এর জন্য সুধাময় সকলের কাছেই ক্ষমা চেয়েছে।

বড় বউ শুনলে খুব দুঃখ পাবে। সুধা-অন্ত প্রাণ তার। সুধাময়কে একবার দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। কিন্তু মেজকর্তা সে জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হন নি। ভাবিত হয়েছেন অন্য ব্যাপারে।

সুধাময় লিখেছে :

অনুভব করছি এমন একটা কিছু করার যাতে সব গ্লানির মোচন হয়। নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছি, ইংরেজ যতকাল এদেশে আছে আমাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। আমার দেশে আমি প্রতিষ্ঠা পাব না। আমার দক্ষতা যতই থাকুক, জ্ঞান যত বেশীই থাক, কিন্তু আমি ইংরেজ নই—মাত্র এই কারণেই যোগ্য পদে আমাকে নিয়োগ করা হল না। নিতান্ত অজ্ঞ এক ইংরেজের বাচ্চাকে তিনগুণ মাইনে দিয়ে আমার উপর বসিয়ে দেওয়া হল। সেই অপমানে আমি রেলের চাকরি ছেড়েছি, কিন্তু অপমানের জ্বালা ভুলতে পারছি না। শুধু এই একটি মাত্র ঘটনাই নয়। আরও অনেক দাগ বুকে জমেছে। চাকরি করার মোহ আমার ঘুচেছে। মেজ কাকা, চাকরি আর করব না, এ সিদ্ধান্ত খুব সহজে নিতে পারি নি। জানি আপনারা দুঃখ পাবেন। আপনাদের অনেক আশা ছিল আমার উপর। সে আশা পূর্ণ করতে পারলাম না। বাবার মুখ, মায়ের মুখ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ধিক্কার দেবার জন্য তৈরী হয়ে আছেন তাঁরা। কিন্তু কী করব?

মেজকর্তা চিঠিখানা পড়তে পড়তে দুঃখ পেলেন মনে। না, না, ধিক্কার দেব কেন? যেন সুধাকে সান্ত্বনা জানালেন। তোমার তো দোষ নেই কিছু।

আবার তিনি পড়তে শুরু করলেন :

কিন্তু কী করব? ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট থাকলেই চাকরি পাওয়া যায় না। চাকরি যদি পেতে চাই তা হলে হয় আমাকে ইংরেজ, নয় মুসলমান আর নইলে সি ডউল্‌ড্‌ কাস্ট্‌ হতে হবে।

আহা বেচারা! মেজকর্তার মন সমবেদনায় ভরে উঠল। তিনি পড়ে চললেন : দেশের মুক্তি না হলে, আমার দেশ আমার না হলে, আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাই কাকা, এখন আমি কাজের মত কাজে লাগব, এমন কাজ, যার মূল্য কখনও কমবে না, যার গৌরব ম্লান হবে না। যে পথে আমরা চলেছি, সে পথে ফুলের মালা নিয়ে আমাদের জন্য কেউ অপেক্ষা করে থাকবে না তা জানি। জীবনের জয়গান জল্লাদের শোণিতসিক্ত হাতে যাঁরা রচনা করে গেছেন, তাদের অনুসরণ শ্রেয়।

সুধাময়ের চিঠিখানার নীচের অংশে শব্দে শব্দে যে আক্রোশ ফুটে

বেরুচ্ছে তাই নয়, কেমন একটা স্থূলতার পরিচয়ও সর্বত্র ছড়ানো। পরিষ্কার অর্থই বা কী? কী করতে চায় সুধাময়?

একটা জিনিস বোঝা গেল, সুধাময় আবার দেবতা বদলেছে। স্পষ্টই লিখেছে: কাউন্সিলে ঘটা করে ঢুকে বিরোধিতা-বিরোধিতা খেলায় ইংরেজের শাসন টলানো যাবে না, অহিংসার নির্বীর্য প্রতিরোধেও মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের আসন তিলমাত্র সরানো যাবে না। সভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে 'স্বরাজ চাই, স্বরাজ চাই' বলে চেঁচালেও ইংরেজ স্বরাজ দিয়ে দেবে না। ইংরেজকে তাড়াবার ভাষা একটিই আছে, বুলি নয়—গুলি, একথা যাঁরা বলেন তাঁরা আমার নমস্য।

না, সুধাময় কোন অস্পষ্টতা রাখে নি। নূতন দেবতা প্রতিষ্ঠা করেছে, সে কথা বোঝাই যাচ্ছে। অসহিষ্ণু, একালের ছেলেরা বড্ড অসহিষ্ণু। মেজকর্তার মনে পড়ল তাঁর কলেজী জীবনের কথা।

তখন তাঁদের মনেও দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এমন ক্ষিপ্ততার মধ্য দিয়ে নয়। উত্তেজনা যে কম ছিল তাও ত নয়। মেট্রোপলিটন কলেজে গিয়ে যেবার তিনি ভর্তি হলেন, সেইবারই কী দারুণ হৈ-চৈ হয়ে গেল সুরেন বাঁড়ুজ্জেকে নিয়ে! ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে সুরেন্দ্রনাথকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তাই নিয়ে ছাত্রমহলে কী সাংঘাতিক আলোড়ন! সি আর দাশ তখন শুধুমাত্র চিত্তরঞ্জন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। কলকাতার অবিসম্বাদী ছাত্রনেতা। তাঁর পোশাক-আসাকের বাহার দেখেই গ্রামের এই লাজুক ছাত্রটির তখন চোখ ছানাবড়া হয়ে যেত। তখন ছিল স্টুডেণ্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিপত্তি। গরম গরম বক্তৃতা তখনও শুনেছিলেন মেজকর্তা। পরাধীনতার গ্লানি অন্তরে বেজেছে। তবু যেন ইংরেজের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ তখন জেগে ওঠে নি।

বিশ্বাস ছিল তার ন্যায়বিচারের প্রতি। তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যারা মনে করতেন ইংরেজের সংস্পর্শে এসে নতুন ভাবধারায় দীক্ষিত হয়েছি আমরা। আমরা উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারলে, আমাদের ভাগ্য গড়বার অধিকার আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে পেয়ে যাব। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, মানবতার উদার বন্ধনে দুটো দেশের

মনে রাখী বাঁধা হবে। ভারত আর ইংলণ্ড, এ তো শুধু মাত্র দুটো পৃথক ভৌগোলিক সীমানা নয়, দুটো সভ্যতার প্রতীক।

মেজকর্তা ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন। তিনি জানেন, সভ্যতা কোন বিশেষ জাতির বা দেশের রপ্তানিযোগ্য মাল নয়। সভ্যতায় সমগ্র মানবজাতিরই অধিকার আছে। পৃথিবীর যে কোনও কোণেই সভ্যতার উন্মেষ হোক না কেন, তার প্রসাদ মানুষ মাত্রেরই প্রাপ্য। এ-অধিকার থেকে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারবে না। ভারত একদিন সভ্যতার শীর্ষে উঠেছিল। একদিন আবার সে ধীরে ধীরে নেবে গেল। উঠল আরব সভ্যতা। তার কাজ শেষ করে সে বিদায় নিল। ইয়োরোপীয় সভ্যতার পুনর্জাগরণ হল। ভারতীয় সভ্যতার সুকৃতির বহু ফল আরব সভ্যতা আত্মস্থ করেছিল, আরব সভ্যতার অনেক রোশনাই ইয়োরোপের নতুন সভ্যতার উন্মেষে সাহায্য করেছে। ইয়োরোপীয় সভ্যতার একটি ধারাই ইংরেজ আবার বয়ে এনেছে। তাই তো আশা হয়েছিল, এই নতুন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতের জড়ত্ব ভাঙবে। ছোট ছোট নিষেধের বন্ধনে যে বিরাট মানবাত্মা সতত পীড়িত হচ্ছিল এদেশে, নবীন স্রোতের বিরাট প্লাবনে সেসব বাধা বন্ধ ঘুচে যাবে।

কিন্তু সে আশা সফল হয় নি। শিক্ষকের ভূমিকার চেয়ে ইংরেজ শাসকের ভাবনার প্রতিই পক্ষপাত বেশী দেখাল। এতে সে জগতের ক্ষতিই শুধু করে নি, নিজেকেও অনেক দীনতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। নিজের সভ্যতা, নিজের সংস্কৃতির প্রতিই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! গণতন্ত্রের প্রবক্তা ইংরেজ ভণ্ড বলে পরিগণিত হয়েছে।

আপাতাববোধিতার জন্য ইংরেজ যে এদেশে কত দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যে ইংরেজী শিক্ষা এককালে সমগ্র ভারতে একাত্মবোধের জন্ম দিয়েছিল, সেই ইংরেজী শিক্ষাই এখন 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুলে'র চক্রান্তে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা আর প্রাদেশিকতার জন্ম দিচ্ছে। এমন দিন আসবে, মেজকর্তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আসবেই, যখন এই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরাই সমস্ত রকম সঙ্কীর্ণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে। গোঁড়ামির ধারক-বাহক এবং প্রচারক হবে।

এদেশের চিন্তারাজ্যে যে অগ্নি-সংস্কার হওয়া উচিত ছিল, ইংরেজ তা ঘটতে দেয় নি। সে পুরাতনের সঙ্গে সর্বতোভাবে রফা করেছে। তাই

অধ্যাত্মবাদের জীর্ণ খোলস এখনও আমরা আঁকড়ে ধরে বসে আছি। শিল্প-বিপ্লবের প্রসার হতে ইংরেজ দিল না, দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের দ্বারা যে ইংরেজ নিজের দেশে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ করল, জীবিকা অর্জনের নতুন উপায় বের করল বিজ্ঞানের কল্যাণে, সেই ইংরেজই ভাবতে গাঁটছড়া বাধল সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে। রফা রফা রফা। স্বভাবজ বানিয়া বুদ্ধির নির্দেশে ইংরেজ শুধু রফাই করে গেল। নইলে নিজের পণ্য এদেশে যে বেচা যায় না।

নিজের দেশে যে ইংরেজ আইনের রাজ প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই ইংরেজ 'রুল অব ল' ছেড়ে ভারত শাসন শুরু করল 'রেগুলেশন লাঠি'র দাপটে। নিজেকে বার বার অস্বীকার করেছে ভারতের ইংরেজ প্রতিনিধিরা।

যে লিবারেল ভাবধারা এদেশে উনিশ শতকে জন্মগ্রহণ করেছিল, ইংরেজ তাকে বুঝতে পারে নি। অবহেলা উপেক্ষায় তার পরিপুষ্টির অভাব ঘটিয়েছে। এবং তার ফলে উগ্র হিংস্র ইংরেজ-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে এদেশে। সুধাময়দের রক্তে বিদ্বেষের সেই আগুনই বুঝি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে আবার। এরই নাম কি প্রতিফল?

মেজকর্তার চোখের উপর কত আন্দোলন হয়ে গেল, কত ঝড় বয়ে গেল। বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী, সন্ত্রাসবাদ, নন-কো-অপারেশন, সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স—নরম গরম অনেক আন্দোলন। কত রকম দাবি উঠল। হোমরুল, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস। এখন 'স্বরাজ চাই'তে এসে ঠেকেছে।

দেশে নাড়া যে পড়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই মেজকর্তার। সন্দেহ আছে এই নাড়ার পরিণাম সম্পর্কে। বিদ্বেষের আগুন শুধু পরকে পুড়িয়েই থামে না, নিজের মুখও যে পোড়ায়। সম্ভবত সে কথা বোঝবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে সুধাময়। সুধা তো ছেলেমানুষ। মগজের চেয়ে রক্তের তেজেই বেশী বিশ্বাস তার। সুধাময় না হয় ছেলেমানুষ। কিন্তু নেতারাও কি একই ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছেন না?

গতকালের অমৃতবাজারে লিখেছে, মেজকর্তা পড়ছিলেন, গোলটেবিল বৈঠকের কথাবার্তা চলছে। ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস যদি নাই দাও, তবে ওরই কাছাকাছি, দায়িত্বশীল সরকার একটা গঠন করতে দাও, আপাতত তাতেই চলবে। নেতাদের নাকি এখন এই ভাব।

সুধাময়রা ওতে সন্তুষ্ট নয়। উগ্রতর পথ অবলম্বনের কথা ওরা ভাবছে। মেজকর্তা অন্য কথা ভাবছেন। রাজনীতিক চেতনা আমাদের যতদূর

বিকশিত হবার তা তো হয়েছে। সামাজিক চেতনা আমাদের সেই তুলনায় এগিয়েছে কি? রাজনৈতিক পরিবর্তনে দেশ খানিকটা এগোয়, মানুষ এগোয় সামাজিক পরিবর্তনে। সম্ভবত একথা বোঝার মত ধৈর্য আজ আর কারোর নেই।

নাঃ, সুধা চিন্তায় ফেলেছে তাঁকে। ওর সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। কলকাতায় শেষ পর্যন্ত কি তাঁকে যেতেই হবে? হবে বইকি। সুধার এই চিঠির পর কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায়!

নরা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, মাজেবাবু, বড়দি আর জামাইবাবু আয়েছেন।

মেজকর্তার মাথায় সুধাময়ের কথাই ঘুরছিল। চমকে উঠলেন।

সুধা এসেছে?

নরা বলল, না, বড়দি আর জামাইবাবু আর তিনাগের ছাওয়াল। বাবু, বড়মা কয়ে দেলেন, বাজার করে নিয়ে যাতি হবে আপনারে। ঘরে ত সব বাড়ন্ত হয়েছেন।

মেজকর্তার বুকটা হঠাৎ খুশির ঢেউয়ে তোলপাড় করে উঠল। হঠাৎ গিরিবালারা এল কেন? আগে ত লেখে নি কিছু!

নরাকে বললেন, আলোটা নিবো। দরজায় তালা দে। চল্, যাই।

তেরো

লেডি কুকুরের বাচ্চা দুটো বড় অসভ্য। একটুও কথা শুনছে না। শঙ্খ অনেক কষ্টে ওদের জন্য একটা নৌকো যোগাড় করেছে। নৌকো মানে সুপারি গাছের আস্ত একটা ডেগো। গোড়ার দিকটা ডোঙা মতন। সেইটে হল শঙ্খর নৌকো।

অবশ্য এ নৌকোর আবিষ্কর্তা শঙ্খ নয়, নরা। নৌকো চড়ে মামাবাড়ি এসে, নৌকো চড়ার শখ চেপেছে শঙ্খর। দিন চারেক বায়না ধরবার পর হঠাৎ নবার মাথায় বুদ্ধি খেলেছে। সুপারির ডেগো কুড়িয়ে এনে তার ডোঙায় শঙ্খকে বসিয়ে উঠনময় টেনে নিযে বেড়িয়েছে তাকে।

নে, কত নৌকো চড়বি চড়্। বাবুদের বাগানে সুপুরি গাছের অভাব নেই।

শঙ্খ খুশীই হয়েছে নৌকো চড়ে। কিছুক্ষণ আগেও নরা তাকে টেনে বেড়িয়েছে। একটু আগে বাজার আনতে গেল। শঙ্খ অমনি একা হয়ে গেল। একা একা সে থাকতে চায় না। তার খুব খারাপ লাগে। এ বাড়িটা কেমন বড় বড়। এ বাড়িটার চারিধারে কেমন বন জঙ্গল। শঙ্খর ভয় ভয় করে, গা ছম ছম করে। বড় ভীতু। একা থাকতে ভয় পায়।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। সে একটু ভিজল। ভালই লাগছিল। আরেকটু ভিজলে আরও ভাল লাগত। কিন্তু মাসি চেঁচামেচি করল। দিদা ছুটে এল। তাকে উপরে তুলে নিয়ে গেল। আঁচল দিয়ে তার মাথা মুখ মুছিয়ে দিল দিদা। দুধ খেতে দিল। দুধ খেতে তার ভাল লাগে না। কেমন জল জল। বিচ্ছিরি। বড়রা কত কী খায়! বড় বড় পিঁড়িতে বসে। বড় বড় থালা বাটিতে কত ভাল ভাল জিনিস থাকে। ওরা খায়। ওর বাবা দু-একবার সেই সব জিনিস একটু মুখে তুলে দিয়েছে ওকে, মা দিয়েছে, দাদু দিয়েছে, দাদা দিয়েছে, মাসি দিয়েছে, দিদা দিয়েছে। কোনটা খেতে তার ভাল লেগেছে, কোনটা লাগে নি। তবু সে তা খেয়েছে, তবু সে তা খায়। সে সব জিনিসের ঝাঁজাল আস্বাদ আর-এক নতুন রোমাঞ্চে আভিভূত করে তাকে। ওসব জিনিস ছেড়ে দুধ, রামো:, ও কি মুখে তোলা যায়!

কিন্তু এ কথা বড়মা বোঝে না, মা-ও না। সবাই মিলে ঠেসে ঠুসে তাকে দুধ খাওয়াল। তার কোন আপত্তি টিকল না। আগে জানলে সে পালিয়ে যেত। দুধ খেয়ে বড় বিরক্ত লাগল তার। গুম মেরে বসে রইল খানিক। ধীরে ধীরে সবাই যে যার কাজে চলে গেল। আবার সে একা হয়ে পড়ল।

ঘরের ভিতর চুপ করে বসে থাকতেও ভাল লাগল না। বাইরে এল। বারান্দায় অনেকগুলো হুঁকো কল্কে ছিল। বেশ দেখতে বটে জিনিসগুলো। বড়দের মুখের কাছে মুখ নিয়ে ভুড়ুক ভুড়ুক কেমন ডাকে! কী আছে ওর ভিতরে? একটা হুঁকো টেনে নিল। একটু কাত হয়েছে কি, কল্কেটা পড়ে ভেঙে গেল। যাকৃগে। ওটার ভিতরে কিছু নেই। শুধু গুঁড়ো গুঁড়ো ছাই। আসল ব্যাপার হয়ত লুকিয়ে আছে এই কালো পেটের

মধ্যে। সে বার-দুই ঝাঁকাল। কী যেন খলখল করছে। জল। এই যে জল বেরুচ্ছে। জল পড়ে মেঝে ভেসে গেল। যাঃ। যাকৃগে। আর কী আছে ওর ভিতরে! ভিতর থেকে কথা বলে কে? নলচে ধরে বার কয়েক ঝাঁকি দিল সে। শেষে ধাঁই ধাঁই করে আছাড় মারল গোটা কয়েক। বেশ ঠক ঠক শব্দ হল। শব্দটা বেশ লাগছে। ঠক ঠক ঠকাস। মার, আরও জোরে আছাড় মার। ঠকাস। নলচে থেকে হুঁকোর খোলটা খুলে বেরিয়ে গেল। বাঃ বাঃ! এ তো মজা মন্দ নয়। খোলটা কেমন গড়াচ্ছে! কী সুন্দর লাঠি হয়েছে নলচেটায়! শঙ্খ খুশিতে ফেটে পড়বে যেন। নলচেটা দিয়ে খোলটাকে ঠেলা মারছে সে, আর খুশিতে লাফাচ্ছে।

রামকিষ্টো এসে দেখে বড়কর্তার হুঁকোটার ও-কম্ম হয়ে গেছে। সর্বনাশ! বড়বাবু দেখলে আর আস্ত রাখবে না। রামকিষ্টো তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে নলচেটা কেড়ে নিতে গেল।

বলল, ভাঙ্গাচুরার একেবারে যে মা-গুসাই হয়ে উঠিছ মণি, অ্যাঁ! একদণ্ডও বুঝি স্থস্থির হতি মন চায় না, কেমন? যত কোপ কাজের জিনিসি! দ্যাও উটা।

শঙ্খ নলচে দেবে না। কিছুতেই না।

বলল, লাঠি। আমাল লাঠি। মারব।

রামকিষ্টো বলল, ওর চাইতিউ ভাল লাঠি আমি তুমারে বানায়ে দিবানে। লক্ষী ছাওয়াল। এখন নলচেডা দ্যাও দিনি। দাদু তামাক খাবে।

না, তামাক খাবে না। আমাল লাঠি। মাব্ব।

রামকিষ্টোর অনেক কাজ। বাদবিতণ্ডার সময় নেই। সে বৃথা বিলম্ব না করে নলচেটা নিয়ে নিল। শঙ্খর খুব রাগ হল। এ কী কথা! সে যে জিনিসে হাত দেবে, অমনি ওরা ছোঁ মেরে সেটা নিয়ে নেবে! বেশ, সে চায় না, এদের কোন জিনিসই সে চায় না। প্রচণ্ড অভিমান হল তার। কেউ তাকে দেখতে পারে না। কেউ না। কেউ না। খানিকক্ষণ দুরন্ত অভিমানের জোয়ারে সে ভেসে চলল। কাঁদল। হঠাৎ দেখে উঠনে নৌকোটা পড়ে আছে।

শঙ্খ উঠনে নেমে গেল। নৌকোটা টেনে নিয়ে উঠনময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। হ্যাঁ, এইবার একটা ভাল কাজই তো পাওয়া গেছে। কিছুক্ষণ নৌকো টানবার পর খেয়াল হল, তার নৌকো খালি। যাত্রী নেই কেউ।

এদিক ওদিক চাইতেই দেখে ডুয়ার ধারে নেড়ি কুকুরের বাচ্চা দুটো খেলা করছে। শঙ্খ খুব খুশী হল।

ডাকল, আয় আয়।

ওরা সে ডাকে সাড়া দিল না। বারকয়েক ডাকাডাকি করেও যখন ওরা এল না, তখন শঙ্খ নিজেই ওদের কাছে গেল।

ডাকল, আয়, নৌকো চাব্‌বি আয়।

ওরা তবুও এল না। তখন শঙ্খ একটা বাচ্চাকে ধরে এনে ওর নৌকোর উপর বসিয়ে দিল। তারপর আরেকটি বাচ্চাকে ধরে এনে দেখে অন্যটা তৎক্ষণে আরেক জায়গায় চলে গেছে। শঙ্খ বোকা বনে গেল।

হাতের বাচ্চাটাকে নৌকোয় বসিয়ে, সে তখন আগের বাচ্চার পিছনে ধাওয়া করল। কিছুক্ষণ ছুটাছুটি করে যখন ওটাকে ধরে নিয়ে এল তখন এটা আবার আরেক দিকে হাঁটা দিয়েছে।

সে ডাকল, আয় আয়।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! শঙ্খ মহা মুশকিলে পড়ল। সে একটা করে বাচ্চা ধরে এনে নৌকোয় বসায়, ততক্ষণে আরেকটা অন্যদিকে হাঁটা মারে। দৌড়ে দৌড়ে সে হয়রান হয়ে গেল। বিরক্ত হয়ে উঠল। তখন একটা বাচ্চার পেটে মারল লাথি। কেঁউ কেঁউ করে সেটা আর্তনাদ করে উঠল। বা রে, এ তো বেশ খেলা! মারল আরেক লাথি। বাচ্চাটা কেঁউ কেঁউ করে আবার কঁকাতে লাগল। বাঃ বাঃ! খুশিতে ফেটে পড়ল শঙ্খ। হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল।

বাচ্চাটাকে শাসাতে লাগল, আর দুষ্টু করবি? দুষ্টু করবি?

আবার মারল লাথি। আবার, আবার। বার বার লাথি মারছে শঙ্খ, বার বার আর্তনাদ করে উঠছে ছোট্ট কুকুরছানাটা। আর খুব মজা লাগছে তার। চেঁচামেচি শুনে গিরিবালা বেরিয়ে এল। শঙ্খকে কুকুরের ছানা ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখে বেজায় রেগে গেল।

ডাক দিল, খুকা, উঠে আয়। অসভ্য কোথাকার! কুকুর ছেনতিছ! উঠে আয় পিচেশ।

শঙ্খ মাকে দেখে নালিশ করল, মারব। দুষ্টু। মারব।

থাক্, তুমার আর শাসন করতি হবে না। তুমি এখন আসো দিনি। কাদা মাখে একেবারে ভূত হয়ে উঠিছ। আসো, চ্যান করায়ে দিই।

গিরিবালা শঙ্খকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। তার এখন অনেক কাজ বাকী।

বড়মার জ্বর, চাঁপার জ্বর। ম্যালেরিয়ায় পাড় করেছে দুজনকে। খুব ভোগান্তি যাচ্ছে। ফুলির মা, ফুলিও নেই। মেয়েকে নিয়ে বছরখানেক হল শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছে ফুলির মা। ছোট কাকিমা কাকার ওখানে। কাকা ঝিকরগাছায় বদলি হয়েছেন। প্রায় মাসখানেক ধরে শুভদাই সব দিক সামাল দিচ্ছিলেন, গিরিবালা আসতে তার পরিশ্রম একটু লাঘব হয়েছে।

এবারে বাপের বাড়িতে এসে গিরিবালাকে খুব খাটতে হচ্ছে। ফুরসত মোটে পাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি করে বাবার ইস্কুলের ভাত রেঁধে দিতে হয়। দু-দুটো রোগীর সেবা করতে হয়। মাঝে মাঝে চাল ফুরিয়ে গেলে, ধান ভেনেও নিতে হচ্ছে। সে যে বাপের বাড়ি এসেছে তা সে বুঝতে পারছে না। সাত দিনও আসে নি, এরই মধ্যে সে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

তিন বছর সে আসে নি। তার চোখে এতদিন বাপের বাড়ির যে ছবিটা ভেসেছে, সেটা ত তিন বছর আগেকার। এর মধ্যে কত পরিবর্তন হয়েছে এ সংসারের তার কোন ধারণাই ছিল না। নদীর ঘাটে নরাকে দেখে তাই সে অত অবাক হয়ে গিয়েছিল। যে নরাকে সে বছর তিনেক আগে দেখে গিয়েছিল, আর এখানে এসে যে নরাকে দেখল, দুইয়ের মধ্যে প্রায় আকাশ-পাতাল তফাত। তারপর এখন গিরিবালা বুঝতে পারছে, শুধু নরারই নয়, এখানকার সব কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে।

শ্বশুরবাড়ি যখন ছিল, তখন তার বাপের বাড়িটাকে তুলনায় অনেক উজ্জ্বল বলে মনে হত গিরিবালার। এবার সে বাপের বাড়ির সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির বিশেষ তফাত কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সেই আজ-আনা আজ-খাওয়া এখন এখানেও শুরু হয়েছে। বাড়িঘরের বাইরেকার চেহারাও অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছে। আগে বারবাড়ি আর ভিতর-বাড়ির মধ্যেকার চেগারের বেড়াটা সব সময় মজবুত থাকত। এবার গিরিবালা এসে দেখল, বেড়াটা জরাজীর্ণই শুধু হয়ে ওঠে নি, একপাশে হেলে পড়ার ফলে ভিতরের আব্রু প্রায় নষ্টই হতে বসেছে। পিসিমা

অনেক খিটখিটে হয়ে উঠেছেন, বড়মা চাপা রুগ্ন শীর্ণ, বাবা অনেক গম্ভীর, জ্যোঠামশাই চিন্তার ভারে ন্যুব্জ। সব মিলিয়ে এখানে এখন যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সেটা যেন ঠিক আগের মত গিরিবালাকে সোৎসাহে আমন্ত্রণ জানাল না, যেন আগের উষ্ণতা অনেকখানি মিইয়ে গিয়েছে।

বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে যত রকমের পরিবর্তন চোখে পড়ে, ভিতরে ভিতরে অত পরিবর্তন হয়েছে কি না গিরিবালা জানে না। সে শুধু অনুভব করছে, এই বাড়িটা তার কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে। সেটা কার দোষ, তার, না এ বাড়ির, গিরিবালা তাও জানে না। শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এখানে আসবার জন্য তার প্রাণটা কেন যে এত আকুলি-বিকুলি করত, এখন যেন সে তার সঙ্গত কোন জোরাল কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। শ্বশুরবাড়ি থাকতে সে ভেবেছিল, ভূষণ একবার তাকে বাপের বাড়িতে এনে ফেলুক, তারপর গিরিবালা দেখবে সে কেমন করে তাকে চা-বাগানে নিয়ে যায়।

এই তো ভূষণ তাকে এখানে রেখে এখন কলকাতায় গিয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যে এসেই তাকে সঙ্গে নিয়ে আসাম চলে যাবে। শ্বশুরবাড়ি থাকতেই গিরিবালা মনে মনে অনেক যুক্তি এঁটে এসেছিল। তার পক্ষে শ্রীহট্টে না যাবার স্বপক্ষে অনেক অকাট্য কারণ সে তৈরি করে রেখেছিল। কিন্তু, এখন, তার মত ভীতু লোকেরও যেন মনে হচ্ছে, সত্যিই সে সব অজুহাতের কোন মানে নেই। শ্বশুরবাড়ি থাকতে বার বার তার মনে হত, বাপের বাড়িই বুঝি তার সব থেকে বড় আশ্রয়। এখন তার মনে হচ্ছে চা-বাগানে গেলেও সে এমন কিছু জলে পড়বে না। অর্থাৎ বাপের বাড়ির এই পরিবেশে সে আলাদা এমন কিছু খুঁটির জোর পেল না, যা তাকে শ্রীহট্টে যেতে প্রবলভাবে বাধা দিতে পারে। বরং উল্টোই হল। এরই মধ্যে গিরিবালা মনে মনে, ভূষণ কবে আসবে, তারই জন্য যেন তৈরী হয়ে বসে থাকল।

চোদ্দ

জ্বরটা যখন আসে তখন কিন্তু এত কষ্ট হয় না বড় বউয়ের। মাঝে মাঝে শুরুটা বরং ভালই লাগে। কেমন এক রকম নেশার মতন। হয়ত রাঁধতে বসেছেন, কি বাসন মাজতে, কি কাপড় নিয়ে গেছেন পুকুরে কাঁচতে, অমনি বড় বউ টের পেলেন তার রক্তে কেমন যেন এক অস্থিরতা জেগে উঠতে শুরু হয়েছে। বুঝলেন, জ্বর আসছে। ম্যালেরিয়া এমনি করেই আসে। বড় বউ আর বিশেষ বিলম্ব করেন না। যতটা পারেন হাতের কাজ তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দেন। জানেন, কপালের রগ দুটোর টিপটিপনি শুরু হলেই কম্প দিয়ে এসে পড়বে জ্বর। তখন আর দিশে-বিশে পাওয়া যাবে না।

তাই বড় বউ সময় থাকতেই সতর্ক হয়ে ওঠেন। জ্বর আসবার লক্ষণ দেখলেই হাতের কাজ চুকিয়ে ফেলেন। এমন কী, দাঁতে খানিকটে গুঁড়ো ঘষে নিতেও ভোলেন না। তারপর হয় চাঁপাকে নয় অন্য কাউকে, যে তখন হাতের কাছে থাকে তাকেই বিছানাটা পেতে দিতে বলেন। তারপর পাতা বিছানায় শুতে না-শুতেই ম্যালেরিয়ার কম্প শুরু হয়ে যায়। দারুণ শীত করতে থাকে। লেপের উপর লেপ, কাঁথার উপর কাঁথা চাপা দিয়েও শীত কমানো যায় না। চাঁপা কি ফুলি, ফুলির মা কি শুভদা জোর করে ঠেসে ধরলেও কম্প থামাতে পারা যায় না বড় বউয়ের। জ্বরের তাপ বাড়তে থাকে। কানের ভিতর হাজার হাজার ঝিঁঝিপোকার ডাক শোনা যায়। মাথার দপদপানি শতগুণ বেড়ে যায়। তার পর জোয়ার ভেঙে বন্যা, মহাপ্লাবন…। বড় বউয়ের শরীরটা শক্ত শক্ত ধাক্কায় ভেঙে পড়তে থাকে। খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে ওঠে। তার পর কখন যেন দেখবার বোঝবার ভাববার অনুভব করবার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হয়। চেনা জগৎটা তলিয়ে যায়। অনেকক্ষণ আর কোন কিছুর সাড় থাকে না।

হঠাৎ এক সময় চৈতন্য ফিরে এলে বড় বউ দেখেন, তাঁর নির্জীব দেহটা

লেপ কাঁথার বিরাট স্তূপের ভিতর বন্দী হয়ে গলগল করে ঘামছে। বিস্বাদ মুখ, অবসন্ন দেহ। নড়তে-চড়তে আর ইচ্ছে করে না। মনে হয়, কোন এক হিংস্র দৈত্য ছেঁচে থেঁতলে তাঁর দেহ থেকে রস বের করে নিয়ে ছিবড়েটা নয়নজুলিতে ফেলে দিয়েছে। এই সময়টা খুব খারাপ লাগে বড় বউয়ের। খুবই অসহায় অসহায় ঠেকে।

আর কেবলই সুধাব কথা মনে হয়।

কেমন আছে সুধা? এত করে লেখা হচ্ছে বাড়ি আসার জন্য, আসছে না কেন? কতদিন আসে নি সুধা। এক বছর, দু বছর, এক যুগ। আর কি আসবে না? আসবেই না? যদি হঠাৎ মরে যান তিনি, সুধার মুখখানা ত আর দেখতে পাবেন না। পাবেনই না? সর্বনাশ! বুক ধড়ফড় করতে থাকে। শীর্ণ নিস্তেজ চোখ দুটো দিয়ে অবিরলধারে জল ঝরে পড়ে।

সুধাকে নিয়ে কত আশা ছিল তাঁদের। এখানকার পড়া শেষ করে কলকাতায় পড়ার আবদার ধরেছিল সুধা। বড় বউয়ের মোটে মত ছিল না। মাজেবাবুর কথা মনে ছিল তাঁর। কলকাতা সম্পর্কে মহাভয় ছিল। কলকাতায় গেলে ধর্মাধর্ম লোপ পায় বলে ধারণা ছিল বড় বউয়ের। তবুও মাজেবাবুর কথার উপর ভরসা করে বুক বেঁধেছিলেন তিনি। সাহস করে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন ছেলেকে। শেষ পর্যন্ত কলকাতাই গ্রাস করল সুধাকে। যা ভয় করেছিলেন, তাই হল। বই, এখন মাজে-বাবু কোন কথা বলেন না কেন? 'সুধা' 'সুধা' করে তাঁর প্রাণ যখন বেরিয়ে যাবার যোগাড় হচ্ছে, তখন এনে দিতে পারছেন না কেন তাঁরা ছেলেকে? খুব ত সাহস দিয়েছিলেন তখন।

মাঝে মাঝে বড় বউয়ের মনে হয়, সুধা হয়ত বেঁচেই নেই। সবাই মিলে তাঁকে ধোঁকা দিয়ে রেখেছে। বেঁচে নেই সুধা? ষাট, ষাট! এ কী অলক্ষুণে ভাবনা! তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন বড় বউ, জাগ্রত দেবতাদের কাছে মানত করেন, সুধাকে তাঁর কোলে ফিরিয়ে দিতে। বুক চিরে রক্ত দেবেন তাঁদের পায়ে ঢেলে।

কখনও মনে হয়, লেখাপড়া না শেখানোই উচিত ছিল সুধাকে। কোলের ছেলে তা হলে কোলেই থাকত। জমিজমা দেখত। বিয়ে দিয়ে দিতেন তাঁর। এতদিনে বেটার বউ নাতি নাতনী নিয়ে সুখের ঘর বসে

যেত। লেখাপড়া না শিখলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত! লেখাপড়া শিখে এই ত হল, সে মা-বাবাকে পর্যন্ত গেরাহ্যি করে না। নিশ্চয়ই সুধা কলকাতায় কোন বড রকমের কেলেঙ্কারি-টেলেঙ্কারি ঘটিয়ে বসেছে। নইলে আসছে না কেন বাড়িতে? বড় বউয়ের মন বলছে, কিছু একটা ঘটেছে সুধার। কিছুদিন ধরে তাঁর মনটা কেবলই কু গাইছে। চিঠির পর চিঠি লেখা হচ্ছে 'বাড়ি এস' 'বাড়ি এস' বলে, কোন্ সাহসে সুধা তা উপেক্ষা করছে? এর মধ্যে দু-তিনটে ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছিল ওর। বিনোদপুরের অক্ষয় ঘোষের মেয়েটাকে ত পছন্দও হয়েছিল কর্তাদের। মেয়ের বাবারও এখানে বিয়ে দেবার খুব ইচ্ছে ছিল। দেড় বছর ধরে কী ঝুলোঝুলিই না তারা করেছে। কিন্তু বিয়ে যে করবে, তাকে ত ভিড়ানোই গেল না। বোশেখ মাসে তারা সে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে।

তবে কি সুধা কলকাতায় বিয়ে-থা করেছে? তাদের না জানিয়েই বিয়ে করে বসবে সুধা? না না, তা কি হয়? তা কখনও সুধা করবে না। বিশ্বাসই বা কী? বড় বউ বিরক্ত হয়ে ওঠেন। আজকালকার ছেলেদের মতিগতির কি কিছু ঠিকঠিকানা আছে! এই ত আজ বছর দেড়েক ধরে ক্রমাগত ভুগছেন বড বউ, কবে হয়ত একদিন পট করে মরে যাবেন, সে সব কথা সুধাকে লেখা হয়েছে, সুধা জানে, তবু কি একবার এসেছে চোখের দেখা দেখতে? আর তাঁব অসুখের কথা শুনেও একবার তাঁকে দেখে যাবে না সুধা, বড বউ কি এ কথা ঘুণাক্ষরেও কখনও ভাবতে পেরেছিলেন? যে-ছেলে এ-কাজ পারে, তার অসাধ্য এ জগতে আর কী আছে?

বড বউই শুধু 'সুধা' 'সুধা' করে ভেবে মরেন। সুধা মার জন্য কাঁচ-কলাটাও ভাবে না। কত যে দুঃস্বপ্ন দেখেন সুধাকে ঘিরে, বিছানায় নির্জীব হয়ে যে সময়টা পড়ে থাকেন তখন, তার কি সীমা-সংখ্যা আছে!

আজ, এই ত কিছুক্ষণ আগে জরটা ছাড়ল। একটু বুঝি তন্দ্রাটা এসেছিল। দেখলেন ভূষণ সুধাময়ের অচৈতন্য দেহটা কাঁধে করে বয়ে আনছে। গাড়ি ধরতে পারে নি ভূষণ, হেঁটে হেঁটেই কলকাতা থেকে এসে পড়েছে। সুধাময়ের মাথাটা ফেটে গেছে, গলগল করে রক্ত পড়ছে। বারান্দায় এনে ওকে শোয়ানো হল। রক্তে বারান্দা ভেসে গেল, উঠন

ভেসে গেল। হুড়হুড় করে বৃষ্টি পড়ে উঠনে একগলা জল দাঁড়িয়ে গেল। সুধার রক্তে সেই জল লাল হয়ে উঠল। বড় বউ রান্নাঘরে ছিলেন। তাড়াতাড়ি করে সেই গলা-জল ভেঙে গুদামের বারান্দায় উঠতেই আছাড় খেয়ে তিনি সুধার গায়ের উপর পড়ে গেলেন। সুধার দেহটাও অমনি পিছলে জলে পড়ে গেল, আর কে যেন বলে উঠল, হা অভাগী, ছেলেরে জলে ঠেলে ফেলে দিলি! বড় বউ তাড়াতাড়ি করে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেন সুধাকে আর অমনি জলে প্রবল স্রোতের টান উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সুধা ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বড় বউ 'ওরে ধর্ ধর্' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। তাঁর তন্দ্রা ভেঙে গেল। ভয়ে আতঙ্কে থরথর করে তাঁর শরীর কাঁপতে লেগেছে। বুক অস্থির অস্থির করছে। বড়কর্তা পাশের ঘরে ছিলেন। চিৎকার শুনে এ-ঘরে এসে পড়লেন। বড় বউয়ের ভাবগতিক দেখে বড় কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল?

বড় বউ শ্রান্ত চোখে বড়কর্তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন। তিনি তখনও হাঁপাচ্ছেন।

বড়কর্তা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে বড়বউ? অমন করে চেঁচিয়ে উঠলে ক্যান?

বড় বউ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যেন প্রকৃতিস্থ হলেন খানিকটা। তার পর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেলেন।

একটু পরে খানিকটা সামলে নিয়ে বললেন, তুমরা মানুষ না গো, পাষাণ। আজ পর্যন্তও আমার সুধারে আনে দিতি পারলে না!

বড়কর্তা বললেন, চিঠি লিখলি হারামজাদা জবাব দেয় না। করব কী কও?

বড় বউ বললেন, এক কাজ কর, আমারে কলকাতায় নিয়ে চল। আমার মনডা বড় উতলা হয়ে পড়িছে। ওগো, আজ যাচ্ছেতাই স্বপন দেখিছি। নিয়ে যাবা আমারে কলকাতায়?

বড়কর্তা বললেন, কলকাতায় যাওয়া কি মুখির কথা বড় বউ? আমি ছাই কিছু চিনিউ নে। উতলা হয়ে আর করবা কী? কপালে যা আছে তা কি খণ্ডাতি পারবা? দেখি, জামাইরি ত কয়ে দিইছি. কলকাতায় যায়ে যেন সে নবাবের সঙ্গে দেখা করে। জামাই ত এই পথেই ফেরবে, যেন তারে ধরে নিয়ে আসে।

বড় বউ বললেন, জামাই কি চিঠিপত্তর কিছু দেছে ?

বড়কর্তা বললেন, মহী তো কিছু ক'ল না। আসে নি বোধ হয়।

আরে ও কী, ও দাদু, ওষুধির শিশি পালে কনে ?

শঙ্খ চাঁপার মিক্শ্চারের শিশিটা দু হাতে ধরে থপ থপ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বড়কর্তা তাড়াতাড়ি ওষুধের শিশিটা নিতে গেলেন। শঙ্খ দিল না। বড় বউয়ের কাছে সরে গেল।

বড়কর্তা বললেন, দিয়ে দ্যাও দাদু, দিয়ে দ্যাও। ওষুধ ন্যায় না।

শঙ্খ বলল, ওচুদ নে না। দিদি খাবে। দিদি অচুখ।

বড় বউয়েব হাতে শিশিটা দিয়ে দিল শঙ্খ।

বলল, দিদি অচুখ, দিদি খাবি, ওচুদ খাবি।

অমনি বড় বউয়েব মনেব গুরুভার অনেকটা লাঘব হয়ে গেল। মুখে হাসি ফুটল। ওইটুকুন ছেলেব বুদ্ধিটা দেখেছ একবার। ঠিক ধরেছে কেমন ? আমার অসুখ, আমাকেই ওষুধ খাওয়াতে এসেছে।

বললেন, হ্যাঁ দাদু, ওষুধ খাব। তুমি এতক্ষণ কনে ছিলে ?

শঙ্খ বললে, ওচুদ খাবি, ওচুদ খাবি।

বড় বউ শঙ্খকে কাছে টেনে নিলেন। ওর গায়ে মাথাব হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। দেখেছ, মাথায় কত ময়লা! জট পড়ে যাচ্ছে। চুলগুলো ভাল কবে আঁচড়িয়ে না দিলে মাথায় যে খুস্কি পড়বে। কিন্তু দেয় কে ? তিনি ত বিছানায় পড়ে। চাপাও পড়েছে। বেচারী বউ। দু দিনের জন্য বেড়াতে এল, আজ বাদে কাল চলে যাবে বোন মগের মুল্লুকে। কোথায় হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করবে দু দিন, না এসে ইস্তক হেঁসেলে ঢুকে হাঁড়ি ঠেলতে লেগেছে।

গিরিবালা এক জামবাটি গরম সাবু রেঁধে নিয়ে ঢুকল। কাগজী লেবুর গন্ধ ছাড়ছে সাবুর বাটি থেকে।

বড় বউ গিরিবালাকে হাসতে হাসতে বললেন, ও বুড়ী, এই দ্যাখ্, তোর ছেলে কেমন ডাক্তাব হয়ে উঠিছে। ওষুধির শিশিডে আমারে দিয়ে কয় কী, দিদি ওষুধ খাবে। দিদিব অসুখ।

কথাটা শুনে শঙ্খ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, দিদি ওচুদ খাবে। দিদি অচুখ।

বড়কর্তা বললেন, ডাক্তারেব বিটা তো। বাপকা বিটা সিপাহীকা ঘুড়া, কুচ নেহি তো থুড়া থুড়া।

ঘোড়ার কথা কানে যেতেই শঙ্খ বড় বউকে ছেড়ে বড়কর্তাকে ধরল।

দাদু গোড়া।

বড়কর্তা বললেন, ঘুড়ায় চড়বা ?

শঙ্খ লাফাতে লাফাতে বলল, গোড়া চব্‌ব। দাদু গোডা।

গিরিবালা হেসে ফেলল।

বলল, আপনি আবার হাভাতেরে শাগের ক্ষেত দ্যাখালেন ত !

শঙ্খ ততক্ষণে বড়কর্তার হাত ধরে টানাটানি শুরু করেছে।

দাদু গোডা চব্‌ব। গোডা দে।

বড়কর্তা বললেন, তবে চল যাই দাদু, দুজনে মিলে ঘোড়া ধরিগে।

বড়কর্তা শঙ্খকে নিয়ে যাবার উপক্রম করতেই গিরিবালা বলল, জ্যেঠামশাই, রান্না হয়ে গেছে কিন্তু। চ্যানটা সারে ফ্যালেন।

ওরা বেরিয়ে যেতেই বড় বউ সাবুর বাটি কোলে করে ছেলেমানুষের মত খুঁত-খুঁত করতে লাগলেন।

সাবু আর মুখি তুলা যায় না রে মণি। বমি আসে। আমি বরং চাড্ডে ভাতই খাব।

গিরিবালা হাসতে হাসতে বলল, তুমি যে চাঁপার উপর দিয়ে যাও। চাঁপা তবু তো সাবুর পায়েস পালিই খুশী হয়।

বড় বউ বিরক্তি চেপে বললেন, দিনির পর দিন এ ছাই কি গিলা যায় !

গিরিবালা বলল, জরডা না ছাড়লি ত আর অন্নপথ্যি দেবে না ডাক্তারে। খ্যাও, খায়ে ন্যাও। আমি লেবু-টেবু দিয়ে সরবত বানায়ে আনিছি। খারাপ লাগবে না।

বড় বউ আর দ্বিরুক্তি না করে ঢক ঢক করে গিলে ফেললেন সাবুটুকু। তার পর মুখ মুছে শুয়ে পড়লেন।

ভূষণের চিঠি এসেছে। ভূষণ মেজকর্তাকে লেখেছে :

শ্রীচরণকমলেষু,

বাবুজি, আমাদের যাবার দিন স্থির হইয়াছে। এই সপ্তাহের শেষেই চা-বাগান অভিমুখে রওনা দিতে হইবে। হাতে সময় আর মোটে নাই। এদিকে বাগানের ডিসপেন্সারির জন্য সাজ-সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রাদি কেনাকাটা করিবার জন্য আমার এখন কলিকাতা ত্যাগ করিবার উপায়

নাই। মেজবউদির বিশেষ ইচ্ছা তিনি শঙ্খকে দেখিবেন। তাই উহাদিগকে কলিকাতায় আনিতে হইবে। অথচ আমি গিয়া উহাদিগকে লইয়া আসিব আমার হাতে এমন সময়ও নাই। কাজেই উহাদিগকে কলিকাতায় পৌঁছিয়া দিবার ভার আপনাকেই লইতে হইবে। এবং দুই-এক দিনের মধ্যেই পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

সেজদা বলিয়াছেন, বাগানের ব্যবস্থাদি ভালই। কাহারও কোন প্রকার অসুবিধা হইবে না। আমাদিগকে কলিকাতা হইতে ঢাকা অথবা চিটাগাং মেলে গোয়ালন্দ যাইতে হইবে। চিটাগাং মেলে যাওয়াই সুবিধাজনক। গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর পর্যন্ত স্টীমারে এবং চাঁদপুর হইতে পুনরায় রেলযোগে লাকসাম এবং কুলাউড়া জংশন হইয়া দক্ষিণভাগ স্টেশনে নামিতে হইবে। দক্ষিণভাগ হইতে হাতি অথবা অন্যান্য যানবাহনে বাগানে পৌঁছিতে হইবে। ভাবনার কিছুমাত্র কারণ নাই। তবে আপনি হাতির কথা কাহাকেও জানাইবেন না। অনর্থক ত্রাসবৃদ্ধি পাইবে। আসামে হাতি দিয়া জমি চাষ করে। উহা বলদ অপেক্ষাও নিরীহ।

আমি বর্তমানে এক শত টাকা বেতন পাইব এবং পঞ্চাশ টাকা অ্যালাউন্স পাইব। এতদ্ব্যতীত একটি বাংলো এবং চাকর কোম্পানি আমাকে দিবেন। ব্যবসা ইত্যাদি করিবারও প্রচুর সুযোগ আছে জানিলাম। উহাতে আরও উৎসাহ বোধ করিতেছি।

এবার সুধাদার ব্যাপারে কিছু বলি। কী যে বলিব, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনারা যে ঠিকানা দিয়াছিলেন, সুধাদা সেই ঠিকানায় আর থাকে না। উহা একটি মেসবাড়ি। ওইখানে গিয়া সুধাদার খোঁজ করিয়া জানিতে পারি, সে অনেক দিন হইল ওখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। কোথায় কেহ জানে না। আগে মাঝে মাঝে ওখানে আসিত এবং চিঠিপত্র থাকিলে লইয়া যাইত। মেসের ম্যানেজার কোন কথা বলিতেই চাহেন না। শেষে আমি পুলিসের লোক নহি, সুধাদার আত্মীয়, এ-কথা বিশ্বাস করাইবার পর আমার ঠিকানা রাখিয়া দিলেন এবং বলিলেন, সুধাদার খবর কিছু থাকিলে তিনি আমাকে জানাইবেন। এ সকল কী ব্যাপার কিছুই বুঝিতেছি না। আমার ভাল ঠেকিতেছে না। সে কারণেও আপনার পক্ষে কলিকাতায় আসা প্রয়োজন। যাহা হউক, আপনি পত্রপাঠ উহাদিগকে লইয়া চলিয়া আসিবেন।

বড়মা এবং চাঁপার শরীর কি ভাল হইয়াছে? আশা করি আর সকলের কুশল। অত্র সকলের মঙ্গল জানিবেন। আপনি ও অন্যান্য গুরুজনগণ ভক্তিপূর্ণ প্রণাম লইবেন। ছোটদের আশীর্বাদ দিবেন। ইতি—

আপনার জামাতা ভূষণ

এই চিঠির পর আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। ব্যাপারটা যে কতদূর গড়িয়েছে, এখান থেকে তা জানা যাবে না। মেজকর্তা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ঠিক করলেন, সাত দিনের জন্য কলকাতায় যাবেন। যে কবেই হোক সুধাময়কে খুঁজে বের করতেই হবে। কী চায় সুধাময়, জানতে হবে। সত্যিই যদি সে কোন সর্বনাশা সঙ্কল্পের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে থাকে, তা হলে সর্বশক্তি দিয়েই তাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে হবে।

ভূষণের চিঠির কথা বাড়ির সবাইকে মেজকর্তা খানিকটা জানালেন। শুধু বললেন, সুধাময়ের সঙ্গে ভূষণ দেখা করতে পারে নি। গিরিবালাদের নিয়ে তিনি ত কলকাতায় যাচ্ছেন। আসবার সময় সুধাকে ধরে আনবেন।

পনরো

একটুর জন্য ওঁরা কলকাতার ট্রেনখানা ধরতে পারলেন না। প্রায় নাকের উপর দিয়েই সেখানা বেরিয়ে গেল। সারা রাতের মধ্যে কলকাতার ট্রেন আর নেই। এর পরে আছে দার্জিলিং মেল। তা সে ত শেষরাত্রে। হতাশ হলেন মেজকর্তা। রাগ হল হতচ্ছাড়া বাসখানার উপর। ঝিনেদা থেকে চুয়াডাঙার ইস্টিশান, বাইশ মাইল ত মোটে রাস্তা। এর মধ্যে যে কতবার বিগড়ে গেল বাসখানা তার ইয়ত্তা নেই।

এখন কী আর করা যায়! ওয়েটিং রুমে বিছানা খুলে পাতিয়ে দিলেন কুলিকে দিয়ে। গিরিবালা ঘুমন্ত ছেলেকে শুইয়ে নিজে আরাম করে বসল। শঙ্খর জন্য বোতলে দুধ আছে। দশটা নাগাদ একবার খাইয়ে ঘুমটা পাড়িয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত। সকালের আগে সে আর উঠবে না। মেজকর্তা টাইম-টেবল দেখলেন, সকাল পাঁচটা পনরো মিনিটে শিয়ালদহ পৌঁছে যাবে

গাড়ি। সেখান থেকে গড়পারে ভূষণের দাদার বাসায় পৌঁছতে বড় জোর আধ ঘণ্টাই লাগুক।

মেজকর্তা দোকান থেকে কিছু লুচি তরকারি আনলেন। গিরিবালার এসব খাবার খেতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না, তবু খেল। তার মনটা বিশেষ ভাল ছিল না। চাঁপার জ্বরটা ছেড়েও ছাড়ল না। ঠিক তাদের আসবার আগেই নতুন করে জ্বর এসে গেল। ওর শরীরটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে। ভাল ডাক্তার না দেখালে আর চলবে না। বাবাকে ভাল করে বলে যাবে। আবার কবে এ দেশে আসবে গিরিবালা কে জানে?

বাপ ভাই আত্মীয় বন্ধু ছেড়ে গিরিবালা চলল কোন্ অকূল পাথারে ঘর বাঁধতে! এখন একমাত্র ভরসা ভূষণ। এবার যে সংসার পাতবে গিরিবালা তাতে সে-ই হবে কর্ত্রী। হ্যাঁ, তাই তো। তার মাথার উপর আর ত কেউ থাকবে না। এ কথাটা ত আগে খেয়াল হয় নি। এই নতুন সংসারটা হবে তার আর ভূষণের। ভূষণ, সে আর শঙ্খ।

গিরিবালা তার এই নতুন ভাবনাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। বাপের বাড়িতে বড়মার জায়গা যেখানে, শ্বশুরবাড়িতে বড় জায়ের, যেখানে, ডোমারে বাবার বাসাবাড়িতে তার মায়ের জায়গা যেখানে ছিল, গিরিবালা তার নতুন সংসারে একলাফে এবার সেই জায়গায় উঠে পড়বে। কারও অধীন হয়ে, খোঁটা খেয়ে, হাততোলা হয়ে আর থাকতে হবে না তাকে। সংসারে কোন্ জিনিস কতটা আনতে হবে, কাকে কী দিতে হবে, কে ঠিক করবে? গিরিবালা। সেই গিরিবালা যে কিছুদিন আগে পর্যন্তও সবার হুকুম মেনে চলেছে। কোথাও বিশেষ জোর খাটাতে পারে নি। ভয়ে ভয়ে থেকেছে। বিয়ে হয়ে যাবার পর বাপের সংসারে মেয়ের আর জোর থাকবে কী করে? শ্বশুরবাড়ি গেল গিরিবালা। কিন্তু সেখানেও ত জোর পেল না। কী করে পাবে? এখন গিবিবালার মনে হচ্ছে, সেটা ত তার সংসার ছিল না, সেটা যে দিদির সংসার।

হ্যাঁ, এইবার তার জোর হবে। তার নিজের সংসার পাবে সে। ভালমন্দ যা কিছু ঘটবে, তার সব দায়িত্ব গিরিবালার। গিরিবালা ভাবতে লাগল, সে দেখিয়ে দেবে সংসার করা কাকে বলে। সে কাউকে খোঁটা দেবে না, অবজ্ঞা করবে না, তার সংসারে কাউকে মনে কষ্ট পেতে দেবে না। এই অল্প দিনের মধ্যে সে যে তিক্ততার স্বাদ পেয়েছে, তার আশ্রয়ে

কেউ যাতে সে আস্বাদ না পায়, প্রাণপণে তার ব্যবস্থা করবে গিরিবালা।

আর এই প্রথম গিরিবালার মনে হল, চা-বাগানের চাকরিটা নিয়ে ভূষণ খুব খারাপ কিছু করে নি। বরং গিরিবালাকে একটা গোটা সংসারের গিন্নী হবার সুযোগ করে দিয়েছে। এখন যতই ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবছে গিরিবালা, ততই দেখতে পাচ্ছে ভূষণ ভালই করেছে কাজটা। সে ভাগ্যিস গিরিবালার কথা শুনে তখন মেজ ভাসুরের আদেশটা অমান্য করে নি। ভূষণকে এখন কত কাছে কাছে সে পাবে। বিয়ের পর থেকেই ত তার এই বাসনা, ভূষণকে একান্ত করে সে পাবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে বাসনা তার পূর্ণ হয় নি। বিয়ের পর ভয় আর লজ্জা কাটতেই ত এক বছর গেল। তারপর আরেকটা বছর না ঘুরতেই জানতে পারলে সে মা হতে যাচ্ছে। তখন আবার নতুন এক লজ্জা। সেটা যদিও বা সামাল দিল, তবুও সে ভূষণকে মনের মতন করে পেল না। নিজে যেমন সংসারের কাজে, শঙ্খের পরিচর্যায় দিনরাত মগ্ন হয়ে গেল, তেমনি ভূষণও যেন হারিয়ে গেল বহু-জনের ভিড়ে। এই ভিড়, গুরুজনদের সদা উপস্থিতি, এসব ত আর নতুন সংসারে থাকবে না। শুধু সে আর ভূষণ। গিরিবালা হিসেব করতে লাগল। এক দিকে সে বাবা বোন বড় জ্যেঠী পিসি জা এদের সঙ্গ যেমনি হারাচ্ছে, তেমনি পাচ্ছেও কিছু। কিছু কেন, অনেক পাচ্ছে। ভূষণকে একান্ত করে পাওয়া তার যে দু-মুঠি ভরে যাওয়া। কথাটা মনে পড়তেই রোমাঞ্চ জাগছে তার।

ভস্ ভস্ ভস্ ভস্ করে একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল। তাদের গাড়ি নাকি? গিরিবালার মন ছ্যাঁক করে উঠল। তাড়াতাড়ি সে উঠে বসল।

মেজকর্তা একটা বেঞ্চিতে বসে ছিলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, কী রে, উঠে পড়লি যে?

গিরিবালা থতমত খেয়ে গেল।

বলল, ভাবলাম গাড়ি বুঝি আসে গেল।

মেজকর্তা একটু হেসে বললেন, এখানা মালগাড়ি। আমাদের গাড়ির ঢের দেরি।

গিরিবালা অপ্রস্তুত হয়ে চেয়ে দেখল সত্যিই মালগাড়ি। রাতের আবছা অন্ধকারে ভুতো-ভুতো লাগছে। ডোমারেও সে মালগাড়ি

দেখেছে। তার মোটে পছন্দ লাগে না। সবটা মিলিয়ে কেমন যেন একটা বুকচাপা নিরেট ভাব আছে মালগাড়ির চেহারায়। আলো নেই, খোলা-মেলা নেই। দমবন্ধ করা ভাব। একবার এলে সহজে নড়তে চায় না। স্টেশন জুড়ে পড়ে থাকে। ঘটাং ঘটাং, ঠকাস্ ঠকাস্ কত রকম বিশ্রী শব্দ করে! এগোয় পেছোয়। ইঞ্জিনটা হঠাৎ ভস্ ভস্ করতে করতে তেড়ে-মেড়ে যেন চলে যায়। ভাব দেখে মনে হয়, আর বুঝি ফিরবে না। ওমা, পরক্ষণেই আবার বেহায়ার মত ফিরে আসে। ওই তাদের গ্রামের সরকার মশাইয়ের মত স্বভাব আর কী? সকালে উঠেই খুড়ির সঙ্গে খিটিমিটি বাধে। অবস্থা চরমে উঠলে হঠাৎ ছাতিখানা বগলে করে চেঁচিয়ে ওঠেন সরকার মশাই, "থাকল তোর কাঁচকলার সংসার, এই চললাম যেদিকি দু চোখ যায়।" বেরিয়ে পড়েন বাড়ি থেকে। তারপর দুপুরবেলা খাবার সময় আবার গুটগুট করে বাড়িতে ঢুকে পড়েন। যেন কিছুই হয় নি। মালগাড়ির ইঞ্জিনগুলোর রকম-সকম সেই সরকার মশাইয়ের মতই বটে।

গিরিবালা শুয়ে পড়ল। কখন যে এই মালগাড়িখানা বিদায় হবে! বিরক্তি লাগল তার। কখন আসবে কলকাতার গাড়ি? অসহিষ্ণু হয়ে উঠল সে।

তা অস্বীকার করে লাভ নেই, গিরিবালা কলকাতায় পৌঁছবার জন্য এর মধ্যে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আবার ভয়-ভয়ও করছে তার। সেজ ভাসুর সাহেব লোক। সেজ জা কলকাতায় থাকা মেয়ে। বিয়ের সময় সেই যা গিরিবালা তাঁদের দেখেছিল। তার মনে পড়ে, সেজ জা তার চুলগুলো দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন। প্রশংসা করেছিলেন। তারপর নতুন ফ্যাশানে তার চুল বেঁধে দিয়েছিলেন নিজের হাতে। পাটি-খোপা না কী যেন একটা ইংরেজী নাম বলেছিলেন। গিরিবালার মনে নেই। তার বলে তখন সসেমিরা অবস্থা। ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল সে। চম্পির বিয়েতে ওঁরা কেউই আসেন নি, টাকা কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সেজ জা শঙ্খকে দেখতে চেয়েছেন। যে বাউন্ডুলে ছেলে হয়েছে একখান, সেখানে গিয়ে কী যে অসভ্যতা করবে, গিরিবালা সেই ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠল।

ঘরের ভিতর বড্ড গুমোট। গরমে অস্থির হয়ে উঠল গিরিবালা। সে ঘামছে। শঙ্খ গলগল করে ঘামছে। বাবাকেও বারে বারে ঘাম

মুছছে দেখছে। মাঝে মাঝে বাবা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন। পাখা একখানা পেলে হত। গিরিবালা আঁচলটা দিয়ে প্রাণপণে হাওয়া খেতে লাগল।

এর আগে গিরিবালা কখনও ইস্টিশানে রাত কাটায় নি। অদ্ভুত এক জায়গা বটে! ওয়েটিংরুমের এক খুপরি ঘরে বাক্স বিছানা নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ঘরে ছায়া-ছায়া অন্ধকার। দেওয়ালে বড একটা আলো। দেওয়ালগিরির পেটের লাল কালিতে লেখা 'চুয়াডাঙ্গা' কথাটা সে আলোয় জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু ঘরে ভাল আলো হয় নি। কুলি দুটো প্রথমে গিরিবালাকে আরেকটা ঘরে ঢুকিয়ে দিতে গিয়েছিল। সে ঘরের দরজায় একটা মেয়েলোকের ছবি আঁকা। তলায় লেখা 'জেনানা'। এ আবার কী কথা? বাবা ওকে একা-একা সে-ঘরে রাখতে সাহস পান নি। তাই এই ঘরে এনে তুলেছেন। আরও দু-তিনজন লোক আছে সে ঘরে। তাই গিরিবালা এক কোণে গুটিশুটি মেরে ছেলেকে নিয়ে শুয়েছে।

মালগাড়িটা একটু আগে চলে গেল। তবুও গুমোট গেল না। পিড পিড় করে বৃষ্টি পডছে ধারে-কাছের কোন টিনের চালে। গোটাকতক হিন্দুস্থানী খচমচ খচমচ বাজনা বাজিয়ে, গান গেয়ে কানের পোকা নড়িয়ে দিচ্ছে। বাব্বাঃ, এর নাম গান! রক্ষে কর। কাঁচা চামডার বিশ্রী গন্ধ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। গায়ে পাক দিয়ে উঠছে গিরিবালার।

এর মধ্যেও একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল গিরিবালার। হঠাৎ এক বিকট শব্দ, হৈ-চৈ, চেঁচামেচিতে তার ঘুম ভেঙে গেল। শঙ্খও ভয় পেয়ে কেঁদে উঠে পডল। গিরিবালা দেখল একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে। "চ-গ্রাম, পাঁউরুটি বিস্কুট"—টেনে টেনে সুর করে করে বলতে বলতে গোটাকতক লোক এধার-ওধার যাচ্ছে। গিরিবালা আবার ধড়মড় করে উঠে বসল। তাদের গাড়ি এল নাকি?

মেজকর্তা রাতজাগা গলায় বললেন, শো, শো, শুয়ে থাক্। আমাদের গাড়ি শেষ রাত্তিরে আসবে। এখনও অনেক দেরি।

এখনও অনেক দেরি! বাবা, আর কত দেরি হবে! গিরিবালা খানিকটা হতাশ হল। জল তেষ্টা পেয়েছে তার। পেট ভুটভাট করছে। শঙ্খ খুঁতখুঁত করে কান্না জুড়ল। কিছুতেই শোবে না। বিশ্রী লাগছে গিরিবালার। কোনমতে কলকাতায় পৌছতে পারলে সে বাঁচে।

মেজকর্তা নিঃঝুম প্ল্যাটফর্মে শঙ্খকে কোলে নিয়ে ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ পরে ওকে ঘুম পাড়ালেন। ঘরে যে গরম। এই কচি শিশু কি ঘুমতে পারে! একটা পাখা আনা উচিত ছিল। মাঝে মাঝে পশলা পশলা বৃষ্টি হচ্ছে আর ততই যেন গরম বাড়ছে। একেবারে যেন সিদ্ধ করে ছাড়বে। মেজকর্তার পিঠে পেটে এর মধ্যেই বেশ ঘামাচি গজিয়ে গেল। ঘরে এসে ঘুমন্ত নাতিকে মেয়ের কোলে দিয়ে দিলেন।

আবার বাইরে এলেন। বাইরে তবু কিছুটা আরাম পাওয়া যাচ্ছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু তারবাবুর ঘরে টেলিগ্রাফ-যন্ত্রটা মাঝে মাঝে কিট কিট কিট করে উঠছে আবার থেমে যাচ্ছে। তারবাবু টেবিলে হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে নিচ্ছেন খানিক খানিক, আবার ধড়মড় করে ঠেলে উঠে চাবি টিপে টরে-টক্কা টরে-টক্কা টরে-টক্কা টরে-টক্কা টরে করছেন। আর দূরে, প্ল্যাটফর্মের শেষ মুড়ো ছাড়িয়েও অনেক দূরে, সিগন্যালের লাল চোখ নিষ্কম্প চেয়ে আছে। আর মাঝে মাঝে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ে তাঁর দৃষ্টি আবছা করে দিচ্ছে। আর মাঠ থেকে ভেসে আসছে ব্যাঙদের ঐকতান : মক মক মক গ্যাঁ গোঁ মক মক মক মক……

কলকাতায় পৌঁছেই আর বিলম্ব নয়, ভূষণকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে সুধাময়ের খোঁজে। বড় বউ ভুগে ভুগে বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছে। বড্ড উতলা হয়ে উঠেছে সুধার জন্য। ওকে বাড়িতে এবার আনতেই হবে। বড় বউয়ের ইচ্ছে, সুধার বিয়ে দেবার, দিতে হবে ওর বিয়েটা। দায়িত্ব পড়ুক ঘাড়ে। ভাবনা-চিন্তাগুলো অনেক বাস্তব হয়ে উঠবে তা হলে।

দেশ স্বাধীন করার ব্রত নিয়েছে সুধা। বিয়ে করবে না বলে জানিয়েছে। মেজকর্তা হাসলেন। কপনি আঁটার দেশে ত জন্ম। রাতদিন ব্রহ্মচর্য, তপশ্চর্যা, এই সব জিনিস ঘুরছে। স্বাধীনতা মানে যে সমৃদ্ধি, সম্ভোগের অধিকার, সেটা আর এদের মাথায় ঢোকে না। উপোসী আত্মার কি কখনও সদ্‌গতি হয়? কিন্তু বলে দেখ এ কথা, আজকালকার ছেলেরা কেমন তেড়ে আসে, দেখো। মেজকর্তার মাথা আবার কিলবিল করে উঠল। পরনে কপনি হাতে গীতা, দেশোদ্ধারের সব নয়া ফ্যাশান চালু হচ্ছে। আরেক দিকে আসরে নেমেছেন গান্ধী মহারাজ। চরকা কাটো। চরকাতেই স্বরাজ। সবাই যেন ফুসমন্তরে স্বরাজ এনে ফেলবেন। দেশের

লোকের বিচারবুদ্ধি ঘোলা করে দিয়ে চোখ বুজে মন্তর জপাও। আমার কথা শোন, এতেই স্বরাজ আসবে। লোকেরা অজ্ঞ, অবিবেচক থাকুক, তাদের চোখ ফোটাতে অনেক পরিশ্রম। তার চেয়ে কানামাছি খেলাও।

সুধাময় বার বার কানামাছি খেলতে গেছে। মেজকর্তা বার বার তার চোখ ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। কে জানে এবার সুধা তাকে আমল দেবে কিনা?

আকাশের দিকে চেয়ে মেজকর্তা আশ্বাস পেতেই চেষ্টা করলেন হয়ত। কিন্তু কোথায় আকাশ? বর্ষার মেঘে লেপ মুড়ি দিয়ে সে মুখ ঢেকে আছে।

এক সময় ট্রেন আসবার নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। ট্রেন এল না। শোনা গেল দার্জিলিং মেল এক ঘণ্টা লেট। ধীরে ধীরে ইস্টিশানটার ঘুম ভাঙল। সময় গড়াল। ভোর হল, তবু আলো ফুটল না। আকাশে মেঘ। আলো পলাতক। বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। গিরিবালা অতিকষ্টে ইস্টিশানের জল দিয়ে মুখ ধুয়ে এল। শঙ্খকেও ধুইয়ে মুছিয়ে আনল। শঙ্খর ক্ষিধে পেয়েছে। দুধ নেই। যেটুকু এনেছিল গিরিবালা, সেটুকু রাত্রেই খেয়ে ফেলেছে শঙ্খ। এমন বিপত্তি হবে কে জানত? ওদের ত কাল রাত্রেই পৌঁছে যাবার কথা। শঙ্খ ক্ষিধের চোটে কান্না জুড়ে দিল।

মেজকর্তাও বড় বিরক্ত হলেন। দুধ তিনি এখন কোথায় পাবেন? চা-ওয়ালাদের কাছ থেকে কিনতে চেষ্টা করলেন, ওরা দুধ বেচে না। মহা মুশকিল! এর উপর আবার ট্রেনটাও লেট করছে। মেজকর্তা এদিক-ওদিক ঘুরছেন দুধের সন্ধানে। দেখলেন, এক জায়গায় বেশ লোক জড়ো হয়েছে। জনাকুড়ি লোক খদ্দর-টদ্দর পরে হাতে ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। জনাকয়েক মুসলমানও আছে সেই দলে। কী ব্যাপার?

বোধ হয় নেতা-টেতা কেউ আসবে, কি মুক্ত রাজবন্দী। মেজকর্তা ভাবলেন, তাই সম্বর্ধনা জানাবার জন্য এসেছে। শঙ্খ তাঁর কোলে। সে প্রবলভাবে কান্না জুড়েছে। কী যে তিনি করবেন, ভেবে পেলেন না। এমন বৃষ্টি শুরু হয়েছে যে, ইস্টিশানের বাইরের দোকানেও যেতে পারছেন না। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই বৃষ্টি মাথায় করে আরও যে লোক আসছে ইস্টিশানে। এবার যে দলটা এল, তাদের মধ্যে জনাদুয়েক খদ্দর-পরা মহিলাকেও দেখলেন মেজকর্তা। অঝোর ধারায় তাঁরা কাঁদছেন। ব্যাপারটা কী?

শঙ্খ কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে উঠল। মেজকর্তা ওকে নিয়ে আবার ইস্টিশানের ভিতরের দিকে চলে এলেন। প্ল্যাটফর্মে এর মধ্যেই আরও অনেক লোক এসে জমেছে। অনেকের হাতেই মালা। মুখ থমথমে, পা খালি।

দুধ কি মিলবেই না নাকি? বড় মুশকিল হল। শঙ্খ কেঁদে কেঁদে একেবারে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না তাকে। নিস্তব্ধ ইস্টিশানে শঙ্খর গোঁযার কান্না রীতিমত অস্বস্তির মধ্যে ফেলল মেজকর্তাকে। গিরিবালা শেষ পর্যন্ত ওকে কোলে নিয়ে মাই খাওয়াতে বসল। কিছুতেই খাবে না শঙ্খ। এমন সময় ট্রেনের ঘণ্টা বাজল। মেজকর্তা টিকিট কিনতে গেলেন। টিকিট কিনে অগত্যা এক পাউরুটিওলার কাছ থেকে রুটি কিনে খেতে দিলেন শঙ্খকে। শঙ্খ এবারে থামল।

দার্জিলিং মেলখানা যখন ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে এসে ঢুকল, তখন সেটা আষ্টেপৃষ্ঠে ভিজে গিয়েছে। ছাত দিয়ে গা দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। যে লোকগুলো এতক্ষণ ফুল, মালা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা হুড়মুড় করে ইঞ্জিনের দিকে ছুটল। মেজকর্তা অতিকষ্টে ভিড় ঠেলে গিরিবালা আর শঙ্খকে নিয়ে একখানা ইণ্টার ক্লাস কামরায় উঠে পড়লেন। ততক্ষণে গাড়িসুদ্ধ লোক গলা বের করে চিৎকার করতে লেগেছেন, ও মশাই, সামনে নয়, সামনে নয়, পিছনে যান, পিছনে। গার্ডের গাড়ির সঙ্গে যে লগেজ ভ্যান, সেইখানে। সেই ভ্যানেই আছেন।

মেজকর্তা সকলের সমস্বর চিৎকারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। শঙ্খও দাদুর কোলে চড়ে রুটিতে কামড় দিতে দিতে অবাক হয়ে থেমে গেল।

মেজকর্তা দেখলেন, এদের চিৎকার শুনে বাইরের সেই জনতা হন্তদন্ত হয়ে আবার পিছনে ছুট দিল। সেই মহিলা কজনকেও ছুটতে দেখলেন তিনি।

অবাক হয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে মশাই, এত ছুটাছুটি কিসের জন্য?

একজন জবাব দিলেন, সে কী, আপনি জানেন না? দেশবন্ধু যে মারা গেছেন। এই ট্রেনে ডেড বডি যাচ্ছে। লাগেজ ভ্যানে আছে।

দেশবন্ধু মারা গেছেন! মেজকর্তা প্রথমে ধরতে পারলেন না কথাটা। কোন্ দেশবন্ধু? দেশবন্ধু আর কটা আছে বাংলায়? সি আর দাশ মারা গেছেন! মেজকর্তার বুকে কথাটা যেন বুলেট হয়ে এসে বিঁধল।

সে কী, কোথায় মারা গেলেন? দার্জিলিঙে! কাল মারা গেছেন। উঃ, কি প্রোসেশন মশাই, মনে হল দার্জিলিঙ বুঝি ভেঙে পড়বে। যাত্রীরা বলে যাচ্ছেন যে যার কথা। দেখছেন ত কী ভিড় ইস্টিশানে ইস্টিশানে। এখানেই দেড় ঘণ্টার উপর লেট। কলকাতায় সন্ধ্যের আগে পৌছলে হয়। মেজকর্তার কানে কথাগুলোর আওয়াজ ঢুকছে, মানে বুঝতে পারছেন না। দেশবন্ধু এই গাড়িতেই যাচ্ছেন, অথচ তিনি নেই! আশ্চর্য! মুহূর্তে সব ফাঁকা হয়ে গেল যেন। যেন এই ট্রেন নেই, এই ইস্টিশান নেই, বুঝি এই যুগটাও নেই। তার বুকের মধ্যে কেমন যেন শূন্যতার সৃষ্টি হল। ধপ করে বসে পড়লেন মেজকর্তা। বর্তমান কালের সীমা ছাড়িয়ে তাঁর স্মৃতি হু-হু করে উড়ে চলল পিছনে, কলেজী জীবনে। এই অমিত উৎসাহী এক অগ্নিশিখার সংস্পর্শে তখন তিনি এসেছিলেন। অনেক অগ্নিগর্ভ ভাষণ তিনি তখন শুনেছিলেন। পরবর্তী জীবনে দাশ সাহেবের অনেক ভাষণ তিনি কাগজেও পড়েছেন। কিন্তু সব ছাড়িয়ে এখন হঠাৎ তার মনে একটি ভাষণের গোটা কতক লাইন ভেসে উঠল। যে ভাষণটির কথা মেজকর্তাব ম ন পডল, সেটা তাঁব কানে শোনা নয়, কাগজে পড়া। সেটাই যে কেন তাঁর মনে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল এখন, মেজকর্তা তা বলতে পাবেন না। ইংলণ্ডে পড়তে গিয়ে প্রকাশ্য সভায় চিত্তরঞ্জন সেই ভাষণটি দিয়েছিলেন।

"Gentlemen, I was sorry to find it given expression to in Parliamentary speeches on more than one occasion that England conquered India by the sword and by the sword must she keep it! England, gentlemen, did no such thing, it was not her swords and bayonets that won for her this vast and glorious empire, it was not her military valour that achieved this triumph, it was in the main a moral victory or a moral triumph. England might well be proud of it. But to attribute all this to the sword and then to argue that the policy of sword is the only policy that ought to be pursued in India is to my mind absolutely base and quite unworthy of an Englishman.

ইংলণ্ড ভারতকে তরোয়ালের জোরে নয়, বেয়নেটের জোরে নয়, জয় করেছে নৈতিক শক্তির জোরে। তাই ভারতকে তরোয়ালের জোরে দাবিয়ে রাখার কথা ইংরেজের মুখে শোভা পায় না। অতি সত্যি কথা। কিন্তু সত্য কথা বলার সাহস কজন রাখে?

সারাজীবনে অনেক ভাষণ দিয়েছেন দেশবন্ধু, কিন্তু এমন কথা আর বলেন নি। অন্তত মেজকর্তা আর তো শোনেন নি। কী আপসোস, এ কথাতে কোন পক্ষই কর্ণপাত করে নি। কথাটা কেউ মনেও রাখে নি আজ। এ কথা সম্ভবত আর-কেউ বলবেও না। যাঁদের ভাবনায় এমন কথা স্থান পেত, তাঁদের যুগ এই হয়ত শেষ হয়ে গেল।

পরক্ষণেই মনে পড়ল, এই গাড়িতেই দেশবন্ধুর দেহ যাচ্ছে কলকাতায়। তিনিও যাচ্ছেন। তিনি যেন তাঁদের যুগের শবদেহকেই বহন করে নিয়ে চলেছেন। কী আশ্চর্য যোগাযোগ! যাত্রীরা আবার আলোচনায় মেতে উঠলেন। হ্যাঁ, এ-মৃত্যু রাজার মৃত্যু। দেশবন্ধু এখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, কাউন্সিলে বিরোধী দলের নেতা, স্বরাজ্য পার্টির লীডার আর বাংলার দেশবন্ধু। শুধু বাংলার নয় মশাই, উনি গোটা ইণ্ডিয়ার। আরেকজন মন্তব্য করলেন। হঠাৎ মেজকর্তার প্রবল ইচ্ছে হল তাঁকে একবার গিয়ে দেখে আসেন। উঠে পড়লেন চট করে।

বললেন, যাই, একবার দেখে আসি।

একজন সহযাত্রী হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, এখন কোথায় যাচ্ছেন? হুইসেল দিয়েছে গার্ড। গাড়ি ছাড়বে। পরের স্টপেজে গিয়ে দেখে আসবেন।

একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে গাড়ি ছাড়ল। কয়েক ধাক্কায় বেরিয়ে এল ইস্টিশানের বাইরে। জোরে বৃষ্টি নামল। মেজকর্তার সামনের জানলা দিয়ে ছাট আসছে জোরে। যাত্রীরা পটাপট কাচের শার্শি তুলে দিলেন। একটু পরে পিছন থেকেও ছাট আসতে লাগল। সেদিককার শার্শিও তুলে দেওয়া হল। জলের ঝাপটা লেগে কাচের শার্শি অস্বচ্ছ হয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ মেজকর্তার মনে হল, গোটা কামরাটাই, হয়তো বা গোটা ট্রেনটাই, এক বৃহৎ শবাধারে পরিণত হয়েছে।

শূন্য মনে শূন্য চোখে মেজকর্তা অনেকক্ষণ বসে থাকলেন। হঠাৎ শঙ্খর চিৎকারে তাঁর সম্বিত ফিরে এল। এই ত মৃতের রাজ্যে প্রাণের কোলাহল! হঠাৎ শঙ্খ দুমদাম শার্শিতে কিল মারছে, লাফাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে: বিটুটি বিটুটি, বিটুটি!

লেখক পরিচিতি

মৃত্যু গৌরকিশোর ঘোষের কাছে একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এবং স্বাভাবিক। জীবন তাঁর কাছে মৃত্যুর নেতি মাত্র। কাজেই মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর যেমন কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই, জীবন সম্পর্কেও তেমনি কোন মাথাব্যথা নেই।

ঈশ্বর অপেক্ষা ডিপার্টমেন্টের চিফ অনেক বেশি ক্ষমতা ধরেন, গৌর-কিশোর ঘোষ একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন।

অপিচ গৌরকিশোর ঘোষের জীবনের গতি তাঁর স্ত্রী, ডিপার্টমেন্টের চিফ, ঈশ্বর অথবা ইতিহাস-নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়; এ বিষয়ে মানবিক প্রবৃত্তিগুলিই তাঁর সারথি। যা কিছু মানবিক, দেহ মনে ক্রিয়াশীল, তাতেই তাঁর আগ্রহ অন্তহীন।

ন্যায়, বিচার, বিবেক প্রভৃতির অর্থ গৌরকিশোর ঘোষের কাছে স্বচ্ছ নয়। কৃষি ও শিল্পজাত উৎপন্নের তালিকায় তিনি ওগুলির সন্ধান পান নি, জ্যামিতিক উপপাদ্যেও নয়।

সত্য যদি বলতেই হয় তবে, গৌরকিশোর ঘোষ বলেন, বিশ্বাসযোগ্য করে বলবেন। তা না হলে সত্যে মিথ্যার ভেদাভেদ বোঝা যায় না।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে গৌরকিশোর ঘোষকে কোনও শাস্ত্র-পাঠ নিতে হয় নি। শিখেছেন তাঁর সাঁইত্রিশ বছরের জীবনের কাছ থেকে।

গৌরকিশোর ঘোষের জন্ম যশোহর জেলায়, সন ১৯২৩ খ্রীঃ। হাতে খড়ি শ্রীহট্ট জেলার এক চা বাগানে। স্কুলের দরজা পার হন নবদ্বীপে। সন ১৯৪১ খ্রীঃ। ১৯৪৫ সালে আই-এস-সি পাস করেন।

১৯৪১ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি ক্রমামত পেশা বদলেছেন। প্রাইভেট টিউটর, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, ফিটার, এ-আর-পি রেস্কিউ সার্ভিসের খালাসী, রেস্তোরাঁর বয়, কাঠের কনট্রাক্টার, রোড্ সরকার, বিমান জাহাজের ফিটার, ট্রেড্ইউনিয়ন অর্গানাইজার, রেশন দোকানের কেরাণী, ইস্কুল মাস্টার, ওষুধ কোম্পানীর এজেন্ট, কার্ডবোর্ড ও বীমা কোম্পানীর দালাল, বালতির কারখানার এজেন্ট, ভ্রাম্যমান নৃত্য সম্প্রদায়ের ম্যানেজার, ল্যাণ্ডকাস্টমস্ ক্লিয়ারিং কেরাণী, প্রুফ রিডার, সর্বোপরি মোসাহেব।

বর্তমানে পেশাদার রিপোর্টার।

ভাষা সংস্কারের ধার ধারেন না। রচনার প্রধান ত্রুটি, সহজে তা বোঝা যায়।

মুদ্রাকর প্রমাদের ফলে কয়েকটি মারাত্মক ত্রুটি ঘটেছে। আমরা সেজন্য দুঃখিত। কয়েকটি পরিচ্ছেদের ক্রমিক সংখ্যা ওলোটপালোট হয়েছে। ৬৫ পৃষ্ঠায় "এগার" পরিচ্ছেদের সংখ্যাটি বসে নি। ১৮০ পৃষ্ঠায় "তেইশ", ১৮৭ পৃষ্ঠায় "চব্বিশ" এবং ২০৫ পৃষ্ঠায় "পঁচিশে"র বদলে যথাক্রমে "কুড়ি", "একুশ" এবং "বাইশ" পড়তে হবে।

অবশ্য এই ত্রুটির জন্য কাহিনীর ধারাবাহিকতা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি। তবুও এই অসতর্কতার জন্য আমাদের পাঠক পৃষ্ঠপোষকবর্গের কাছে মার্জনা চাইছি।